রবীন্দ্র-রচনাবলী

রবীন্দ্র-রচনাবলী

প্রথম খণ্ড

বিশ্বভারতী
৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা

প্রকাশ ১৩৪৬ আশ্বিন
পুনর্মুদ্রণ ১৩৪৬ চৈত্র, ১৩৪৭ চৈত্র, ১৩৪৯ আশ্বিন
১৩৫২ বৈশাখ, ১৩৫৬ আশ্বিন, ১৩৬৩ মাঘ
চৈত্র ১৩৭০ : ১৮৮৫ শক

মূল্য : কাগজের-মলাট দশ টাকা
রেক্সিন-বাঁধাই তেরো টাকা

প্রকাশক শ্রীকানাই সামন্ত
বিশ্বভারতী। ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭
মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ। ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা ৯
১'৫

সূচী

চিত্রসূচী

নিবেদন

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র বাংলা রচনার একটি নূতন সংস্করণ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশের আয়োজন হইল। প্রত্যেক খণ্ডে চারিটি ভাগ থাকিবে— (১) কবিতা ও গান (২) নাটক ও প্রহসন (৩) উপন্যাস ও গল্প (৪) প্রবন্ধ। রচনাগুলি যথাসম্ভব গ্রন্থপ্রকাশের কালানুক্রম অনুসারে মুদ্রিত হইবে।

এইখানে একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত কবির অনেক রচনা কোনো পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। সেই-সকল রচনা সংগৃহীত হইতেছে, সর্বশেষ খণ্ডে সেগুলি সন্নিবিষ্ট হইবে। প্রকাশকাল অনুসারে সেগুলি যথাস্থানে যোজনা করা এখন আর সম্ভব হইল না।

আর একটি কথা কবি তাঁহার ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রথম-বয়সের অনেক রচনা অত্যন্ত অপরিণত বলিয়া বর্জন করিতে ইচ্ছা করেন, এই রচনাবলীতে সেগুলিকে স্থান দিতে চাহেন না। এই প্রসঙ্গে তিনি আমাদিগকে জানাইয়াছেন—

'ভূরিপরিমাণ যে-সকল লেখাকে আমি ত্যাজ্য বলে গণ্য করি আপনাদের সম্মিলিত নির্বন্ধে সেগুলিকেও স্বীকার করে নিতে হবে। আমার লজ্জা চিরন্তন হয়ে যাবে এবং তাতে আমার নাম-স্বাক্ষর থাকবে। অর্থাৎ ভাবী কালের সামনে যখন দাঁড়াব তখন গাধার টুপিটা খুলতে পারব না। আপনারা তর্ক করে থাকেন, ইতিহাসের আবর্জনা দিয়ে যে গাধার টুপিটা বানানো হয়, ইতিহাসের খাতিরে সেটা মহাকালের আসরে পরে আসতেই হবে। কবির তাতে মাথা হেঁট হয়ে যায়। ইতিহাসও বহু অবাস্তবকে বর্জন করতে করতে তবে সত্য ইতিহাস হয়। মানুষের অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের দেহে যে একটা লম্ববান প্রত্যঙ্গ ছিল সেটাকে সর্বদা পশ্চাতে যোজনা করে বেড়ালে মানুষের ইতিহাস উজ্জ্বল হয় না, এ কথা মানবসন্তান মাত্রেই স্বীকার করে থাকে।'

ভূমিকাতেও তিনি এইরূপ যুক্তি দিয়াছেন। তবে শেষ অবধি একটা আপস-নিষ্পত্তি হইয়াছে, যে-সব রচনা তিনি বর্জনীয় বলিয়া মনে করেন তাহার অধিকাংশই পরিশিষ্ট খণ্ডে স্থান পাইবে।

বিভিন্ন সংস্করণে অনেক গ্রন্থের স্থানে স্থানে কবি অল্পবিস্তর পরিবর্তন করিয়াছেন। বর্তমানে যে পাঠ তাঁহার অনুমোদিত, এই রচনাবলীতে সেই পাঠই অনুসৃত হইল।

আশ্বিন ১৩৪৬

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

ভূমিকা

বিশ্বভারতী গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতির অধ্যক্ষেরা আমার গদ্য পদ্য সমস্ত লেখা একসঙ্গে জড়ো করে বিশেষভাবে সাজিয়ে ছাপাবার সংকল্প করেছেন। কাজটি পরিমাণে বৃহৎ এবং সম্পাদনায় দুঃখসাধ্য; এ রকম অনুষ্ঠান আমাদের দেশের সকল শ্রেণীর সাহিত্যবিচারকদের সম্পূর্ণ মনের মতো করে তোলা কারও শক্তিতে নেই এ কথা নিশ্চিত জেনে নিজে এর দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি নিয়েছি। যাঁরা সাহস করে এর ভার বহন করতে প্রস্তুত তাঁদের জন্যে উদ্‌বিগ্ন রইলুম।

অতি অল্প বয়স থেকে স্বভাবতই আমার লেখার ধারা আমার জীবনের ধারার সঙ্গে সঙ্গেই অবিচ্ছিন্ন এগিয়ে চলেছে। চারি দিকের অবস্থা ও আবহাওয়ার পরিবর্তনে এবং অভিজ্ঞতার নূতন আমদানি ও বৈচিত্র্যে রচনার পরিণতি নানা বাঁক নিয়েছে ও রূপ নিয়েছে; একটা কোনো ঐক্যের স্বাক্ষর তাদের সকলের মধ্যে অঙ্কিত হয়ে নিশ্চয়ই পরস্পরের আত্মীয়তার প্রমাণ দিতে থাকে। যাঁরা বাইরে থেকে সন্ধান ও চর্চা করেন তাঁদের বিচারবুদ্ধির কাছে সেটা ধরা পড়ে। কিন্তু লেখকের কাছে সেটা স্পষ্ট গোচর হয় না। মনের ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে যখন ফুল ফোটায়, ফল ফলায়, তখন সেইটের আবেগ ও বাস্তবতাই কবির কাছে হয় একান্ত প্রত্যক্ষ। তার মাঝে মাঝে সময় আসে যখন ফলন যায় কমে, যখন হাওয়ার মধ্যে প্রাণশক্তির প্রেরণা হয় ক্ষীণ। তখন ইতস্তত যে ফসলের চিহ্ন দেখা দেয় সে আগেকার কাটা শস্যের পোড়ো বীজের অঙ্কুর। এই অফলা সময়গুলো ভোলবার যোগ্য। এটা হল উঞ্ছবৃত্তির ক্ষেত্র তাঁদেরই কাছে যাঁরা ঐতিহাসিক সংগ্রহকর্তা। কিন্তু ইতিহাসের সম্বল আর কাব্যের সম্পত্তি এক জাতের নয়।

ইতিহাস সবই মনে রাখতে চায় কিন্তু সাহিত্য অনেক ভোলে। ছাপাখানা ঐতিহাসিকের সহায়। সাহিত্যের মধ্যে আছে বাছাই করার

ধর্ম, ছাপাখানা তার প্রবল বাধা। কবির রচনাক্ষেত্রকে তুলনা করা যেতে পারে নীহারিকার সঙ্গে। তার বিস্তীর্ণ ঝাপসা আলোর মাঝে মাঝে ফুটে উঠেছে সংহত ও সমাপ্ত সৃষ্টি। সেইগুলিই কাব্য। আমার রচনায় আমি তাদেরই স্বীকার করতে চাই। বাকি যত ক্ষীণ বাষ্পীয় ফাঁকগুলি যথার্থ সাহিত্যের শামিল নয়। ঐতিহাসিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী; বাষ্প, নক্ষত্র, ফাঁক, কোনোটাকেই সে বাদ দিতে চায় না।

আমার আয়ু এখন পরিণামের দিকে এসেছে। আমার মতে আমার শেষ কর্তব্য হচ্ছে, যে লেখাগুলিকে মনে করি সাহিত্যের লক্ষ্যে এসে পৌচেছে তাদের রক্ষা করে বাকিগুলোকে বর্জন করা। কেননা রসসৃষ্টির সত্য পরিচয়ের সেই একমাত্র উপায়। সব-কিছুকে নির্বিচারে রাশীকৃত করলে সমগ্রকে চেনা যায় না। সাহিত্যরচয়িতারূপে আমার চিত্তের যে একটি চেহারা আছে সেইটেকে স্পষ্ট করে প্রকাশ করা যেতে পারলেই আমার সার্থকতা। অরণ্যকে চেনাতে গেলেই জঙ্গলকে সাফ করা চাই, কুঠারের দরকার।

একেবারে শ্রেষ্ঠ লেখাগুলিকে নিয়েই আঁট করে তোড়া বাঁধতে হবে এ কথা আমি বলিনে। একটা আদর্শ আছে সেটা নিছক পয়লা শ্রেণীর আদর্শ নয়, সেটা সাধারণ চলতি শ্রেণীর আদর্শ। তার মধ্যে পরস্পরের মূল্যের কমিবেশি আছে। রেলগাড়িতে যেমন প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর কামরা। তাদের রূপের ও ব্যবহারের আদর্শ ঠিক এক নয় কিন্তু চাকায় চাকায় মিল আছে। একটা সাধারণ সমাপ্তির আদর্শ তারা সকলেই রক্ষা করেছে। যারা অসম্পূর্ণ, কারখানা-ঘরের বাইরে তাদের আনা উচিত হয় না। কিন্তু তারা যে অনেক এসে পড়েছে, তা এই বইয়ের গোড়ার দিকের কবিতাগুলি দেখলে ধরা পড়বে। কুয়াশা যেমন বৃষ্টি নয় এরাও তেমনি কবিতা নয়। যাঁরা পড়বেন তাঁরা এইসব কাঁচা বয়সের অকালজাত অঙ্গহীনতার নমুনা দেখে যদি হাসতে হয় তো হাসবেন, তবু একটুখানি দয়া রাখবেন মনে এই ভেবে যে, ভাগ্যক্রমে এই আরম্ভই শেষ নয়। এই প্রসঙ্গে একটা কথা জানিয়ে

রাখি, এই বইয়ে যে গীতিনাট্য ছাপানো হয়েছে তার গানগুলিকে কেউ যেন কবিতা বলে সন্দেহ না করেন।

সাহিত্যরচনার মধ্যে জীবধর্ম আছে। নানা কারণে তারা সবাই একই পূর্ণতায় দেখা দেয় না। তাদের সবাইকে একত্রে এলোমেলো বাড়তে দিলে সবারই ক্ষতি হয়। মনে আছে এক সময়ে বিজয়া পত্রে বিপিনচন্দ্র পাল আমার রচিত গানের সমালোচনা করেছিলেন। সে সমালোচনা অনুকূল হয়নি। তিনি আমার যে-সব গানকে তলব দিয়ে বিচারকক্ষে দাঁড় করিয়েছিলেন তাদের মধ্যে বিস্তর ছেলেমানুষি ছিল। তাদের সাক্ষ্য সংশয় এনেছিল সমস্ত রচনার 'পরে। তারা সেই পরিণতি পায়নি যার জোরে গীতসাহিত্যসভায় তারা আপনাদের লজ্জা নিবারণ করতে পারে। ইতিহাসের রসদ জোগাবার কাজে ছাপাখানার আড়কাঠির হাতে সাহিত্যমহলে তাদের চালান দেওয়া হয়েছে। তাদের সরিয়ে আনতে গেলে ইতিহাস আপন পুরাতন দাবির দোহাই পেড়ে আপত্তি পেশ করে।

আজ যদি আমার সমস্ত রচনার সমগ্র পরিচয় দেবার সময় উপস্থিত হয়ে থাকে তবে তাদের মধ্যে ভালো মন্দ মাঝারি আপন আপন স্থান পাবে এ কথা মানা যেতে পারে। তারা সবাই মিলেই সমষ্টির স্বাভাবিকতা রক্ষা করে। কেবল যাদের মধ্যে পরিণতি ঘটেনি তারা কোনো এক সময়ে দেখা দিয়েছিল বলেই যে ইতিহাসের খাতিরে তাদের অধিকার স্বীকার করতে হবে এ কথা শ্রদ্ধেয় নয়। সেগুলোকে চোখের আড়াল করে রাখতে পারলেই সমস্তগুলোর সম্মান থাকে।

অতএব আমার সমস্ত লেখা সংগ্রহ করার মানে হচ্ছে এই যে, যে-সব লেখা অন্তত আমারই রচনার আদর্শ অনুসারে লেখায় প্রস্ফুট হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের একত্র করা। বিধাতার হাতের কাজে অসম্পূর্ণ সৃষ্টি মাঝে মাঝে দেখা দেয়, কিন্তু দেখা দিয়েছে বলেই যে টিকে যায় তা নয়, সম্পূর্ণ সৃষ্টির সঙ্গে সামঞ্জস্য হয় না বলেই তাদের জবাব দেওয়া হয়। সেইরকম জবাব-দেওয়া লাঞ্ছন-ধারী রচনা অনেকগুলিই পাওয়া

যাবে এই গ্রন্থের শুরু থেকেই, তাদের ভিড় ঠেলে পাঠকেরা আপন চেষ্টায় যদি পথ করে চলে যান তবে তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা হবে। প্রথম বুনোনির সময় যে মাটি বৃষ্টি পায়নি, তার তৃষার্ত পীড়িত বীজ থেকে কুঞ্চিত হয়ে যে অঙ্কুর বেরোয় সে যেমন কিছু একটা প্রকাশ করতে চায় কিন্তু তার পূর্বেই ব্যর্থ হয়ে যায় মরে, সন্ধ্যাসংগীতের কবিতা সেই জাতের। একে সংগ্রহ করে রাখবার মূল্য নেই। এর কেবল একটা দাম আছে, সে হচ্ছে চিত্তচাঞ্চল্যের আবেগে বাঁধা ছন্দের শিকল ভাঙা।

অনেক দিনের রচনাগুলো যখন একত্র জমা করা যায় তখন এই ভাবনাটা মনে আসে। তারা নানা বয়সের ও মনের নানা অবস্থার সামগ্রী। শুধু নিজের মনের নয়, চারি দিকের মনের। ইতিহাসের এই অনিবার্য বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়েই সাহিত্যের তরী চলে আপন তীর্থে। সকলের চেয়ে ভেদ ঘটায় রচনাশক্তির কমিবেশিতে। এক সময়ে বিশেষ রসের আয়োজনে মনকে যা টেনেছিল, আর-এক সময়ে তা টানে না, কিংবা অন্য রকম করে টানে। তাতে কোনো ক্ষতি হয় না যদি তার তৎকালীন প্রকাশটা হয় সম্পূর্ণ জোরের সঙ্গে। অনেক সময়ে সেইটেই হয় না। আমরা যাকে বলি ছেলেমানুষি, কাব্যের বিষয় হিসাবে সেটা অতি উত্তম, রচনার রীতি হিসাবে সেটা উপেক্ষার যোগ্য। বয়সের এক পর্বে যা লিখেছি অন্য পর্বে তা লিখিনে কিংবা হয়তো অন্য রকম করে লিখি। সেই তার রূপ ও রসের পরিবর্তন যদি যথাসময়ে আপন প্রকাশরীতির যোগ্য বাহন পেয়ে থাকে তা হলে কোনো নালিশ থাকে না। যুগপরিবর্তন ইতিহাসের অঙ্গ, কিন্তু সাহিত্যের একটা মূলনীতি সকল পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে মানুষের মনকে আনন্দের জোগান দিয়ে থাকে, সেটা হচ্ছে আমাদের অলংকার-শাস্ত্রে যাকে বলে রসতত্ত্ব। এই রস আধুনিকী বা সনাতনী কোনো বিশেষ মালমসলার ফরমাশে তৈরি হয় না। কখনো কখনো কোনো অর্থনৈতিক রাষ্ট্রনৈতিক সমাজনৈতিক গোঁড়ামি জেগে উঠে রসসৃষ্টি-শালায় ডিক্টেটরি করতে আসে, বাইরে থেকে দণ্ড হাতে তাদের শাসন

চালায়, মনে করে চিরকালের মতো অপ্রতিহত তাদের প্রভাব। তাদের তকমা চোখ ভোলায় যাদের, তারা রসরাজ্যের বাইরের লোক, তারা রবাহূত; এক-একটা বিশেষ রব শুনে অভিভূত হয়, ভিড় করে। রসের প্রকৃতি হচ্ছে যাকে বলা যায় গুহাহিত, অভাবনীয়, সে কোনো বিশেষ উত্তেজিত সাময়িকতার আইনকানুনের অধীন নয়। তার প্রকাশ এবং তার লুপ্তি মানবপ্রকৃতির যে নিগূঢ় বিশেষত্বের সঙ্গে জড়িত তা কেউ স্পষ্ট নির্ণয় করতে পারে না। স্বভাবের গহন সৃষ্টিশালার গভীর প্রেরণায় মানুষ আপন খেলনা গড়ে আবার খেলনা ভাঙে। আমরা কারিগররা তার সেই ভাঙাগড়ার লীলায় উপকরণ জুগিয়ে আসছি। কিন্তু সেগুলো নিতান্ত খেলনা নয়, সেগুলো কীর্তি, প্রত্যেকবার মানুষ এই আশা করে, নইলে তার হাত চলে না। অথচ সেই সঙ্গেই একটা নিরাসক্ত বৈরাগ্যকে রক্ষা করতে পারলেই ভালো।

আমার আশি বছর বয়সের সাহিত্যিক প্রয়াসকে সম্পূর্ণ আকারে পুঞ্জিত করবার এই যে চেষ্টা আজ দেখছি, এর মধ্যে নিশ্চিত অনুমান করছি অনেক গাঁথুনি আছে, যার উপরে আগামী কালের বিস্মরণের দূত প্রত্যহ অদৃশ্য কালীতে আসন্ন লুপ্তির চিহ্ন অঙ্কিত করে চলেছে। এ সম্বন্ধে আমার মনে কোনো মোহ নেই, এবং ক্ষোভ করাও বৃথা বলে মনে করি।

এই যদি সত্য হয়, তবে যে সুহৃদ্‌রা আমার রচনাগুলি রক্ষণীয় বলে গণ্য করছেন তাঁদের ইচ্ছাকে কী বলে সম্মান করা যায়। এ উপলক্ষে পৃথিবীতে জীববংশধারার ইতিহাস স্মরণের যোগ্য। কালের পরিবর্তিত গতির সঙ্গে অনেক জীব তাল রেখে চলতে পারেনি, প্রাণরঙ্গশালা থেকে সেই বেতালাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সবাই তো সরেনি। অনেক আছে কালের সঙ্গে তাদের মিল ভাঙেনি। আজ নূতনও তাদের দাবি করে, পুরাতনও তাদের ত্যাগ করেনি। কি শিল্পকলায় কি সাহিত্যে, যদি তার যথেষ্ট প্রমাণ না থাকত তা হলে বলতে হত—, সৃষ্টিকর্তা মানুষের মন আপন পিছনের রাস্তা

ক্রমাগত পুড়িয়ে ফেলতে ফেলতেই চলেছে। কথাটা তো সত্য নয়। মানুষ সামনের দিকে যেমন অগ্রসরণ করে তেমনি অনুসরণ করে পিছনের, নইলে তার চলাই হয় না। পিছনহারা সাহিত্য বলে যদি কিছু থাকে সে কবন্ধ, সে অস্বাভাবিক।

তাই বলছি, আজ যাঁরা আমার রচনাকে স্থায়ী সম্মানের রূপ দিতে প্রবৃত্ত হয়েছেন তাঁরা আপন রুচি ও সংস্কৃতি অনুসারে তার স্থায়িত্ব উপলব্ধি করেছেন। মানুষ আপনার এই উপলব্ধিকে বিশ্বাস করেই পাকা ইমারতের কাজ ফাঁদে, ভুল হতে পারে, কিন্তু ভুল না হওয়ার সম্ভাবনাকে মানুষ যে আস্থা করে সেই আস্থারই মূল্য বেশি। বর্তমান অনুষ্ঠানকর্তাদের সম্বন্ধে এই হচ্ছে বলবার কথা। আর আমার কথা যদি বল, আমি মনুর উপদেশ মানব—, নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতং। যে যায় যাক্, যে থাকে থাক্। সেই সঙ্গে মিথ্যা বিনয়ের ভাণ করব না। বন্ধুরা আমার এতকালের অধ্যবসায়কে যে নিশ্চিত শ্রদ্ধার মূল্য দিতে প্রবৃত্ত হয়েছেন আমিও তাকে শ্রদ্ধা করে সেই দানের মধ্যে আমার শেষ পুরস্কার গ্রহণ করব। কাল তাঁদের ফাঁকি দেবে না এবং বিড়ম্বনা করবে না কবিকেও, এই কথায় সংশয় করার চেয়ে বিশ্বাস করাতে উপস্থিত লাভ, কেননা কালের দরবারে এর শেষ মীমাংসার সম্ভাবনা দূরে আছে।

সবশেষে এই কথা জানিয়ে রাখছি, যাঁরা এই গ্রন্থপ্রকাশের ভার নিয়েছেন তাঁদের দুঃসাধ্য কাজে আমি যথাসাধ্য দৃষ্টি রাখব এবং তাঁরা আমার সমর্থনের অনুসরণ করবেন।

৩০।৬।৩৯
শ্রীনিকেতন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম খণ্ডের বিজ্ঞপ্তি

কবির সপ্ততিতম জয়ন্তী উপলক্ষে ছাত্রছাত্রীগণের সংবর্ধনার উত্তরে তিনি যে প্রতিভাষণ পাঠ করেন বালক-কবির সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ হইতে আরম্ভ করিয়া নানা পর্বের মধ্য দিয়া তাঁহার কবিজীবনের পরিণতির কথা অল্পপরিসরের মধ্যে তাহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। রবীন্দ্র-রচনাবলীর অবতরণিকারূপে এই প্রতিভাষণটি মুদ্রিত হইল।

প্রথম খণ্ডের চারিটি ভাগে যথাক্রমে সন্ধ্যাসংগীত, প্রকৃতির প্রতিশোধ, বউ-ঠাকুরানীর হাট ও য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র প্রথম স্থান পাইয়াছে। ইহার পূর্বে লিখিত অনেক রচনা আমাদের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা অনুসারে পরিশিষ্ট খণ্ডে প্রকাশিত হইবে।

এই রচনাবলী প্রকাশকল্পে বিশেষ শ্রম স্বীকার করিয়া ও সর্বদা আমাদের উপদেশ দিয়া শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু আমাদের একান্ত কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন সাঁতরা, শ্রীযুক্ত বিজনবিহারী ভট্টাচার্য ও শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন এই রচনাবলীর সম্পাদনায় সহ-যোগিতা করিয়া গ্রন্থপ্রকাশ সহজসাধ্য করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গ্রন্থের প্রকাশকাল ইত্যাদি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ ও শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোমের রচনা হইতে কোনো কোনো বিষয়ে সাহায্য লইয়াছি। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু, শ্রীযুক্ত অনিলকুমার চন্দ, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেন, শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, শ্রীযুক্ত পৃথ্বীসিং নাহার ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র-নাথ কর নানা বিষয়ে আমাদের আনুকূল্য ও সহায়তা করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলের নিকট আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র বাংলা রচনাবলীর সম্পাদন সহজসাধ্য ও সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য রবীন্দ্র-সাহিত্যানুরাগী সকলেরই সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করি।

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

অবতরণিকা

যে সংসারে প্রথম চোখ মেলেছিলুম সে ছিল অতি নিভৃত। শহরের বাইরে শহরতলির মতো, চারি দিকে প্রতিবেশীর ঘরবাড়িতে কলরবে আকাশটাকে আঁট করে বাঁধেনি।

আমাদের পরিবার আমার জন্মের পূর্বেই সমাজের নোঙর তুলে দূরে বাঁধা-ঘাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল। আচার-অনুশাসন ক্রিয়াকর্ম সেখানে সমস্তই বিরল।

আমাদের ছিল মস্ত একটা সাবেক কালের বাড়ি, তার ছিল গোটাকতক ভাঙা ঢাল বর্শা ও মরচে-পড়া তলোয়ার -খাটানো দেউড়ি, ঠাকুরদালান, তিন-চারটে উঠোন, সদর-অন্দরের বাগান, সম্বৎসরের গঙ্গাজল ধরে রাখবার মোটা মোটা জালা -সাজানো অন্ধকার ঘর। পূর্বযুগের নানা পালপার্বণের পর্যায় নানা কলরবে সাজে সজ্জায় তার মধ্য দিয়ে একদিন চলাচল করেছিল, আমি তার স্মৃতিরও বাইরে পড়ে গেছি। আমি এসেছি যখন, এ বাসায় তখন পুরাতন কাল সদ্য বিদায় নিয়েছে, নতুন কাল সবে এসে নামল, তার আসবাবপত্র তখনও এসে পৌঁছয়নি।

এ বাড়ি থেকে এ-দেশীয় সামাজিক জীবনের স্রোত যেমন সরে গেছে তেমনি পূর্বতন ধনের স্রোতেও পড়েছে ভাঁটা। পিতামহের ঐশ্বর্য-দীপাবলী নানা শিখায় একদা এখানে দীপ্যমান ছিল, সেদিন বাকি ছিল দহনশেষের কালো দাগগুলো, আর ছাই, আর একটিমাত্র কম্পমান ক্ষীণ শিখা। প্রচুর উপকরণসমাকীর্ণ পূর্বকালের আমোদ-প্রমোদ-বিলাস-সমারোহের সরঞ্জাম কোণে কোণে ধূলিমলিন জীর্ণ অবস্থায় কিছু কিছু বাকি যদি বা থাকে তাদের কোনো অর্থ নেই। আমি ধনের মধ্যে জন্মাইনি, ধনের স্মৃতির মধ্যেও না।

নিরালায় এই পরিবারে যে স্বাতন্ত্র্য জেগে উঠেছিল সে স্বাভাবিক, মহাদেশ থেকে দূরবিচ্ছিন্ন দ্বীপের গাছপালা জীবজন্তুরই স্বাতন্ত্র্যের মতো।

তাই আমাদের ভাষায় একটা কিছু ভঙ্গী ছিল কলকাতার লোক যাকে ইশারা করে বলত ঠাকুরবাড়ির ভাষা। পুরুষ ও মেয়েদের বেশভূষাতেও তাই, চালচলনেও।

বাংলা ভাষাটাকে তখন শিক্ষিতসমাজ অন্দরে মেয়েমহলে ঠেলে রেখেছিলেন; সদরে ব্যবহার হত ইংরেজি— চিঠিপত্রে, লেখাপড়ায়, এমন-কি মুখের কথায়। আমাদের বাড়িতে এই বিকৃতি ঘটতে পারেনি। সেখানে বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগ ছিল সুগভীর, তার ব্যবহার ছিল সকল কাজেই।

আমাদের বাড়িতে আর একটি সমাবেশ হয়েছিল সেটি উল্লেখযোগ্য। উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাক্‌পৌরাণিক যুগের ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতি বাল্যকালেই প্রায় প্রতিদিনই বিশুদ্ধ উচ্চারণে অনর্গল আবৃত্তি করেছি উপনিষদের শ্লোক। এর থেকে বুঝতে পারা যাবে সাধারণত বাংলাদেশে ধর্মসাধনায় ভাবাবেগের যে উদ্বেলতা আছে আমাদের বাড়িতে তা প্রবেশ করেনি। পিতৃদেবের প্রবর্তিত উপাসনা ছিল শান্ত সমাহিত।

এই যেমন এক দিকে তেমনি অন্য দিকে আমার গুরুজনদের মধ্যে ইংরেজি সাহিত্যের আনন্দ ছিল নিবিড়। তখন বাড়ির হাওয়া শেক্‌স্‌পীয়রের নাট্যরস-সম্ভোগে আন্দোলিত, সার ওঅল্‌টার স্কটের প্রভাবও প্রবল। দেশপ্রীতির উন্মাদনা তখন দেশে কোথাও নেই। রঙ্গলালের "স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে" আর তার পরে হেমচন্দ্রের "বিংশতি কোটি মানবের বাস" কবিতায় দেশমুক্তি-কামনার সুর ভোরের পাখির কাকলির মতো শোনা যায়। হিন্দুমেলার পরামর্শ ও আয়োজনে আমাদের বাড়ির সকলে তখন উৎসাহিত, তার প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন নবগোপাল মিত্র। এই মেলার গান ছিল মেজদাদার লেখা "জয় ভারতের জয়", গণদাদার লেখা "লজ্জায় ভারত-যশ গাইব কী করে", বড়দাদার "মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি"। জ্যোতিদাদা এক গুপ্তসভা স্থাপন করেছেন—একটি পোড়ো বাড়িতে

তার অধিবেশন; ঋগ্‌বেদের পুঁথি, মড়ার মাথার খুলি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান; রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত; সেখানে আমরা ভারত-উদ্ধারের দীক্ষা পেলেম।

এই-সকল আকাঙ্ক্ষা উৎসাহ উদ্‌যোগ এর কিছুই ঠেলাঠেলি ভিড়ের মধ্যে নয়। শান্ত অবকাশের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে এর প্রভাব আমাদের অন্তরে প্রবেশ করেছিল। রাজসরকারের কোতোয়াল হয় তখন সতর্ক ছিল না, নয় উদাসীন ছিল, তারা সভার সভ্যদের মাথার খুলি ভঙ্গ বা রসভঙ্গ করতে আসেনি।

কলকাতা শহরের বক্ষ তখন পাথরে বাঁধানো হয়নি, অনেকখানি কাঁচা ছিল। তেল-কলের ধোঁওয়ায় আকাশের মুখে তখনও কালী পড়েনি। ইমারত-অরণ্যের ফাঁকায় ফাঁকায় পুকুরের জলের উপর সূর্যের আলো ঝিকিয়ে যেত, বিকেলবেলায় অশথের ছায়া দীর্ঘতর হয়ে পড়ত, হাওয়ায় দুলত নারকেল গাছের পত্র-ঝালর, বাঁধা নালা বেয়ে গঙ্গার জল ঝরনার মতো ঝরে পড়ত আমাদের দক্ষিণ বাগানের পুকুরে, মাঝে মাঝে গলি থেকে পালকি-বেহারার হাঁইহুঁই শব্দ আসত কানে, আর বড়ো রাস্তা থেকে সহিসের হেইও হাঁক। সন্ধ্যাবেলায় জ্বলত তেলের প্রদীপ, তারই ক্ষীণ আলোয় মাদুর পেতে বুড়ি দাসীর কাছে শুনতুম রূপকথা। এই নিস্তব্ধপ্রায় জগতের মধ্যে আমি ছিলুম এক কোণের মানুষ— লাজুক, নীরব, নিশ্চঞ্চল।

আরও একটা কারণে আমাকে খাপছাড়া করেছিল। আমি ইস্কুল-পালানো ছেলে, পরীক্ষা দিইনি, পাশ করিনি, মাস্টার আমার ভাবী কালের সম্বন্ধে হতাশ্বাস। ইস্কুলঘরের বাইরে যে অবকাশটা বাধাহীন সেইখানে আমার মন হাঘরেদের মতো বেরিয়ে পড়েছিল।

ইতিপূর্বেই কোন্ একটা ভরসা পেয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করেছিলুম, লোকে যাকে বলে কবিতা সেই ছন্দ-মেলানো মিল-করা ছড়াগুলো সাধারণ কলম দিয়েই সাধারণ লোকে লিখে থাকে। তখন দিনও এমন ছিল, ছড়া যারা বানাতে পারত তাদের দেখে লোক বিস্মিত

হত। এখন যারা না পারে তারাই অসাধারণ বলে গণ্য। পয়ার-ত্রিপদী মহলে আপন অবাধ অধিকারবোধের অক্লান্ত উৎসাহে লেখায় মাতলুম। আট অক্ষর দশ অক্ষরের চৌকো-চৌকো কত রকম শব্দভাগ নিয়ে চলল ঘরের কোণে আমার ছন্দ-ভাঙাগড়ার খেলা। ক্রমে প্রকাশ পেল দশজনের সামনে।

এই লেখাগুলি যেমনি হোক এর পিছনে একটি ভূমিকা আছে— সে হচ্ছে একটি বালক, সে কুনো, সে একলা, সে একঘরে, তার খেলা নিজের মনে। সে ছিল সমাজের শাসনের অতীত, ইস্কুলের শাসনের বাইরে। বাড়ির শাসনও তার হালকা। পিতৃদেব ছিলেন হিমালয়ে, বাড়িতে দাদারা ছিলেন কর্তৃপক্ষ। জ্যোতিদাদা, যাঁকে আমি সকলের চেয়ে মানতুম, বাইরে থেকে তিনি আমাকে কোনো বাঁধন পরাননি। তাঁর সঙ্গে তর্ক করেছি, নানা বিষয়ে আলোচনা করেছি বয়স্যের মতো। তিনি বালককেও শ্রদ্ধা করতে জানতেন। আমার আপন মনের স্বাধীনতার দ্বারাই তিনি আমার চিত্তবিকাশের সহায়তা করেছেন। তিনি আমার ’পরে কর্তৃত্ব করবার ঔৎসুক্যে যদি দৌরাত্ম্য করতেন তা হলে ভেঙে-চুরে তেড়ে-বেঁকে যা-হয়-একটা-কিছু হতুম, সেটা হয়তো ভদ্রসমাজের সন্তোষজনকও হত, কিন্তু আমার মতো একেবারেই হত না।

শুরু হল আমার ভাঙাছন্দে টুকরো কাব্যের পালা, উল্কাবৃষ্টির মতো; বালকের যা-তা ভাবের এলোমেলো কাঁচা গাঁথুনি। এই রীতি-ভঙ্গের ঝোঁকটা ছিল সেই একঘরে ছেলের মজ্জাগত। এতে যথেষ্ট বিপদের শঙ্কা ছিল। কিন্তু এখানেও অপঘাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেছি। তার কারণ, আমার ভাগ্যক্রমে সেকালে বাংলা সাহিত্যে খ্যাতির হাটে ভিড় ছিল অতি সামান্য— প্রতিযোগিতার উত্তেজনা উত্তপ্ত হয়ে ওঠেনি। বিচারকের দণ্ড থেকে অপ্রশংসার অপ্রিয় আঘাত নামত, কিন্তু কটূক্তি ও কুৎসার উত্তেজনা তখনও সাহিত্যে ঝাঁঝিয়ে ওঠেনি।

সেদিনকার অল্পসংখ্যক সাহিত্যিকের মধ্যে আমি ছিলেম বয়সে সব-

চেয়ে ছোটো, শিক্ষায় সব-চেয়ে কাঁচা। আমার ছন্দগুলি লাগাম-ছেঁড়া, লেখবার বিষয় ছিল অস্ফুট উক্তিতে ঝাপসা, ভাষার ও ভাবের অপরিণতি পদে পদে। তখনকার সাহিত্যিকেরা মুখের কথায় বা লেখায় প্রায়ই আমাকে প্রশ্রয় দেননি— আধো-আধো বাধো-বাধো কথা নিয়ে বেশ একটু হেসেছিলেন। সে হাসি বিদূষকের নয়, সেটা বিদূষণ-ব্যবসায়ের অঙ্গ ছিল না। তাঁদের লেখায় শাসন ছিল, অসৌজন্য ছিল না লেশমাত্র। বিমুখতা যেখানে প্রকাশ পেয়েছে সেখানেও বিদ্বেষ দেখা দেয়নি। তাই প্রশ্রয়ের অভাব সত্ত্বেও, বিরুদ্ধ রীতির মধ্য দিয়েও, আপন লেখা আপন মতে গড়ে তুলেছিলেম।

সেদিনকার খ্যাতিহীনতার স্নিগ্ধ প্রথম প্রহর কেটে গেল। প্রকৃতির শুশ্রূষা ও আত্মীয়দের স্নেহের ঘনচ্ছায়ায় ছিলেম বসে। কখনো কাটিয়েছি তেতালার ছাদের প্রান্তে কর্মহীন অবকাশে মনে মনে আকাশ-কুসুমের মালা গেঁথে, কখনো গাজিপুরের বৃদ্ধ নিমগাছের তলায় বসে ইঁদারার জলে বাগান সেঁচ দেবার করুণধ্বনি শুনতে শুনতে অদূর গঙ্গার স্রোতে কল্পনাকে অহৈতুক বেদনায় বোঝাই করে দূরে ভাসিয়ে দিয়ে। নিজের মনের আলো-আঁধারের মধ্যে থেকে হঠাৎ পরের মনের কনুইয়ের ধাক্কা খাবার জন্যে বড়ো রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে হবে এমন কথা সেদিন ভাবিওনি। অবশেষে একদিন খ্যাতি এসে অনাবৃত মধ্যাহ্নরৌদ্রে টেনে বের করলে। তাপ ক্রমেই বেড়ে উঠল, আমার কোণের আশ্রয় একেবারে ভেঙে গেল। খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে যে গ্লানি এসে পড়ে আমার ভাগ্যে অন্যদের চেয়ে তা অনেক বেশি আবিল হয়ে উঠেছিল। এমন অনবরত, এমন অকুণ্ঠিত, এমন অকরুণ, এমন অপ্রতিহত অসম্মাননা আমার মতো আর কোনো সাহিত্যিককেই সইতে হয়নি। এও আমার খ্যাতি-পরিমাপের বৃহৎ মাপকাঠি। এ কথা বলবার সুযোগ পেয়েছি যে, প্রতিকূল পরীক্ষায় ভাগ্য আমাকে লাঞ্ছিত করেছে, কিন্তু পরাভবের অগৌরবে লজ্জিত করেনি। এ ছাড়া আমার দুর্‌গ্রহ কালো বর্ণের এই যে পটটি ঝুলিয়েছেন এরই উপরে আমার বন্ধুদের সুপ্রসন্ন

মুখ সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তাঁদের সংখ্যা অল্প নয়, সে কথা বুঝতে পারি আজকের এই অনুষ্ঠানেই। বন্ধুদের কাউকে জানি, অনেককেই জানিনে। তাঁরাই কেউ কাছে থেকে কেউ দূরে থেকে এই উৎসবে মিলিত হয়েছেন, সেই উৎসাহে আমার মন আনন্দিত। আজ আমার মনে হচ্ছে তাঁরা আমাকে জাহাজে তুলে দিতে ঘাটে এসে দাঁড়িয়েছেন— আমার খেয়াতরী পাড়ি দেবে দিবালোকের পরপারে তাঁদের মঙ্গলধ্বনি কানে নিয়ে।

আমার কর্মপথের যাত্রা সত্তর বছরের গোধূলিবেলায় একটা উপসংহারে এসে পৌঁছল। আলো ম্লান হবার শেষ মুহূর্তে এই জয়ন্তী অনুষ্ঠানের দ্বারা দেশ আমার দীর্ঘজীবনের মূল্য স্বীকার করবেন।

ফসল যতদিন মাঠে ততদিন সংশয় থেকে যায়। বুদ্ধিমান মহাজন খেতের দিকে তাকিয়েই আগাম দাদন দিতে দ্বিধা করে, অনেকটা হাতে রেখে দেয়। যখন গোলায় উঠল তখনই ওজন বুঝে দামের কথা পাকা হতে পারে। আজ আমার বুঝি সেই ফলন-শেষের হিসাব চুকিয়ে দেবার দিন।

যে মানুষ অনেক কাল বেঁচে আছে সে অতীতেরই শামিল। বুঝতে পারছি, আমার সাবেক বর্তমান এই হাল বর্তমান থেকে বেশ খানিকটা তফাতে। যে-সব কবি পালা শেষ করে লোকান্তরে তাঁদেরই আঙিনার কাছটায় আমি এসে দাঁড়িয়েছি, তিরোভাবের ঠিক পূর্ব-সীমানায়। বর্তমানের চলতি রথের বেগের মুখে কাউকে দেখে নেবার যে অস্পষ্টতা সেটা আমার বেলা এতদিনে কেটে যাবার কথা। যতখানি দূরে এলে কল্পনার ক্যামেরায় মানুষের জীবনটাকে সমগ্রলক্ষবদ্ধ করা যায় আধুনিকের পুরোভাগ থেকে আমি ততটা দূরেই এসেছি।

পঞ্চাশের পরে বানপ্রস্থের প্রস্তাব মনু করেছেন। তার কারণ মনুর হিসাবমত পঞ্চাশের পরে মানুষ বর্তমানের থেকে পিছিয়ে পড়ে। তখন কোমর বেঁধে ধাবমান কালের সঙ্গে সমান ঝোঁকে পা ফেলে চলার বেগে যতটা ক্লান্তি ততটা সফলতা থাকে না, যতটা ক্ষয় ততটা পূরণ হয় না।

অতএব তখন থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাকে সেই সর্বকালের মোহানার দিকে যাত্রা করতে হবে যেখানে কাল স্তব্ধ। গতির সাধনা শেষ করে তখন স্থিতির সাধনা।

মনু যে মেয়াদ ঠিক করে দিয়েছেন এখন সেটাকে ঘড়ি ধরে খাটানো প্রায় অসাধ্য। মনুর যুগে নিশ্চয়ই জীবনে এত দায় ছিল না, তার গ্রন্থি ছিল কম। এখন শিক্ষা বল, কর্ম বল, এমন-কি আমোদপ্রমোদ খেলাধুলা, সমস্তই বহুব্যাপক। তখনকার সম্রাটেরও রথ যত বড়ো যত জমকালো হোক, এখনকার রেলগাড়ির মতো তাতে বহু গাড়ির এমন দ্বন্দ্বসমাস ছিল না। এই গাড়ির মাল খালাস করতে বেশ একটু সময় লাগে। পাঁচটায় আপিসে ছুটি শাস্ত্রনির্দিষ্ট বটে, কিন্তু খাতাপত্র বন্ধ করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বাড়িমুখো হবার আগেই বাতি জ্বালতে হয়। আমাদের সেই দশা। তাই পঞ্চাশের মেয়াদ বাড়িয়ে না নিলে ছুটি মঞ্জুর অসম্ভব। কিন্তু সত্তরের কোঠায় পড়লে আর ওজর চলে না। বাইরের লক্ষণে বুঝতে পারছি, আমার সময় চলল আমাকে ছাড়িয়ে—কম করে ধরলেও অন্তত দশ বছর আগেকার তারিখে আমি বসে আছি। দূরের নক্ষত্রের আলোর মতো, অর্থাৎ সে যখনকার সে তখনকার নয়।

তবু একেবারে থামবার আগে চলার ঝোঁকে অতীত কালের খানিকটা ধাক্কা এসে পড়ে বর্তমানের উপরে। গান সমস্তটাই শমে এসে পৌঁছলে তার সমাপ্তি; তবু আরও কিছুক্ষণ ফরমাশ চলে পালটিয়ে গাবার জন্যে। সেটা অতীতেরই পুনরাবৃত্তি। এর পরে বড়োজোর ছুটো-একটা তান লাগানো চলে, কিন্তু চুপ করে গেলেও লোকসান নেই। পুনরাবৃত্তিকে দীর্ঘকাল তাজা রাখবার চেষ্টাও যা আর কইমাছটাকে ডাঙায় তুলে মাসখানেক বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টাও তাই।

এই মাছটার সঙ্গে কবির তুলনা আরও একটু এগিয়ে নেওয়া যাক। মাছ যতক্ষণ জলে আছে ওকে কিছু কিছু খোরাক জোগানো সৎকর্ম, সেটা মাছের নিজের প্রয়োজনে। পরে যখন তাকে ডাঙায় তোলা

হল তখন প্রয়োজনটা তার নয়, অপর কোনো জীবের। তেমনি কবি যতদিন না একটা স্পষ্ট পরিণতিতে পৌঁছয় ততদিন তাকে কিছু কিছু উৎসাহ দিতে পারলে ভালোই—সেটা কবির নিজেরই প্রয়োজনে। তার পরে তার পূর্ণতায় যখন একটা সমাপ্তির যতি আসে তখন তার সম্বন্ধে যদি কোনো প্রয়োজন থাকে সেটা তার নিজের নয়, প্রয়োজন তার দেশের।

দেশ মানুষের সৃষ্টি। দেশ মৃন্ময় নয়, সে চিন্ময়। মানুষ যদি প্রকাশমান হয় তবেই দেশ প্রকাশিত। সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা ভূমির কথা যতই উচ্চকণ্ঠে রটাব ততই জবাবদিহির দায় বাড়বে। প্রশ্ন উঠবে প্রাকৃতিক দান তো উপাদান মাত্র, তা নিয়ে মানবিক সম্পদ কতটা গড়ে তোলা হল। মানুষের হাতে দেশের জল যদি যায় শুকিয়ে, ফল যদি যায় মরে, মলয়জ যদি বিষিয়ে ওঠে মারীবীজে, শস্যের জমি যদি হয় বন্ধ্যা, তবে কাব্যকথায় দেশের লজ্জা চাপা পড়বে না। দেশ মাটিতে তৈরি নয়, দেশ মানুষে তৈরি।

তাই দেশ নিজের সত্তা প্রমাণেরই খাতিরে অহরহ তাকিয়ে আছে তাদেরই জন্যে যারা কোনো সাধনায় সার্থক। তারা না থাকলেও গাছপালা জীবজন্তু জন্মায়, বৃষ্টি পড়ে, নদী চলে, কিন্তু দেশ আচ্ছন্ন থাকে মরুবালুতলে ভূমির মতো।

এই কারণেই দেশ যার মধ্যে আপন ভাষাবান্ প্রকাশ অনুভব করে তাকে সর্বজনসমক্ষে নিজের ব'লে চিহ্নিত করবার উপলক্ষ রচনা করতে চায়। যেদিন তাই করে, যেদিন কোনো মানুষকে আনন্দের সঙ্গে সে অঙ্গীকার করে, সেদিনই মাটির কোল থেকে দেশের কোলে সেই মানুষের জন্ম।

আমার জীবনের সমাপ্তিদশায় এই জয়ন্তী অনুষ্ঠানের যদি কোনো সত্য থাকে তবে তা এই তাৎপর্য নিয়ে। আমাকে গ্রহণ করার দ্বারা দেশ যদি কোনো ভাবে নিজেকে লাভ না করে থাকে তবে আজকের এই উৎসব অর্থহীন। যদি কেউ এ কথায় অহংকারের আশঙ্কা ক'রে

আমার জন্যে উদ্‌বিগ্ন হন তবে তাঁদের উদ্‌বেগ অনাবশ্যক। যে খ্যাতির সম্বল অল্প তার সমারোহ যতই বেশি হয়, ততই তার দেউলে হওয়া দ্রুত ঘটে। ভুল মস্ত হয়েই দেখা দেয়, চুকে যায় অতি ক্ষুদ্র হয়ে। আতশবাজির অভ্রবিদারক আলোটাই তার নির্বাণের উজ্জ্বল তর্জনীসংকেত।

এ কথায় সন্দেহ নেই যে, পুরস্কারের পাত্র-নির্বাচনে দেশ ভুল করতে পারে। সাহিত্যের ইতিহাসে ক্ষণমুখরা খ্যাতির মৌনসাধন বার বার দেখা গেছে। তাই আজকের দিনের আয়োজনে আজই অতিশয় উল্লাস যেন না করি, এই উপদেশের বিরুদ্ধে যুক্তি চলে না। তেমনি তা নিয়ে এখনই তাড়াতাড়ি বিমর্ষ হবারও আশু কারণ দেখি না। কালে কালে সাহিত্যবিচারের রায় একবার উলটিয়ে আবার পালটিয়েও থাকে। অব্যবস্থিতচিত্ত মন্দগতি কালের সবশেষ বিচারে আমার ভাগ্যে যদি নিঃশেষে ফাঁকিই থাকে তবে এখনই আগাম শোচনা করতে বসা কিছু নয়। এখনকার মতো এই উপস্থিত অনুষ্ঠানটাই নগদ লাভ। তার পরে চরম জবাবদিহির জন্যে প্রপৌত্রেরা রইলেন। আপাতত বন্ধুদের নিয়ে আশ্বস্তচিত্তে আনন্দ করা যাক, অপর পক্ষে যাঁদের অভিরুচি হয় তাঁরা ফুৎকারে বুদ্‌বুদ বিদীর্ণ করার উৎসাহে আনন্দ করতে পারেন। এই দুই বিপরীত ভাবের কালোয় সাদায় সংসারের আনন্দধারায় যমের ভগ্নী যমুনা ও শিবজটানিঃসৃতা গঙ্গা মিলে থাকে। ময়ূর আপন পুচ্ছগর্বে নৃত্য করে খুশি, আবার শিকারি আপন লক্ষ্যবেধগর্বে তাকে গুলি করে মহা আনন্দিত।

আধুনিক কালে পাশ্চাত্ত্য দেশে সাহিত্যে কলাসৃষ্টিতে লোকচিত্তের সম্মতি অতি ঘন ঘন বদল হয়, এটা দেখা যাচ্ছে। বেগ বেড়ে চলেছে মানুষের যানে-বাহনে, বেগ অবিশ্রাম ঠেলা দিচ্ছে মানুষের মনপ্রাণকে।

যেখানে বৈষয়িক প্রতিযোগিতা উগ্র সেখানে এই বেগের মূল্য বেশি। ভাগ্যের হরির লুট নিয়ে হাটের ভিড়ে ধুলার 'পরে যেখানে সকলে মিলে কাড়াকাড়ি, সেখানে যে মানুষ বেগে জেতে মালেও

তার জিত। তৃপ্তিহীন লোভের বাহন বিরামহীন বেগ। সমস্ত পশ্চিম মাতালের মতো টলমল করছে সেই লোভে। সেখানে বেগবৃদ্ধি ক্রমে লাভের উপলক্ষ না হয়ে স্বয়ং লক্ষ্য হয়ে উঠছে। বেগেরই লোভ আজ জলে স্থলে আকাশে হিস্টিরিয়ার চীৎকার করতে করতে ছুটে বেরোল।

কিন্তু প্রাণপদার্থ তো বাষ্পবিদ্যুতের-ভূতে-তাড়া-করা লোহার এঞ্জিন নয়। তার একটি আপন ছন্দ আছে। সেই ছন্দে দুই-এক মাত্রা টান সয়, তার বেশি নয়। মিনিট কয়েক ডিগবাজি খেয়ে চলা সাধ্য হতে পারে, কিন্তু দশ মিনিট যেতে না যেতে প্রমাণ হবে যে মানুষ বাইসিকেলের চাকা নয়, তার পদাতিকের চাল পদাবলীর ছন্দে। গানের লয় মিষ্টি লাগে যখন সে কানের সজীব ছন্দ মেনে চলে। তাকে দুন থেকে চৌদুনে চড়ালে সে কলাদেহ ছেড়ে কৌশলদেহ নেবার জন্যই হাঁসফাঁস করতে থাকে। তাগিদ যদি আরো বাড়াও তা হলে রাগিণীটা পাগলা-গারদের সদর গেটের উপর মাথা ঠুকে মারা যাবে। সজীব চোখ তো ক্যামেরা নয়, ভালো করে দেখে নিতে সে সময় নেয়। ঘণ্টায় বিশ-পঁচিশ মাইল দৌড়ের দেখা তার পক্ষে কুয়াশা দেখা। একদা তীর্থযাত্রা বলে একটা সজীব পদার্থ আমাদের দেশে ছিল, ভ্রমণের পূর্ণস্বাদ নিয়ে সেটা সম্পন্ন হত। কলের গাড়ির আমলে তীর্থ রইল, যাত্রা রইল না; ভ্রমণ নেই, পৌঁছনো আছে— শিক্ষাটা বাদ দিয়ে পরীক্ষাটা পাশ করা যাকে বলে। রেল-কোম্পানির কারখানায় কলে-ঠাসা তীর্থযাত্রার ভিন্ন ভিন্ন দামের বটিকা সাজানো, গিলে ফেললেই হল— কিন্তু হলই না যে, সে কথা বোঝবারও ফুরসত নেই। কালিদাসের যক্ষ যদি মেঘদূতকে বরখাস্ত করে দিয়ে এরোপ্লেন-দূতকে অলকায় পাঠাতেন তা হলে অমন দুই-সর্গ-ভরা মন্দাক্রান্তা ছন্দ দু-চারটে শ্লোক পার না হতেই অপঘাতে মরত। কলে-ঠাসা বিরহ তো আজ পর্যন্ত বাজারে নামেনি।

মেঘদূতের শোকাবহ পরিণামে শোক করবে না এমনতরো বলবান

পুরুষ আজকাল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কেউ কেউ বলছেন, এখন কবিতার যে আওয়াজটা শোনা যাচ্ছে সে নাভিশ্বাসের আওয়াজ। ওর সময় হয়ে এল। যদি তা সত্য হয় তবে সেটা কবিতার দোষে নয়, সময়ের দোষে। মানুষের প্রাণটা চিরদিনই ছন্দে-বাঁধা, কিন্তু তার কালটা কলের তাড়ায় সম্প্রতি ছন্দ-ভাঙা।

আঙুরের খেতে চাষি কাঠি পুঁতে দেয়; তারই উপর আঙুর লতিয়ে উঠে আশ্রয় পায়, ফল ধরায়। তেমনি জীবনযাত্রাকে সবল ও সফল করবার জন্যে কতকগুলি রীতিনীতি বেঁধে দিতে হয়। এই রীতিনীতির অনেকগুলিই নির্জীব নীরস, উপদেশ-অনুশাসনের খুঁটি। কিন্তু বেড়ায় লাগানো জিয়লকাঠের খুঁটি যেমন রস পেলেই বেঁচে ওঠে, তেমনি জীবনযাত্রা যখন প্রাণের ছন্দে শান্তগমনে চলে তখন শুকনো খুঁটিগুলো অন্তরের গভীরে পৌঁছবার অবকাশ পেয়ে ক্রমেই প্রাণ পেতে থাকে। সেই গভীরেই সঞ্জীবনরস। সেই রসে তত্ত্ব ও নীতির মতো পদার্থও হৃদয়ের আপন সামগ্রীরূপে সজীব ও সজ্জিত হয়ে ওঠে, মানুষের আনন্দের রঙ তাতে লাগে। এই আনন্দের প্রকাশের মধ্যেই চিরন্তনতা। একদিনের নীতিকে আর-একদিন আমরা গ্রহণ নাও করতে পারি, কিন্তু সেই নীতি যে প্রীতিকে, যে সৌন্দর্যকে, আনন্দের সত্য ভাষায় প্রকাশ করেছে সে আমাদের কাছে নূতন থাকবে। আজও নূতন আছে মোগল সাম্রাজ্যের শিল্প— সেই সাম্রাজ্যকে, তার সাম্রাজ্যনীতিকে আমরা পছন্দ করি আর না করি।

কিন্তু যে যুগে দলে দলে গরজের তাড়ায় অবকাশ ঠাসা হয়ে নিরেট হয়ে যায় সে যুগ প্রয়োজনের, সে যুগ প্রীতির নয়। প্রীতি সময় নেয় গভীর হতে। আধুনিক এই ত্বরা-তাড়িত যুগে প্রয়োজনের তাগিদ কচুরিপানার মতোই সাহিত্যধারার মধ্যেও ভূরি ভূরি ঢুকে পড়েছে। তারা বাস করতে আসে না, সমস্যাসমাধানের দরখাস্ত হাতে ধন্না দিয়ে পড়ে। সে দরখাস্ত যতই অলংকৃত হোক তবু সে খাঁটি সাহিত্য নয়, সে দরখাস্তই। দাবি মিটলেই তার অন্তর্ধান।

এমন অবস্থায় সাহিত্যের হাওয়াবদল হয় এ-বেলা ও-বেলা। কোথাও আপন দরদ রেখে যায় না। পিছনটাকে লাথি মেরেই চলে, যাকে উঁচু করে গড়েছিল তাকে ধূলিসাৎ করে তার 'পরে অট্টহাসি। আমাদের মেয়েদের পাড়ওআলা শাড়ি, তাদের নীলাম্বরী, তাদের বেনারসি চেলি মোটের উপর দীর্ঘকাল বদল হয়নি; কেননা ওরা আমাদের অন্তরের অনুরাগকে আঁকড়ে আছে। দেখে আমাদের চোখের ক্লান্তি হয় না। হ'ত ক্লান্তি, মনটা যদি রসিয়ে দেখবার উপযুক্ত সময় না পেয়ে বেদরদি ও অশ্রদ্ধাপরায়ণ হয়ে উঠত। হৃদয়হীন অগভীর বিলাসের আয়োজনে অকারণে অনায়াসে ঘন ঘন ফ্যাশনের বদল। এখনকার সাহিত্যে তেমনি রীতির বদল। হৃদয়টা দৌড়তে দৌড়তে প্রীতিসম্বন্ধের রাখী গাঁথতে ও পরাতে পারে না। যদি সময় পেত সুন্দর করে বিনিয়ে বিনিয়ে গাঁথত। এখন ওকে ব্যস্ত লোকেরা ধমক দিয়ে বলে, রেখে দাও তোমার সুন্দর। সুন্দর পুরোনো, সুন্দর সেকেলে। আনো একটা যেমন-তেমন-করে-পাক-দেওয়া শণের দড়ি— সেটাকে বলব রিয়ালিজ্‌ম্‌। এখনকার হুদ্দাড়-দৌড়-ওআলা লোকের ওইটেই পছন্দ। স্বল্পায়ু ফ্যাশন হঠাৎ-নবাবের মতো উদ্ধত— তার প্রধান অহংকার এই যে, সে অধুনাতন; অর্থাৎ, তার বড়াই গুণ নিয়ে নয়, কাল নিয়ে।

বেগের এই মোটর-কলটা পশ্চিমদেশের মর্মস্থানে। ওটা এখনও পাকা দলিলে আমাদের নিজস্ব হয়নি। তবু আমাদেরও দৌড় আরম্ভ হল। ওদেরই হাওয়া-গাড়ির পায়দানের উপর লাফ দিয়ে আমরা উঠে পড়েছি। আমরাও খর্বকেশিনী খর্ববেশিনী সাহিত্যকীর্তির টেক্‌নিকের হাল ফ্যাশন নিয়ে গম্ভীরভাবে আলোচনা করি, আমরাও অধুনাতনের স্পর্ধা নিয়ে পুরাতনের মানহানি করতে অত্যন্ত খুশি হই।

এই-সব চিন্তা করেই বলেছিলুম, আমার এ বয়সে খ্যাতিকে আমি বিশ্বাস করিনে। এই মায়ামৃগীর শিকারে বনে-বাদাড়ে ছুটে বেড়ানো যৌবনেই সাজে। কেননা, সে বয়সে মৃগ যদি বা না'ও মেলে, মৃগয়াটাই যথেষ্ট। ফুল থেকে ফল হতেও পারে, না হতেও পারে, তবু আপন

স্বভাবকেই চাঞ্চল্যে সার্থক করতে হয় ফুলকে। সে অশান্ত, বাইরের দিকেই তার বর্ণগন্ধের নিত্য উদ্যম। ফলের কাজ অন্তরে, তার স্বভাবের প্রয়োজন অপ্রগল্‌ভ শান্তি। শাখা থেকে মুক্তির জন্যেই তার সাধনা— সেই মুক্তি নিজেরই আন্তরিক পরিণতির যোগে।

আমার জীবনে আজ সেই ফলেরই ঋতু এসেছে, যে ফল আশু বৃন্তচ্যুতির অপেক্ষা করে। এই ঋতুটির সুযোগ সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে হলে বাহিরের সঙ্গে অন্তরের শান্তি-স্থাপন চাই। সেই শান্তি খ্যাতি-অখ্যাতির দ্বন্দ্বের মধ্যে বিধ্বস্ত হয়।

খ্যাতির কথা থাক্। ওটার অনেকখানিই অবাস্তবের বাষ্পে পরিস্ফীত। তার সংকোচন-প্রসারণ নিয়ে যে-মানুষ অতিমাত্র ক্ষুব্ধ হতে থাকে সে অভিশপ্ত। ভাগ্যের পরম দান প্রীতি, কবির পক্ষে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার তাই। যে-মানুষ কাজ দিয়ে থাকে খ্যাতি দিয়ে তার বেতন শোধ চলে, আনন্দ দেওয়াই যার কাজ প্রীতি না হলে তার প্রাপ্য শোধ হয় না।

অনেক কীর্তি আছে যা মানুষকেই উপকরণ করে গড়ে তোলা, যেমন রাষ্ট্র। কর্মের বল সেখানে জনসংখ্যায়, তাই সেখানে মানুষকে দলে টানা নিয়ে কেবলই দ্বন্দ্ব চলে। বিস্তারিত খ্যাতির বেড়াজাল ফেলে মানুষ ধরা নিয়ে ব্যাপার। মনে করো, লয়েড জর্জ্। তাঁর বুদ্ধিকে তাঁর শক্তিকে অনেক লোকে যখন মানে তখনই তাঁর কাজ চলে। বিশ্বাস আলগা হলে বেড়াজাল গেল ছিঁড়ে, মানুষ-উপকরণ পুরোপুরি জোটে না।

অপর পক্ষে, কবির সৃষ্টি যদি সত্য হয়ে থাকে সেই সত্যের গৌরব সেই সৃষ্টির নিজেরই মধ্যে, দশজনের সম্মতির মধ্যে নয়। দশজনে তাকে স্বীকার করেনি এমন প্রায়ই ঘটে থাকে। তাতে বাজারদরের ক্ষতি হয়, কিন্তু সত্য মূল্যের কমতি হয় না।

ফুল ফুটেছে, এইটেই ফুলের চরম কথা। যার ভালো লাগল সেই জিতল, ফুলের জিত তার আপন আবির্ভাবেই। সুন্দরের অন্তরে আছে

একটি রসময় রহস্যময় আয়ত্তের অতীত সত্য, আমাদের অন্তরেরই সঙ্গে তার অনির্বচনীয় সম্বন্ধ। তার সম্পর্কে আমাদের আত্মচেতনা হয় মধুর, গভীর, উজ্জ্বল। আমাদের ভিতরের মানুষ বেড়ে ওঠে, রঙিয়ে ওঠে, রসিয়ে ওঠে। আমাদের সত্তা যেন তার সঙ্গে রঙে রসে মিলে যায়— একেই বলে অনুরাগ।

কবির কাজ এই অনুরাগে মানুষের চৈতন্যকে উদ্দীপ্ত করা, ঔদাসীন্য থেকে উদ্‌বোধিত করা। সেই কবিকেই মানুষ বড়ো বলে যে এমন-সকল বিষয়ে মানুষের চিত্তকে আশ্লিষ্ট করেছে যার মধ্যে নিত্যতা আছে, মহিমা আছে, মুক্তি আছে, যা ব্যাপক এবং গভীর। কলা ও সাহিত্যের ভাণ্ডারে দেশে দেশে কালে কালে মানুষের অনুরাগের সম্পদ রচিত ও সঞ্চিত হয়ে উঠছে। এই বিশাল ভুবনে বিশেষ দেশের মানুষ বিশেষ কাকে ভালোবেসেছে সে তার সাহিত্য দেখলেই বুঝতে পারি। এই ভালোবাসার দ্বারাই তো মানুষকে বিচার করা।

বীণাপাণির বীণায় তার অনেক। কোনোটা সোনার, কোনোটা তামার, কোনোটা ইস্পাতের। সংসারের কণ্ঠে হালকা ও ভারী, আনন্দের ও প্রমোদের যতরকমের সুর আছে সবই তাঁর বীণায় বাজে। কবির কাব্যেও সুরের অসংখ্য বৈচিত্র্য। সবই যে উদাত্ত ধ্বনির হওয়া চাই এমন কথা বলিনে। কিন্তু সমস্তের সঙ্গে সঙ্গেই এমন কিছু থাকা চাই যার ইঙ্গিত ধ্রুবের দিকে, সেই বৈরাগ্যের দিকে যা অনুরাগকেই বীর্যবান ও বিশুদ্ধ করে। ভর্তৃহরির কাব্যে দেখি ভোগের মানুষ আপন সুর পেয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গেই কাব্যের গভীরের মধ্যে বসে আছে ত্যাগের মানুষ আপন একতারা নিয়ে— এই দুই সুরের সমবায়েই রসের ওজন ঠিক থাকে, কাব্যেও, মানবজীবনেও। দূরকাল ও বহুজনকে যে সম্পদ দান করার দ্বারা সাহিত্য স্থায়ীভাবে সার্থক হয়, কাগজের নৌকোয় বা মাটির গামলায় তো তার বোঝাই সইবে না। আধুনিক-কাল-বিলাসীরা অবজ্ঞার সঙ্গে বলতে পারেন এ-সব কথা আধুনিক কালের বুলির সঙ্গে মিলছে না— তা যদি হয় তা হলে সেই

আধুনিক কালটারই জন্যে পরিতাপ করতে হবে। আশ্বাসের কথা এই যে, সে চিরকালই আধুনিক থাকবে এত আয়ু তার নয়।

কবি যদি ক্লান্ত মনে এমন কথা মনে করে যে, কবিত্বের চিরকালের বিষয়গুলি আধুনিক কালে পুরোনো হয়ে গেছে তা হলে বুঝব আধুনিক কালটাই হয়েছে বৃদ্ধ ও রসহীন। চিরপরিচিত জগতে তার সহজ অনুরাগের রস পৌঁচচ্ছে না, তাই জগৎটাকে আপনার মধ্যে নিতে পারল না। যে কল্পনা নিজের চারি দিকে আর রস পায় না, সে যে কোনো চেষ্টাকৃত রচনাকেই দীর্ঘকাল সরস রাখতে পারবে এমন আশা করা বিড়ম্বনা। রসনায় যার রুচি মরেছে চিরদিনের অন্নে সে তৃপ্তি পায় না, সেই একই কারণে কোনো একটা আজগবি অন্নেও সে চিরদিন রস পাবে এমন সম্ভাবনা নেই।

আজ সত্তর বছর বয়সে সাধারণের কাছে আমার পরিচয় একটা পরিণামে এসেছে। তাই আশা করি, যাঁরা আমাকে জানবার কিছুমাত্র চেষ্টা করেছেন এতদিনে অন্তত তাঁরা এ কথা জেনেছেন যে, আমি জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহণ করিনি। আমি চোখ মেলে যা দেখলুম চোখ আমার কখনো তাতে ক্লান্ত হল না। বিস্ময়ের অন্ত পাইনি। চরাচরকে বেষ্টন করে অনাদিকালের যে অনাহত বাণী অনন্তকালের অভিমুখে ধ্বনিত তাতে আমার মনপ্রাণ সাড়া দিয়েছে, মনে হয়েছে যুগে যুগে এই বিশ্ববাণী শুনে এলুম। সৌরমণ্ডলীর প্রান্তে এই আমাদের ছোটো শ্যামলা পৃথিবীকে ঋতুর আকাশদূতগুলি বিচিত্র রসের বর্ণসজ্জায় সাজিয়ে দিয়ে যায়, এই আদরের অনুষ্ঠানে আমার হৃদয়ের অভিষেকবারি নিয়ে যোগ দিতে কোনোদিন আলস্য করিনি। প্রতিদিন উষাকালে অন্ধকার রাত্রির প্রান্তে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছি এই কথাটি উপলব্ধি করবার জন্যে যে, যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি। আমি সেই বিরাট সত্তাকে আমার অনুভবে স্পর্শ করতে চেয়েছি যিনি সকল সত্তার আত্মীয়সম্বন্ধের ঐক্যতত্ত্ব; যাঁর খুশিতেই নিরন্তর অসংখ্যরূপের প্রকাশে বিচিত্রভাবে আমার প্রাণ খুশি হয়ে উঠছে— বলে উঠছে—

কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ; যাতে কোনো প্রয়োজন নেই তাও আনন্দের টানে টানবে, এই অত্যাশ্চর্য ব্যাপারের চরম অর্থ যাঁর মধ্যে; যিনি অন্তরে অন্তরে মানুষকে পরিপূর্ণ করে বিদ্যমান বলেই প্রাণপণ কঠোর আত্মত্যাগকে আমরা আত্মঘাতী পাগলের পাগলামি বলে হেসে উঠলুম না।

ঈশোপনিষদের প্রথম যে মন্ত্রে পিতৃদেব দীক্ষা পেয়েছিলেন সেই মন্ত্রটি বার বার নতুন নতুন অর্থ নিয়ে আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে, বার বার নিজেকে বলেছি— তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, মা গৃধঃ। আনন্দ কর তাই নিয়ে যা তোমার কাছে সহজে এসেছে— যা রয়েছে তোমার চার দিকে তারই মধ্যে চিরন্তন— লোভ কোরো না। কাব্যসাধনায় এই মন্ত্র মহামূল্য। আসক্তি যাকে মাকড়সার মতো জালে জড়ায় তাকে জীর্ণ করে দেয়; তাতে গ্লানি আসে, ক্লান্তি আনে। কেননা, আসক্তি তাকে সমগ্র থেকে উৎপাটন করে নিজের সীমার মধ্যে বাঁধে— তার পরে তোলা ফুলের মতো অল্পক্ষণেই সে ম্লান হয়। মহৎ সাহিত্য ভোগকে লোভ থেকে উদ্ধার করে, সৌন্দর্যকে আসক্তি থেকে, চিত্তকে উপস্থিত গরজের দণ্ডধারীদের কাছ থেকে। রাবণের ঘরে সীতা লোভের দ্বারা বন্দী; রামের ঘরে সীতা প্রেমের দ্বারা মুক্ত, সেখানেই তাঁর সত্য প্রকাশ। প্রেমের কাছে দেহের অপরূপ রূপ প্রকাশ পায়, লোভের কাছে তার স্থূল মাংস।

অনেক দিন থেকেই লিখে আসছি, জীবনের নানা পর্বে নানা অবস্থায়। শুরু করেছি কাঁচা বয়সে— তখনো নিজেকে বুঝিনি। তাই আমার লেখার মধ্যে বাহুল্য এবং বর্জনীয় জিনিস ভূরি ভূরি আছে তাতে সন্দেহ নেই। এ-সমস্ত আবর্জনা বাদ দিয়ে বাকি যা থাকে আশা করি তার মধ্যে এই ঘোষণাটি স্পষ্ট যে, আমি ভালোবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে, আমি কামনা করেছি মুক্তিকে— যে মুক্তি পরমপুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে, আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য সেই মহামানবের মধ্যে যিনি সদা

জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। আমি আবাল্য-অভ্যস্ত ঐকান্তিক সাহিত্য-সাধনার গণ্ডীকে অতিক্রম করে একদা সেই মহামানবের উদ্দেশে যথাসাধ্য আমার কর্মের অর্ঘ্য আমার ত্যাগের নৈবেদ্য আহরণ করেছি— তাতে বাইরের থেকে যদি বাধা পেয়ে থাকি অন্তরের থেকে পেয়েছি প্রসাদ। আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে— এখানে সর্বদেশ সর্বজাতি ও সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা— তাঁরই বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহংকার আমার ভেদবুদ্ধি ক্ষালন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।

আমার যা-কিছু অকিঞ্চিৎকর তাকে অতিক্রম করেও যদি আমার চরিত্রের অন্তরতম প্রকৃতি ও সাধনা লেখায় প্রকাশ পেয়ে থাকে, আনন্দ দিয়ে থাকে, তবে তার পরিবর্তে আমি প্রীতি কামনা করি, আর-কিছু নয়। এ কথা যেন জেনে যাই, অকৃত্রিম সৌহার্দ্য পেয়েছি সেই তাঁদের কাছে যাঁরা আমার সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও জেনেছেন সমস্ত জীবন আমি কী চেয়েছি, কী পেয়েছি, কী দিয়েছি, আমার অপূর্ণ জীবনে অসমাপ্ত সাধনায় কী ইঙ্গিত আছে।

সাহিত্যে মানুষের অনুরাগসম্পদ সৃষ্টি করাই যদি কবির যথার্থ কাজ হয়, তবে এই দান গ্রহণ করতে গেলে প্রীতিরই প্রয়োজন। কেননা, প্রীতিই সমগ্র করে দেখে। আজ পর্যন্ত সাহিত্যে যাঁরা সম্মান পেয়েছেন তাঁদের রচনাকে আমরা সমগ্রভাবে দেখেই শ্রদ্ধা অনুভব করি। তাকে টুকরো টুকরো ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছিদ্রসন্ধান বা ছিদ্রখনন করতে স্বভাবত প্রবৃত্তি হয় না। জগতে আজ পর্যন্ত অতিবড়ো সাহিত্যিক এমন কেউ জন্মাননি, অনুরাগবঞ্চিত পরুষ চিত্ত নিয়ে যাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাকেও বিদ্রূপ করা, তার কদর্থ করা, তার প্রতি অশোভন মুখবিকৃতি করা, যে-কোনো মানুষ না পারে। প্রীতির প্রসন্নতাই সেই সহজ ভূমিকা, যার উপরে কবির সৃষ্টি সমগ্র হয়ে সুস্পষ্ট হয়ে প্রকাশমান হয়।

মর্তলোকের শ্রেষ্ঠ দান এই প্রীতি আমি পেয়েছি এ কথা প্রণামের সঙ্গে বলি। পেয়েছি পৃথিবীর অনেক বরণীয়দের হাত থেকে— তাঁদের

কাছে কৃতজ্ঞতা নয়, আমার হৃদয় নিবেদন করে দিয়ে গেলেম। তাঁদের দক্ষিণ হাতের স্পর্শে বিরাট মানবেরই স্পর্শ লেগেছে আমার ললাটে; আমার যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তা তাঁদের গ্রহণের যোগ্য হোক।

আর আমার স্বদেশের লোক যাঁরা অতিনিকটের অতিপরিচয়ের অস্পষ্টতা ভেদ করেও আমাকে ভালোবাসতে পেরেছেন আজ এই অনুষ্ঠানে তাঁদেরই বহুযত্নরচিত অর্ঘ্য সজ্জিত। তাঁদের সেই ভালোবাসা হৃদয়ের সঙ্গে গ্রহণ করি।

কবিতা ও গান

সন্ধ্যাসংগীত

সূচনা

এই গ্রন্থাবলীতে আমার কাব্যরচনার প্রথম পরিচয় নিয়ে দেখা দিয়েছে সন্ধ্যাসংগীত। তার পূর্বেও অনেক লেখা লিখেছি, কিন্তু সেগুলিকে লুপ্ত করবার চেষ্টা করেছি অনাদরে। হাতের অক্ষর পাকাবার যে খাতা ছিল বাল্যকালে সেগুলিকে যেমন অনাদরে রাখিনি, এও তেমনি। সেগুলি ছিল যাকে বলে কপিবুক, বাইরে থেকে মডেল-লেখা নকল করবার সাধনায়। কাঁচা বয়সে পরের লেখা মক্‌শ করে আমরা অক্ষর ফেঁদে থাকি বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তার মধ্যেও নিজের স্বাভাবিক ছাঁদ একটা প্রকাশ হতে থাকে। অবশেষে পরিণতিক্রমে সেইটেই বাইরের নকল খোলসটাকে বিদীর্ণ করে স্বরূপকে প্রকাশ করে দেয়। প্রথম বয়সের কবিতাগুলি সেইরকম কপিবুকের কবিতা।

সেই কপিবুক-যুগের চৌকাঠ পেরিয়েই প্রথম দেখা দিল সন্ধ্যাসংগীত। তাকে আমের বোলের সঙ্গে তুলনা করব না, করব কচি আমের গুটির সঙ্গে, অর্থাৎ তাতে তার আপন চেহারাটা সবে দেখা দিয়েছে শ্যামল রঙে। রস ধরেনি, তাই তার দাম কম। কিন্তু সেই কবিতাই প্রথম স্বকীয় রূপ দেখিয়ে আমাকে আনন্দ দিয়েছিল। অতএব সন্ধ্যাসংগীতেই আমার কাব্যের প্রথম পরিচয়। সে উৎকৃষ্ট নয়, কিন্তু আমারই বটে। সে সময়কার অন্য সমস্ত কবিতা থেকে আপন ছন্দের বিশেষ সাজ প'রে এসেছিল। সে সাজ বাজারে চলিত ছিল না।



রবীন্দ্রনাথ
আনুমানিক ১২ বৎসর

সন্ধ্যাসংগীত

সন্ধ্যা

অয়ি সন্ধ্যে,
অনন্ত আকাশতলে বসি একাকিনী,
কেশ এলাইয়া
মৃদু মৃদু ও কী কথা   কহিস আপন মনে
গান গেয়ে গেয়ে,
নিখিলের মুখপানে চেয়ে।
প্রতিদিন শুনিয়াছি,   আজও তোর কথা
নারিনু বুঝিতে।
প্রতিদিন শুনিয়াছি,   আজও তোর গান
নারিনু শিখিতে।
চোখে লাগে ঘুমঘোর,
প্রাণ শুধু ভাবে হয় ভোর।
হৃদয়ের অতিদূর দূর দূরান্তরে
মিলাইয়া কণ্ঠস্বর তোর কণ্ঠস্বরে
উদাসী প্রবাসী যেন
তোর সাথে তোরি গান করে।

অয়ি সন্ধ্যা, তোরি যেন স্বদেশের প্রতিবেশী
তোরি যেন আপনার ভাই
প্রাণের প্রবাসে মোর দিশা হারাইয়া
বেড়ায় সদাই।

শোনে যেন স্বদেশের গান,
দূর হতে কার পায় সাড়া
খুলে দেয় প্রাণ।
যেন কী পুরানো স্মৃতি
জাগিয়া উঠে রে ওই গানে।
ওই তারকার মাঝে যেন তার গৃহ ছিল,
হাসিত কাঁদিত ওইখানে।
আরবার ফিরে যেতে চায়
পথ তবু খুঁজিয়া না পায়।
কত না পুরানো কথা, কত না হারানো গান,
কত না প্রাণের দীর্ঘশ্বাস,
শরমের আধো হাসি, সোহাগের আধো বাণী,
প্রণয়ের আধো মৃদু ভাষ,
সন্ধ্যা, তোর ওই অন্ধকারে
হারাইয়া গেছে একেবারে।
পূর্ণ করি অন্ধকার তোর
তারা সবে ভাসিয়া বেড়ায়
যুগান্তের প্রশান্ত হৃদয়ে
ভাঙাচোরা জগতের প্রায়।
যবে এই নদীতীরে বসি তোর পদতলে
তারা সবে দলে দলে আসে,
প্রাণেরে ঘেরিয়া চারি পাশে;
হয়তো একটি হাসি একটি আধেক হাসি
সমুখেতে ভাসিয়া বেড়ায়,
কভু ফোটে কভু বা মিলায়।

আজি আসিয়াছি সন্ধ্যা, বসি তোর অন্ধকারে
মুদিয়া নয়ান

সাধ গেছে গাহিবারে— মৃদু স্বরে শুনাবারে
দু-চারিটি গান।
যেথায় পুরানো গান যেথায় হারানো হাসি
যেথা আছে বিস্মৃত স্বপন
সেইখানে সযতনে রেখে দিস গানগুলি,
রচে দিস সমাধিশয়ন।
জানি সন্ধ্যা, জানি তোর স্নেহ,
গোপনে ঢাকিবি তার দেহ—
বসিয়া সমাধি-'পরে নিষ্ঠুরকৌতুকভরে
দেখিস হাসে না যেন কেহ।
ধীরে শুধু ঝরিবে শিশির,
মৃদু শ্বাস ফেলিবে সমীর।
স্তব্ধতা কপোলে হাত দিয়ে
একা সেথা রহিবে বসিয়া,
মাঝে মাঝে দু-একটি তারা
সেথা আসি পড়িবে খসিয়া।

গান আরম্ভ

চারি দিকে খেলিতেছে মেঘ,
বায়ু আসি করিছে চুম্বন—
সীমাহারা নভস্তল দুই বাহু পসারিয়া
হৃদয়ে করিছে আলিঙ্গন।

অনন্ত এ আকাশের কোলে
টলমল মেঘের মাঝার
এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর
তোর তরে কবিতা আমার!

যবে আমি আসিব হেথায়
মন্ত্র পড়ি ডাকিব তোমায়।
বাতাসে উড়িবে তোর বাস,
ছড়ায়ে পড়িবে কেশপাশ,
ঈষৎ মেলিয়া আঁখিপাতা
মৃদু হাসি পড়িবে ফুটিয়া—
হৃদয়ের মৃদুল কিরণ
অধরেতে পড়িবে লুটিয়া।
এলোথেলো কেশপাশ লয়ে
বসে বসে খেলিবি হেথায়,
উষার অলক দুলাইয়া
সমীরণ যেমন খেলায়।
চুমিয়া চুমিয়া ফুটাইব
আধফোটা হাসির কুসুম,
মুখ লয়ে বুকের মাঝারে
গান গেয়ে পাড়াইব ঘুম।
কৌতুকে করিয়া কোলাকুলি
আসিবে মেঘের শিশুগুলি,
ঘিরিয়া দাঁড়াবে তারা সবে
অবাক হইয়া চেয়ে রবে।

মেঘ হতে নেমে ধীরে ধীরে
আয় লো কবিতা, মোর বামে—
চম্পক-অঙ্গুলি ছুটি দিয়ে
অন্ধকার ধীরে সরাইয়ে
যেমন করিয়া উষা নামে।

বায়ু হতে আয় লো কবিতা,
আসিয়া বসিবি মোর পাশে—
কে জানে বনের কোথা হতে

ভেসে ভেসে সমীরণস্রোতে
সৌরভ যেমন করে আসে।
হৃদয়ের অন্তঃপুর হতে
বধূ মোর, ধীরে ধীরে আয়—
ভীরু প্রেম যেমন করিয়া
ধীরে উঠে হৃদয় ধরিয়া,
বঁধুর পায়ের কাছে গিয়ে
অমনি মুরছি পড়ে যায়।

অথবা শিথিল কলেবরে
এস তুমি, বসো মোর পাশে—
মরণ যেমন করে আসে,
শিশির যেমন করে ঝরে,
পশ্চিমের আঁধারসাগরে
তারাটি যেমন করে যায়,
অতি ধীরে মৃদু হেসে সিঁদুর সীমন্তদেশে
দিবা সে যেমন করে আসে
মরিবারে স্বামীর চিতায়
পশ্চিমের জ্বলন্ত শিখায়।
পরবাসী ক্ষীণ-আয়ু একটি মুমূর্ষু বায়ু
শেষ কথা বলিতে বলিতে
তখনি যেমন মরে যায়
তেমনি, তেমনি করে এস—
কবিতা রে, বধূটি আমার,
দুটি শুধু পড়িবে নিশ্বাস,
দুটি শুধু বাহিরিবে বাণী,
বাহু দুটি হৃদয়ে জড়ায়ে
মরমে রাখিবি মুখখানি।

তারকার আত্মহত্যা

জ্যোতির্ময় তীর হতে আঁধারসাগরে
ঝাঁপায়ে পড়িল এক তারা,
একেবারে উন্মাদের পারা।
চৌদিকে অসংখ্য তারা রহিল চাহিয়া
অবাক্ হইয়া—
এই-যে জ্যোতির বিন্দু আছিল তাদের মাঝে
মুহূর্তে সে গেল মিশাইয়া।
যে সমুদ্রতলে
মনোদুঃখে আত্মঘাতী
চির-নির্বাপিত-ভাতি
শত মৃত তারকার
মৃতদেহ রয়েছে শয়ান
সেথায় সে করেছে পয়ান।

কেন গো, কী হয়েছিল তার।
একবার শুধালে না কেহ—
কী লাগি সে তেয়াগিল দেহ।

যদি কেহ শুধাইত
আমি জানি কী যে সে কহিত।
যতদিন বেঁচে ছিল
আমি জানি কী তারে দহিত।
সে কেবল হাসির যন্ত্রণা,
আর কিছু না!
জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ড ঢাকিতে আঁধার হৃদি
অনিবার হাসিতেই রহে,
যত হাসে ততই সে দহে।

তেমনি, তেমনি তারে হাসির অনল
দারুণ উজ্জ্বল—
দহিত, দহিত তারে, দহিত কেবল।
জ্যোতির্ময় তারাপূর্ণ বিজন তেয়াগি
তাই আজ ছুটেছে সে নিতান্ত মনের ক্লেশে
আঁধারের তারাহীন বিজনের লাগি।

কেন গো, তোমরা যত তারা
উপহাস করি তারে হাসিছ অমন ধারা।
তোমাদের হয়নি তো ক্ষতি,
যেমন আছিল আগে তেমনি রয়েছে জ্যোতি।
সে কি কভু ভেবেছিল মনে—
(এত গর্ব আছিল কি তার)
আপনারে নিবাইয়া তোমাদের করিবে আঁধার।

গেল, গেল, ডুবে গেল, তারা এক ডুবে গেল,
আঁধারসাগরে—
গভীর নিশীথে
অতল আকাশে।
হৃদয়, হৃদয় মোর, সাধ কি রে যায় তোর
ঘুমাইতে ওই মৃত তারাটির পাশে
ওই আঁধারসাগরে
এই গভীর নিশীথে
ওই অতল আকাশে।

আশার নৈরাশ্য

ওরে আশা, কেন তোর হেন দীনবেশ !
নিরাশারই মতো যেন বিষণ্ণ বদন কেন—
যেন অতি সংগোপনে
যেন অতি সন্তর্পণে
অতি ভয়ে ভয়ে প্রাণে করিস প্রবেশ ।
ফিরিবি কি প্রবেশিবি ভাবিয়া না পাস,
কেন, আশা, কেন তোর কিসের তরাস ।

আজ আসিয়াছ দিতে যে সুখ-আশ্বাস,
নিজে তাহা কর না বিশ্বাস,
তাই হেন মৃদু গতি,
তাই উঠিতেছে ধীরে দুখের নিশ্বাস ।
বসিয়া মরমস্থলে কহিছ চোখের জলে—
"বুঝি হেন দিন রহিবে না,
আজ যাবে, আসিবে তো কাল,
দুঃখ যাবে, ঘুচিবে যাতনা ।"
কেন, আশা, মোরে কেন হেন প্রতারণা ।
দুঃখক্লেশে আমি কি ডরাই,
আমি কি তাদের চিনি নাই ।
তারা সবে আমারি কি নয় ।
তবে, আশা, কেন এত ভয় ।
তবে কেন বসি মোর পাশ
মোরে, আশা, দিতেছ আশ্বাস ।

বলো, আশা, বসি মোর চিতে,
"আরো দুঃখ হইবে বহিতে,

হৃদয়ের যে প্রদেশ হয়েছিল ভস্মশেষ
আর যারে হত না সহিতে,
আবার নূতন প্রাণ পেয়ে
সেও পুন থাকিবে দহিতে।"

করিয়ো না ভয়,
দুঃখ-জ্বালা আমারি কি নয়?
তবে কেন হেন ম্লান মুখ,
তবে কেন হেন দীন বেশ?
তবে কেন এত ভয়ে ভয়ে
এ হৃদয়ে করিস প্রবেশ?

পরিত্যক্ত

চলে গেল, আর কিছু নাই কহিবার।
চলে গেল, আর কিছু নাই গাহিবার।
শুধু গাহিতেছে আর শুধু কাঁদিতেছে
দীনহীন হৃদয় আমার, শুধু বলিতেছে,
"চলে গেল সকলেই চলে গেল গো,
বুক শুধু ভেঙে গেল, দ'লে গেল গো।"

বসন্ত চলিয়া গেলে বর্ষা কেঁদে কেঁদে বলে,
"ফুল গেল, পাখি গেল—
আমি শুধু রহিলাম, সবই গেল গো।"
দিবস ফুরালে রাতি স্তব্ধ হয়ে রহে,
শুধু কেঁদে কহে,
"দিন গেল, আলো গেল, রবি গেল গো—
কেবল একেলা আমি, সবই গেল গো।"

উত্তরবায়ুর সম প্রাণের বিজনে মম
কে যেন কাঁদিছে শুধু,
"চলে গেল, চলে গেল,
সকলেই চলে গেল গো।"

উৎসব ফুরায়ে গেলে ছিন্ন শুষ্ক মালা
পড়ে থাকে হেথায় হোথায়—
তৈলহীন শিখাহীন ভগ্ন দীপগুলি
ধুলায় লুটায়—
একবার ফিরে কেহ দেখে নাকো ভুলি,
সবে চলে যায়।

পুরানো মলিন ছিন্ন বসনের মতো
মোরে ফেলে গেল,
কাতর নয়নে চেয়ে রহিলাম কত—
সাথে না লইল।

তাই প্রাণ গাহে শুধু, কাঁদে শুধু, কহে শুধু,
"মোরে ফেলে গেল,
সকলেই মোরে ফেলে গেল
সকলেই চলে গেল গো।"

একবার ফিরে তারা চেয়েছিল কি ?
বুঝি চেয়েছিল।
একবার ভুলে তারা কেঁদেছিল কি ?
বুঝি কেঁদেছিল।
বুঝি ভেবেছিল—
লয়ে যাই— নিতান্ত কি একেলা কাঁদিবে ?
তাই বুঝি ভেবেছিল।
তাই চেয়েছিল।

তার পরে?   তার পরে!
তার পরে বুঝি হেসেছিল।
একফোঁটা অশ্রুবারি মুহূর্তেই শুকাইল।
তার পরে?   তার পরে!
চলে গেল।
তার পরে?   তার পরে!
ফুল গেল, পাখি গেল, আলো গেল, রবি গেল,
সবই গেল, সবই গেল গো—
হৃদয় নিশ্বাস ছাড়ি কাঁদিয়া কহিল,
"সকলেই চলে গেল গো,
আমারেই ফেলে গেল গো।"

সুখের বিলাপ

অবশ নয়ন নিমীলিয়া
সুখ কহে নিশ্বাস ফেলিয়া,
"এমন জোছনা সুমধুর,
বাঁশরি বাজিছে দূর দূর,
যামিনীর হসিত নয়নে
লেগেছে মৃদুল ঘুমঘোর।
নদীতে উঠেছে মৃদু ঢেউ,
গাছেতে নড়িছে মৃদু পাতা;
লতায় ফুটিয়া ফুল দুটি
পাতায় লুকায় তার মাথা;
মলয় সুদূর বনভূমে
কাঁপায়ে গাছের ছায়াগুলি
লাজুক ফুলের মুখ হতে
ঘোমটা দিতেছে খুলি খুলি।
এমন মধুর রজনীতে
একেলা রয়েছি বসিয়া,

যামিনীর হৃদয় হইতে
জোছনা পড়িছে খসিয়া।"

হৃদয়ে একেলা শুয়ে শুয়ে
সুখ শুধু এই গান গায়,
"নিতান্ত একেলা আমি যে
কেহ, কেহ, কেহ নাই হায়।"
আমি তারে শুধাইনু গিয়া,
"কেন, সুখ, কার কর আশা?"
সুখ শুধু কাঁদিয়া কহিল,
"ভালোবাসা, ভালোবাসা গো।
সকলি, সকলি হেথা আছে—
কুসুম ফুটেছে গাছে গাছে,
আকাশে তারকা রাশি রাশি,
জোছনা ঘুমায় হাসি হাসি।
সকলি, সকলি হেথা আছে—
সেই শুধু, সেই শুধু নাই,
ভালোবাসা নাই শুধু কাছে।"

অবশ নয়ন নিমীলিয়া
সুখ কহে নিশ্বাস ফেলিয়া
"এই তটিনীর ধারে, এই শুভ্র জোছনায়,
এই কুসুমিত বনে, এই বসন্তের বায়,
কেহ মোর নাই একেবারে,
তাই সাধ গেছে কাঁদিবারে।
তাই সাধ যায় মনে মনে—
মিশাব এ যামিনীর সনে,
কিছুই রবে না আর প্রাতে,
শিশির রহিবে পাতে পাতে।

সাধ যায় মেঘটির মতো
কাঁদিয়া মরিয়া গিয়া আজি
অশ্রুজলে হই পরিণত।"

সুখ বলে, "এ জন্ম ঘুচায়ে
সাধ যায় হইতে বিষাদ।"
"কেন সুখ, কেন হেন সাধ?"
"নিতান্ত একা যে আমি গো
কেহ যে, কেহ যে নাই মোর।"
"সুখ, কারে চায় প্রাণ তোর?
সুখ, কার করিস রে আশা?"
সুখ শুধু কেঁদে কেঁদে বলে,
"ভালোবাসা, ভালোবাসা গো।"

হৃদয়ের গীতিধ্বনি

ও কী সুরে গান গাস, হৃদয় আমার?
শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, বসন্ত শরৎ নাই,
দিন নাই, রাত্রি নাই— অবিরাম অনিবার
ও কী সুরে গান গাস, হৃদয় আমার?
বিরলে বিজন বনে বসিয়া আপন মনে
ভূমি-পানে চেয়ে চেয়ে, একই গান গেয়ে গেয়ে—
দিন যায়, রাত যায়, শীত যায়, গ্রীষ্ম যায়,
তবু গান ফুরায় না আর?
মাথায় পড়িছে পাতা, পড়িছে শুকানো ফুল,
পড়িছে শিশিরকণা, পড়িছে রবির কর,
পড়িছে বরষা-জল ঝরঝর ঝরঝর,
কেবলি মাথার 'পরে করিতেছে সমস্বরে
বাতাসে শুকানো পাতা মরমর মরমর—

বসিয়া বসিয়া সেথা, বিশীর্ণ মলিন প্রাণ
গাহিতেছে একই গান একই গান একই গান।
পারিনে শুনিতে আর, একই গান একই গান।

কখন থামিবি তুই, বল্ মোরে বল্ প্রাণ!
একেলা ঘুমায়ে আছি—
সহসা স্বপন টুটি
সহসা জাগিয়া উঠি
সহসা শুনিতে পাই
হৃদয়ের এক ধারে
সেই স্বর ফুটিতেছে,
সেই গান উঠিতেছে—
কেহ শুনিছে না যবে
চারি দিকে স্তব্ধ সবে
সেই স্বর সেই গান অবিরাম অবিশ্রাম
অচেতন আঁধারের শিরে শিরে চেতনা সঞ্চারে।

দিবসে মগন কাজে, চারি দিকে দলবল,
চারি দিকে কোলাহল।
সহসা পাতিলে কান শুনিতে পাই সে গান,
নানাশব্দময় সেই জনকোলাহল
তাহারি প্রাণের মাঝে একমাত্র শব্দ বাজে—
এক স্বর, এক ধ্বনি, অবিরাম অবিরল—
যেন সে কোলাহলের হৃদয়স্পন্দন-ধ্বনি—
সমস্ত ভুলিয়া যাই, বসে বসে তাই গনি।

ঘুমাই বা জেগে থাকি, মনের দ্বারের কাছে
কে যেন বিষণ্ণ প্রাণী দিনরাত বসে আছে—
চিরদিন করিতেছে বাস,
তারি শুনিতেছি যেন নিশ্বাস-প্রশ্বাস।

এ প্রাণের ভাঙা ভিতে স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে
ঘুঘু এক বসে বসে গায় একস্বরে,
কে জানে কেন সে গান গায়।
গলি সে কাতর স্বরে স্তব্ধতা কাঁদিয়া মরে,
প্রতিধ্বনি করে হায়-হায়।

হৃদয় রে, আর কিছু শিখিলিনে তুই,
শুধু ওই গান!
প্রকৃতির শত শত রাগিণীর মাঝে
শুধু ওই তান!

তবে থাম্ থাম্ ওরে প্রাণ,
পারিনে শুনিতে আর একই গান, একই গান।

দুঃখ-আবাহন

আয় দুঃখ, আয় তুই,
তোর তরে পেতেছি আসন,
হৃদয়ের প্রতি শিরা টানি টানি উপাড়িয়া
বিচ্ছিন্ন শিরার মুখে তৃষিত অধর দিয়া
বিন্দু বিন্দু রক্ত তুই করিস শোষণ;
জননীর স্নেহে তোরে করিব পোষণ।
হৃদয়ে আয় রে তুই হৃদয়ের ধন।

নিভৃতে ঘুমাবি তুই হৃদয়ের নীড়ে;
অতি গুরু তোর ভার—
দু-একটি শিরা তাহে যাবে বুঝি ছিঁড়ে,
যাক ছিঁড়ে।
জননীর স্নেহে তোরে করিব বহন
দুর্বল বুকের 'পরে করিব ধারণ,

একেলা বসিয়া ঘরে অবিরল একস্বরে
গাব তোর কানে কানে ঘুম পাড়াবার গান
মুদিয়া আসিবে তোর শ্রান্ত দু-নয়ান।
প্রাণের ভিতর হতে উঠিয়া নিশ্বাস
শ্রান্ত কপালেতে তোর করিবে বাতাস,
তুই নীরবে ঘুমাস।

আয়, দুঃখ, আয় তুই, ব্যাকুল এ হিয়া।
দুই হাতে মুখ চাপি হৃদয়ের ভূমি-'পরে
পড়্ আছাড়িয়া।
সমস্ত হৃদয় ব্যাপি একবার উচ্চস্বরে
অনাথ শিশুর মতো ওঠ্ রে কাঁদিয়া।
প্রাণের মর্মের কাছে
একটি যে ভাঙা বাদ্য আছে
দুই হাতে তুলে নে রে, সবলে বাজায়ে দে রে
নিতান্ত উন্মাদ-সম ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্।
ভাঙে তো ভাঙিবে বাদ্য, ছেঁড়ে তো ছিঁড়িবে তন্ত্রী—
নে রে তবে তুলে নে রে, সবলে বাজায়ে দে রে
নিতান্ত উন্মাদ-সম ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্।
দারুণ আহত হয়ে দারুণ শব্দের ঘায়
যত আছে প্রতিধ্বনি বিষম প্রমাদ গনি
একেবারে সমস্বরে
কাঁদিয়া উঠিবে যন্ত্রণায়—
দুঃখ, তুই আয় তুই আয়।

নিতান্ত একেলা এ হৃদয়।
আর কিছু নয়,
কাছে আয় একবার, তুলে ধর্ মুখ তার,
মুখে তার আঁখি দুটি রাখ্,
একদৃষ্টে চেয়ে শুধু থাক্।

আর কিছু নয়,
নিরালয় এ হৃদয়
শুধু এক সহচর চায়।
তুই দুঃখ, তুই কাছে আয়।
কথা না কহিস যদি বসে থাক্ নিরবধি
হৃদয়ের পাশে দিনরাতি।
যখনি খেলাতে চাস হৃদয়ের কাছে যাস,
হৃদয় আমার চায় খেলাবার সাথি।

আয় দুঃখ হৃদয়ের ধন,
এই হেথা পেতেছি আসন।
প্রাণের মর্মের কাছে
এখনো যা রক্ত আছে
তাই তুই করিস শোষণ।

শান্তিগীত

ঘুমা দুঃখ হৃদয়ের ধন,
ঘুমা তুই, ঘুমা রে এখন।
সুখে সারা দিনমান শোণিত করিয়া পান
এখন তো মিটেছে তিয়াষ?
দুঃখ, তুই সুখেতে ঘুমাস।

আজ জোছনার রাত্রে বসন্তপবনে,
অতীতের পরলোক ত্যজি শূন্যমনে,
বিগত দিবসগুলি শুধু একবার
পুরানো খেলার ঠাঁই দেখিতে এসেছে
এই হৃদয়ে আমার—

যবে বেঁচেছিল তারা এই এ শ্মশানে
দিন গেলে প্রতিদিন পুড়াত যেখানে
একেকটি আশা আর একেকটি সুখ,
সেইখানে আসি তারা বসিয়া রয়েছে
অতিম্লানমুখ।

সেখানে বসিয়া তারা সকলে মিলিয়া
অতি মৃদু স্বরে
পুরানো কালের গীতি নয়ন মুদিয়া
ধীরে গান করে।

দুঃখ, তুই ঘুমা।
ধীরে উঠিতেছে গান,
ক্রমে ছাইতেছে প্রাণ,
নীরবতা ছায় যথা সন্ধ্যার গগন।
গানের প্রাণের মাঝে তোর তীব্র কণ্ঠস্বর
ছুরির মতন।
তুই থাম্ দুঃখ, থাম্।
তুই ঘুমা দুঃখ, ঘুমা।

কাল উঠিস আবার,
খেলিস দুরন্ত খেলা হৃদয়ে আমার;
হৃদয়ের শিরাগুলি ছিড়ি ছিঁড়ি মোর
তাইতে রচিস তন্ত্রী বীণাটির তোর,
সারাদিন বাজাস বসিয়া
ধ্বনিয়া হৃদয়।
আজ রাত্রে রব শুধু চাহিয়া চাঁদের পানে,
আর কিছু নয়।

অসহ্য ভালোবাসা

বুঝেছি গো বুঝেছি সজনি,
কী ভাব তোমার মনে জাগে—
বুক-ফাটা প্রাণ-ফাটা মোর ভালোবাসা
এত বুঝি ভালো নাহি লাগে।
এত ভালোবাসা বুঝি পার না সহিতে,
এত বুঝি পার না বহিতে।

যখনি গো নেহারি তোমায়—
মুখ দিয়া আঁখি দিয়া   বাহিরিতে চায় হিয়া,
শিরার শৃঙ্খলগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিতে চায়,
ওই মুখ বুকে ঢাকে,   ওই হাতে হাত রাখে,
কী করিবে ভাবিয়া না পায়,
যেন তুমি কোথা আছ খুঁজিয়া না পায়।
মন মোর পাগলের হেন   প্রাণপণে শুধায় সে যেন,
"প্রাণের প্রাণের মাঝে কী করিলে তোমারে গো পাই,
যে ঠাঁই রয়েছে শূন্য কী করিলে সে শূন্য পুরাই!"
এইরূপে দেহের দুয়ারে
মন যবে থাকে যুঝিবারে,
তুমি চেয়ে দেখ মুখ-বাগে—
এত বুঝি ভালো নাহি লাগে।
তুমি চাও যবে মাঝে মাঝে
অবসর পাবে তুমি কাজে
আমারে ডাকিবে একবার—
কাছে গিয়া বসিব তোমার,
মৃদু মৃদু সুমধুর বাণী
কব তব কানে কানে রানী।

তুমিও কহিবে মৃদু ভাষ,
তুমিও হাসিবে মৃদু হাস,
হৃদয়ের মৃদু খেলাখেলি—
ফুলেতে ফুলেতে হেলাহেলি।

চাও তুমি দুখহীন প্রেম
ছুটে যেথা ফুলের সুবাস,
উঠে যেথা জোছনালহরী,
বহে যেথা বসন্তবাতাস।
নাহি চাও আত্মহারা প্রেম
আছে যেথা অনন্ত পিয়াস,
বহে যেথা চোখের সলিল,
উঠে যেথা দুখের নিশ্বাস।
প্রাণ যেথা কথা ভুলে যায়,
আপনারে ভুলে যায় হিয়া,
অচেতন চেতনা যেথায়
চরাচর ফেলে হারাইয়া।

এমন কি কেহ নাই, বল্ মোরে বল্ আশা,
মার্জনা করিবে মোর অতি— অতি ভালোবাসা!

হলাহল

এমন ক'দিন কাটে আর!
ললিত গলিত হাস, জাগরণ, দীর্ঘশ্বাস,
সোহাগ, কটাক্ষ, মান, নয়নসলিলধার,
মৃদু হাসি— মৃদু কথা— আদরের, উপেক্ষার—
এই শুধু, এই শুধু, দিনরাত এই শুধু—
এমন ক'দিন কাটে আর!

কটাক্ষে মরিয়া যায়, কটাক্ষে বাঁচিয়া উঠে,
হাসিতে হৃদয় জুড়ে, হাসিতে হৃদয় টুটে,
ভীরুর মতন আসে দাঁড়ায়ে রহে গো পাশে,
ভয়ে ভয়ে মৃদু হাসে, ভয়ে ভয়ে মুখ ফুটে,
একটু আদর পেলে অমনি চরণে লুটে,
অমনি হাসিটি জাগে মলিন অধরপুটে,
একটু কটাক্ষ হেরি অমনি সরিয়া যায়—
অমনি জগৎ যেন শূন্য মরুভূমি-হেন,
অমনি মরণ যেন প্রাণের অধিক ভায়।

প্রণয় অমৃত এ কি? এ যে ঘোর হলাহল—
হৃদয়ের শিরে শিরে প্রবেশিয়া ধীরে ধীরে
অবশ করেছে দেহ, শোণিত করেছে জল।
কাজ নাই, কর্ম নাই, বসে আছে এক ঠাঁই,
হাসি ও কটাক্ষ লয়ে খেলেনা গড়িছে যত,
কভু ঢুলে পড়া আঁখি কভু অশ্রুভারে নত।

দূর করো, দূর করো, বিকৃত এ ভালোবাসা,
জীবনদায়িনী নহে, এ যে গো হৃদয়নাশা।
কোথায় প্রণয়ে মন যৌবনে ভরিয়া উঠে,
জগতের অধরেতে হাসির জোছনা ফুটে,
চোখেতে সকলি ঠেকে বসন্তহিল্লোলময়,
হৃদয়ের শিরে শিরে শোণিত সতেজে বয়—
তা নয়, একি এ হল, একি এ জর্জর মন!
হাসিহীন দু অধর, জ্যোতিহীন দু নয়ন!
দূরে যাও, দূরে যাও, হৃদয় রে দূরে যাও—
ভুলে যাও, ভুলে যাও, ছেলেখেলা ভুলে যাও।
দূর করো, দূর করো, বিকৃত এ ভালোবাসা—
জীবনদায়িনী নহে, এ যে গো হৃদয়নাশা।

অনুগ্রহ

এই-যে জগৎ হেরি আমি,
মহাশক্তি জগতের স্বামী,
এ কি হে তোমার অনুগ্রহ ?
হে বিধাতা কহ মোরে কহ।
ওই-যে সমুখে সিন্ধু, এ কি অনুগ্রহবিন্দু ?
ওই-যে আকাশে শোভে চন্দ্র সূর্য গ্রহ,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তব অনুগ্রহ ?
ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্র একজন
আমারে যে করেছ সৃজন,
এ কি শুধু অনুগ্রহ করে
ঋণপাশে বাঁধিবারে মোরে ?
করিতে করিতে যেন খেলা
কটাক্ষে করিয়া অবহেলা,
হেসে ক্ষমতার হাসি অসীম ক্ষমতা হতে
ব্যয় করিয়াছ এক রতি
অনুগ্রহ ক'রে মোর প্রতি ?
শুভ্র শুভ্র জুঁই দুটি ওই-যে রয়েছে ফুটি
ও কি তব অতি শুভ্র ভালোবাসা নয় ?
বলো মোরে, মহাশক্তিময়,
ওই-যে জোছনা-হাসি ওই-যে তারকারাশি,
আকাশে হাসিয়া ফুটে রয়,
ও কি তব ভালোবাসা নয় ?
ও কি তব অনুগ্রহহাসি
কঠোর পাষাণ লৌহময় ?
তবে হে হৃদয়হীন দেব,
জগতের রাজ-অধিরাজ,
হানো তব হাসিময় বাজ,

মহা অনুগ্রহ হতে তব
মুছে তুমি ফেলহ আমারে—
চাহি না থাকিতে এ সংসারে।

ভালোবাসি আপনা ভুলিয়া,
গান গাহি হৃদয় খুলিয়া,
ভক্তি করি পৃথিবীর মতো,
স্নেহ করি আকাশের প্রায়।
আপনারে দিয়েছি ফেলিয়া,
আপনারে গিয়েছি ভুলিয়া,
যারে ভালোবাসি তার কাছে
প্রাণ শুধু ভালোবাসা চায়।

সাক্ষী আছ তুমি অন্তর্যামী
কতখানি ভালোবাসি আমি,
দেখি যবে তার মুখ হৃদয়ে দারুণ সুখ
ভেঙে ফেলে হৃদয়ের দ্বার
বলে, "এ কী ঘোর কারাগার!"

প্রাণ বলে, "পারিনে সহিতে,
এ দুরন্ত সুখেরে বহিতে।"
আকাশে হেরিলে শশী আনন্দে উথলি উঠি
দেয় যথা মহাপারাবার
অসীম আনন্দ উপহার,
তেমনি সমুদ্র-ভরা আনন্দ তাহারে দিই
হৃদয় যাহারে ভালোবাসে,
হৃদয়ের প্রতি ঢেউ উথলি গাহিয়া উঠে
আকাশ পুরিয়া গীতোচ্ছ্বাসে।
ভেঙে ফেলি উপকূল পৃথিবী ডুবাতে চাহে,
আকাশে উঠিতে চায় প্রাণ—

আপনারে ভুলে গিয়ে হৃদয় হইতে চাহে
একটি জগতব্যাপী গান।
তাহারে কবির অশ্রু হাসি
দিয়েছি কত-না রাশি রাশি,
তাহারি কিরণে ফুটিতেছে
হৃদয়ের আশা ও ভরসা,
তাহারি হাসি ও অশ্রুজল
এ প্রাণের বসন্ত বরষা।

ভালোবাসি, আর গান গাই—
কবি হয়ে জন্মেছি ধরায়—
রাত্রি এত ভালো নাহি বাসে,
উষা এত গান নাহি গায়।

ভালোবাসা স্বাধীন মহান,
ভালোবাসা পর্বত-সমান।
ভিক্ষাবৃত্তি করে না তপন
পৃথিবীরে চাহে সে যখন—
সে চাহে উজ্জ্বল করিবারে,
সে চাহে উর্বর করিবারে,
জীবন করিতে প্রবাহিত,
কুসুম করিতে বিকশিত।
চাহে সে বাসিতে শুধু ভালো,
চাহে সে করিতে শুধু আলো,
স্বপ্নেও কি ভাবে কভু ধরা,
তপনেরে অনুগ্রহ করা ?
যবে আমি যাই তার কাছে
সে কি মনে ভাবে গো তখন
অনুগ্রহ ভিক্ষা মাগিবারে
এসেছে ভিক্ষুক একজন ?

অনুগ্রহ পাষাণমমতা,
করুণার কঙ্কাল কেবল,
ভাবহীন বজ্রে গড়া হাসি—
স্ফটিককঠিন অশ্রুজল।
অনুগ্রহ বিলাসী গর্বিত,
অনুগ্রহ দয়ালু কৃপণ—
বহু কষ্টে অশ্রুবিন্দু দেয়
শুষ্ক আঁখি করিয়া মন্থন।
নীচ হীন দীন অনুগ্রহ
কাছে যবে আসিবারে চায়,
প্রণয় বিলাপ করি উঠে—
গীতগান ঘৃণায় পলায়।

হে দেবতা, অনুগ্রহ হতে
রক্ষা করো অভাগা কবিরে,
অপযশ অপমান দাও—
দুঃখ জালা বহিব এ শিরে।
সম্পদের স্বর্ণকারাগারে,
গরবের অন্ধকার-মাঝ,
অনুগ্রহ রাজার মতন
চিরকাল করুক বিরাজ।
সোনার শৃঙ্খল ঝংকারিয়া
গরবের স্ফীত দেহ লয়ে
অনুগ্রহ আসে নাকো যেন
আমাদের স্বাধীন আলয়ে।

গান আসে ব'লে গান গাই,
ভালোবাসি ব'লে ভালোবাসি,
কেহ যেন মনে নাহি করে
মোরা কারো কৃপার প্রয়াসী।

নাহয় শুনো না মোর গান,
ভালোবাসা ঢাকা রবে মনে।
অনুগ্রহ ক'রে এই কোরো—
অনুগ্রহ কোরো না এ জনে।

আবার

তুমি কেন আসিলে হেথায়
এ আমার সাধের আবাসে ?
এ আলয়ে যে নিবাসী থাকে,
এ আলয়ে যে অতিথি আসে,
সবাই আমার সখা, সবাই আমার বঁধু,
সবারেই আমি ভালোবাসি,
তারাও আমারে ভালোবাসে—
তুমি তবে কেন এলে হেথা
এ আমার সাধের আবাসে ?

এ আমার প্রেমের আলয়,
এ মোর স্নেহের নিকেতন ;
বেছে বেছে কুসুম তুলিয়া
রচিয়াছি কোমল আসন।
কেহ হেথা নাইকো নিষ্ঠুর,
কিছু হেথা নাইকো কঠিন,
কবিতা আমার প্রণয়িনী
এইখানে আসে প্রতিদিন।
সমীর কোমলমন আসে হেথা অনুক্ষণ
যখনি সে পায় অবকাশ,
যখনি প্রভাত ফুটে, যখনি সে জেগে উঠে
ছুটিয়া সে আসে মোর পাশ।

দুই বাহু প্রসারিয়া আমারে বুকেতে নিয়া
কত শত বারতা শুধায়,
সখা মোর প্রভাতের বায়।
আকাশেতে তুলে আঁখি বাতায়নে বসে থাকি
নিশি যবে পোহায়-পোহায়,
উষার আলোকে হারা সখী মোর শুকতারা
আমার এ মুখপানে চায়।
নীরবে চাহিয়া রহে, নীরব নয়নে কহে,
"সখা, আজ বিদায়, বিদায়।"

ধীরে ধীরে সন্ধ্যার বাতাস
প্রতিদিন আসে মোর পাশ।
দেখে, আমি বাতায়নে, অশ্রু ঝরে দু নয়নে,
ফেলিতেছি দুখের নিশ্বাস।
অতি ধীরে আলিঙ্গন করে,
কথা কহে সকরুণ স্বরে,
কানে কানে বলে, "হায় হায়!"
কোমল কপোল দিয়া কপোল চুম্বন করি
অশ্রুবিন্দু সুধীরে শুকায়।
সবাই আমার মন বুঝে,
সবাই আমার দুঃখ জানে,
সবাই করুণ আঁখি মেলি
চেয়ে থাকে এই মুখপানে।
যে কেহ আমার ঘরে আসে
সবাই আমারে ভালোবাসে—
তবে কেন তুমি এলে হেথা
এ আমার সাধের আবাসে?

ফেরো ফেরো, ও নয়ন রসহীন ও বয়ন
আনিয়ো না এ মোর আলয়ে—

আমরা সখারা মিলি আছি হেথা নিরিবিলি
আপনার মনোদুঃখ লয়ে।
এমনি হয়েছে শান্ত মন,
ঘুচেছে দুঃখের কঠোরতা ;
ভালো লাগে বিহঙ্গের গান,
ভালো লাগে তটিনীর কথা।
ভালো লাগে কাননে দেখিতে
বসন্তের কুসুমের মেলা,
ভালো লাগে সারাদিন বসে
দেখিতে মেঘের ছেলেখেলা।
এইরূপে সায়াহ্নের কোলে
রচেছি গোধূলি-নিকেতন,
দিবসের অবসান-কালে
পশে হেথা রবির কিরণ।
আসে হেথা অতি দূর হতে
পাখিদের বিরামের তান,
ম্রিয়মাণ সন্ধ্যা-বাতাসের
থেকে থেকে মরণের গান।
পরিশ্রান্ত অবশ পরানে
বসিয়া রয়েছি এইখানে।

যাও মোরে যাও ছেড়ে, নিয়ো না নিয়ো না কেড়ে,
নিয়ো না নিয়ো না মন মোর।
সখাদের কাছ হতে ছিনিয়া নিয়ো না মোরে,
ছিঁড়ো না এ প্রণয়ের ডোর।
আবার হারাই যদি এই গিরি এই নদী
মেঘ বায়ু কানন নির্ঝর,
আবার স্বপন ছুটে একেবারে যায় টুটে
এ আমার গোধূলির ঘর,

আবার আশ্রয়হারা ঘুরে ঘুরে হই সারা
ঝটিকার মেঘখণ্ড-সম
দুঃখের বিদ্যুৎ-ফণা ভীষণ ভুজঙ্গ এক
পোষণ করিয়া বক্ষে মম—
তাহা হলে এ জনমে নিরাশ্রয় এ জীবনে
ভাঙা ঘর আর গড়িবে না,
ভাঙা হৃদি আর জুড়িবে না!
কাল সবে গড়েছি আলয়,
কাল সবে জুড়েছি হৃদয়—
আজি তা দিয়ো না যেন ভেঙে,
রাখো তুমি রাখো এ বিনয়।

পাষাণী

জগতের বাতাস করুণা,
করুণা সে রবিশশী তারা,
জগতের শিশির করুণা—
জগতের বৃষ্টিবারিধারা।
জননীর স্নেহধারা-সম
এই-যে জাহ্নবী বহিতেছে,
মধুরে তটের কানে কানে
আশ্বাস-বচন কহিতেছে—
এও সেই বিমল করুণা
হৃদয় ঢালিয়া বহে যায়,
জগতের তৃষা নিবারিয়া
গান গাহে করুণ ভাষায়।
কাননের ছায়া সে করুণা,
করুণা সে উষার কিরণ,

করুণা সে জননীর আঁখি,
করুণা সে প্রেমিকের মন।
এমন যে মধুর করুণা,
এমন যে কোমল করুণা,
জগতের হৃদয়-জুড়ানো
এমন যে বিমল করুণা—
দিন দিন বুক ফেটে যায়,
দিন দিন দেখিবারে পাই,
যারে ভালোবাসি প্রাণপণে
সে করুণা তার মনে নাই।
পরের নয়নজলে তার না হৃদয় গলে,
দুখেরে সে করে উপহাস,
দুখেরে সে করে অবিশ্বাস।
দেখিয়া হৃদয় মোর তরাসে শিহরি উঠে,
প্রেমের কোমল প্রাণে শত শত শেল ফুটে,
হৃদয় কাতর হয়ে নয়ন মুদিতে চায়,
কাঁদিয়া সে বলে, "হায় হায়,
এ তো নহে আমার দেবতা,
তবে কেন রয়েছে হেথায়?"

তুমি নও, সে জন তো নও,
তবে তুমি কোথা হতে এলে?
এলে যদি এস তবে কাছে,
এ হৃদয়ে যত অশ্রু আছে
একবার সব দিই ঢেলে,
তোমার সে কঠিন পরান
যদি তাহে একতিল গলে,
কোমল হইয়া আসে মন
সিক্ত হয়ে অশ্রুজলে-জলে।

কাঁদিবারে শিখাই তোমায়—
পরদুঃখে ফেলিতে নিশ্বাস,
করুণার সৌন্দর্য অতুল
ও নয়নে করে যেন বাস।
প্রতিদিন দেখিয়াছি আমি
করুণারে করেছ পীড়ন,
প্রতিদিন ঐ মুখ হতে
ভেঙে গেছে রূপের মোহন।
কুবলয়-আঁখির মাঝারে
সৌন্দর্য পাই না দেখিবারে,
হাসি তব আলোকের প্রায়
কোমলতা নাহি যেন তায়,
তাই মন প্রতিদিন কহে,
"নহে নহে, এ জন সে নহে।"

শোনো বঁধু, শোনো, আমি করুণারে ভালোবাসি।
সে যদি না থাকে তবে ধূলিময় রূপরাশি।
তোমারে যে পূজা করি, তোমারে যে দিই ফুল,
ভালোবাসি বলে যেন কখনো কোরো না ভুল।
যে জন দেবতা মোর কোথা সে আছে না জানি,
তুমি তো কেবল তার পাষাণপ্রতিমাখানি।
তোমার হৃদয় নাই, চোখে নাই অশ্রুধার,
কেবল রয়েছে তব পাষাণ-আকার তার।

দুই দিন

আরম্ভিছে শীতকাল, পড়িছে নীহারজাল,
শীর্ণ বৃক্ষশাখা যত ফুলপত্রহীন ;
মৃতপ্রায় পৃথিবীর মুখের উপরে
বিষাদে প্রকৃতিমাতা শুভ্র বাষ্পজালে-গাঁথা
কুজ্ঝটি-বসনখানি দেছেন টানিয়া।
পশ্চিমে গিয়েছে রবি, স্তব্ধ সন্ধ্যাবেলা,
বিদেশে আসিনু শ্রান্ত পথিক একেলা।

রহিনু দু'দিন।
এখনো রয়েছে শীত, বিহঙ্গ গাহে না গীত,
এখনো ঝরিছে পাতা, পড়িছে তুহিন।
বসন্তের প্রাণভরা চুম্বন-পরশে
সর্ব অঙ্গ শিহরিয়া পুলকে-আকুল-হিয়া
মৃতশয্যা হতে ধরা জাগেনি হরষে।
এক দিন দুই দিন ফুরাইল শেষে,
আবার উঠিতে হল, চলিনু বিদেশে।

এই যে ফিরানু মুখ, চলিনু পুরবে,
আর কি রে এ জীবনে ফিরে আসা হবে!
কত মুখ দেখিয়াছি দেখিব না আর।
ঘটনা ঘটিবে কত, বরষ বরষ শত
জীবনের 'পর দিয়া হয়ে যাবে পার—
হয়তো-বা একদিন অতি দূর দেশে,
আসিয়াছে সন্ধ্যা হয়ে, বাতাস যেতেছে বয়ে,
একেলা নদীর ধারে রহিয়াছি বসে—
হু হু করে উঠিবেক সহসা এ হিয়া,
সহসা এ মেঘাচ্ছন্ন স্মৃতি উজলিয়া

একটি অস্ফুট রেখা সহসা দিবে যে দেখা,
একটি মুখের ছবি উঠিবে জাগিয়া,
একটি গানের ছত্র পড়িবেক মনে,
দু-একটি সুর তার উদিবে স্মরণে,
অবশেষে একেবারে সহসা সবলে
বিস্মৃতির বাঁধগুলি ভাঙিয়া চূর্ণিয়া ফেলি
সেদিনের কথাগুলি বন্যার মতন
একেবারে বিপ্লাবিয়া ফেলিবে এ মন।

শতফুলদলে গড়া সেই মুখ তার
স্বপনেতে প্রতিনিশি হৃদয়ে উদিবে আসি
এলানো আকুল কেশে, আকুল নয়নে।
সেই মুখ সঙ্গী মোর হইবে বিজনে,
নিশীথের অন্ধকার আকাশের পটে
নক্ষত্র-গ্রহের মতো উঠিবেক ফুটে
ধীরে ধীরে রেখা রেখা সেই মুখ তার
নিঃশব্দে মুখের পানে চাহিয়া আমার।
চমকি উঠিব জাগি শুনি ঘুমঘোরে
"যাবে তবে? যাবে?" সেই ভাঙা-ভাঙা স্বরে।

ফুরাল দু'দিন—
শরতে যে শাখা হয়েছিল পত্রহীন
এ দু'দিনে সে শাখা উঠেনি মুকুলিয়া,
অচল শিখর-'পরি যে তুষার ছিল পড়ি
এ দু'দিনে কণা তার যায়নি গলিয়া,
কিন্তু এ দু'দিন তার শত বাহু দিয়া
চিরটি জীবন মোর রহিবে বেষ্টিয়া।
দু'দিনের পদচিহ্ন চিরদিন-তরে
অঙ্কিত রহিবে শত বরষের শিরে।

পরাজয়-সংগীত

ভালো করে যুঝিলিনে, হল তোরি পরাজয়—
কী আর ভাবিতেছিস, ম্রিয়মাণ, হা হৃদয়!
কাঁদ্ তুই, কাঁদ্, হেথা আয়,
একা বসে বিজনে বিদেশে।
জানিতাম জানিতাম হা রে
এমনি ঘটিবে অবশেষে।

সংসারে যাহারা ছিল সকলেই জয়ী হল,
তোরি শুধু হল পরাজয়—
প্রতি রণে প্রতি পদে একে একে ছেড়ে দিলি
জীবনের রাজ্য সমুদয়।
যতবার প্রতিজ্ঞা করিলি
ততবার পড়িল টুটিয়া,
ছিন্ন আশা বাঁধিয়া তুলিলি
বার বার পড়িল লুটিয়া।
"সান্ত্বনা সান্ত্বনা" করি ফিরি
সান্ত্বনা কি মিলিল রে মন?
জুড়াইতে ক্ষত বক্ষঃস্থল
ছুরিরে করিলি আলিঙ্গন।
ইচ্ছা, সাধ, আশা যাহা ছিল
অদৃষ্ট সকলি লুটে নিল।

মনে হইতেছে আজি জীবন হারায়ে গেছে,
মরণ হারায়ে গেছে হায়!
কে জানে এ কী এ ভাব? শূন্যপানে চেয়ে আছি
মৃত্যুহীন মরণের প্রায়।

পরাজিত এ হৃদয় জীবনের দুর্গ মম
মরণে করিল সমর্পণ,
তাই আজ জীবনে মরণ।

জাগ্ জাগ্ জাগ্ ওরে, গ্রাসিতে এসেছে তোরে
নিদারুণ শূন্যতার ছায়া,
আকাশ-গরাসী তার কায়া।
গেল তোর চন্দ্র সূর্য, গেল তোর গ্রহ তারা,
গেল তোর আত্ম আর পর।
এইবেলা প্রাণপণ কর্।
এইবেলা ফিরে দাঁড়া তুই,
স্রোতোমুখে ভাসিস্‌নে আর।
যাহা পাস আঁকড়িয়া ধর্—
সম্মুখে অসীম পারাবার,
সম্মুখেতে চির অমানিশি,
সম্মুখেতে মরণ বিনাশ!
গেল, গেল, বুঝি নিয়ে গেল
আবর্ত করিল বুঝি গ্রাস!

শিশির

শিশির কাঁদিয়া শুধু বলে,
"কেন মোর হেন ক্ষুদ্র প্রাণ—
শিশুটির কল্পনার মতো
জনমি অমনি অবসান?
ঘুম-ভাঙা উষা-মেয়েটির
একটি সুখের অশ্রু হায়,
হাসি তার ফুরাতে ফুরাতে
এ অশ্রুটি শুকাইয়া যায়।

টুকটুকে মুখখানি নিয়ে
গোলাপ হাসিছে মুচকিয়ে,
বকুল প্রাণের সুধা দিয়ে,
বায়ুরে মাতাল করি তুলে—
প্রজাপতি ভাবিয়া না পায়
কাহারে তাহার প্রাণ চায়,
তুলিয়া অলস পাখা দুটি
ভ্রমিতেছে ফুল হতে ফুলে—
সেই হাসি-রাশির মাঝারে
আমি কেন থাকিতে না পাই!
যেমনি নয়ন মেলি, হায়,
সুখের নিমেষটির প্রায়,
অতৃপ্ত হাসিটি মুখে লয়ে
অমনি কেন গো মরে যাই!”

শুয়ে শুয়ে অশোক-পাতায়
মুমূর্ষু শিশির বলে, “হায়,
কোনো সুখ ফুরায়নি যার
তার কেন জীবন ফুরায়?”

“আমি কেন হইনি শিশির?”
কহে কবি নিশ্বাস ফেলিয়া।
“প্রভাতেই যেতেম শুকায়ে
প্রভাতেই নয়ন মেলিয়া।
হে বিধাতা, শিশিরের মতো
গড়েছ আমার এই প্রাণ,
শিশিরের মরণটি কেন
আমারে করনি তবে দান?”

সংগ্রাম-সংগীত

হৃদয়ের সাথে আজি
করিব রে করিব সংগ্রাম।
এতদিন কিছু না করিনু,
এতদিন বসে রহিলাম,
আজি এই হৃদয়ের সাথে
একবার করিব সংগ্রাম।

বিদ্রোহী এ হৃদয় আমার
জগৎ করিছে ছারখার।
গ্রাসিছে চাঁদের কায়া ফেলিয়া আঁধার ছায়া
সুবিশাল রাহুর আকার।
মেলিয়া আঁধার গ্রাস দিনেরে দিতেছে ত্রাস,
মলিন করিছে মুখ তার।
উষার মুখের হাসি লয়েছে কাড়িয়া,
গভীর বিরামময় সন্ধ্যার প্রাণের মাঝে
দুরন্ত অশান্তি এক দিয়াছে ছাড়িয়া।
প্রাণ হতে মুছিতেছে অরুণের রাগ,
দিতেছে প্রাণের মাঝে কলঙ্কের দাগ,
প্রাণের পাখির গান দিয়াছে থামায়ে,
বেড়াত যে সাধগুলি মেঘের দোলায় দুলি
তাদের দিয়াছে হায় ভূতলে নামায়ে।
ক্রমশই বিছাইছে অন্ধকার পাখা,
আঁখি হতে সব কিছু পড়িতেছে ঢাকা।
ফুল ফুটে, আমি আর দেখিতে না পাই ;
পাখি গাহে, মোর কাছে গাহে না সে আর ;
দিন হল, আলো হল, তবু দিন নাই,
আমি শুধু নেহারি পাখার অন্ধকার।

মিছা বসে রহিব না আর,
চরাচর হারায় আমার।
রাজ্যহারা ভিখারির সাজে
দগ্ধ ধ্বংস-ভস্ম-'পরি ভ্রমিব কি হাহা করি
জগতের মরুভূমি-মাঝে ?

আজ তবে হৃদয়ের সাথে
একবার করিব সংগ্রাম।
ফিরে নেব, কেড়ে নেব আমি
জগতের একেকটি গ্রাম।
ফিরে নেব রবিশশীতারা,
ফিরে নেব সন্ধ্যা আর উষা,
পৃথিবীর শ্যামল যৌবন,
কাননের ফুলময় ভূষা।
ফিরে নেব হারানো সংগীত,
ফিরে নেব মৃতের জীবন,
জগতের ললাট হইতে
আঁধার করিব প্রক্ষালন।
আমি হব সংগ্রামে বিজয়ী,
হৃদয়ের হবে পরাজয়,
জগতের দূর হবে ভয়।

হৃদয়েরে রেখে দেব বেঁধে,
বিরলে মরিবে কেঁদে কেঁদে।
দুঃখে বিঁধি কষ্টে বিঁধি জর্জর করিব হৃদি—
বন্দী হয়ে কাটাবে দিবস,
অবশেষে হইবে সে বশ,
জগতে রটিবে মোর যশ।
বিশ্বচরাচরময় উচ্ছ্বসিবে জয় জয়,
উল্লাসে পুরিবে চারি ধার,

গাবে রবি, গাবে শশী, গাবে তারা শূন্যে বসি,
গাবে বায়ু শত শত বার।
চারি দিকে দিবে হুলুধ্বনি,
বরষিবে কুসুম-আসার,
বেঁধে দেব বিজয়ের মালা
শান্তিময় ললাটে আমার।

আমি-হারা

হায় হায়,
জীবনের তরুণ বেলায়,
কে ছিল রে হৃদয়-মাঝারে,
দুলিত রে অরুণ-দোলায়!
হাসি তার ললাটে ফুটিত,
হাসি তার ভাসিত নয়নে,
হাসি তার ঘুমায়ে পড়িত
সুকোমল অধরশয়নে।
ঘুমাইলে, নন্দনবালিকা
গেঁথে দিত স্বপনমালিকা;
জাগরণে, নয়নে তাহার
ছায়াময় স্বপন জাগিত;
আশা তার পাখা প্রসারিয়া
উড়ে যেত উধাও হইয়া,
চাঁদের পায়ের কাছে গিয়ে
জ্যোৎস্নাময় অমৃত মাগিত।
বনে সে তুলিত শুধু ফুল,
শিশির করিত শুধু পান,
প্রভাতের পাখিটির মতো
হরষে করিত শুধু গান।

কে গো সেই, কে গো হায় হায়,
জীবনের তরুণ বেলায়
খেলাইত হৃদয়-মাঝারে
দুলিত রে অরুণ দোলায় ?
সচেতন অরুণকিরণ
কে সে প্রাণে এসেছিল নামি ?
সে আমার শৈশবের কুঁড়ি,
সে আমার সুকুমার আমি।

প্রতিদিন বাড়িল আঁধার,
পথমাঝে উড়িল রে ধূলি,
হৃদয়ের অরণ্য-আঁধারে
দুজনে আইনু পথ ভুলি।
নয়নে পড়িছে তার রেণু,
শাখা বাজে সুকুমার কায়,
ঘন ঘন বহিছে নিশ্বাস
কাঁটা বিঁধে সুকোমল গায়।
ধুলায় মলিন হল দেহ,
সভয়ে মলিন হল মুখ,
কেঁদে সে চাহিল মুখপানে
দেখে মোর ফেটে গেল বুক।

কেঁদে সে কহিল মুখ চাহি,
"ওগো মোরে আনিলে কোথায় ?
পায় পায় বাজিতেছে বাধা,
তরুশাখা লাগিছে মাথায়।
চারি দিকে মলিন আঁধার,
কিছু হেথা নাহি যে সুন্দর,
কোথা গো শিশির-মাখা ফুল,
কোথা গো প্রভাতরবিকর ?"

কেঁদে কেঁদে সাথে সে চলিল,
কহিল সে সকরুণ স্বর,
"কোথা গো শিশির-মাখা ফুল,
কোথা গো প্রভাত রবিকর।"
প্রতিদিন বাড়িল আঁধার,
পথ হল পঙ্কিল মলিন—
মুখে তার কথাটিও নাই,
দেহ তার হল বলহীন।
অবশেষে একদিন, কেমনে, কোথায়, কবে
কিছুই যে জানিনে গো হায়,
হারাইয়া গেল সে কোথায়।

রাখো দেব, রাখো, মোরে রাখো,
তোমার স্নেহেতে মোরে ঢাকো,
আজি চারি দিকে মোর এ কী অন্ধকার ঘোর,
একবার নাম ধরে ডাকো।
পারি না যে সামালিতে, কাঁদি গো আকুল চিতে,
কত রব মৃত্তিকা বহিয়া।
ধূলিময় দেহখানি ধুলায় আনিছে টানি,
ধুলায় দিতেছে ঢাকি হিয়া।

হারায়েছি আমার আমারে,
আজি আমি ভ্রমি অন্ধকারে।
কখনো বা সন্ধ্যাবেলা আমার পুরানো সাথি
মুহূর্তের তরে আসে প্রাণে,
চারি দিকে নিরখে নয়ানে।
প্রণয়ীর শ্মশানেতে একেলা বিরলে আসি
প্রণয়ী যেমন কেঁদে যায়,
নিজের সমাধি-'পরে নিজে বসি উপছায়া
যেমন নিশ্বাস ফেলে হায়,

কুসুম শুকায়ে গেলে যেমন সৌরভ তার
কাছে কাছে কাঁদিয়া বেড়ায়,
সুখ ফুরাইয়া গেলে একটি মলিন হাসি
অধরে বসিয়া কেঁদে চায়,
তেমনি সে আসে প্রাণে চায় চারি দিক-পানে,
কাঁদে, আর কেঁদে চলে যায়।
বলে শুধু, "কী ছিল, কী হল,
সে সব কোথায় চলে গেল!"

বহুদিন দেখি নাই তারে,
আসেনি এ হৃদয়-মাঝারে।
মনে করি মনে আনি তার সেই মুখখানি,
ভালো করে মনে পড়িছে না।
হৃদয়ে যে ছবি ছিল ধুলায় মলিন হল,
আর তাহা নাহি যায় চেনা।
ভুলে গেছি কী খেলা খেলিত,
ভুলে গেছি কী কথা বলিত।
যে গান গাহিত সদা সুর তার মনে আছে,
কথা তার নাহি পড়ে মনে।
যে আশা হৃদয়ে লয়ে উড়িত সে মেঘ চেয়ে
আর তাহা পড়ে না স্মরণে।
শুধু যবে হৃদি-মাঝে চাই
মনে পড়ে— কী ছিল, কী নাই।

গান-সমাপন

জনমিয়া এ সংসারে কিছুই শিখিনি আর,
শুধু গাই গান।
স্নেহময়ী মার কাছে শৈশবে শিখিয়াছিনু
দু-একটি তান।
শুধু জানি তাই,
দিবানিশি তাই শুধু গাই।
শতছিদ্রময় এই হৃদয়-বাঁশিটি লয়ে
বাজাই সতত—
দুঃখের কঠোর স্বর রাগিণী হইয়া যায়,
মৃদুল নিশ্বাসে পরিণত।
আঁধার জলদ যেন ইন্দ্রধনু হয়ে যায়,
ভুলে যাই সকল যাতনা।
ভালো যদি না লাগে সে গান
ভালো সখা, তাও গাহিব না।

এমন পণ্ডিত কত রয়েছেন শত শত
এ সংসারতলে,
আকাশের দৈত্যবালা উন্মাদিনী চপলারে
বেঁধে রাখে দাসত্বের লোহার শিকলে।
আকাশ ধরিয়া হাতে নক্ষত্র-অক্ষর দেখি
গ্রন্থ পাঠ করিছেন তাঁরা,
জ্ঞানের বন্ধন যত ছিন্ন করে দিতেছেন
ভাঙি ফেলি অতীতের কারা।
আমি তার কিছুই করি না,
আমি তার কিছুই জানি না।
এমন মহান্ এ সংসারে
জ্ঞানরত্নরাশির মাঝারে

আমি দীন শুধু গান গাই,
তোমাদের মুখপানে চাই।
ভালো যদি না লাগে সে গান
ভালো সখা, তাও গাহিব না।

বড়ো ভয় হয়, পাছে কেহই না দেখে তারে
যে জন কিছুই শেখে নাই।
ওগো সখা, ভয়ে ভয়ে তাই
যাহা জানি সেই গান গাই,
তোমাদের মুখপানে চাই।
শ্রান্ত দেহ হীনবল, নয়নে পড়িছে জল,
রক্ত ঝরে চরণে আমার,
নিশ্বাস বহিছে বেগে, হৃদয়-বাঁশিটি মম
বাজে না বাজে না বুঝি আর।
দিন গেল, সন্ধ্যা গেল, কেহ দেখিলে না চেয়ে
যত গান গাই।
বুঝি কারো অবসর নাই।
বুঝি কারো ভালো নাহি লাগে—
ভালো সখা, আর গাহিব না।

উপহার

ভুলে গেছি কবে তুমি ছেলেবেলা একদিন
মরমের কাছে এসেছিলে,
স্নেহময় ছায়াময় সন্ধ্যাসম আঁখি মেলি
একবার বুঝি হেসেছিলে।

বুঝি গো সন্ধ্যার কাছে শিখেছে সন্ধ্যার মায়া
ওই আঁখি দুটি—
চাহিলে হৃদয়পানে মরমেতে পড়ে ছায়া,
তারা উঠে ফুটি।

আগে কে জানিত বলো কত কী লুকানো ছিল
হৃদয়নিভৃতে,
তোমার নয়ন দিয়া আমার নিজের হিয়া
পাইনু দেখিতে।

কখনো গাওনি তুমি, কেবল নীরবে রহি
শিখায়েছ গান—
স্বপ্নময় শান্তিময় পুরবীরাগিণী-তানে
বাঁধিয়াছ প্রাণ।

আকাশের পানে চাই, সেই সুরে গান গাই
একেলা বসিয়া।
একে একে সুরগুলি, অনন্তে হারায়ে যায়
আঁধারে পশিয়া।

বলো দেখি কতদিন
আসনি এ শূন্য প্রাণে।

বলো দেখি কতদিন
চাওনি হৃদয়পানে,
বলো দেখি কতদিন
শোননি এ মোর গান—
তবে সখী গান-গাওয়া
হল বুঝি অবসান।

যে রাগ শিখায়েছিলে সে কি আমি গেছি ভুলে?
তার সাথে মিলিছে না স্বর?
তাই কি আস না প্রাণে, তাই কি শোন না গান—
তাই সখী, রয়েছ কি দূর?
ভালো সখী, আবার শিখাও,
আরবার মুখপানে চাও,
একবার ফেলো অশ্রুজল
আঁখিপানে দুটি আঁখি তুলি।
তা হলে পুরানো স্বর আবার পড়িবে মনে,
আর কভু যাইব না ভুলি।

সেই পুরাতন চোখে মাঝে মাঝে চেয়ো সখী,
উজলিয়া স্মৃতির মন্দির।
এই পুরাতন প্রাণে মাঝে মাঝে এসো সখী,
শূন্য আছে প্রাণের কুটির।
নহিলে আঁধার মেঘরাশি
হৃদয়ের আলোক নিবাবে,
একে একে ভুলে যাব স্বর,
গান গাওয়া সাঙ্গ হয়ে যাবে।

প্রভাতসংগীত

শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী
প্রাণাধিকাসু
রবিকাকা

সূচনা

'কড়ি ও কোমল' রচনার পূর্বে কাব্যের ভাষা আমার কাছে ধরা দেয়নি। কাঁচা বয়সে মনের ভাবগুলো নূতনত্বের আবেগ নিয়ে রূপ ধরতে চাচ্ছে, কিন্তু যে উপাদানে তাদেরকে শরীরের বাঁধন দিতে পারত তারই অবস্থা তখন তরল; এইজন্যে ওগুলো হয়েছে ঢেউওয়ালা জলের উপরকার প্রতিবিম্বের মতো আঁকাবাঁকা, ওরা মূর্ত হয়ে ওঠেনি, সুতরাং কাব্যের পদবীতে পৌঁছতে পারেনি। সেইজন্যে আমার মত এই যে, কড়ি ও কোমলের পর থেকেই আমার কাব্যরচনা ভালো মন্দ সব-কিছু নিয়ে একটা স্পষ্ট সৃষ্টির ধারা অবলম্বন করেছে।

প্রভাতসংগীতে যে অবস্থায় আমার প্রথম বিকাশোন্মুখ মন অপরিণত ভাবনা নিয়ে অপরিস্ফুট রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিল, তার কথা আজও আমার মনে আছে। তার পূর্বে সন্ধ্যাসংগীতের পর্বে আমার মনে কেবলমাত্র হৃদয়াবেগের গদ্‌গদভাষী আন্দোলন চলছিল। প্রভাত-সংগীতের ঋতুতে আপনা-আপনি দেখা দিতে আরম্ভ করেছে একটা-আধটা মননের রূপ, অর্থাৎ ফুল নয় সে, ফসলের পালা, সেও অশিক্ষিত বিনা চাষের জমিতে।

সেই সময়কার কথা মনে পড়ছে যখন কোথা থেকে কতকগুলো মত মনের অন্দর-মহলে জেগে উঠে সদরের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল। ওইগুলোর নাম—অনন্ত জীবন, অনন্ত মরণ, প্রতিধ্বনি। 'অনন্ত জীবন' বলতে আমার মনে এই একটা ভাব এসেছিল—বিশ্বজগতে আসা এবং যাওয়া দুটোই থাকারই অন্তর্গত, ঢেউয়ের মতো আলোতে ওঠা এবং অন্ধকারে নামা। ক্ষণে ক্ষণে হাঁ এবং ক্ষণে ক্ষণে না নিয়ে এই জগৎ নয়, বিশ্বচরাচর গোচর-অগোচরের নিরবচ্ছিন্ন মালা গাঁথা। এই ভাবনাটা ভিতরে ভিতরে মনকে খুব দোলা দিয়েছিল। নিজের অন্তরের দিকে চেয়ে একটা ধারণা আমার মধ্যে জেগে উঠেছিল যে, আমার প্রতি মুহূর্তের সমস্ত ভালোমন্দ, আমার প্রতি দিনের সুখদুঃখের সমস্ত অভিজ্ঞতা চিরকালের মতো অনবরত একটা সৃষ্টিরূপ ধরছে, প্রকাশ-অপ্রকাশের নিত্য ওঠাপড়া

নিয়ে যে সৃষ্টির স্বরূপ। এই কথাটা ভাবতে ভাবতেই মনে হল, মৃত্যু তা হলে কী। এক রকম করে তার উত্তর এসেছিল এই যে, জীবন সব-কিছুকে রাখে, আর মৃত্যু সব-কিছুকে চালায়। প্রতি মুহূর্তেই মরছি, আমি, আর সেই মরার ভিতর দিয়েই আমি বাঁচার রাস্তায় এগোচ্ছি, যেন আমার মধ্যে সেলাইয়ের কাজ চলছে— গাঁথা পড়ছে অতীত ভবিষ্যৎ বর্তমান। মুহূর্তকালীন মৃত্যুপরম্পরা দিয়ে মর্তজীবন এই যেমন বেড়ে চলেছে প্রবালদ্বীপের মতো, তেমনি মৃত্যুর পর মৃত্যু আমাকে দিয়ে লোক-লোকান্তরের অভিজ্ঞতার জাল বিস্তার করে চলবে—আমার চেতনার সূত্রটিকে নিয়ে মৃত্যু এক-এক ফোঁড়ে এক-এক লোককে সম্বন্ধ-সূত্রে গাঁথবে। মনে আছে, এই চিন্তায় আমার মনকে খুব আনন্দ দিয়েছিল। 'প্রতিধ্বনি' কবিতা লিখেছিলুম যখন প্রথম গিয়েছিলুম দার্জিলিঙে। যে ভাবে তখন আমাকে আবিষ্ট করেছিল সেটা এই যে— বিশ্বসৃষ্টি হচ্ছে একটা ধ্বনি, আর সে প্রতিধ্বনিরূপে আমাকে মুগ্ধ করছে, ক্ষুব্ধ করছে, আমাকে জাগিয়ে রাখছে, সেই সুন্দর, সেই ভীষণ। সৃষ্টির সমস্ত গতিপ্রবাহ নিত্যই একটা কোন্ কেন্দ্রস্থলে গিয়ে পড়ছে আর সেখান থেকে প্রতিধ্বনিরূপে নির্ঝরিত হচ্ছে আলো হয়ে, রূপ হয়ে, ধ্বনি হয়ে। এই ভাবগুলো যদিও অস্পষ্ট, তবু আমার মনের মধ্যে খুব প্রবল হয়ে আন্দোলিত হচ্ছিল, মুখে মুখে কোনো কোনো বন্ধুর সঙ্গে আলোচনাও করেছি। কিন্তু এ-সকল ভাবনা তখন কী গদ্যে কী পদ্যে আলোচনা করবার সময় হয়নি, তখনও পাইনি ভাষাভারতীর প্রসাদ। তাই বলে রাখছি, প্রভাতসংগীতে এ-সমস্ত লেখার আর-কোনো মূল্য যদি থাকে, সে ষোলো-আনা সাহিত্যিক মূল্য নয়।

প্রভাতসংগীত

আহ্বানসংগীত

ওরে তুই জগৎ-ফুলের কীট,
জগৎ যে তোর শুকায়ে আসিল,
মাটিতে পড়িল খসে—
সারা দিন রাত গুমরি গুমরি
কেবলি আছিস বসে।
মড়কের কণা, নিজ হাতে তুই
রচিলি নিজের কারা,
আপনার জালে জড়ায়ে পড়িয়া
আপনি হইলি হারা।
অবশেষে কারে অভিশাপ দিস
হাহুতাশ করে সারা,
কোণে বসে শুধু ফেলিস নিশাস,
ঢালিস বিষের ধারা।

জগৎ যে তোর মুদিয়া আসিল,
ফুটিতে নারিল আর,
প্রভাত হইলে প্রাণের মাঝারে
ঝরে না শিশিরধার।
ফেলিস নিশাস, মরুর বাতাস
জ্বলিস জ্বালাস কত,
আপন জগতে আপনি আছিস
একটি রোগের মতো।

হৃদয়ের ভার বহিতে পার না,
আছ মাথা নত করে—
ফুটিবে না ফুল, ফলিবে না ফল,
শুকায়ে পড়িবে মরে।

রোদন, রোদন, কেবলি রোদন,
কেবলি বিষাদশ্বাস—
লুকায়ে, শুকায়ে, শরীর গুটায়ে
কেবলি কোটরে বাস।
নাই কোনো কাজ— মাঝে মাঝে চাস
মলিন আপনা-পানে,
আপনার স্নেহে কাতর বচন
কহিস আপন কানে।
দিবস রজনী মরীচিকাসুরা
কেবলি করিস পান।
বাড়িতেছে তৃষা, বিকারের তৃষা—
ছট্‌ফট্‌ করে প্রাণ।
'দাও দাও' ব'লে সকলি যে চাস,
জঠর জ্বলিছে ভুখে—
মুঠি মুঠি ধুলা তুলিয়া লইয়া
কেবলি পুরিস মুখে।
নিজের নিশাসে কুয়াশা ঘনায়ে
ঢেকেছে নিজের কায়া,
পথ আঁধারিয়া পড়েছে সমুখে
নিজের দেহের ছায়া।
ছায়ার মাঝারে দেখিতে না পাও,
শব্দ শুনিলে ডর'—
বাহু প্রসারিয়া চলিতে চলিতে
নিজেরে আঁকড়ি ধর'।

চারি দিকে শুধু ক্ষুধা ছড়াইছে
যে দিকে পড়িছে দিঠ,
বিষেতে ভরিলি জগৎ রে তুই
কীটের অধম কীট।

আজিকে বারেক ভ্রমরের মতো
বাহির হইয়া আয়,
এমন প্রভাতে এমন কুসুম
কেন রে শুকায়ে যায়।
বাহিরে আসিয়া উপরে বসিয়া
কেবলি গাহিবি গান,
তবে সে কুসুম কহিবে রে কথা,
তবে সে খুলিবে প্রাণ।
আকাশে হাসিবে তরুণ তপন,
কাননে ছুটিবে বায়,
চারি দিকে তোর প্রাণের লহরী
উথলি উথলি যায়।
বায়ুর হিল্লোলে ধরিবে পল্লব
মরমর মৃদু তান,
চারি দিক হতে কিসের উল্লাসে
পাখিতে গাহিবে গান।
নদীতে উঠিবে শত শত ঢেউ,
গাবে তারা কল কল,
আকাশে আকাশে উথলিবে শুধু
হরষের কোলাহল।
কোথাও বা হাসি কোথাও বা খেলা
কোথাও বা সুখগান—
মাঝে বসে তুই বিভোর হইয়া,
আকুল পরানে নয়ান মুদিয়া

অচেতন সুখে চেতনা হারায়ে
করিবি রে মধুপান।
ভুলে যাবি ওরে আপনারে তুই
ভুলে যাবি তোর গান।
মোহ ছুটিবে রে নয়নেতে তোর,
যে দিকে চাহিবি হয়ে যাবি ভোর,
যাহারে হেরিবি তাহারে হেরিয়া
মজিয়া রহিবে প্রাণ।
ঘুমের ঘোরেতে গাহিবে পাখি
এখনো যে পাখি জাগেনি,
ভোরের আকাশ ধ্বনিয়া ধ্বনিয়া
উঠিবে বিভাসরাগিণী।
জগত-অতীত আকাশ হইতে
বাজিয়া উঠিবে বাঁশি,
প্রাণের বাসনা আকুল হইয়া
কোথায় যাইবে ভাসি।
উদাসিনী আশা গৃহ তেয়াগিয়া
অসীম পথের পথিক হইয়া
সুদূর হইতে সুদূরে উঠিয়া
আকুল হইয়া চায়,
যেমন বিভোর চকোরের গান
ভেদিয়া ভেদিয়া সুদূর বিমান
চাঁদের চরণে মরিতে গিয়া
মেঘেতে হারায়ে যায়।
মুদিত নয়ান, পরান বিভল,
স্তবধ হইয়া শুনিবি কেবল,
জগতেরে সদা ডুবায়ে দিতেছে
জগত-অতীত গান—
তাই শুনি যেন জাগিতে চাহিছে
ঘুমেতে-মগন প্রাণ।

জগৎ বাহিরে যমুনাপুলিনে
কে যেন বাজায় বাঁশি,
স্বপন-সমান পশিতেছে কানে
ভেদিয়া নিশীথরাশি—
এ গান শুনিনি, এ আলো দেখিনি,
এ মধু করিনি পান,
এমন বাতাস পরান পুরিয়া
করেনি রে সুধা দান,
এমন প্রভাত-কিরণ মাঝারে
কখনো করিনি স্নান,
বিফলে জগতে লভিনু জনম,
বিফলে কাটিল প্রাণ।
দেখ্ রে সবাই চলেছে বাহিরে
সবাই চলিয়া যায়,
পথিকেরা সবে হাতে হাতে ধরি
শোন্ রে কী গান গায়।
জগৎ ব্যাপিয়া শোন্ রে সবাই
ডাকিতেছে, আয়, আয়—
কেহ বা আগেতে কেহ বা পিছায়ে,
কেহ ডাক শুনে ধায়।
অসীম আকাশে স্বাধীন পরানে
প্রাণের আবেগে ছোটে,
এ শোভা দেখিলে জড়ের শরীরে
পরান নাচিয়া ওঠে।
তুই শুধু ওরে ভিতরে বসিয়া
গুমরি মরিতে চাস!
তুই শুধু ওরে করিস রোদন,
ফেলিস দুখের শ্বাস!
ভূমিতে পড়িয়া আঁধারে বসিয়া
আপনা লইয়া রত

আপনারে সদা কোলেতে তুলিয়া
সোহাগ করিস কত !
আর কতদিন কাটিবে এমন,
সময় যে চলে যায় ।
ওই শোন্ ওই ডাকিছে সবাই,
বাহির হইয়া আয় !

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

আজি এ প্রভাতে প্রভাতবিহগ
কী গান গাইল রে !
অতিদূর দূর আকাশ হইতে
ভাসিয়া আইল রে !
না জানি কেমনে পশিল হেথায়
পথহারা তার একটি তান,
আঁধার গুহায় ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া
গভীর গুহায় নামিয়া নামিয়া
আকুল হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ছুঁয়েছে আমার প্রাণ ।
আজি এ প্রভাতে সহসা কেন রে
পথহারা রবিকর
আলয় না পেয়ে পড়েছে আসিয়ে
আমার প্রাণের'পর !
বহুদিন পরে একটি কিরণ
গুহায় দিয়েছে দেখা,
পড়েছে আমার আঁধার সলিলে
একটি কনকরেখা ।
প্রাণের আবেগ রাখিতে নারি
থর থর করি কাঁপিছে বারি,

টলমল জল করে থল থল,
কল কল করি ধরেছে তান।
আজি এ প্রভাতে কী জানি কেন রে
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ।
জাগিয়া দেখিনু চারি দিকে মোর
পাষাণে রচিত কারাগার ঘোর,
বুকের উপরে আঁধার বসিয়া
করিছে নিজের ধ্যান।
না জানি কেন রে এতদিন পরে
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ!

জাগিয়া দেখিনু আমি আঁধারে রয়েছি আঁধা,
আপনারি মাঝে আমি আপনি রয়েছি বাঁধা।
রয়েছি মগন হয়ে আপনারি কলস্বরে,
ফিরে আসে প্রতিধ্বনি নিজেরি শ্রবণ-'পরে।
দূর দূর দূর হতে ভেদিয়া আঁধার কারা
মাঝে মাঝে দেখা দেয় একটি সন্ধ্যার তারা।
তারি মুখ দেখে দেখে আঁধার হাসিতে শেখে,
তারি মুখ চেয়ে চেয়ে করে নিশি অবসান।
শিহরি উঠে রে বারি, দোলে রে দোলে রে প্রাণ,
প্রাণের মাঝারে ভাসি দোলে রে দোলে রে হাসি,
দোলে রে প্রাণের 'পরে আশার স্বপন মম,
দোলে রে তারার ছায়া সুখের আভাস-সম।

মাঝে মাঝে একদিন আকাশেতে নাই আলো,
পড়িয়া মেঘের ছায়া কালো জল হয় কালো।
আঁধার সলিল-'পরে ঝর ঝর বারি ঝরে
ঝর ঝর ঝর ঝর, দিবানিশি অবিরল—
বরষার দুখ-কথা, বরষার আঁখিজল।

শুয়ে শুয়ে আনমনে দিবানিশি তাই শুনি,
একটি একটি ক'রে দিবানিশি তাই গুনি,
তারি সাথে মিলাইয়া কল কল গান গাই—
ঝর ঝর কল কল— দিন নাই, রাত নাই।
এমনি নিজেরে লয়ে রয়েছি নিজের কাছে,
আঁধার সলিল-'পরে আঁধার জাগিয়া আছে।
এমনি নিজের কাছে খুলেছি নিজের প্রাণ,
এমনি পরের কাছে শুনেছি নিজের গান।

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত-পাখির গান।
না জানি কেন রে এতদিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ।
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি।
থর থর করি কাঁপিছে ভূধর,
শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে,
ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল
গরজি উঠিছে দারুণ রোষে।
হেথায় হোথায় পাগলের প্রায়
ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায়,
বাহিরিতে চায়, দেখিতে না পায়
কোথায় কারার দ্বার।
প্রভাতেরে যেন লইতে কাড়িয়া
আকাশেরে যেন ফেলিতে ছিঁড়িয়া

উঠে শূন্যপানে— পড়ে আছাড়িয়া,
করে শেষে হাহাকার।
প্রাণের উল্লাসে ছুটিতে চায়,
ভূধরের হিয়া টুটিতে চায়,
আলিঙ্গন তরে ঊর্ধ্বে বাহু তুলি
আকাশের পানে উঠিতে চায়।
প্রভাতকিরণে পাগল হইয়া
জগৎ-মাঝারে লুটিতে চায়।
কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন,
চারি দিকে তার বাঁধন কেন ?
ভাঙ্ রে হৃদয় ভাঙ্ রে বাঁধন,
সাধ্ রে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর পরে লহরী তুলিয়া
আঘাতের পরে আঘাত কর্ !
মাতিয়া যখন উঠিছে পরান
কিসের আঁধার, কিসের পাষাণ !
উথলি যখন উঠিছে বাসনা,
জগতে তখন কিসের ডর !

সহসা আজি এ জগতের মুখ
        নূতন করিয়া দেখিনু কেন ?
একটি পাখির আধখানি তান
        জগতের গান গাহিল যেন !
জগৎ দেখিতে হইব বাহির
        আজিকে করেছি মনে,
দেখিব না আর নিজেরি স্বপন
        বসিয়া গুহার কোণে।
আমি   ঢালিব করুণাধারা,
আমি   ভাঙিব পাষাণকারা,

আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা ;
কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া,
রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া,
দিব রে পরান ঢালি।
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খলখল গেয়ে কলকল
তালে তালে দিব তালি।
তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া—
যাইব বহিয়া— যাইব বহিয়া—
হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া
গাহিয়া গাহিয়া গান,
যত দেব প্রাণ বহে যাবে প্রাণ
ফুরাবে না আর প্রাণ।
এত কথা আছে এত গান আছে
এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে এত সাধ আছে
প্রাণ হয়ে আছে ভোর।

এত সুখ কোথা এত রূপ কোথা
এত খেলা কোথা আছে!
যৌবনের বেগে বহিয়া যাইব
কে জানে কাহার কাছে!
অগাধ বাসনা অসীম আশা,
জগৎ দেখিতে চাই!
জাগিয়াছে সাধ চরাচরময়
প্লাবিয়া বহিয়া যাই।

যত প্রাণ আছে ঢালিতে পারি,
যত কাল আছে বহিতে পারি,
যত দেশ আছে ডুবাতে পারি,
তবে আর কিবা চাই !
পরানের সাধ তাই ।

কী জানি কী হল আজি জাগিয়া উঠিল প্রাণ,
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান—
'পাষাণ-বাঁধন টুটি, ভিজায়ে কঠিন ধরা,
বনেরে শ্যামল করি, ফুলেরে ফুটায়ে ত্বরা,
সারাপ্রাণ ঢালি দিয়া,
জুড়ায়ে জগৎ-হিয়া—
আমার প্রাণের মাঝে কে আসিবি আয় তোরা !'

আমি যাব, আমি যাব, কোথায় সে, কোন্ দেশ—
জগতে ঢালিব প্রাণ,
গাহিব করুণাগান,
উদ্‌বেগ-অধীর হিয়া
সুদূর সমুদ্রে গিয়া
সে প্রাণ মিশাব আর সে গান করিব শেষ ।

ওরে, চারি দিকে মোর
এ কী কারাগার ঘোর !
ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা, আঘাতে আঘাত কর্ !
ওরে, আজ কী গান গেয়েছে পাখি,
এয়েছে রবির কর !

প্রভাত-উৎসব

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি !
জগত আসি সেথা করিছে কোলাকুলি !
ধরায় আছে যত মানুষ শত শত
আসিছে প্রাণে মোর, হাসিছে গলাগলি।
এসেছে সখা সখী বসিয়া চোখোচোখি,
দাঁড়ায়ে মুখোমুখি হাসিছে শিশুগুলি।
এসেছে ভাই বোন পুলকে ভরা মন,
ডাকিছে 'ভাই ভাই' আঁখিতে আঁখি তুলি।
সখারা এল ছুটে, নয়নে তারা ফুটে,
পরানে কথা উঠে— বচন গেল ভুলি।
সখীরা হাতে হাতে ভ্রমিছে সাথে সাথে,
দোলায় চড়ি তারা করিছে দোলাদুলি।
শিশুরে লয়ে কোলে জননী এল চলে,
বুকেতে চেপে ধরে বলিছে 'ঘুমো ঘুমো'।
আনত দু'নয়ানে চাহিয়া মুখপানে
বাছার চাঁদমুখে খেতেছে শত চুমো।
পুলকে পূরে প্রাণ, শিহরে কলেবর,
প্রেমের ডাক শুনি এসেছে চরাচর—
এসেছে রবি শশী, এসেছে কোটি তারা,
ঘুমের শিয়রেতে জাগিয়া থাকে যারা।
পরান পূরে গেল হরষে হল ভোর
জগতে যারা আছে সবাই প্রাণে মোর।

প্রভাত হল যেই কী জানি হল এ কী !
আকাশপানে চাই কী জানি কারে দেখি !
প্রভাতবায়ু বহে কী জানি কী যে কহে,
মরমমাঝে মোর কী জানি কী যে হয় !

এস হে এস কাছে সখা হে এস কাছে—
এস হে ভাই এস, বসো হে প্রাণময়।
পুরব-মেঘমুখে পড়েছে রবিরেখা,
অরুণরথচূড়া আধেক যায় দেখা।
তরুণ আলো দেখে পাখির কলরব—
মধুর আহা কিবা মধুর মধু সব!
মধুর মধু আলো, মধুর মধু বায়,
মধুর মধু গানে তটিনী বয়ে যায়!
যে দিকে আঁখি চায় সে দিকে চেয়ে থাকে,
যাহারি দেখা পায় তারেই কাছে ডাকে,
নয়ন ডুবে যায় শিশির-আঁখি-ধারে,
হৃদয় ডুবে যায় হরষ-পারাবারে।

আয় রে আয় বায়ু, যা রে যা প্রাণ নিয়ে,
জগত-মাঝারেতে দে রে তা প্রসারিয়ে।
ভ্রমিবি বনে বনে, যাইবি দিশে দিশে,
সাগরপারে গিয়ে পুরবে যাবি মিশে।
লইবি পথ হতে পাখির কলতান,
যূথীর মৃদুশ্বাস, মালতীমৃদুবাস—
অমনি তারি সাথে যা রে যা নিয়ে প্রাণ।
পাখির গীতধার ফুলের বাসভার
ছড়াবি পথে পথে হরষে হয়ে ভোর,
অমনি তারি সাথে ছড়াবি প্রাণ মোর।
ধরারে ঘিরি ঘিরি কেবলি যাবি বয়ে
ধরার চারি দিকে প্রাণেরে ছড়াইয়ে।

পেয়েছি এত প্রাণ যতই করি দান
কিছুতে যেন আর ফুরাতে নারি তারে।

আয় রে মেঘ, আয় বারেক নেমে আয়,
কোমল কোলে তুলে আমারে নিয়ে যা রে !
কনক-পাল তুলে বাতাসে দুলে দুলে
ভাসিতে গেছে সাধ আকাশ-পারাবারে।

আকাশ, এস এস, ডাকিছ বুঝি ভাই—
গেছি তো তোরি বুকে, আমি তো হেথা নাই।
প্রভাত-আলো-সাথে ছড়ায় প্রাণ মোর,
আমার প্রাণ দিয়ে ভরিব প্রাণ তোর।

ওঠো হে ওঠো রবি, আমারে তুলে লও,
অরুণতরী তব পুরবে ছেড়ে দাও,
আকাশ-পারাবার বুঝি হে পার হবে—
আমারে লও তবে, আমারে লও তবে।

জগৎ আসে প্রাণে, জগতে যায় প্রাণ,
জগতে প্রাণে মিলি গাহিছে একি গান !
কে তুমি মহাজ্ঞানী, কে তুমি মহারাজ,
গরবে হেলা করি হেসো না তুমি আজ।
বারেক চেয়ে দেখো আমার মুখপানে—
উঠেছে মাথা মোর মেঘের মাঝখানে,
আপনি আসি উষা শিয়রে বসি ধীরে
অরুণকর দিয়ে মুকুট দেন শিরে,
নিজের গলা হতে কিরণমালা খুলি
দিতেছে রবি-দেব আমার গলে তুলি !
ধূলির ধূলি আমি রয়েছি ধূলি-'পরে,
জেনেছি ভাই বলে জগৎ চরাচরে।

অনন্ত জীবন

অধিক করি না আশা, কিসের বিষাদ,
জনমেছি দু দিনের তরে—
যাহা মনে আসে তাই আপনার মনে
গান গাই আনন্দের ভরে।
এ আমার গানগুলি দু দণ্ডের গান
রবে না রবে না চিরদিন—
পুরব-আকাশ হতে উঠিবে উচ্ছ্বাস,
পশ্চিমেতে হইবে বিলীন।

তোরা ফুল, তোরা পাখি, তোরা খোলা প্রাণ,
জগতের আনন্দ যে তোরা,
জগতের বিষাদ-পাসরা।
পৃথিবীতে উঠিয়াছে আনন্দলহরী
তোরা তার একেকটি ঢেউ,
কখন উঠিলি আর কখন মিলালি
জানিতেও পারিল না কেউ।

নাই তোর নাই রে ভাবনা,
এ জগতে কিছুই মরে না।
নদীস্রোতে কোটি কোটি মৃত্তিকার কণা
ভেসে আসে, সাগরে মিশায়—
জান না কোথায় তারা যায়!
একেকটি কণা লয়ে গোপনে সাগর
রচিছে বিশাল মহাদেশ,
না জানি কবে তা হবে শেষ।

মুহূর্তেই ভেসে যায় আমাদের গান,
জান না তো কোথায় তা যায়!
আকাশের সাগরসীমায়!
আকাশ-সমুদ্র-তলে গোপনে গোপনে
গীতরাজ্য হতেছে সৃজন,
যত গান উঠিতেছে ধরার আকাশে
সেইখানে করিছে গমন।
আকাশ পুরিয়া যাবে শেষ,
উঠিবে গানের মহাদেশ।

নাই তোর নাই রে ভাবনা,
এ জগতে কিছুই মরে না।
কাল দেখেছিনু পথে হরষে খেলিতেছিল
দুটি ভাই গলাগলি করি,
দেখেছিনু জানালায় নীরবে দাঁড়ায়েছিল
দুটি সখা হাতে হাতে ধরি,
দেখেছিনু কচি মেয়ে মায়ের বাহুতে শুয়ে
ঘুমায়ে করিছে স্তনপান,
ঘুমন্ত মুখের 'পরে বরষিছে স্নেহধারা
স্নেহমাখা নত দু'নয়ান,
দেখেছিনু রাজপথে চলেছে বালক এক
বৃদ্ধ জনকের হাত ধরি—
কত কী যে দেখেছিনু, হয়তো সে-সব ছবি
আজ আমি গিয়েছি পাসরি।
তা বলে নাহি কি তাহা মনে?
ছবিগুলি মেশেনি জীবনে?
স্মৃতির কণিকা তারা স্মরণের তলে পশি
রচিতেছে জীবন আমার—
কোথা যে কে মিশাইল, কেবা গেল কার পাশে
চিনিতে পারিনে তাহা আর।

হয়তো অনেকদিন দেখেছিনু ছবি এক
দুটি প্রাণী বাহুর বাঁধনে—
তাই আজ ছুটাছুটি এসেছি প্রভাতে উঠি
সখারে বাঁধিতে আলিঙ্গনে।
হয়তো অনেকদিন শুনেছিনু পাখি এক
আনন্দে গাহিছে প্রাণ খুলি,
সহসা রে তাই আজ প্রভাতের মুখ দেখি
প্রাণ মন উঠিছে উথলি।
সকলি মিশেছে আসি হেথা,
জীবনে কিছু না যায় ফেলা—
এই-যে যা-কিছু চেয়ে দেখি
এ নহে কেবলি ছেলেখেলা।

এই জগতের মাঝে একটি সাগর আছে
নিস্তব্ধ তাহার জলরাশি,
চারি দিক হতে সেথা অবিরাম অবিশ্রাম
জীবনের স্রোত মিশে আসি।
সূর্য হতে ঝরে ধারা, চন্দ্র হতে ঝরে ধারা,
কোটি কোটি তারা হতে ঝরে,
জগতের যত হাসি যত গান যত প্রাণ
ভেসে আসে সেই স্রোতোভরে—
মেশে আসি সেই সিন্ধু-'পরে।
পৃথ্বী হতে মহাস্রোত ছুটিতেছে অবিরাম
সেই মহাসাগর-উদ্দেশে,
আমরা মাটির কণা জলস্রোত ঘোলা করি
অবিশ্রাম চলিয়াছি ভেসে—
সাগরে পড়িব অবশেষে।
জগতের মাঝখানে সেই সাগরের তলে
রচিত হতেছে পলে পলে

অনন্ত-জীবন মহাদেশ,
কে জানে হবে কি তাহা শেষ!

তাই বলি, প্রাণ ওরে, গান গা পাখির মতো,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ শোক ভুলি—
তুই যাবি, গান যাবে, একসাথে ভেসে যাবে
তুই আর তোর গানগুলি।
মিশিবি সে সিন্ধুজলে অনন্তসাগরতলে,
একসাথে শুয়ে রবি প্রাণ,
তুই আর তোর এই গান।

অনন্ত মরণ

কোটি কোটি ছোটো ছোটো মরণেরে লয়ে
বসুন্ধরা ছুটিছে আকাশে,
হাসে খেলে মৃত্যু চারি পাশে।
এ ধরণী মরণের পথ,
এ জগৎ মৃত্যুর জগৎ।

যতটুকু বর্তমান, তারেই কি বল' প্রাণ?
সে তো শুধু পলক, নিমেষ।
অতীতের মৃত ভার পৃষ্ঠেতে রয়েছে তার,
না জানি কোথায় তার শেষ।
যত বর্ষ বেঁচে আছি তত বর্ষ মরে গেছি,
মরিতেছি প্রতি পলে পলে,

জীবন্ত মরণ মোরা মরণের ঘরে থাকি
জানিনে মরণ কারে বলে।

একমুঠা মরণেরে জীবন বলে কি তবে,
মরণের সমষ্টি কেবল ?
একটি নিমেষ তুচ্ছ শত মরণের গুচ্ছ,
নাম নিয়ে এত কোলাহল।
মরণ বাড়িবে যত জীবন বাড়িবে তত,
পলে পলে উঠিব আকাশে
নক্ষত্রের কিরণনিবাসে।

মরণ বাড়িবে যত কোথায় কোথায় যাব,
বাড়িবে প্রাণের অধিকার—
বিশাল প্রাণের মাঝে কত গ্রহ কত তারা
হেথা হোথা করিবে বিহার।
উঠিবে জীবন মোর কত-না আকাশ ছেয়ে,
ঢাকিয়া ফেলিবে রবি শশী—
যুগ-যুগান্তর যাবে, নব নব রাজ্য পাবে
নব নব তারায় প্রবেশি।

কবে রে আসিবে সেই দিন
উঠিব সে আকাশের পথে,
আমার মরণ ডোর দিয়ে
বেঁধে দেব জগতে জগতে।
আমাদের মরণের জালে
জগৎ ফেলিব আবরিয়া,
এ অনন্ত আকাশসাগরে
দশ দিক রহিব ঘেরিয়া।

জয় হোক জয় হোক মরণের জয় হোক—
আমাদের অনন্ত মরণ,
মরণের হবে না মরণ।
এ ধরায় মোরা সবে শতাব্দীর ক্ষুদ্র শিশু
লইলাম তোমার শরণ।
এস তুমি এস কাছে, স্নেহ-কোলে লও তুমি,
পিয়াও তোমার মাতৃস্তন,
আমাদের করো হে পালন।
আনন্দে পুরেছে প্রাণ, হেরিতেছি এ জগতে
মরণের অনন্ত উৎসব।
কার নিমন্ত্রণে মোরা মহাযজ্ঞে এসেছি রে,
উঠেছে বিপুল কলরব।

যে ডাকিছে ভালোবেসে, তারে চিনিস নে শিশু ?
তার কাছে কেন তোর ডর ?
জীবন যাহারে বলে মরণ তাহারি নাম,
মরণ তো নহে তোর পর।
আয়, তারে আলিঙ্গন কর্—
আয়, তার হাতখানি ধর।

পুনর্মিলন

কিসের হরষ কোলাহল
শুধাই তোদের, তোরা বল্।
আনন্দ-মাঝারে সব উঠিতেছে ভেসে ভেসে
আনন্দে হতেছে কভু লীন—
চাহিয়া ধরণী-পানে নব আনন্দের গানে
মনে পড়ে আর-এক দিন।

সে তখন ছেলেবেলা— রজনী প্রভাত হলে,
তাড়াতাড়ি শয্যা ছাড়ি ছুটিয়া যেতেম চলে ;
সারি সারি নারিকেল বাগানের এক পাশে,
বাতাস আকুল করে আম্রমুকুলের বাসে।
পথপাশে দুই ধারে
বেলফুল ভারে ভারে
ফুটে আছে, শিশুমুখে প্রথম হাসির প্রায়—
বাগানে পা দিতে দিতে
গন্ধ আসে আচম্বিতে,
নর্‌গেস্‌ কোথা ফুটে খুঁজে তারে পাওয়া দায়।
মাঝেতে বাঁধানো বেদী, জুঁইগাছ চারি ধারে—
সূর্যোদয় দেখা দিত প্রাচীরের পরপারে।
নবীন রবির আলো
সে যে কী লাগিত ভালো,
সর্বাঙ্গে সুবর্ণসুধা অজস্র পড়িত ঝরে—
প্রভাত ফুলের মতো ফুটায়ে তুলিত মোরে।

এখনো সে মনে আছে
সেই জানালার কাছে
বসে থাকিতাম একা জনহীন দ্বিপ্রহরে।
অনন্ত আকাশ নীল,
ডেকে চলে যেত চিল
জানায়ে সুতীব্র তৃষা সুতীক্ষ্ণ করুণ স্বরে।
পুকুর গলির ধারে,
বাঁধা ঘাট এক পারে—
কত লোক যায় আসে, স্নান করে, তোলে জল—
রাজহাঁস তীরে তীরে
সারাদিন ভেসে ফিরে,
ডানা দুটি ধুয়ে ধুয়ে করিতেছে নিরমল।

পূর্ব ধারে বৃদ্ধ বট
মাথায় নিবিড় জট,
ফেলিয়া প্রকাণ্ড ছায়া দাঁড়ায়ে রহস্যময়।
আঁকড়ি শিকড়-মুঠে
প্রাচীর ফেলেছে টুটে,
খোপেখাপে ঝোপেঝাপে কত-না বিস্ময় ভয়।
বসি শাখে পাখি ডাকে সারাদিন একতান—
চারি দিক স্তব্ধ হেরি কী যেন করিত প্রাণ।
মৃদু তপ্ত সমীরণ গায়েতে লাগিত এসে,
সেই সমীরণস্রোতে কত কী আসিত ভেসে।
কোন্ সমুদ্রের কাছে
মায়াময় রাজ্য আছে,
সেথা হতে উড়ে আসে পাখির ঝাঁকের মতো
কত মায়া, কত পরী, রূপকথা কত শত।

আরেকটি ছোটো ঘর মনে পড়ে নদীকূলে,
সম্মুখে পেয়ারাগাছ ভরে আছে ফলে ফুলে।
বসিয়া ছায়াতে তারি ভুলিয়া শৈশবখেলা,
জাহ্নবীপ্রবাহ-পানে চেয়ে আছি সারাবেলা।
ছায়া কাঁপে, আলো কাঁপে, ঝুরু ঝুরু বহে বায়—
ঝর ঝর মর মর পাতা ঝরে পড়ে যায়।
সাধ যেত যাই ভেসে
কত রাজ্যে কত দেশে,
দুলায়ে দুলায়ে ঢেউ নিয়ে যাবে কত দূর—
কত ছোটো ছোটো গ্রাম
নূতন নূতন নাম,
অভ্রভেদী শুভ্র সৌধ, কত নব রাজপুর।
কত গাছ, কত ছায়া জটিল বটের মূল—

তীরে বালুকার 'পরে,
ছেলেমেয়ে খেলা করে,
সন্ধ্যায় ভাসায় দীপ, প্রভাতে ভাসায় ফুল।
ভাসিতে ভাসিতে শুধু দেখিতে দেখিতে যাব
কত দেশ, কত মুখ, কত-কী দেখিতে পাব।
কোথা বালকের হাসি,
কোথা রাখালের বাঁশি,
সহসা সুদূর হতে অচেনা পাখির গান।
কোথাও বা দাঁড় বেয়ে
মাঝি গেল গান গেয়ে,
কোথাও বা তীরে বসে পথিক ধরিল তান।
শুনিতে শুনিতে যাই আকাশেতে তুলে আঁখি—
আকাশেতে ভাসে মেঘ, আকাশেতে ওড়ে পাখি।
হয়তো বরষা কাল— ঝর ঝর বারি ঝরে,
পুলকরোমাঞ্চ ফুটে জাহ্নবীর কলেবরে—
থেকে থেকে ঝন্ ঝন্
ঘন বাজ-বরিষণ,
থেকে থেকে বিজলীর চমকিত চকমকি।
বহিছে পুরব বায়,
শীতে শিহরিছে কায়,
গহন জলদে দিবা হয়েছে আঁধারমুখী।

সেই, সেই ছেলেবেলা
আনন্দে করেছি খেলা
প্রকৃতি গো, জননী গো, কেবলি তোমারি কোলে।
তার পরে কী যে হল— কোথা যে গেলেম চলে।
হৃদয় নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে,
দিশে দিশে নাহিকো কিনারা,
তারি মাঝে হ'নু পথহারা।

সে বন আঁধারে ঢাকা
গাছের জটিল শাখা
সহস্র স্নেহের বাহু দিয়ে
আঁধার পালিছে বুকে নিয়ে।
নাহি রবি, নাহি শশী, নাহি গ্রহ, নাহি তারা,
কে জানে কোথায় দিগ্বিদিক।
আমি শুধু একেলা পথিক।
তোমারে গেলেম ফেলে,
অরণ্যে গেলেম চলে,
কাটালেম কত শত দিন
ম্রিয়মাণ সুখশান্তিহীন।

আজিকে একটি পাখি পথ দেখাইয়া মোরে
আনিল এ অরণ্য-বাহিরে
আনন্দের সমুদ্রের তীরে।
সহসা দেখিনু রবিকর,
সহসা শুনিনু কত গান।
সহসা পাইনু পরিমল,
সহসা খুলিয়া গেল প্রাণ।

দেখিনু ফুটিছে ফুল, দেখিনু উড়িছে পাখি,
আকাশ পুরেছে কলস্বরে।
জীবনের ঢেউগুলি ওঠে পড়ে চারি দিকে,
রবিকর নাচে তার 'পরে।
চারি দিকে বহে বায়ু, চারি দিকে ফুটে আলো,
চারি দিকে অনন্ত আকাশ,
চারি দিক -পানে চাই— চারি দিকে প্রাণ ধায়,
জগতের অসীম বিকাশ।

কেহ এসে বসে কোলে, কেহ ডাকে সখা ব'লে,
কাছে এসে কেহ করে খেলা।
কেহ হাসে, কেহ গায়, কেহ আসে, কেহ যায়—
এ কী হেরি আনন্দের মেলা!
যুবক যুবতী হাসে, বালক বালিকা নাচে,
দেখে যে রে জুড়ায় নয়ন।
ও কে হোথা গান গায়, প্রাণ কেড়ে নিয়ে যায়,
ও কী শুনি অমিয়-বচন।

তাই আজি শুধাই তোমারে,
কেন এ আনন্দ চারি ধারে।
বুঝেছি গো বুঝেছি গো, এতদিন পরে বুঝি
ফিরে পেলে হারানো সন্তান।
তাই বুঝি দুই হাতে জড়ায়ে লয়েছ বুকে,
তাই বুঝি গাহিতেছ গান।
ভালোবাসা খুঁজিবারে গেছিনু অরণ্যমাঝে,
হৃদয়ে হইনু পথহারা,
বরষিনু অশ্রুবারিধারা।
ভ্রমিলাম দূরে দূরে— কে জানিত বল্ দেখি
হেথা এত ভালোবাসা আছে।
যে দিকেই চেয়ে দেখি সেই দিকে ভালোবাসা
ভাসিতেছে নয়নের কাছে।
মা আমার, আজ আমি কত শত দিন পরে
যখনি রে দাঁড়ানু সম্মুখে,
অমনি চুমিলি মুখ, কিছু নাই অভিমান,
অমনি লইলি তুলে বুকে।
ছাড়িব না তোর কোল, রব হেথা অবিরাম,
তোর কাছে শিখিব রে স্নেহ,
সবারে বাসিব ভালো— কেহ না নিরাশ হবে
মোরে ভালো বাসিবে যে কেহ।

প্রতিধ্বনি

অয়ি প্রতিধ্বনি,
বুঝি আমি তোরে ভালোবাসি,
বুঝি আর কারেও বাসি না।
আমারে করিলি তুই আকুল ব্যাকুল,
তোর লাগি কাঁদে মোর বীণা।
তোর মুখে পাখিদের শুনিয়া সংগীত,
নির্ঝরের শুনিয়া ঝর্ঝর,
গভীর রহস্যময় অরণ্যের গান,
বালকের মধুমাখা স্বর,
তোর মুখে জগতের সংগীত শুনিয়া,
তোরে আমি ভালোবাসিয়াছি ;
তবু কেন তোরে আমি দেখিতে না পাই,
বিশ্বময় তোরে খুঁজিয়াছি।

চিরকাল— চিরকাল—
তুই কি রে চিরকাল
সেই দূরে রবি,
আধো স্বরে গাবি শুধু গীতের আভাস,
তুই চিরকবি।
দেখা তুই দিবি না কি ? নাহয় না দিলি
একটি কি পুরাবি না আশ ?
কাছে হতে একবার শুনিবারে চাই
তোর গীতোচ্ছ্বাস।
অরণ্যের পর্বতের সমুদ্রের গান,
ঝটিকার বজ্রগীতস্বর,
দিবসের প্রদোষের রজনীর গীত,
চেতনার নিদ্রার মর্মর,

বসন্তের বরষার শরতের গান,
　　জীবনের মরণের স্বর,
আলোকের পদধ্বনি মহা অন্ধকারে
　　ব্যাপ্ত করি বিশ্বচরাচর,
পৃথিবীর চন্দ্রমার গ্রহ-তপনের,
　　কোটি কোটি তারার সংগীত,
তোর কাছে জগতের কোন্ মাঝখানে
　　না জানি রে হতেছে মিলিত।
সেইখানে একবার বসাইবি মোরে
　　সেই মহা-আঁধার নিশায়,
শুনিব রে আঁখি মুদি বিশ্বের সংগীত
　　তোর মুখে কেমন শুনায়।

জোছনায় ফুলবনে একাকী বসিয়া থাকি,
　　আঁখি দিয়া অশ্রুবারি ঝরে—
বল্ মোরে বল্ অয়ি মোহিনী ছলনা,
　　সে কি তোরি তরে ?
বিরামের গান গেয়ে সায়াহ্নের বায়
　　কোথা বহে যায়—
তারি সাথে কেন মোর প্রাণ হু হু করে,
　　সে কি তোরি তরে ?
বাতাসে সৌরভ ভাসে, আঁধারে কত-না তারা,
　　আকাশে অসীম নীরবতা—
তখন প্রাণের মাঝে কত কথা ভেসে যায়,
　　সে কি তোরি কথা ?
ফুলের সৌরভগুলি আকাশে খেলাতে এসে
　　বাতাসেতে হয় পথহারা,
　　চারি দিকে ঘুরে হয় সারা,

মার কোলে ফিরে যেতে চায়,
ফুলে ফুলে খুঁজিয়া বেড়ায়,
তেমনি প্রাণের মাঝে অশরীরী আশাগুলি
ভ্রমে কেন হেথায় হোথায়—
সে কি তোরে চায় ?
আঁখি যেন কার তরে পথ-পানে চেয়ে আছে
দিন গনি গনি,
মাঝে মাঝে কারো মুখে সহসা দেখে সে যেন
অতুল রূপের প্রতিধ্বনি,
কাছে গেলে মিলাইয়া যায়
নিরাশের হাসিটির প্রায়—
সৌন্দর্যের মরীচিকা এ কাহার মায়া,
এ কি তোরি ছায়া !

জগতের গানগুলি দূর-দূরান্তর হতে
দলে দলে তোর কাছে যায়,
যেন তারা বহ্নি হেরি পতঙ্গের মতো
পদতলে মরিবারে চায়।
জগতের মৃত গানগুলি
তোর কাছে পেয়ে নব প্রাণ
সংগীতের পরলোক হতে
গায় যেন দেহমুক্ত গান।
তাই তার নব কণ্ঠধ্বনি
প্রভাতের স্বপনের প্রায়,
কুসুমের সৌরভের সাথে
এমন সহজে মিশে যায়।

আমি ভাবিতেছি বসে গানগুলি তোরে
না জানি কেমনে খুঁজে পায়—

না জানি কোথায় খুঁজে পায়।
না জানি কী গুহার মাঝারে
অস্ফুট মেঘের উপবনে,
স্মৃতি ও আশায় বিজড়িত
আলোক-ছায়ার সিংহাসনে,
ছায়াময়ী মূর্তিখানি আপনে আপনি মিশি
আপনি বিস্মিত আপনায়,
কার পানে শূন্যপানে চায়!
সায়াহ্নে প্রশান্ত রবি স্বর্ণময় মেঘমাঝে
পশ্চিমের সমুদ্রসীমায়
প্রভাতের জন্মভূমি শৈশব পুরব-পানে
যেমন আকুল নেত্রে চায়,
পুরবের শূন্যপটে প্রভাতের স্মৃতিগুলি
এখনো দেখিতে যেন পায়,
তেমনি সে ছায়াময়ী কোথা যেন চেয়ে আছে
কোথা হতে আসিতেছে গান—
এলানো কুন্তলজালে সন্ধ্যার তারকাগুলি
গান শুনে মুদিছে নয়ান।
বিচিত্র সৌন্দর্য জগতের
হেথা আসি হইতেছে লয়।
সংগীত, সৌরভ, শোভা জগতে যা-কিছু আছে
সবি হেথা প্রতিধ্বনিময়।
প্রতিধ্বনি, তব নিকেতন,
তোমার সে সৌন্দর্য অতুল,
প্রাণে জাগে ছায়ার মতন—
ভাষা হয় আকুল ব্যাকুল।
আমরণ চিরদিন কেবলি খুঁজিব তোরে
কখনো কি পাব না সন্ধান?
কেবলি কি রবি দূরে, অতি দূর হতে
শুনিব রে ওই আধো গান?

এই বিশ্বজগতের মাঝখানে দাঁড়াইয়া
বাজাইবি সৌন্দর্যের বাঁশি,
অনন্ত জীবনপথে খুঁজিয়া চলিব তোরে,
প্রাণমন হইবে উদাসী।
তপনেরে ঘিরি ঘিরি যেমন ঘুরিছে ধরা,
ঘুরিব কি তোর চারি দিকে?
অনন্ত প্রাণের পথে বরষিবি গীতধারা,
চেয়ে আমি রব অনিমিখে।
তোরি মোহময় গান শুনিতেছি অবিরত,
তোরি রূপ কল্পনায় লিখা—
করিস নে প্রবঞ্চনা সত্য করে বল্ দেখি
তুই তো নহিস মরীচিকা?
কত বার আর্ত স্বরে শুধায়েছি প্রাণপণে,
অয়ি তুমি কোথায়—কোথায়—
অমনি সুদূর হতে কেন তুমি বলিয়াছ
'কে জানে কোথায়'?
আশাময়ী, ও কী কথা তুমি কি আপনহারা—
আপনি জান না আপনায়?

মহাস্বপ্ন

পূর্ণ করি মহাকাল পূর্ণ করি অনন্ত গগন,
নিদ্রামগ্ন মহাদেব দেখিছেন মহান্ স্বপন।
বিশাল জগৎ এই প্রকাণ্ড স্বপন সেই,
হৃদয়সমুদ্রে তাঁর উঠিতেছে বিশ্বের মতন।
উঠিতেছে চন্দ্র সূর্য, উঠিতেছে আলোক আঁধার,
উঠিতেছে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের জ্যোতি-পরিবার।
উঠিতেছে, ছুটিতেছে গ্রহ উপগ্রহ দলে দলে,
উঠিতেছে ডুবিতেছে রাত্রি দিন আকাশের তলে।

একা বসি মহাসিন্ধু চিরদিন গাইতেছে গান,
ছুটিয়া সহস্র নদী পদতলে মিলাইছে প্রাণ।
তটিনীর কলরব, লক্ষ নির্ঝরের ঝর ঝর,
সিন্ধুর গম্ভীর গীত, মেঘের গম্ভীর কণ্ঠস্বর,
ঝটিকা করিছে হা হা আশ্রয়-আলয় তার ছাড়ি
বাজায়ে অরণ্যবীণা ভীমবল শত বাহু নাড়ি,
রুদ্র রাগ আলাপিয়া গড়ায়ে পড়িছে হিমরাশ
পর্বতদৈত্যের যেন ঘনীভূত ঘোর অট্টহাস,
ধীরে ধীরে মহারণ্য নাড়িতেছে জটাময় মাথা—
ঝর ঝর মর মর উঠিতেছে সুগম্ভীর গাথা।
চেতনার কোলাহলে দিবস পুরিছে দশ দিশি,
ঝিল্লিরবে একমন্ত্র জপিতেছে তাপসিনী নিশি,
সমস্ত একত্রে মিলি ধ্বনিয়া ধ্বনিয়া চারি ভিত
উঠাইছে মহা-হৃদে মহা এক স্বপনসংগীত।
স্বপনের রাজ্য এই স্বপন-রাজ্যের জীবগণ
দেহ ধরিতেছে কত মুহুর্মুহু নূতন নূতন।
ফুল হয়ে যায় ফল, ফুল ফল বীজ হয় শেষে,
নব নব বৃক্ষ হয়ে বেঁচে থাকে কাননপ্রদেশে।
বাষ্প হয়, মেঘ হয়, বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিবারিধারা।
নির্ঝর তটিনী হয়, ভাঙি ফেলে শিলাময় কারা।
নিদাঘ মরিয়া যায়, বরষা শ্মশানে আসি তার
নিবায় জ্বলন্ত চিতা বরষিয়া অশ্রুবারিধার।
বরষা হইয়া বৃদ্ধ শ্বেতকেশ শীত হয়ে যায়,
যযাতির মতো পুন বসন্তযৌবন ফিরে পায়।
এক শুধু পুরাতন, আর সব নূতন নূতন,
এক পুরাতন হৃদে উঠিতেছে নূতন স্বপন।
অপূর্ণ স্বপন-সৃষ্ট মানুষেরা অভাবের দাস,
জাগ্রত পূর্ণতা-তরে পাইতেছে কত-না প্রয়াস!
চেতনা ছিঁড়িতে চাহে আধো-অচেতন আবরণ—
দিনরাত্রি এই আশা, এই তার একমাত্র পণ।

পূর্ণ আত্মা জাগিবেন, কভু কি আসিবে হেন দিন ?
অপূর্ণ জগৎ-স্বপ্ন ধীরে ধীরে হইবে বিলীন ?
চন্দ্র-সূর্য-তারকার অন্ধকার স্বপ্নময়ী ছায়া
জ্যোতির্ময় সে হৃদয়ে ধীরে ধীরে মিলাইবে কায়া।
পৃথিবী ভাঙিয়া যাবে, একে একে গ্রহতারাগণ
ভেঙে ভেঙে মিলে যাবে এককটি বিশ্বের মতন।
চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ চেয়ে জ্যোতির্ময় মহান্ বৃহৎ
জীব-আত্মা মিলাইবে এককটি জলবিম্ববৎ।
কভু কি আসিবে, দেব, সেই মহাস্বপ্ন-ভাঙা দিন—
সত্যের সমুদ্র-মাঝে আধো সত্য হয়ে যাবে লীন ?
আধেক প্রলয়জলে ডুবে আছে তোমার হৃদয়—
বলো, দেব, কবে হেন প্রলয়ের হইবে প্রলয়।

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়

দেশশূন্য কালশূন্য জ্যোতিঃশূন্য, মহাশূন্য-'পরি
চতুর্মুখ করিছেন ধ্যান,
মহা অন্ধ অন্ধকার সভয়ে রয়েছে দাঁড়াইয়া—
কবে দেব খুলিবে নয়ান।
অনন্ত হৃদয়-মাঝে আসন্ন জগৎ চরাচর
দাঁড়াইয়া স্তম্ভিত নিশ্চল,
অনন্ত হৃদয়ে তাঁর ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান
ধীরে ধীরে বিকাশিছে দল।
লেগেছে ভাবের ঘোর, মহানন্দে পূর্ণ তাঁর প্রাণ
নিজের হৃদয়পানে চাহি,
নিস্তরঙ্গ রহিয়াছে অনন্ত আনন্দপারাবার—
কূল নাহি, দিগ্বিদিক নাহি।

পুলকে পূর্ণিত তাঁর প্রাণ,
সহসা আনন্দসিন্ধু হৃদয়ে উঠিল উথলিয়া,
আদিদেব খুলিলা নয়ান ;
জনশূন্য জ্যোতিঃশূন্য অন্ধতম অন্ধকার-মাঝে
উচ্ছ্বসি উঠিল বেদগান।
চারি মুখে বাহিরিল বাণী
চারি দিকে করিল প্রয়াণ।
সীমাহারা মহা অন্ধকারে
সীমাশূন্য ব্যোমপারাবারে
প্রাণপূর্ণ ঝটিকার মতো,
ভাবপূর্ণ ব্যাকুলতা-সম,
আশাপূর্ণ অতৃপ্তির প্রায়,
সঞ্চরিতে লাগিল সে ভাষা।
দূর দূর যত দূর যায়
কিছুতেই অন্ত নাহি পায়—
যুগ যুগ যুগ যুগান্তর
ভ্রমিতেছে আজিও সে বাণী,
আজিও সে অন্ত নাহি পায়।

ভাবের আনন্দে ভোর, গীতিকবি চারি মুখে
করিতে লাগিলা বেদগান।
আনন্দের আন্দোলনে ঘন ঘন বহে শ্বাস,
অষ্ট নেত্রে বিস্ফুরিল জ্যোতি।
জ্যোতির্ময় জটাজাল কোটিসূর্যপ্রভাসম
দিঘিদিকে পড়িল ছড়ায়ে,
মহান্ ললাটে তাঁর অযুত তড়িৎস্ফূর্তি
অবিরাম লাগিল খেলিতে।
অনন্ত ভাবের দল, হৃদয়-মাঝারে তাঁর
হতেছিল আকুল ব্যাকুল—
মুক্ত হয়ে ছুটিল তাহারা,

জগতের গঙ্গোত্রীশিখর হতে
শত শত স্রোতে
উচ্ছ্বসিল অগ্নিময় বিশ্বের নির্ঝর,
বাহিরিল অগ্নিময়ী বাণী,
উচ্ছ্বসিল বাষ্পময় ভাব।
উত্তরে দক্ষিণে গেল,
পূরবে পশ্চিমে গেল,
চারি দিকে ছুটিল তাহারা,
আকাশের মহাক্ষেত্রে শৈশব-উচ্ছ্বাস বেগে
নাচিতে লাগিল মহোল্লাসে।
শব্দশূন্য শূন্যমাঝে সহসা সহস্র স্বরে
জয়ধ্বনি উঠিল উথলি,
হর্ষধ্বনি উঠিল ফুটিয়া,
স্তব্ধতার পাষাণহৃদয়
শত ভাগে গেল রে ফাটিয়া।
শব্দস্রোত ঝরিল চৌদিকে
এক কালে সমস্বরে—
পূরবে উঠিল ধ্বনি, পশ্চিমে উঠিল ধ্বনি,
ব্যাপ্ত হল উত্তরে দক্ষিণে।
অসংখ্য ভাবের দল খেলিতে লাগিল যত
উঠিল খেলার কোলাহল।
শূন্যে শূন্যে মাতিয়া বেড়ায়—
হেথা ছোটে, হোথা ছুটে যায়।
কী করিবে আপনা লইয়া
যেন তাহা ভাবিয়া না পায়,
আনন্দে ভাঙিয়া যেতে চায়।
যে প্রাণ অনন্ত যুগ রবে
সেই প্রাণ পেয়েছে নূতন,
আনন্দে অনন্ত প্রাণ যেন
মুহূর্তে করিতে চায় ব্যয়।

অবশেষে আকাশ ব্যাপিয়া
পড়িল প্রেমের আকর্ষণ।
এ ধায় উহার পানে,
এ চায় উহার মুখে,
আগ্রহে ছুটিয়া কাছে আসে।
বাষ্পে বাষ্পে করে ছুটাছুটি,
বাষ্পে বাষ্পে করে আলিঙ্গন।
অগ্নিময় কাতর হৃদয়
অগ্নিময় হৃদয়ে মিশিছে।
জ্বলিছে দ্বিগুণ অগ্নিরাশি
আঁধার হতেছে চুর চুর।
অগ্নিময় মিলন হইতে
জন্মিতেছে আগ্নেয় সন্তান,
অন্ধকার শূন্যমরুমাঝে
শত শত অগ্নি-পরিবার
দিশে দিশে করিছে ভ্রমণ।

নূতন সে প্রাণের উল্লাসে
নূতন সে প্রাণের উচ্ছ্বাসে
বিশ্ব যবে হয়েছে উন্মাদ,
চারি দিকে উঠিছে নিনাদ,
অনন্ত আকাশে দাঁড়াইয়া
চারি দিকে চারি হাত দিয়া
বিষ্ণু আসি মন্ত্র পড়ি দিলা,
বিষ্ণু আসি কৈলা আশীর্বাদ।
লইয়া মঙ্গলশঙ্খ করে,
কাঁপায়ে জগৎ চরাচরে
বিষ্ণু আসি কৈলা শঙ্খনাদ।
থেমে এল প্রচণ্ড কল্লোল,
নিবে এল জ্বলন্ত উচ্ছ্বাস,

গ্রহগণ নিজ অশ্রুজলে
নিবাইল নিজের হুতাশ।
জগতের বাঁধিল সমাজ,
জগতের বাঁধিল সংসার,
বিবাহে বাহুতে বাহু বাঁধি
জগৎ হইল পরিবার।
বিষ্ণু আসি মহাকাশে, লেখনী ধরিয়া করে
মহান্ কালের পত্র খুলি
ধরিয়া ব্রহ্মার ধ্যানগুলি,
একমনে পরম যতনে,
লিখি লিখি যুগ-যুগান্তর
বাঁধি দিলা ছন্দের বাঁধনে।

জগতের মহা বেদব্যাস
গঠিলা নিখিল উপন্যাস,
বিশৃঙ্খল বিশ্বগীতি লয়ে
মহাকাব্য করিলা রচন।
জগতের ফুলরাশি লয়ে
গাঁথি মালা মনের মতন
নিজ গলে কৈলা আরোপণ।
জগতের মালাখানি জগৎ-পতির গলে
মরি কিবা সেজেছে অতুল
দেখিবারে হৃদয় আকুল।
বিশ্বমালা অসীম অক্ষয়,
কত চন্দ্র কত সূর্য কত গ্রহ কত তারা
কত বর্ণ কত গীত -ময়।
নিজ নিজ পরিবার লয়ে
ভ্রমে সবে নিজ নিজ পথে,
বিষ্ণুদেব চক্র হাতে লয়ে,
চক্র চক্রে বাঁধিলা জগতে।

চক্রপথে ভ্রমে গ্রহ তারা,
চক্রপথে রবি শশী ভ্রমে,
শাসনের গদা হস্তে লয়ে
চরাচর রাখিলা নিয়মে।
দুরন্ত প্রেমেরে মন্ত্র পড়ি
বাঁধি দিলা বিবাহবন্ধনে।
মহাকায় শনিরে ঘেরিয়া
হাতে হাতে ধরিয়া ধরিয়া
নাচিতে লাগিল এক তালে
সুধামুখ চাঁদ শত শত।
পৃথিবীর সমুদ্রহৃদয়
চন্দ্রে হেরি উঠে উথলিয়া।
পৃথিবীর মুখপানে চেয়ে
চন্দ্র হাসে আনন্দে গলিয়া।
মিলি যত গ্রহ ভাইবোন
এক অন্নে হইল পালিত,
তারা-সহোদর যত ছিল
এক সাথে হইল মিলিত।
কত কত শত বর্ষ ধরি
দূর পথ অতিক্রম করি
পাঠাইছে বিদেশ হইতে
তারাগুলি আলোকের দূত
ক্ষুদ্র ওই দূরদেশবাসী
পৃথিবীর বারতা লইতে।
রবি ধায় রবির চৌদিকে,
গ্রহ ধায় রবিরে ঘেরিয়া,
চাঁদ হাসে গ্রহমুখ চেয়ে,
তারা হাসে তারায় হেরিয়া।
মহাছন্দ মহা অনুপ্রাস
চরাচরে বিস্তারিল পাশ।

পশিয়া মানসসরোবরে
স্বর্ণপদ্ম করিলা চয়ন,
বিষ্ণুদেব প্রসন্ন আননে
পদ্মপানে মেলিল নয়ন।
ফুটিয়া উঠিল শতদল,
বাহিরিল কিরণ বিমল,
মাতিল রে দ্যুলোক ভূলোক—
আকাশে পুরিল পরিমল।
চরাচরে উঠাইয়া গান
চরাচরে জাগাইয়া হাসি
কোমল কমলদল হতে
উঠিল অতুল রূপরাশি।
মেলি দুটি নয়ন বিহ্বল
ত্যজিয়া সে শতদলদল
ধীরে ধীরে জগৎ-মাঝারে
লক্ষ্মী আসি ফেলিলা চরণ—
গ্রহে গ্রহে তারায় তারায়
ফুটিল রে বিচিত্র বরন।
জগৎ মুখের পানে চায়,
জগৎ-পাগল হয়ে যায়,
নাচিতে লাগিল চারি দিকে—
আনন্দের অন্ত নাহি পায়।
জগতের মুখপানে চেয়ে
লক্ষ্মী যবে হাসিলেন হাসি
মেঘেতে ফুটিল ইন্দ্রধনু,
কাননে ফুটিল ফুলরাশি—
হাসি লয়ে করে কাড়াকাড়ি
চন্দ্র সূর্য গ্রহ চারি ভিতে,
চাহে তাঁর চরণছায়ায়
যৌবনকুসুম ফুটাইতে।

জগতের হৃদয়ের আশা
দশ দিকে আকুল হইয়া
ফুল হয়ে পরিমল হয়ে
গান হয়ে উঠিল ফুটিয়া :
একি হেরি যৌবন-উচ্ছ্বাস,
একি রে মোহন ইন্দ্রজাল—
সৌন্দর্যকুসুমে গেল ঢেকে
জগতের কঠিন কঙ্কাল।
হাসি হয়ে ভাতিল আকাশে
তারকার রক্তিম নয়ান,
জগতের হর্ষকোলাহল
রাগিণীতে হল অবসান।
কোমলে কঠিন লুকাইল,
শক্তিরে ঢাকিল রূপরাশি,
প্রেমের হৃদয়ে মহা বল
অশনির মুখে দিল হাসি।
সকলি হইল মনোহর
সাজিল জগৎ-চরাচর।

মহাছন্দে বাঁধা হয়ে যুগ যুগ যুগ যুগান্তর
পড়িল নিয়ম-পাঠশালে
অসীম জগৎ-চরাচর।
শ্রান্ত হয়ে এল কলেবর,
নিদ্রা আসে নয়নে তাহার,
আকর্ষণ হতেছে শিথিল,
উত্তাপ হতেছে একাকার।
জগতের প্রাণ হতে
উঠিল রে বিলাপসংগীত,
কাঁদিয়া উঠিল চারি ভিত।

পুরবে বিলাপ উঠে; পশ্চিমে বিলাপ উঠে,
কাঁদিল রে উত্তর দক্ষিণ,
কাঁদে গ্রহ, কাঁদে তারা, শ্রান্তদেহে কাঁদে রবি—
জগৎ হইল শান্তিহীন।
চারি দিক হতে উঠিতেছে
আকুল বিশ্বের কণ্ঠস্বর,
"জাগো জাগো জাগো মহাদেব,
কবে মোরা পাব অবসর?
অলঙ্ঘ্য নিয়মপথে ভ্রমি
হয়েছে হে শ্রান্ত কলেবর।
নিয়মের পাঠ সমাপিয়া
সাধ গেছে খেলা করিবারে
একবার ছেড়ে দাও, দেব,
অনন্ত এ আকাশ-মাঝারে।"
জগতের আত্মা কহে কাঁদি,
"আমারে নূতন দেহ দাও—
প্রতিদিন বাড়িছে হৃদয়,
প্রতিদিন বাড়িতেছে আশা,
প্রতিদিন টুটিতেছে দেহ,
প্রতিদিন ভাঙিতেছে বল।
গাও দেব মরণসংগীত
পাব মোরা নূতন জীবন।"
জগৎ কাঁদিল উচ্চরবে
জাগিয়া উঠিলা মহেশ্বর,
তিন কাল ত্রিনয়ন মেলি,
হেরিলেন দিক্ দিগন্তর।
প্রলয়বিষাণ তুলি করে ধরিলেন শূলী,
পদতলে জগৎ চাপিয়া—
জগতের আদি অন্ত থরথর থরথর
একবার উঠিল কাঁপিয়া।

বিষাণেতে পুরিলা নিশ্বাস,
ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল
জগতের সমস্ত বাঁধন।
উঠিল রে মহাশূন্যে গরজিয়া তরঙ্গিয়া
ছন্দোমুক্ত জগতের উন্মত্ত আনন্দকোলাহল।
ছিঁড়ে গেল রবি শশী গ্রহ তারা ধূমকেতু,
কে কোথায় ছুটে গেল,
ভেঙে গেল, টুটে গেল,
চন্দ্রে সূর্যে গুঁড়াইয়া
চূর্ণ চূর্ণ হয়ে গেল।
মহা অগ্নি জ্বলিল রে,
আকাশের অনন্ত হৃদয়—
অগ্নি, অগ্নি, শুধু অগ্নিময়।
মহা অগ্নি উঠিল জ্বলিয়া
জগতের মহা চিতানল।
খণ্ড খণ্ড রবি শশী, চূর্ণ চূর্ণ গ্রহ তারা
বিন্দু বিন্দু আঁধারের মতো
বরষিছে চারি দিক হতে,
অনলের তেজোময় গ্রাসে
নিমেষেতে যেতেছে মিশায়ে।
সৃজনের আরম্ভসময়ে
আছিল অনাদি অন্ধকার,
সৃজনের ধ্বংসযুগান্তরে
রহিল অসীম হুতাশন।
অনন্ত আকাশগ্রাসী অনলসমুদ্রমাঝে
মহাদেব মুদি ত্রিনয়ান
করিতে লাগিলা মহাধ্যান।

স্রোত

জগৎ-স্রোতে ভেসে চলো, যে যেথা আছ ভাই!
চলেছে যেথা রবি শশী চল্ রে সেথা যাই।
কোথায় চলে কে জানে তা, কোথায় যাবে শেষে,
জগৎ-স্রোত বহে গিয়ে কোন্ সাগরে মেশে।
অনাদি কাল চলে স্রোত অসীম আকাশেতে,
উঠেছে মহা কলরব অসীমে যেতে যেতে।
উঠিছে ঢেউ, পড়ে ঢেউ, গনিবে কেবা কত!
ভাসিছে শত গ্রহ তারা, ডুবিছে শত শত।
ঢেউয়ের 'পরে খেলা করে আলোকে আঁধারেতে,
জলের কোলে লুকাচুরি জীবনে মরণেতে।
শতেক কোটি গ্রহ তারা যে স্রোতে তৃণপ্রায়
সে স্রোত-মাঝে অবহেলে ঢালিয়া দিব কায়,
অসীম কাল ভেসে যাব অসীম আকাশেতে,
জগৎ-কলকলরব শুনিব কান পেতে।
দেখিব ঢেউ— উঠে ঢেউ, দেখিব মিশে যায়,
জীবন-মাঝে উঠে ঢেউ মরণ-গান গায়।
দেখিব চেয়ে চারি দিকে, দেখিব তুলে মুখ—
কত-না আশা, কত হাসি, কত-না সুখ দুখ,
বিরাগ দ্বেষ ভালোবাসা, কত-না হায়-হায়—
তপন ভাসে, তারা ভাসে, তা'রাও ভেসে যায়।
কত-না যায়, কত চায়, কত-না কাঁদে হাসে—
আমি তো শুধু ভেসে যাব, দেখিব চারি পাশে।

অবোধ ওরে, কেন মিছে করিস 'আমি আমি'।
উজানে যেতে পারিবি কি সাগরপথগামী?
জগৎ-পানে যাবি নে রে, আপনা-পানে যাবি—
সে যে রে মহা মরুভূমি, কী জানি কী যে পাবি।

মাথায় করে আপনারে, সুখ-দুখের বোঝা,
ভাসাতে চাস প্রতিকূলে— সে তো রে নহে সোজা।
অবশ দেহ, ক্ষীণ বল, সঘনে বহে শ্বাস,
লইয়া তোর সুখদুখ এখনি পাবি নাশ।

জগৎ হয়ে রব আমি, একেলা রহিব না।
মরিয়া যাব একা হলে একটি জলকণা।
আমার নাহি সুখ দুখ, পরের পানে চাই—
যাহার পানে চেয়ে দেখি তাহাই হয়ে যাই।
তপন ভাসে, তারা ভাসে, আমিও যাই ভেসে—
তাদের গানে আমার গান, যেতেছি এক দেশে।
প্রভাত সাথে গাহি গান, সাঁঝের সাথে গাই,
তারার সাথে উঠি আমি— তারার সাথে যাই।
ফুলের সাথে ফুটি আমি, লতার সাথে নাচি,
বায়ুর সাথে ঘুরি শুধু ফুলের কাছাকাছি।
মায়ের প্রাণে স্নেহ হয়ে শিশুর পানে ধাই,
দুখীর সাথে কাঁদি আমি সুখীর সাথে গাই।
সবার সাথে আছি আমি, আমার সাথে নাই,
জগৎ-স্রোতে দিবানিশি ভাসিয়া চলে যাই।

চেয়ে থাকা

মনেতে সাধ যে দিকে চাই
কেবলি চেয়ে রব।
দেখিব শুধু, দেখিব শুধু,
কথাটি নাহি কব।
পরানে শুধু জাগিবে প্রেম,
নয়নে লাগে ঘোর,
জগতে যেন ডুবিয়া রব
হইয়া রব ভোর।

তটিনী যায়, বহিয়া যায়,
কে জানে কোথা যায় ;
তীরেতে বসে রহিব চেয়ে,
সারাটি দিন যায় ।
সুদূর জলে ডুবিছে রবি
সোনার লেখা লিখি,
সাঁঝের আলো জলেতে শুয়ে
করিছে ঝিকিমিকি ।
সুধীর স্রোতে তরণীগুলি
যেতেছে সারি সারি,
বহিয়া যায়, ভাসিয়া যায়
কত-না নরনারী ।
না জানি তারা কোথায় থাকে
যেতেছে কোন্ দেশে,
সুদূর তীরে কোথায় গিয়ে
থামিবে অবশেষে ।
কত কী আশা গড়িছে বসে
তাদের মনখানি,
কত কী সুখ কত কী দুখ
কিছুই নাহি জানি ।

দেখিব পাখি আকাশে ওড়ে,
সুদূরে উড়ে যায়,
মিশায়ে যায় কিরণমাঝে,
আঁধাররেখাপ্রায় !
তাহারি সাথে সারাটি দিন
উড়িবে মোর প্রাণ,
নীরবে বসি তাহারি সাথে
গাহিব তারি গান ।

তাহারি মতো মেঘের মাঝে
বাঁধিতে চাহি বাসা,
তাহারি মতো চাঁদের কোলে
গড়িতে চাহি আশা।
তাহারি মতো আকাশে উঠে,
ধরার পানে চেয়ে
ধরায় যারে এসেছি ফেলে
ডাকিব গান গেয়ে।
তাহারি মতো, তাহারি সাথে
উষার দ্বারে গিয়ে,
ঘুমের ঘোর ভাঙায়ে দিব
উষারে জাগাইয়ে।

পথের ধারে বসিয়া রব
বিজন তরুছায়,
সমুখ দিয়ে পথিক যত
কত-না আসে যায়।
ধুলায় বসে আপন-মনে
ছেলেরা খেলা করে,
মুখেতে হাসি সখারা মিলে
যেতেছে ফিরে ঘরে।

পথের ধারে ঘরের দ্বারে
বালিকা এক মেয়ে,
ছোটো ভায়েরে পাড়ায় ঘুম
কত কী গান গেয়ে।
তাহার পানে চাহিয়া থাকি
দিবস যায় চলে,
স্নেহেতে ভরা করুণ আঁখি—
হৃদয় যায় গলে।

এতটুকু সে পরানটিতে
　　এতটা সুধারাশি।
কাছেতে তাই দাঁড়ায়ে তারে
　　দেখিতে ভালোবাসি।

কোথা বা শিশু কাঁদিছে পথে
　　মায়েরে ডাকি ডাকি,
আকুল হয়ে পথিকমুখে
　　চাহিছে থাকি থাকি।
কাতর স্বর শুনিতে পেয়ে
　　জননী ছুটে আসে,
মায়ের বুক জড়ায়ে শিশু
　　কাঁদিতে গিয়ে হাসে।
অবাক হয়ে তাহাই দেখি
　　নিমেষ ভুলে গিয়ে,
দুইটি ফোঁটা বাহিরে জল
　　দুইটি আঁখি দিয়ে।

যায় রে সাধ জগৎ-পানে
　　কেবলি চেয়ে রই
অবাক হয়ে, আপনা ভুলে,
　　কথাটি নাহি কই।

সাধ

অরুণময়ী তরুণী উষা
　　জাগায়ে দিল গান।
পুরব মেঘে কনকমুখী
বারেক শুধু মারিল উঁকি,
অমনি যেন জগৎ ছেয়ে
　　বিকশি উঠে প্রাণ।

কাহার হাসি বহিয়া এনে
করিলি সুধা দান।
ফুলেরা সব চাহিয়া আছে
আকাশপানে মগন-মনা,
মুখেতে মৃদু বিমল হাসি
নয়নে দুটি শিশির-কণা।
আকাশ-পারে কে যেন ব'সে,
তাহারে যেন দেখিতে পায়,
বাতাসে দুলে বাহুটি তুলে
মায়ের কোলে ঝাঁপিতে যায়।
কী যেন দেখে, কী যেন শোনে,
কে যেন ডাকে, কে যেন গায়—
ফুলের সুখ, ফুলের হাসি
দেখিবি তোরা আয় রে আয়।

আ মরি মরি অমনি যদি
ফুলের মতো চাহিতে পারি।
বিমল প্রাণে বিমল সুখে
বিমল প্রাতে বিমল মুখে
ফুলের মতো অমনি যদি
বিমল হাসি হাসিতে পারি।
দুলিছে, মরি, হরষ-স্রোতে,
অসীম স্নেহে আকাশ হতে
কে যেন তারে খেতেছে চুমো
কোলেতে তারি পড়িছে লুটে।
কে যেন তারি নামটি ধ'রে
ডাকিছে তারে সোহাগ ক'রে,
শুনিতে পেয়ে ঘুমের ঘোরে
মুখটি ফুটে হাসিটি ফোটে,
শিশুর প্রাণে সুখের মতো
সুবাসটুকু জাগিয়া ওঠে।

আকাশপানে চাহিয়া থাকে,
না জানি তাহে কী সুখ পায়।
বলিতে যেন শেখেনি কিছু,
কী যেন তবু বলিতে চায়।
আঁধার কোণে থাকিস তোরা,
জানিস কি রে কত সে সুখ
আকাশপানে চাহিলে পরে
আকাশপানে তুলিলে মুখ।
সুদূর দূর, সুনীল নীল,
সুদূরে পাখি উড়িয়া যায়।
সুনীল দূরে ফুটিছে তারা
সুদূর হতে আসিছে বায়।
প্রভাতকরে করি রে স্নান,
ঘুমাই ফুলবাসে,
পাখির গান লাগে রে যেন
দেহের চারি পাশে।
বাতাস যেন প্রাণের সখা,
প্রবাসে ছিল, নতুন দেখা,
ছুটিয়া আসে বুকের কাছে
বারতা শুধাইতে।
চাহিয়া আছে আমার মুখে,
কিরণময় আমারি সুখে
আকাশ যেন আমারি তরে
রয়েছে বুক পেতে।
মনেতে করি আমারি যেন
আকাশ-ভরা প্রাণ,
আমারি প্রাণ হাসিতে ছেয়ে
জাগিছে উষা তরুণ মেয়ে,
করুণ আঁখি করিছে প্রাণে
অরুণসুধা দান।

আমারি বুকে প্রভাতবেলা
ফুলেরা মিলি করিছে খেলা,
হেলিছে কত, দুলিছে কত,
পুলকে ভরা মন,
আমারি তোরা বালিকা মেয়ে
আমারি স্নেহধন।
আমারি মুখে চাহিয়া তোর
আঁখিটি ফুটিফুটি।
আমারি বুকে আলয় পেয়ে
হাসিয়া কুটিকুটি।
কেন রে বাছা, কেন রে হেন
আকুল কিলিবিলি,
কী কথা যেন জানাতে চাস
সবাই মিলি মিলি।
হেথায় আমি রহিব বসে
আজি সকালবেলা,
নীরব হয়ে দেখিব চেয়ে
ভাইবোনের খেলা।
বুকের কাছে পড়িবি ঢলে
চাহিবি ফিরে ফিরে,
পরশি দেহে কোমলদল
স্নেহেতে চোখে আসিবে জল,
শিশিরসম তোদের 'পরে
ঝরিবে ধীরে ধীরে।

হৃদয় মোর আকাশমাঝে
তারার মতো উঠিতে চায়,
আপন সুখে ফুলের মতো
আকাশপানে ফুটিতে চায়।
নিবিড় রাতে আকাশে উঠে

চারি দিকে সে চাহিতে চায়,
তারার মাঝে হারায়ে গিয়ে
আপন মনে গাহিতে চায়।
মেঘের মতো হারায়ে দিশা
আকাশ-মাঝে ভাসিতে চায়—
কোথায় যাবে কিনারা নাই,
দিবসনিশি চলেছে তাই,
বাতাস এসে লাগিছে গায়ে,
জোছনা এসে পড়িছে পায়ে,
উড়িয়া কাছে গাহিছে পাখি,
মুদিয়া যেন এসেছে আঁখি,
আকাশ-মাঝে মাথাটি থুয়ে
আরামে যেন ভাসিয়া যায়,
হৃদয় মোর মেঘের মতো
আকাশ-মাঝে ভাসিতে চায়।
ধরার পানে মেলিয়া আঁখি
উষার মতো হাসিতে চায়।
জগৎ-মাঝে ফেলিতে পা
চরণ যেন উঠিছে না,
শরমে যেন হাসিছে মৃদু হাস,
হাসিটি যেন নামিল ভুঁয়ে,
জাগায়ে দিল ফুলেরে ছুঁয়ে,
মালতীবধূ হাসিয়া তারে
করিল পরিহাস।
মেঘেতে হাসি জড়ায়ে যায়,
বাতাসে হাসি গড়ায়ে যায়,
উষার হাসি— ফুলের হাসি—
কানন-মাঝে ছড়ায়ে যায়।
হৃদয় মোর আকাশে উঠে
উষার মতো হাসিতে চায়।

সমাপন

আজ আমি কথা কহিব না।
আর আমি গান গাহিব না।
হেরো আজি ভোরবেলা এসেছে রে মেলা লোক,
ঘিরে আছে চারি দিকে
চেয়ে আছে অনিমিখে,
হেরে মোর হাসিমুখ ভুলে গেছে দুখশোক।
আজ আমি গান গাহিব না।

সকাতরে গান গেয়ে পথপানে চেয়ে চেয়ে
এদের ডেকেছি দিবানিশি।
ভেবেছিনু মিছে আশা, বোঝে না আমার ভাষা,
বিলাপ মিলায় দিশি দিশি।
কাছে এরা আসিত না, কোলে বসে হাসিত না,
ধরিতে চকিতে হত লীন।
মরমে বাজিত ব্যথা— সাধিলে না কহে কথা—
সাধিতে শিখি নি এতদিন।
দিত দেখা মাঝে মাঝে, দূরে যেন বাঁশি বাজে,
আভাস শুনিনু যেন হায়।
মেঘে কভু পড়ে রেখা, ফুলে কভু দেয় দেখা,
প্রাণে কভু বহে চলে যায়।

আজ তারা এসেছে রে কাছে
এর চেয়ে শোভা কিবা আছে।
কেহ নাহি করে ডর, কেহ নাহি ভাবে পর,
সবাই আমাকে ভালোবাসে,
আগ্রহে ঘিরিছে চারি পাশে।

এসেছিস তোরা যত জনা
তোদের কাহিনী আজি শোনা।
যার যত কথা আছে খুলে বল্ মোর কাছে,
আজ আমি কথা কহিব না।

আয় তুই কাছে আয়, তোরে মোর প্রাণ চায়,
তোর কাছে শুধু বসে রই।
দেখি শুধু, কথা নাহি কই।
ললিত পরশে তোর পরানে লাগিছে ঘোর,
চোখে তোর বাজে বেণুবীণা—
তুই মোরে গান শুনাবি না ?
জেগেছে নূতন প্রাণ, বেজেছে নূতন গান,
ওই দেখ পোহায়েছে রাতি।
আমারে বুকেতে নে রে, কাছে আয়— আমি যে রে
নিখিলের খেলাবার সাথি।
চারি দিকে সৌরভ, চারি দিকে গীতরব,
চারি দিকে সুখ আর হাসি,
চারি দিকে শিশুগুলি মুখে আধো আধো বুলি,
চারি দিকে স্নেহপ্রেমরাশি।
আমারে ঘিরেছে কারা, সুখেতে করেছে সারা,
জগতে হয়েছে হারা প্রাণের বাসনা।
আর আমি কথা কহিব না—
আর আমি গান গাহিব না।

ছবি ও গান

উৎসর্গ

গত বৎসরকার বসন্তের ফুল লইয়া এ বৎসরকার
বসন্তে মালা গাঁথিলাম।
যাঁহার নয়ন-কিরণে প্রতিদিন প্রভাতে এই ফুলগুলি
একটি একটি করিয়া ফুটিয়া উঠিত,
তাঁহারি চরণে ইহাদিগকে উৎসর্গ করিলাম।

সূচনা

ছবি ও গান নিয়ে আমার বলবার কথাটা বলে নিই। এটা বয়ঃসন্ধি-কালের লেখা, শৈশব যৌবন যখন সবে মিলেছে। ভাষায় আছে ছেলেমানুষি, ভাবে এসেছে কৈশোর। তার পূর্বেকার অবস্থায় একটা বেদনা ছিল অনুদ্দিষ্ট, সে যেন প্রলাপ ব'কে আপনাকে শান্ত করতে চেয়েছে। এখন সেই বয়স যখন কামনা কেবল সুর খুঁজছে না, রূপ খুঁজতে বেরিয়েছে। কিন্তু আলো-আঁধারে রূপের আভাস পায়, স্পষ্ট করে কিছু পায় না। ছবি এঁকে তখন প্রত্যক্ষতার স্বাদ পাবার ইচ্ছা জেগেছে মনে, কিন্তু ছবি আঁকবার হাত তৈরি হয় নি তো।

কবি সংসারের ভিতরে তখনও প্রবেশ করে নি, তখনও সে বাতায়ন-বাসী। দূর থেকে যার আভাস দেখে তার সঙ্গে নিজের মনের নেশা মিলিয়ে দেয়। এর কোনো-কোনোটা চোখে দেখা এক-টুকরো ছবি পেন্‌সিলে আঁকা, রবারে ঘষে দেওয়া, আর কোনো-কোনোটা সম্পূর্ণ বানানো। মোটের উপরে অক্ষম ভাষার ব্যাকুলতায় সবগুলিতেই বানানো ভাব প্রকাশ পেয়েছে, সহজ হয় নি। কিন্তু সহজ হবার একটা চেষ্টা দেখা যায়। সেইজন্যে চলতি ভাষা আপন এলোমেলো পদক্ষেপে এর যেখানে-সেখানে প্রবেশ করেছে। আমার ভাষায় ও ছন্দে এই একটা মেলামেশা আরম্ভ হল। 'ছবি ও গান' কড়ি ও কোমলের ভূমিকা করে দিলে।

ছবি ও গান

কে ?

আমার   প্রাণের 'পরে চলে গেল কে
বসন্তের   বাতাসটুকুর মতো !
সে যে   ছুঁয়ে গেল নুয়ে গেল রে,
ফুল   ফুটিয়ে গেল শত শত।

সে   চলে গেল, বলে গেল না,
সে   কোথায় গেল ফিরে এল না,
সে   যেতে যেতে চেয়ে গেল,
কী যেন গেয়ে গেল—
তাই   আপন মনে বসে আছি
কুসুম-বনেতে।

সে   ঢেউয়ের মতো ভেসে গেছে,
চাঁদের আলোর দেশে গেছে,
যেখান দিয়ে হেসে গেছে
হাসি তার   রেখে গেছে রে।
মনে হল আঁখির কোণে
আমায় যেন ডেকে গেছে সে।
আমি   কোথায় যাব কোথায় যাব,
ভাবতেছি তাই একলা বসে।

সে   চাঁদের চোখে বুলিয়ে গেল
ঘুমের ঘোর।

সে প্রাণের কোথা দুলিয়ে গেল
ফুলের ডোর।
সে কুসুম-বনের উপর দিয়ে
কী কথা যে বলে গেল,
ফুলের গন্ধ পাগল হয়ে
সঙ্গে তারি চলে গেল।
হৃদয় আমার আকুল হল,
নয়ন আমার মুদে এল,
কোথা দিয়ে কোথায় গেল সে!

সুখস্বপ্ন

ওই জানালার কাছে বসে আছে
করতলে রাখি মাথা।
তার কোলে ফুল পড়ে রয়েছে,
সে যে ভুলে গেছে মালা গাঁথা।
শুধু ঝুরু ঝুরু বায়ু বহে যায়,
তার কানে কানে কী যে কহে যায়,
তাই আধো শুয়ে আধো বসিয়ে
কত ভাবিতেছে আনমনে।
উড়ে উড়ে যায় চুল,
কোথা উড়ে উড়ে পড়ে ফুল,
ঝুরু ঝুরু কাঁপে গাছপালা
সমুখের উপবনে।
অধরের কোণে হাসিটি
আধখানি মুখ ঢাকিয়া,
কাননের পানে চেয়ে আছে
আধমুকুলিত আঁখিয়া।

সুদূর স্বপন ভেসে ভেসে
  চোখে এসে যেন লাগিছে,
ঘুমঘোরময় সুখের আবেশ
  প্রাণের কোথায় জাগিছে।
চোখের উপরে মেঘ ভেসে যায়,
  উড়ে উড়ে যায় পাখি,
সারাদিন ধরে বকুলের ফুল
  ঝরে পড়ে থাকি থাকি।
মধুর আলস, মধুর আবেশ,
  মধুর মুখের হাসিটি,
মধুর স্বপনে প্রাণের মাঝারে
  বাজিছে মধুর বাঁশিটি।

জাগ্রত স্বপ্ন

আজ একেলা বসিয়া, আকাশে চাহিয়া,
  কী সাধ যেতেছে, মন!
বেলা চলে যায়— আছিস কোথায়?
  কোন্ স্বপনেতে নিমগন?
বসন্তবাতাসে আঁখি মুদে আসে,
  মৃদু মৃদু বহে শ্বাস,
গায়ে এসে যেন এলায়ে পড়িছে
  কুসুমের মৃদু বাস।
যেন সুদূর নন্দনকাননবাসিনী
  সুখঘুমঘোরে মধুরহাসিনী
অজানা প্রিয়ার ললিত পরশ
  ভেসে ভেসে বহে যায়,
অতি মৃদু মৃদু লাগে গায়।

বিস্মরণমোহে আঁধারে আলোকে
মনে পড়ে যেন তায়,
স্মৃতি-আশা-মাখা মৃদু সুখে দুখে
পুলকিয়া উঠে কায়।
ভ্রমি আমি যেন সুদূর কাননে
সুদূর আকাশতলে,
আনমনে যেন গাহিয়া বেড়াই
সরযূর কলকলে।
গহন বনের কোথা হতে শুনি
বাঁশির স্বর-আভাস,
বনের হৃদয় বাজাইছে যেন
মরমের অভিলাষ।
বিভোর হৃদয়ে বুঝিতে পারি নে
কে গায় কিসের গান,
অজানা ফুলের সুরভি মাখানো
স্বরসুধা করি পান।

যেন রে কোথায় তরুর ছায়ায়
বসিয়া রূপসী বালা,
কুসুমশয়নে আধেক মগনা,
বাকলবসনে আধেক নগনা,
সুখদুখগান গাইছে শুইয়া
গাঁথিতে গাঁথিতে মালা।
ছায়ায় আলোকে, নিঝরের ধারে,
কোথা কোন্ গুপ্ত গুহার মাঝারে,
যেন হেথা হোথা কে কোথায় আছে
এখনি দেখিতে পাব—
যেন রে তাদের চরণের কাছে
বীণা লয়ে গান গাব।

শুনে শুনে তারা আনত নয়নে
 হাসিবে মুচুকি হাসি,
শরমের আভা অধরে কপোলে
 বেড়াইবে ভাসি ভাসি।
মাথায় বাঁধিয়া ফুলের মালা
 বেড়াইব বনে বনে।
উড়িতেছে কেশ, উড়িতেছে বেশ,
উদাস পরান কোথা নিরুদ্দেশ,
হাতে লয়ে বাঁশি মুখে লয়ে হাসি
 ভ্রমিতেছি আনমনে।
চারি দিকে মোর বসন্ত হসিত,
যৌবনকুসুম প্রাণে বিকশিত,
কুসুমের 'পরে ফেলিব চরণ
 যৌবনমাধুরীভরে।
চারি দিকে মোর মাধবী মালতী
 সৌরভে আকুল করে।

কেহ কি আমারে চাহিবে না ?
কাছে এসে গান গাহিবে না ?
পিপাসিত প্রাণে চাহি মুখপানে
 কবে না প্রাণের আশা ?
চাঁদের আলোতে দখিন বাতাসে
কুসুমকাননে বাঁধি বাহুপাশে
শরমে সোহাগে মৃদুমধুহাসে
 জানাবে না ভালোবাসা ?
আমার যৌবনকুসুমকাননে
 ললিত চরণে বেড়াবে না ?
আমার প্রাণের লতিকা-বাঁধন
 চরণে তাহার জড়াবে না ?

আমার প্রাণের কুসুম গাঁথিয়া
কেহ পরিবে না গলে ?
তাই ভাবিতেছি আপনার মনে
বসিয়া তরুর তলে ।

দোলা

ঝিকিমিকি বেলা ;
গাছের ছায়া কাঁপে জলে,
সোনার কিরণ করে খেলা ।
জুটিতে দোলার 'পরে দোলে রে,
দেখে রবির আঁখি ভোলে রে ।

গাছের ছায়া চারি দিকে আঁধার করে রেখেছে,
লতাগুলি আঁচল দিয়ে ঢেকেছে ।
ফুল ধীরে ধীরে মাথায় পড়ে,
পায়ে পড়ে, গায়ে পড়ে,
থেকে থেকে বাতাসেতে ঝুরু ঝুরু পাতা নড়ে ।
নিরালা সকল ঠাঁই,
কোথাও সাড়া নাই,
শুধু নদীটি বহে যায় বনের ছায়া দিয়ে,
বাতাস ছুঁয়ে যায় লতারে শিহরিয়ে ।
জুটিতে বসে বসে দোলে,
বেলা কোথায় গেল চলে ।
হেরো, সুধামুখী মেয়ে
কী চাওয়া আছে চেয়ে
মুখানি থুয়ে তার বুকে ।
কী মায়া মাখা চাঁদমুখে ।

হাতে তার কাঁকন দুগাছি,
কানেতে দুলিছে তার দুল,
হাসি-হাসি মুখখানি তার
ফুটেছে সাঁঝের জুঁই ফুল।
গলেতে বাহু বেঁধে
দু-জনে কাছাকাছি—
দুলিছে এলো চুল,
দুলিছে মালাগাছি।
আঁধার ঘনাইল,
পাখিরা ঘুমাইল,
সোনার রবি-আলো আকাশে মিলাইল।
মেঘেরা কোথা গেল চলে,
দুজনে বসে বসে দোলে।
ঘেঁষে আসে বুকে বুকে,
মিলায়ে মুখে মুখে
বাহুতে বাঁধি বাহুপাশ,
সুধীরে বহিতেছে শ্বাস।
মাঝে মাঝে থেকে থেকে
আকাশেতে চেয়ে দেখে,
গাছের আড়ালে দুটি তারা।
প্রাণ কোথা উড়ে যায়,
সেই তারা পানে ধায়,
আকাশের মাঝে হয় হারা।
পৃথিবী ছাড়িয়া যেন তা'রা
দুটিতে হয়েছে দুটি তারা।

একাকিনী

একটি মেয়ে একেলা,
সাঁঝের বেলা,
মাঠ দিয়ে চলেছে।
চারি দিকে সোনার ধান ফলেছে।
ওর মুখেতে পড়েছে সাঁঝের আভা,
চুলেতে করিছে ঝিকিমিকি।
কে জানে কী ভাবে মনে মনে
আনমনে চলে ধিকিধিকি।
পশ্চিমে সোনায় সোনাময়,
এত সোনা কে কোথা দেখেছে।
তারি মাঝে মলিন মেয়েটি
কে যেন রে এঁকে রেখেছে।
মুখখানি কেন গো অমন ধারা,
কোন্‌ খানে হয়েছে পথহারা,
কারে যেন কী কথা শুধাবে,
শুধাইতে ভয়ে হয় সারা।
চরণ চলিতে বাধে বাধে,
শুধালে কথাটি নাহি কয়।
বড়ো বড়ো আকুল নয়নে
শুধু মুখপানে চেয়ে রয়।
নয়ন করিছে ছলছল,
এখনি পড়িবে যেন জল।

সাঁঝেতে নিরালা সব ঠাঁই,
মাঠে কোথাও জনপ্রাণী নাই—
দূরে অতি দূরে দেখা যায়,
মলিন সে সাঁঝের আলোতে

ছায়া ছায়া গাছপালাগুলি
মেশে মেশে মেঘের কোলেতে।
বড়ো তোর বাজিতেছে পায়,
আয় রে আমার কোলে আয়।
আ মরি জননী তোর কে,
বল্ রে কোথায় তোর ঘর।
তরাসে চাহিস কেন রে,
আমারে বাসিস কেন পর?

গ্রামে

নবীন প্রভাত-কনক-কিরণে
নীরবে দাঁড়ায়ে গাছপালা—
কাঁপে মৃদু মৃদু কী যেন আরামে,
বায়ু বহে যায় সুধা-ঢালা।
নীল আকাশেতে নারিকেল-তরু,
ধীরে ধীরে তার পাতা নড়ে—
প্রভাত আলোতে কুঁড়েঘরগুলি,
জলে ঢেউগুলি ওঠে পড়ে।
দুয়ারে বসিয়া তপনকিরণে
ছেলেরা মিলিয়া করে খেলা,
মনে হয় সবি কী যেন কাহিনী
শুনেছিনু কোন্ ছেলেবেলা।
প্রভাতে যেন রে ঘরের বাহিরে
সে কালের পানে চেয়ে আছি,
পুরাতন দিন হোথা হতে এসে
উড়িয়ে বেড়ায় কাছাকাছি।

ঘর-দ্বার সব মায়া-ছায়া-সম,
কাহিনীতে গাঁথা খেলা-ধূলি—
মধুর তপন, মধুর পবন,
ছবির মতন কুঁড়েগুলি।
কেহ বা দোলায় কেহ বা দোলে,
গাছতলে মিলে করে মেলা,
বাঁশি হাতে নিয়ে রাখাল বালক
কেহ নাচে-গায় করে খেলা।
এমনি যেন রে কেটে যায় দিন,
কারো যেন কোনো কাজ নাই,
অসম্ভব যেন সকলি সম্ভব—
পেতেছে যেন রে যাহা চাই।
কেবলি যেন রে প্রভাততপনে
প্রভাতপবনে প্রভাতস্বপনে
বিরামে কাটায়, আরামে ঘুমায়
গাছপালা বন কুঁড়েগুলি।
কাহিনীতে ঘেরা ছোটো গ্রামখানি,
মায়াদেবীদের মায়া-রাজধানী,
পৃথিবী-বাহিরে কলপনা-তীরে
করিছে যেন রে খেলা-ধূলি।

আদরিনী

একটুখানি সোনার বিন্দু, একটুখানি মুখ,
একা একটি বনফুল ফোটে-ফোটে হয়েছে,
কচি কচি পাতার মাঝে মাথা থুয়ে রয়েছে।
চার দিকে তার গাছের ছায়া, চার দিকে তার নিষুতি,
চার দিকে তার ঝোপে-ঝাপে আঁধার দিয়ে ঢেকেছে—

বনের সে যে স্নেহের ধন আদরিণী মেয়ে,
তারে বুকের কাছে লুকিয়ে যেন রেখেছে।

একটুখানি রূপের হাসি আঁধারেতে ঘুমিয়ে আলা,
বনের স্নেহ শিয়রেতে জেগে আছে।
সুকুমার প্রাণটুকু তার কিছু যেন জানে না,
চোখে শুধু সুখের স্বপন লেগে আছে।
একটি যেন রবির কিরণ ভোরের বেলা বনের মাঝে
খেলাতেছিল নেচে নেচে,
নিরালাতে গাছের ছায়ে, আঁধারেতে শ্রান্তকায়ে
সে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে।
বনদেবী করুণ-হিয়ে তারে যেন কুড়িয়ে নিয়ে
যতন করে আপন ঘরেতে।
থুয়ে কোমল পাতার 'পরে মায়ের মতো স্নেহভরে
ছোঁয় তারে কোমল করেতে।
ধীরি ধীরি বাতাস গিয়ে আসে তারে দোলা দিয়ে,
চোখেতে চুমো খেয়ে যায়।
ঘুরে ফিরে আশেপাশে বারবার ফিরে আসে,
হাতটি বুলিয়ে দেয় গায়।

একলা পাখি গাছের শাখে কাছে তোর বসে থাকে,
সারা দুপুরবেলা শুধু ডাকে,
যেন তার আর কেহ নাই, সারা দিন একলাটি তাই
স্নেহভরে তোরে নিয়েই থাকে।
ও পাখির নাম জানি নে, কোথায় ছিল কে তা জানে,
রাতের বেলায় কোথায় চলে যায়,
দুপুরবেলা কাছে আসে— সারা দিন বসে পাশে
একটি শুধু আদরের গান গায়।

রাতে কত তারা ওঠে, ভোরের বেলা চলে যায়—
তোরে তো কেউ দেখে না, জানে না।
এক কালে তুই ছিলি যেন ওদেরই ঘরের মেয়ে,
আজকে রে তুই অজানা অচেনা।
নিত্যি দেখি রাতের বেলা একটি শুধু জোনাই আসে,
আলো দিয়ে মুখপানে তোর চায়।
কে জানে সে কী যে করে! তারা-জন্মের কাহিনী তোর
কানে বুঝি স্বপন দিয়ে যায়।
ভোরের বেলা আলো এল, ডাকছে রে তোর নামটি ধরে,
আজকে তবে মুখখানি তোর তোল্,
আজকে তবে আঁখিটি তোর খোল্,
লতা জাগে, পাখি জাগে, গায়ের কাছে বাতাস লাগে,
দেখি রে— ধীরে ধীরে দোল্ দোল্ দোল্।

খেলা

ছেলেতে মেয়েতে করে খেলা
ঘাসের 'পরে সাঁঝের বেলা।

ঘোর ঘোর গাছের তলে তলে,
ফাঁকায় পড়েছে মলিন আলো,
কোথাও যেন সোনার ছায়া ছায়া
কোথাও যেন আঁধার কালো কালো।
আকাশের ধারে ধারে ঘিরে
বসেছে রাঙা মেঘের মেলা—
শ্যামল ঘাসের 'পরে, সাঁঝে
আলো-আঁধারের মাঝে মাঝে,
ছেলেতে মেয়েতে করে খেলা।

ওরা যে কেন হেসে সারা,
কেন যে করে অমন ধারা,
কেন যে লুটোপুটি,
কেন যে ছুটোছুটি,
কেন যে আহ্লাদে কুটিকুটি!
কেহ বা ঘাসে গড়ায়,
কেহ বা নেচে বেড়ায়,
সাঁঝের সোনা-আকাশে
হাসির সোনা ছড়ায়।
আঁখি দুটি নৃত্য করে,
নাচে চুল পিঠের 'পরে,
হাসিগুলি চোখে মুখে লুকোচুরি খেলা করে।
যেন মেঘের কাছে ছুটি পেয়ে
বিদ্যুতেরা এল ধেয়ে,
আনন্দে হল রে আপন-হারা।
ওদের হাসি দেখে খেলা দেখে
আকাশের এক ধারে থেকে
মৃদু মৃদু হাসছে একটি তারা।

ঝাউগাছে পাতাটি নড়ে না,
কামিনীর পাপড়িটি পড়ে না।
আঁধার কাকের দল
সাঙ্গ করি কোলাহল
কালো কালো গাছের ছায়,
কে কোথায় মিশায়ে যায়—
আকাশেতে পাখিটি ওড়ে না।
সাড়াশব্দ কোথায় গেল,
নিঝুম হয়ে এল এল
গাছপালা বন গ্রামের আশেপাশে।

শুধু খেলার কোলাহল,
শিশুকণ্ঠের কলকল,
হাসির ধ্বনি উঠেছে আকাশে।

কত আর খেলবি ও রে,
নেচে নেচে হাতে ধ'রে
যে যার ঘরে চলে আয় ঝাট্,
আঁধার হয়ে এল পথঘাট।
সন্ধ্যাদীপ জ্বলল ঘরে,
চেয়ে আছে তোদের তরে—
তোদের না হেরিলে মার কোলে
ঘরের প্রাণ কাঁদে সন্ধে হলে।

ঘুম

ঘুমিয়ে পড়েছে শিশুগুলি,
খেলাধুলা সব গেছে ভুলি।

ধীরে নিশীথের বায় আসে খোলা জানালায়,
ঘুম এনে দেয় আঁখিপাতে,
শয্যায় পায়ের কাছে খেলেনা ছড়ানো আছে,
ঘুমিয়েছে খেলাতে-খেলাতে।
এলিয়ে গিয়েছে দেহ, মুখে দেবতার স্নেহ
পড়েছে রে ছায়ার মতন,
কালো কালো চুল তার বাতাসেতে বার বার
উড়ে উড়ে ঢাকিছে বদন।
তারার আলোর মতো হাসিগুলি আসে কত,
আধো-খোলা অধরেতে তার
চুমো খেয়ে যায় কত বার।

সারা রাত স্নেহসুখে তারাগুলি চায় মুখে,
যেন তারা করে গলাগলি,
কত কী যে করে বলাবলি !
যেন তারা আঁচলেতে আঁধারে আলোতে গেঁথে
হাসিমাখা সুখের স্বপন
ধীরে ধীরে স্নেহভরে শিশুর প্রাণের 'পরে
একে একে করে বরিষন।
কাল যবে রবিকরে কাননেতে থরে থরে
ফুটে ফুটে উঠিবে কুসুম,
ওদেরো নয়নগুলি ফুটিয়া উঠিবে খুলি,
কোথায় মিলায়ে যাবে ঘুম।
প্রভাতের আলো জাগি যেন খেলাবার লাগি
ওদের জাগায়ে দিতে চায়,
আলোতে ছেলেতে ফুলে একসাথে আঁখি খুলে
প্রভাতে পাখিতে গান গায়।

বিদায়

সে যখন বিদায় নিয়ে গেল,
তখন নবমীর চাঁদ অস্তাচলে যায়।
গভীর রাতি নিঝুম চারি দিক,
আকাশেতে তারা অনিমিখ,
ধরণী নীরবে ঘুমায়।

হাত দুটি তার ধরে দুই হাতে
মুখের পানে চেয়ে সে রহিল,
কাননে বকুল-তরুতলে
একটিও সে কথা না কহিল।

অধরে প্রাণের মলিন ছায়া,
চোখের জলে মলিন চাঁদের আলো,
যাবার বেলা দুটি কথা ব'লে
বনপথ দিয়ে সে চলে গেল।
ঘন গাছের পাতার মাঝে আঁধার পাখি গুটিয়ে পাখা,
তারি উপর চাঁদের আলো শুয়েছে,
ছায়াগুলি এলিয়ে দেহ আঁচলখানি পেতে যেন
গাছের তলায় ঘুমিয়ে রয়েছে।
গভীর রাতে বাতাসটি নেই— নিশীথে সরসীর জলে
কাঁপে না বনের কালো ছায়া,
ঘুম যেন ঘোমটা-পরা বসে আছে ঝোপে-ঝাপে,
পড়ছে বসে কী যেন এক মায়া।

চুপ ক'রে হেলে সে বকুলগাছে,
রমণী একেলা দাঁড়ায়ে আছে।
এলোখেলো চুলের মাঝে বিষাদমাখা সে মুখখানি,
চাঁদের আলো পড়েছে তার 'পরে।
পথের পানে চেয়ে ছিল, পথের পানেই চেয়ে আছে,
পলক নাহি তিলেক কালের তরে।
গেল রে কে চলে গেল, ধীরে ধীরে চলে গেল,
কী কথা সে বলে গেল হায়,
অতিদূর অশথের ছায়ে মিশায়ে কে গেল রে,
রমণী দাঁড়ায়ে জোছনায়।
সীমাহীন জগতের মাঝে আশা তার হারায়ে গেল,
আজি এই গভীর নিশীথে,
শূন্য অন্ধকারখানি মলিন মুখশ্রী নিয়ে
দাঁড়িয়ে রহিল এক ভিতে।

পশ্চিমের আকাশসীমায়
চাঁদখানি অস্তে যায় যায়।

ছোটো ছোটো মেঘগুলি সাদা সাদা পাখা তুলি
চলে যায় চাঁদের চুমো নিয়ে,
আঁধার গাছের ছায় ফুটু ফুটু জোছনায়
ম্লানমুখী রমণী দাঁড়িয়ে।

সুখের স্মৃতি

চেয়ে আছে আকাশের পানে
জোছনায় আঁচলটি পেতে,
যত আলো ছিল সে চাঁদের
সব যেন পড়েছে মুখেতে।
মুখে যেন গলে পড়ে চাঁদ,
চোখে যেন পড়িছে ঘুমিয়ে,
সুকোমল শিথিল আঁচলে
পড়ে আছে আরামে চুমিয়ে।
একটি মৃণাল-করে মাথা,
আরেকটি পড়ে আছে বুকে,
বাতাসটি বহে দিয়ে গায়
শিহরি উঠিছে অতি সুখে।
হেলে হেলে দুয়ে দুয়ে লতা
বাতাসেতে গায়ে এসে পড়ে,
বিস্ময়ে মুখের পানে চেয়ে
ফুলগুলি দুলে দুলে নড়ে।
অতি দূরে বাজে ধীরে বাঁশি,
অতি সুখে পরান উদাসী,
অধরেতে স্খলিতচরণা
মৃদুহিল্লোলময়ী হাসি।

কে যেন রে চুমো খেয়ে তারে
　　চলে গেছে এই কিছু আগে ;
চুমোটিরে বাঁধি ফুলহারে
অধরেতে হাসির মাঝারে,
চুমোতে চাঁদের চুমো দিয়ে
　　রেখেছে রে যতনে সোহাগে।
তাই সেই চুমোটিরে ঘিরে
　　হাসিগুলি সারা রাত জাগে।
কে যেন রে বসে তার কাছে
গুন গুন করে বলে গেছে
　　মধুমাখা বাণী কানে কানে।
পরানের কুসুমকারায়
কথাগুলি উড়িয়ে বেড়ায়,
　　বাহিরিতে পথ নাহি জানে।
অতি দূর বাঁশরির গানে
　　সে বাণী জড়িয়ে যেন গেছে,
অবিরত স্বপনের মতো
　　ঘুরিয়ে বেড়ায় কাছে কাছে।
মুখে নিয়ে সেই কথা ক'টি
খেলা করে উলটি পালটি,
আপনি আপন বাণী শুনে
　　শরমে সুখেতে হয় সারা।
কার মুখ পড়ে তার মনে,
কার হাসি লাগিছে নয়নে,
স্মৃতির মধুর ফুলবনে
　　কোথায় হয়েছে পথহারা !
চেয়ে তাই সুনীল আকাশে
মুখেতে চাঁদের আলো ভাসে,
অবসান-গান আশেপাশে
　　ভ্রমে যেন ভ্রমরের পারা।

যোগী

পশ্চিমে ডুবেছে ইন্দু, সম্মুখে উদার সিন্ধু,
শিরোপরি অনন্ত আকাশ,
লম্বমান জটাজূটে যোগিবর করপুটে
দেখিছেন সূর্যের প্রকাশ।
উলঙ্গ সুদীর্ঘকায়, বিশাল ললাট ভায়,
মুখে তাঁর শান্তির বিকাশ।
শূন্যে আঁখি চেয়ে আছে, উদার বুকের কাছে
খেলা করে সমুদ্র-বাতাস।
চৌদিকে দিগন্তমুক্ত, বিশ্বচরাচর সুপ্ত,
তারি মাঝে যোগী মহাকায়।
ভয়ে ভয়ে ঢেউগুলি নিয়ে যায় পদধূলি,
ধীরে আসে, ধীরে চলে যায়।
মহা স্তব্ধ সব ঠাঁই, বিশ্বে আর শব্দ নাই
কেবল সিন্ধুর মহাতান—
যেন সিন্ধু ভক্তিভরে জলদগম্ভীর স্বরে
তপনের করে স্তবগান।
আজি সমুদ্রের কূলে, নীরবে সমুদ্র তুলে
হৃদয়ের অতল গভীরে।
অনন্ত সে পারাবার ডুবাইছে চারি ধার,
ঢেউ লাগে জগতের তীরে।

যোগী যেন চিত্রে লিখা— উঠিছে রবির শিখা
মুখে তারি পড়িছে কিরণ,
পশ্চাতে ব্যাপিয়া দিশি তামসী তাপসী নিশি
ধ্যান করে মুদিয়া নয়ন।
শিবের জটার 'পরে যথা সুরধুনী ঝরে
তারাচূর্ণ রজতের স্রোতে,

তেমনি কিরণ লুটে সন্ন্যাসীর জটাজূটে
পুরব-আকাশ-সীমা হতে।
বিমল আলোক হেন ব্রহ্মলোক হতে যেন
ঝরে তাঁর ললাটের কাছে,
মর্তের তামসী নিশি পশ্চাতে যেতেছে মিশি
নীরবে নিস্তব্ধ চেয়ে আছে।
সুদূর সমুদ্রনীরে অসীম আঁধার-তীরে
একটুকু কনকের রেখা,
কী মহা রহস্যময়, সমুদ্রে অরুণোদয়
আভাসের মতো যায় দেখা।
চরাচর ব্যগ্র প্রাণে পুরবের পথপানে
নেহারিছে সমুদ্র অতল—
দেখো চেয়ে মরি মরি, কিরণমৃণাল-'পরি
জ্যোতির্ময় কনককমল।
দেখো চেয়ে দেখো পুবে কিরণে গিয়েছে ডুবে
গগনের উদার ললাট—
সহসা সে ঋষিবর আকাশে তুলিয়া কর
গাহিয়া উঠিল বেদপাঠ।

পাগল

আপন মনে বেড়ায় গান গেয়ে—
গান কেউ শোনে কেউ শোনে না।
ঘুরে বেড়ায় জগৎ-পানে চেয়ে—
তারে কেউ দেখে কেউ দেখে না।
সে যেন গানের মতো প্রাণের মতো শুধু
সৌরভের মতো উড়ছে বাতাসেতে,
আপনারে আপনি সে জানে না,
তবু আপনাতে আপনি আছে মেতে।

হরষে তার পুলকিত গা,
ভাবের ভরে টলমল পা,
কে জানে কোথায় যে সে যায়
আঁখি তার দেখে কি দেখে না।
লতা তার গায়ে পড়ে,
ফুল তার পায়ে পড়ে,
নদীর মুখে কুলু কুলু রা'।
গায়ের কাছে বাতাস করে বা'।
সে শুধু চলে যায়,
মুখে কী বলে যায়,
বাতাস গলে যায় তা শুনে।
সুমুখে আঁখি রেখে
চলেছে কোথা যে কে
কিছু সে নাহি দেখে শোনে।
যেখান দিয়ে যায় সে চলে সেথায় যেন ঢেউ খেলে যায়,
বাতাস যেন আকুল হয়ে ওঠে,
ধরা যেন চরণ ছুঁয়ে শিউরে ওঠে শ্যামল দেহে
লতায় যেন কুসুম ফোটে ফোটে।
বসন্ত তার সাড়া পেয়ে সখা ব'লে আসে ধেয়ে,
বনে যেন দুইটি বসন্ত।
দুই সখাতে ভেসে চলে যৌবনসাগরের জলে,
কোথাও যেন নাহি রে তার অন্ত।
আকাশ বলে 'এস এস', কানন বলে 'বোসো বোসো',
সবাই যেন নাম ধরে তার ডাকে।
হেসে যখন কয় সে কথা মূর্ছা যায় রে বনের লতা,
লুটিয়ে ভুঁয়ে চুপ করে সে থাকে।
বনের হরিণ কাছে আসে— সাথে সাথে ফিরে পাশে,
স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায় দেহছায়।
পায়ের কাছে পড়ে লুটি, বড়ো বড়ো নয়ন দুটি
তুলে তুলে মুখের পানে চায়।

আপনা-ভোলা সরল হাসি ঝরে পড়ছে রাশি রাশি,
আপনি যেন জানতে নাহি পায়।
লতা তারে আটকে রেখে তারি কাছে হাসতে শেখে,
হাসি যেন কুসুম হয়ে যায়।
গান গায় সে সাঁঝের বেলা, মেঘগুলি তাই ভুলে খেলা
নেমে আসতে চায় রে ধরাপানে,
একে একে সাঁঝের তারা গান শুনে তার অবাক-পারা
আর সবারে ডেকে ডেকে আনে।
আপনি মাতে আপন স্বরে, আর সবারে পাগল করে,
সাথে সাথে সবাই গাহে গান—
জগতের যা কিছু আছে সব ফেলে দেয় পায়ের কাছে,
প্রাণের কাছে খুলে দেয় সে প্রাণ।

তোরাই শুধু শুনলি নে রে, কোথায় বসে রইলি যে রে,
দ্বারের কাছে গেল গেয়ে গেয়ে,
কেউ তাহারে দেখলি নে তো চেয়ে।
গাইতে গাইতে চলে গেল, কত দূর সে চলে গেল,
গানগুলি তার হারিয়ে গেল বনে,
দুয়ার দেওয়া তোদের পাষাণ মনে।

মাতাল

বুঝি রে,
চাঁদের কিরণ পান করে ওর ঢুলুঢুলু দুটি আঁখি
কাছে ওর যেয়ো না,
কথাটি শুধায়ো না,
ফুলের গন্ধে মাতাল হয়ে বসে আছে একাকী।

ঘুমের মতো মেয়েগুলি
চোখের কাছে দুলি দুলি
বেড়ায় শুধু নূপুর রনরনি।
আধেক মুদি আঁখির পাতা,
কার সাথে যে কচ্ছে কথা,
শুনছে কাহার মৃদু মধুর ধ্বনি।
অতি সুদূর পরীর দেশে—
সেখান থেকে বাতাস এসে
কানের কাছে কাহিনী শুনায়।
কত কী যে মোহের মায়া,
কত কী যে আলোক ছায়া,
প্রাণের কাছে স্বপন ঘনায়।
কাছে ওর যেয়ো না,
কথাটি শুধায়ো না,
ঘুমের মেয়ে তরাস পেয়ে যাবে,
মৃদু প্রাণে প্রমাদ গনি
নূপুরগুলি রনরনি
চাঁদের আলোয় কোথায় কে লুকাবে।

চলো দূরে নদীর তীরে,
বসে সেথায় ধীরে ধীরে
একটি শুধু বাঁশরি বাজাও।
আকাশেতে হাসবে বিধু,
মধু কণ্ঠে মৃদু মৃদু
একটি শুধু সুখেরই গান গাও।
দূর হতে আসিয়া কানে
পশিবে সে প্রাণের প্রাণে
স্বপনেতে স্বপন ঢালিয়ে।

ছায়াময়ী মেয়েগুলি
গানের স্রোতে দুলি দুলি,
বসে রবে গালে হাত দিয়ে।
গাহিতে গাহিতে তুমি বালা
গেঁথে রাখো মালতীর মালা।
ও যখন ঘুমাইবে, গলায় পরায়ে দিবে
স্বপনে মিশিবে ফুলবাস।
ঘুমন্ত মুখের 'পরে চেয়ে থেকো প্রেমভরে
মুখেতে ফুটিবে মৃদু হাস।

বাদল

একলা ঘরে বসে আছি, কেউ নেই কাছে,
সারাটা দিন মেঘ করে আছে।
সারাদিন বাদল হল,
সারাদিন বৃষ্টি পড়ে,
সারাদিন বইছে বাদল-বায়!
মেঘের ঘটা আকাশভরা,
চারি দিকে আঁধার-করা,
তড়িৎ-রেখা ঝলক মেরে যায়।
শ্যামল বনের শ্যামল শিরে
মেঘের ছায়া নেমেছে রে,
মেঘের ছায়া কুঁড়েঘরের 'পরে,
ভাঙাচোরা পথের ধারে
ঘন বাঁশের বনের ধারে
মেঘের ছায়া ঘনিয়ে যেন ধরে।

বিজন ঘরে বাতায়নে
সারাটা দিন আপন মনে
বসে বসে বাইরে চেয়ে দেখি,

টুপুটুপু বৃষ্টি পড়ে,
পাতা হতে পাতায় ঝরে,
ডালে বসে ভেজে একটি পাখি।
তাল-পুকুরে জলের 'পরে
বৃষ্টিবারি নেচে বেড়ায়,
ছেলেরা মেতে বেড়ায় জলে,
মেয়েগুলি কলসী নিয়ে
চলে আসে পথ দিয়ে,
আঁধারভরা গাছের তলে তলে!

কে জানে কী মনেতে আশ,
উঠছে ধীরে দীর্ঘনিশাস,
বায়ু উঠে শ্বসিয়া শ্বসিয়া।
ডালপালা হাহা ক'রে
বৃষ্টিবিন্দু ঝরে পড়ে
পাতা পড়ে খসিয়া খসিয়া।

আর্তস্বর

শ্রাবণে গভীর নিশি দিগ্বিদিক আছে মিশি
মেঘেতে মেঘেতে ঘন বাঁধা,
কোথা শশী কোথা তারা মেঘারণ্যে পথহারা
আঁধারে আঁধারে সব আঁধা।
জলন্ত বিদ্যুৎ-অহি ক্ষণে ক্ষণে রহি রহি
অন্ধকারে করিছে দংশন।
কুম্ভকর্ণ অন্ধকার নিদ্রা টুটি বার বার
উঠিতেছে করিয়া গর্জন।
শূন্যে যেন স্থান নাই, পরিপূর্ণ সব ঠাঁই,
সুকঠিন আঁধার চাপিয়া।

ঝড় বহে মনে হয়, ও যেন রে ঝড় নয়,
অন্ধকার দুলিছে কাঁপিয়া।
মাঝে মাঝে থরহর কোথা হতে মরমর
কেঁদে কেঁদে উঠিছে অরণ্য।
নিশীথসমুদ্র-মাঝে জলজন্তুসম রাজে
নিশাচর যেন রে অগণ্য।
কে যেন রে মুহুর্মুহু নিশ্বাস ফেলিছে হু হু,
হু হু করে কেঁদে কেঁদে ওঠে,
সুদূর অরণ্যতলে ডালপালা পায়ে দ'লে
আর্তনাদ ক'রে যেন ছোটে।
এ অনন্ত অন্ধকারে কে রে সে, খুঁজিছে কারে,
তন্ন তন্ন আকাশ গহ্বর।
তারে নাহি দেখে কেহ শুধু শিহরায় দেহ
শুনি তার তীব্র কণ্ঠস্বর।
তুই কি রে নিশীথিনী অন্ধকারে অনাথিনী
হারাইলি জগতেরে তোর?
অনন্ত আকাশ-'পরি ছুটিস রে হাহা করি,
আলোড়িয়া অন্ধকার ঘোর।
তাই কি রে থেকে থেকে নাম ধরে ডেকে ডেকে
জগতেরে করিস আহ্বান।
শুনি আজি তোর স্বর শিহরিত কলেবর
কাঁদিয়া উঠিছে কার প্রাণ।
কে আজি রে তোর সাথে ধরি তোর হাতে হাতে
খুঁজিতে চাহিছে যেন কারে।
মহাশূন্যে দাঁড়াইয়ে প্রান্ত হতে প্রান্তে গিয়ে
কে চাহে কাঁদিতে অন্ধকারে!
আঁধারেতে আঁখি ফুটে ঝটিকার 'পরে ছুটে
তীক্ষ্ণশিখা বিদ্যুৎ মাড়ায়ে
হু হু করি নিশ্বাসিয়া চলে যাবে উদাসিয়া
কেশপাশ আকাশে ছড়ায়ে।

উলঙ্গিনী উন্মাদিনী ঝটিকার কণ্ঠ জিনি
তীব্র কণ্ঠে ডাকিবে তাহারে,
সে বিলাপ কেঁপে কেঁপে' বেড়াবে আকাশ ব্যেপে
ধ্বনিয়া অনন্ত অন্ধকারে।
ছিঁড়ি ছিঁড়ি কেশপাশ কভু কান্না কভু হাস
প্রাণ ভ'রে করিবে চীৎকার,
বজ্র-আলিঙ্গন দিয়ে বুকে তোরে জড়াইয়ে
ছুটিতে গিয়েছে সাধ তার।

স্মৃতি-প্রতিমা

আজ কিছু করিব না আর,
সমুখেতে চেয়ে চেয়ে গুন গুন গেয়ে গেয়ে
বসে বসে ভাবি এক বার।
আজি বহু দিন পরে যেন সেই দ্বিপ্রহরে
সেদিনের বায়ু বহে যায়,
হা রে হা শৈশবমায়া, অতীত প্রাণের ছায়া,
এখনো কি আছিস হেথায়?
এখনো কি থেকে থেকে উঠিস রে ডেকে ডেকে,
সাড়া দিবে সে কি আর আছে?
যা ছিল তা আছে সেই, আমি যে সে আমি নেই,
কেন রে আসিস মোর কাছে?
কেন রে পুরানো স্নেহে পরানের শূন্য গেহে
দাঁড়ায়ে মুখের পানে চাস?
অভিমানে ছলছল নয়নে কী কথা বল,
কেঁদে ওঠে হৃদয় উদাস।
আছিল যে আপনার সে বুঝি রে নাই আর,
সে বুঝি রে হয়ে গেছে পর—

তবু সে কেমন আছে শুধাতে আসিস কাছে,
দাঁড়ায়ে কাঁপিস থর্ থর্ ।
আয় রে আয় রে অয়ি, শৈশবের স্মৃতিময়ী,
আয় তোর আপনার দেশে—
যে প্রাণ আছিল তোরি তাহারি দুয়ার ধরি
কেন আজ ভিখারিনী-বেশে !
আগুসরি ধীরি ধীরি বার বার চাস ফিরি,
সংশয়েতে চলে না চরণ—
ভয়ে ভয়ে মুখপানে চাহিস আকুল প্রাণে,
ম্লান মুখে না সরে বচন ।
দেহে যেন নাহি বল, চোখে পড়ে-পড়ে জল,
এলো চুলে, মলিন বসনে—
কথা কেহ বলে পাছে ভয়ে না আসিস কাছে,
চেয়ে র'স আকুল নয়নে ।
সেই ঘর সেই দ্বার মনে পড়ে বার বার
কত যে করিলি খেলাধূলি—
খেলা ফেলে গেলি চলে, কথাটি না গেলি বলে,
অভিমানে নয়ন আকুলি ।
যেথা যা গেছিলি রেখে, ধুলায় গিয়েছে ঢেকে,
দেখ্ রে তেমনি আছে পড়ি—
সেই অশ্রু সেই গান সেই হাসি অভিমান,
ধুলায় যেতেছে গড়াগড়ি ।
তবে রে বারেক আয় ব'স্ হেথা পুনরায়
ধূলিমাখা অতীতের মাঝে—
শূন্য গৃহ জনহীন পড়ে আছে কত দিন,
আর হেথা বাঁশি নাহি বাজে ।
কেন তব আসিবি নে কেন কাছে বসিবি নে
এখনো বাসিস যদি ভালো !
আয় রে ব্যাকুল প্রাণে চাই দুঁহু মুখপানে,
গোধূলিতে নিব-নিব আলো ।

নিবিছে সাঁঝের ভাতি, আসিছে আঁধার রাতি
এখনি ছাইবে চারি ভিতে—
রজনীর অন্ধকারে মরণসাগরপারে
কেহ কারে নারিব দেখিতে।
আকাশের পানে চাই— চন্দ্র নাই, তারা নাই,
একটু না বহিছে বাতাস,
শুধু দীর্ঘ দীর্ঘ নিশি দুজনে আঁধারে মিশি
শুনিব দোঁহার দীর্ঘশ্বাস।
এক বার চেয়ে দেখি কোন্‌খানে আছে যে কী,
কোন্‌খানে করেছিনু খেলা—
শুকানো এ মালাগুলি রাখি রে কণ্ঠেতে তুলি,
কখন চলিয়া যাবে বেলা।
আয় তবে আয় হেথা, কোলে তোর রাখি মাথা,
কেশপাশে মুখ দে রে ঢেকে—
বিন্দু বিন্দু ধীরে ধীরে অশ্রু পড়ে অশ্রুনীরে,
নিশ্বাস উঠিছে থেকে থেকে।
সেই পুরাতন স্নেহে হাতটি বুলাও দেহে,
মাথাটি বুকেতে তুলে রাখি—
কথা কও নাহি কও চোখে চোখে চেয়ে রও,
আঁখিতে ডুবিয়া যাক আঁখি।

আবছায়া

তারা সেই ধীরে ধীরে আসিত,
মৃদু মৃদু হাসিত,
তাদের পড়েছে আজ মনে।
তারা কথাটি কহিত না,
কাছেতে রহিত না,
চেয়ে রইত নয়নে নয়নে।

তারা চলে যেত আনমনে,
বেড়াইত বনে বনে,
আনমনে গাহিত রে গান।
চুল থেকে ঝরে ঝরে
ফুলগুলি যেত পড়ে,
কেশপাশে ঢাকিত বয়ান।
কাছে আমি যাইতাম,
গানগুলি গাইতাম,
সাথে সাথে যাইতাম পিছু—
তারা যেন আনমনা,
শুনিত কি শুনিত না
বুঝিবারে নারিতাম কিছু।
কভু তারা থাকি থাকি
আনমনে শূন্য-আঁখি
চাহিয়া রহিত মুখপানে,
ভালো তারা বাসিত কি,
মৃদু হাসি হাসিত কি,
প্রাণে প্রাণ দিত কি, কে জানে!
গাঁথি ফুলে মালাগুলি
যেন তারা যেত ভুলি
পরাইতে আমার গলায়।
যেন যেতে যেতে ধীরে
চায় তারা ফিরে ফিরে
বকুলের গাছের তলায়।
যেন তারা ভালোবেসে
ডেকে যেত কাছে এসে,
চলে যেতে করিত রে মানা—
আমার তরুণ প্রাণে
তাদের হৃদয়খানি
আধো-জানা আধেক-অজানা।

কোথা চলে গেল তারা,
কোথা যেন পথহারা,
তাদের দেখি নে কেন আর !
কোথা সেই ছায়া-ছায়া
কিশোর-কল্পনা-মায়া,
মেঘমুখে হাসিটি উষার !
আলোতে ছায়াতে ঘেরা
জাগরণ স্বপনেরা
আশেপাশে করিত রে খেলা—
একে একে পলাইল,
শূন্যে যেন মিলাইল,
বাড়িতে লাগিল যত বেলা।

আচ্ছন্ন

লতার লাবণ্য যেন কচি কিশলয়ে ঘেরা,
সুকুমার প্রাণ তার মাধুরীতে ঢেকেছে—
কোমল মুকুলগুলি চারি দিকে আকুলিত
তারি মাঝে প্রাণ যেন লুকিয়ে রেখেছে।
ওরে যেন ভালো করে দেখা যায় না,
আঁখি যেন ডুবে গিয়ে কূল পায় না।
সাঁঝের আভা নেমে এল, জ্যোৎস্না পাশে ঘুমিয়ে প'ল,
ফুলের গন্ধ দেখতে এসেছে,
তারাগুলি ঘিরে বসেছে।
পুরবী রাগিণীগুলি দূর হতে চলে আসে
ছুঁতে তারে হয় নাকো ভরসা—
কাছে কাছে ফিরে ফিরে মুখপানে চায় তারা,
যেন তারা মধুময়ী দুরাশা।

ঘুমন্ত প্রাণেরে ঘিরে স্বপ্নগুলি ঘুরে ফিরে
গাঁথে যেন আলোকের কুয়াশা,
ঢেকে তারে আছে কত, চারি দিকে শত শত
অনিমিষ নয়নের পিয়াসা।
ওদের আড়াল থেকে আবছায়া দেখা যায়
অতুলন প্রাণের বিকাশ,
সোনার মেঘের মাঝে কচি উষা ফোটে ফোটে
পুরবেতে তাহারি আভাস।

আলোকবসনা যেন আপনি সে ঢাকা আছে
আপনার রূপের মাঝার,
রেখা রেখা হাসিগুলি আশেপাশে চমকিয়ে
রূপেতেই লুকায় আবার।
আঁখির আলোকছায়া আঁখিরে রয়েছে ঘিরে,
তারি মাঝে দৃষ্টি পথহারা,
যেথা চলে স্বর্গ হতে অবিরাম পড়ে যেন
লাবণ্যের পুষ্পবারিধারা।
ধরণীরে ছুঁয়ে যেন পা দুখানি ভেসে যায়,
কুসুমের স্রোত বহে যায়,
কুসুমেরে ফেলে রেখে খেলাধুলা ভুলে গিয়ে
মায়ামুগ্ধ বসন্তের বায়।

ওরে কিছু শুধাইলে বুঝি রে নয়ন মেলি
দু দণ্ড নীরবে চেয়ে রবে,
অতুল অধর দুটি ঈষৎ টুটিয়ে বুঝি
অতি ধীরে দুটি কথা কবে।
আমি কি বুঝি সে ভাষা, শুনিতে কি পাব বাণী
সে যেন কিসের প্রতিধ্বনি—
মধুর মোহের মতো যেমনি ছুঁইবে প্রাণ
ঘুমায়ে সে পড়িবে অমনি।

হৃদয়ের দূর হতে সে যেন রে কথা কয়
তাই তার অতি মৃদুস্বর,
বায়ুর হিল্লোলে তাই আকুল কুমুদসম
কথাগুলি কাঁপে থর থর।

কে তুমি গো উষাময়ী, আপন কিরণ দিয়ে
আপনারে করেছ গোপন,
রূপের সাগর-মাঝে কোথা তুমি ডুবে আছ
একাকিনী লক্ষ্মীর মতন !
ধীরে ধীরে ওঠো দেখি, একবার চেয়ে দেখি
স্বর্ণজ্যোতি-কমল আসন,
সুনীল সলিল হতে ধীরে ধীরে উঠে যথা
প্রভাতের বিমল কিরণ।
সৌন্দর্যকোরক টুটে এস গো বাহির হয়ে
অনুপম সৌরভের প্রায়,
আমি তাহে ডুবে যাব সাথে সাথে বহে যাব
উদাসীন বসন্তের বায়।

স্নেহময়ী

হাসিতে ভরিয়ে গেছে হাসিমুখখানি—
প্রভাতে ফুলের বনে দাঁড়ায়ে আপন মনে,
মরি মরি, মুখে নাই বাণী।
প্রভাতকিরণগুলি চৌদিকে যেতেছে খুলি
যেন শুভ্র কমলের দল,
আপন মহিমা লয়ে তারি মাঝে দাঁড়াইয়ে
কে তুই করুণাময়ী বল্।

স্নিগ্ধ ওই দু'নয়ানে চাহিলে মুখের পানে
সুধাময়ী শান্তি প্রাণে জাগে—
শুনি যেন স্নেহবাণী, কোমল ও হাতখানি
প্রাণের গায়েতে যেন লাগে।
তোরে যেন চিনিতাম, তোর কাছে শুনিতাম
কত কী কাহিনী সন্ধেবেলা।
যেন মনে নাই কবে কাছে বসি মোরা সবে
তোর কাছে করিতাম খেলা।
অতি ধীরে তোর পাশে প্রভাতের বায়ু আসে,
যেন ছোটো ভাইটির প্রায়,
যেন তোর স্নেহ পেয়ে তোর মুখপানে চেয়ে
আবার সে খেলাইতে যায়।
অমিয়-মাধুরী মাখি চেয়ে আছে দুটি আঁখি;
জগতের প্রাণ জুড়াইছে—
ফুলেরা আমোদে মেতে হেলে দুলে বাতাসেতে
আঁখি হতে স্নেহ কুড়াইছে।
কী যেন জান গো ভাষা, কী যেন দিতেছ আশা,
আঁখি দিয়ে পরান উথলে—
চারি দিকে ফুলগুলি কচি কচি বাহু তুলি
'কোলে নাও' 'কোলে নাও' বলে।
কারে যেন কাছে ডাক, যেথা তুমি বসে থাক
তার চারি দিকে থাক তুমি—
তোমার আপনা দিয়ে হাসিময়ী শান্তি দিয়ে
পূর্ণ কর চরাচরভূমি।
তোমাতে পুরেছে বন, পূর্ণ হল সমীরণ,
তোমাতে পুরেছে লতাপাতা।
ফুল দূরে থেকে চায়— তোমার পরশ পায়,
লুটায় তোমার কোলে মাথা।
তোমার প্রাণের বিভা চৌদিকে দুলিছে কিবা
প্রভাতের আলোকহিল্লোলে,

আজিকে প্রভাতে এ কি স্নেহের প্রতিমা দেখি
বসে আছ জগতের কোলে !
কেহ মুখে চেয়ে থাকে, কেহ তোরে কাছে ডাকে,
কেহ তোর কোলে খেলা করে।
তুমি শুধু স্তব্ধ হয়ে একটি কথা না কয়ে
চেয়ে আছ আনন্দের ভরে।
ওই-যে তোমার কাছে সকলে দাঁড়ায়ে আছে
ওরা মোর আপনার লোক,
ওরাও আমারি মতো তোর স্নেহে আছে রত
জুঁই বেলা বকুল অশোক।
বড়ো সাধ যায় তোরে ফুল হয়ে থাকি ঘিরে
কাননে ফুলের সাথে মিশে—
নয়নকিরণে তোর ফুলিবে পরান মোর,
সুবাস ছুটিবে দিশে দিশে।
তোমার হাসিটি লয়ে হরষে আকুল হয়ে
খেলা করে প্রভাতের আলো—
হাসিতে আলোটি পড়ে, আলোতে হাসিটি পড়ে,
প্রভাত মধুর হয়ে গেল।
পরশি তোমার কায় মধুর প্রভাতবায়,
মধুময় কুসুমের বাস—
ওই দৃষ্টিসুধা দাও, এই দিক-পানে চাও,
প্রাণে হোক প্রভাতবিকাশ।

রাহুর প্রেম

শুনেছি আমারে ভালো লাগে না,
নাই-বা লাগিল তোর
কঠিন বাঁধনে চরণ বেড়িয়া
চিরকাল তোরে রব আঁকড়িয়া
লৌহশৃঙ্খলের ডোর।
তুই তো আমার বন্দী অভাগিনী
বাঁধিয়াছি কারাগারে,
প্রাণের শৃঙ্খল দিয়েছি প্রাণেতে
দেখি কে খুলিতে পারে।

জগৎ-মাঝারে যেথায় বেড়াবি,
যেথায় বসিবি, যেথায় দাঁড়াবি,
কি বসন্ত শীতে দিবসে নিশীথে
সাথে সাথে তোর থাকিবে বাজিতে
এ পাষাণ প্রাণ অনন্ত শৃঙ্খল
চরণ জড়ায়ে ধ'রে।
এক বার তোরে দেখেছি যখন
কেমনে এড়াবি মোরে।
চাও নাই চাও, ডাক নাই ডাক,
কাছেতে আমার থাক নাই থাক,
যাব সাথে সাথে, রব পায় পায়,
রব গায় গায় মিশি—
এ বিষাদ ঘোর, এ আঁধার মুখ,
হতাশ নিশ্বাস, এই ভাঙা বুক,
ভাঙা বাদ্য-সম বাজিবে কেবল
সাথে সাথে দিবানিশি।

অনন্ত কালের সঙ্গী আমি তোর
আমি যে রে তোর ছায়া—
কিবা সে রোদনে কিবা সে হাসিতে
দেখিতে পাইবি কখনো পাশেতে,
কখনো সমুখে কখনো পশ্চাতে,
আমার আঁধার কায়া।
গভীর নিশীথে একাকী যখন
বসিয়া মলিনপ্রাণে,
চমকি উঠিয়া দেখিবি তরাসে
আমিও রয়েছি বসে তোর পাশে
চেয়ে তোর মুখপানে।
যে দিকেই তুই ফিরাবি বয়ান
সেই দিকে আমি ফিরাব নয়ান,
যে দিকে চাহিবি আকাশে আমার
আঁধার মুরতি আঁকা।
সকলি পড়িবে আমার আড়ালে,
জগৎ পড়িবে ঢাকা।
দুঃস্বপ্নের মতো, দুর্ভাবনাসম,
তোমারে রহিব ঘিরে—
দিবসরজনী এ মুখ দেখিব
তোমার নয়ননীরে।
বিশীর্ণকঙ্কাল চিরভিক্ষাসম
দাঁড়ায়ে সম্মুখে তোর
'দাও দাও' বলে কেবলি ডাকিব,
ফেলিব নয়নলোর।
কেবলি সাধিব, কেবলি কাঁদিব,
কেবলি ফেলিব শ্বাস—
কানের কাছেতে প্রাণের কাছেতে
করিব রে হাহুতাশ!

মোর এক নাম কেবলি বসিয়া
জপিব কানেতে তব,
কাঁটার মতন দিবসরজনী
পায়েতে বিঁধিয়ে রব।
পূর্বজনমের অভিশাপসম
রব আমি কাছে কাছে,
ভাবী জনমের অদৃষ্টের মতো
বেড়াইব পাছে পাছে।
ঢালিয়া আমার প্রাণের আঁধার
বেড়িয়া রাখিব তোর চারি ধার
নিশীথ রচনা করি।
কাছেতে দাঁড়ায়ে প্রেতের মতন
শুধু দুটি প্রাণী করিব যাপন
অনন্ত সে বিভাবরী।
যেন রে অকূল সাগর-মাঝারে
ডুবেছে জগৎ-তরী—
তারি মাঝে শুধু মোরা দুটি প্রাণী
রয়েছি জড়ায়ে তোর বাহুখানি,
যুঝিস ছাড়াতে, ছাড়িব না তবু
সে মহাসমুদ্র 'পরি।
পলে পলে তোর দেহ হয় ক্ষীণ,
পলে পলে তোর বাহু বলহীন,
দুজনে অনন্তে ডুবি নিশিদিন—
তবু আছি তোরে ধরি।
রোগের মতন বাঁধিব তোমারে
নিদারুণ আলিঙ্গনে—
মোর যাতনায় হইবি অধীর,
আমারি অনলে দহিবে শরীর,
অবিরাম শুধু আমি ছাড়া আর
কিছু না রহিবে মনে।

গভীর নিশীথে জাগিয়া উঠিয়া
সহসা দেখিবি কাছে,
আড়ষ্ট কঠিন মৃত দেহ মোর
তোর পাশে শুয়ে আছে।
ঘুমাবি যখন স্বপন দেখিবি,
কেবল দেখিবি মোরে,
এই অনিমেষ তৃষাতুর আঁখি
চাহিয়া দেখিছে তোরে।
নিশীথে বসিয়া থেকে থেকে তুই
শুনিবি আঁধারঘোরে
কোথা হতে এক কাতর উন্মাদ
ডাকে তোর নাম ধ'রে।
সুবিজন পথে চলিতে চলিতে
সহসা সভয় গণি
সাঁঝের আঁধারে শুনিতে পাইবি
আমার হাসির ধ্বনি।

হেরো অন্ধকার মরুময়ী নিশা—
আমার পরান হারায়েছে দিশা,
অনন্ত এ ক্ষুধা অনন্ত এ তৃষা
করিতেছে হাহাকার।
আজিকে যখন পেয়েছি রে তোরে
এ চিরযামিনী ছাড়িব কী করে!
এ ঘোর পিপাসা যুগ-যুগান্তরে
মিটিবে কি কভু আর!
বুকের ভিতরে ছুরির মতন,
মনের মাঝারে বিষের মতন,
রোগের মতন, শোকের মতন
রব আমি অনিবার।

জীবনের পিছে মরণ দাঁড়ায়ে,
আশার পশ্চাতে ভয়—
ডাকিনীর মতো রজনী ভ্রমিছে
চিরদিন ধরে দিবসের পিছে
সমস্ত ধরণীময়।
যেথায় আলোক সেইখানে ছায়া
এই তো নিয়ম ভবে,
ও রূপের কাছে চিরদিন তাই
এ ক্ষুধা জাগিয়া রবে!

মধ্যাহ্নে

হেরো ওই বাড়িতেছে বেলা,
বসে আমি রয়েছি একেলা।
ওই হোথা যায় দেখা, সুদূরে বনের রেখা
মিশেছে আকাশনীলিমায়।
দিক হতে দিগন্তরে মাঠ শুধু ধূ ধূ করে,
বায়ু কোথা বহে চলে যায়।
সুদূর মাঠের পারে গ্রামখানি এক ধারে,
গাছ দিয়ে ছায়া দিয়ে ঘেরা।
কাননের গায়ে যেন ছায়াখানি বুলাইয়া
ভেসে চলে কোথায় মেঘেরা।
মধুর উদাস প্রাণে চাই চারি দিক-পানে,
স্তব্ধ সব ছবির মতন।
সব যেন চারি ধারে অবশ আলসভারে
স্বর্ণময় মায়ায় মগন।
গ্রামখানি, মাঠখানি, উঁচুনিচু পথখানি,
দু-একটি গাছ মাঝে মাঝে
আকাশ-সমুদ্রে-ঘেরা সুবর্ণ দ্বীপের পারা
কোথা যেন সুদূরে বিরাজে।

কনকলাবণ্য লয়ে যেন অভিভূত হয়ে
আপনাতে আপনি ঘুমায়,
নিঝুম পাদপলতা, শ্রান্তকায় নীরবতা
শুয়ে আছে গাছের ছায়ায়।
শুধু অতি মৃদু স্বরে গুন্ গুন্ গান করে
যেন সব ঘুমন্ত ভ্রমর,
যেন মধু খেতে খেতে ঘুমিয়েছে কুসুমেতে
মরিয়া এসেছে কণ্ঠস্বর।
নীল শূন্যে ছবি আঁকা রবির-কিরণ-মাখা,
সেথা যেন বাস করিতেছি।
জীবনের আধখানি যেন ভুলে গেছি আমি,
কোথা যেন ফেলিয়ে এসেছি।
আনমনে ধীরি ধীরি বেড়াতেছি ফিরি ফিরি
ঘুমঘোর ছায়ায় ছায়ায়—
কোথা যাব কোথা যাই সে কথা যে মনে নাই,
ভুলে আছি মধুর মায়ায়।
মধুর বাতাসে আজি যেন রে উঠিছে বাজি
পরানের ঘুমন্ত বীণাটি,
ভালোবাসা আজি কেন সঙ্গীহারা পাখি যেন
বসিয়া গাহিছে একেলাটি।
কে জানে কাহারে চায়, প্রাণ যেন উভরায়,
ডাকে কারে 'এস এস' ব'লে,
কাছে কারে পেতে চায়, সব তারে দিতে চায়,
মাথাটি রাখিতে চায় কোলে।
স্তব্ধ তরুতলে গিয়া পা দুখানি ছড়াইয়া
নিমগন মধুময় মোহে,
আনমনে গান গেয়ে দূর শূন্যপানে চেয়ে
ঘুমায়ে পড়িতে চায় দোঁহে।
দূর মরীচিকা-সম ওই বন-উপবন,
ওরি মাঝে পরান উদাসী—

বিজন বকুলতলে পল্লবের মরমরে
নাম ধরে বাজাইছে বাঁশি।
সে যেন কোথায় আছে সুদূর বনের পাছে
কত নদী-সমুদ্রের পারে,
নিভৃত নির্ঝরতীরে লতায় পাতায় ঘিরে
বসে আছে নিকুঞ্জ-আঁধারে।
সাধ যায় বাঁশি করে বন হতে বনান্তরে
চলে যাই আপনার মনে,
কুসুমিত নদীতীরে বেড়াইব ফিরে ফিরে
কে জানে কাহার অন্বেষণে।
সহসা দেখিব তারে, নিমেষেই একেবারে
প্রাণে প্রাণে হইবে মিলন,
এই মরীচিকাদেশে দুজনে বাসরবেশে
ছায়ারাজ্যে করিব ভ্রমণ।
বাঁধিবে সে বাহুপাশে, চোখে তার স্বপ্ন ভাসে,
মুখে তার হাসির মুকুল—
কে জানে বুকের কাছে আঁচল আছে না আছে,
পিঠেতে পড়েছে এলো চুল।
মুখে আধখানি কথা, চোখে আধখানি কথা,
আধখানি হাসিতে জড়ানো—
দুজনেতে চলে যাই, কে জানে কোথায় যাই,
পদতলে কুসুম ছড়ানো।

বুঝি রে এমনি বেলা ছায়ায় করিত খেলা
তপোবনে ঋষিবালিকারা—
পরিয়া বাকলবাস, মুখেতে বিমল হাস,
বনে বনে বেড়াইত তারা।
হরিণশিশুরা এসে কাছেতে বসিত ঘেঁষে,
মালিনী বহিত পদতলে—

দু-চারি সখীতে মেলি কথা কয় হাসি খেলি
তরুতলে বসি কুতূহলে।
কারো কোলে কারো মাথা, সরল প্রাণের কথা
নিরালায় কহে প্রাণ খুলি—
লুকিয়ে গাছের আড়ে সাধ যায় শুনিবারে
কী কথা কহিছে মেয়েগুলি।
লতার পাতার মাঝে ঘাসের ফুলের মাঝে
হরিণশিশুর সাথে মিলি—
অঙ্গে আভরণ নাই, বাকলবসন পরি
রূপগুলি বেড়াইছে খেলি।

ওই দূর বনছায়া ও যে কী জানে রে মায়া,
ও যেন রে রেখেছে লুকায়ে—
সেই স্নিগ্ধ তপোবন, চিরফুল্ল তরুগণ,
হরিণশাবক তরুছায়ে।
হোথায় মালিনী নদী বহে যেন নিরবধি,
ঋষিকন্যা কুটিরের মাঝে—
কভু বসি তরুতলে স্নেহে তারে ভাই বলে,
ফুলটি ঝরিলে ব্যথা বাজে।
কত ছবি মনে আসে, পরানের আশেপাশে
কল্পনা কত যে করে খেলা—
বাতাস লাগায়ে গায়ে বসিয়া তরুর ছায়ে
কেমন কাটিয়া যায় বেলা।

পূর্ণিমায়

যাই যাই ডুবে যাই—
আরো আরো ডুবে যাই,
বিহ্বল অবশ অচেতন।
কোন্ খানে, কোন্ দূরে,
নিশীথের কোন্ মাঝে,
কোথা হয়ে যাই নিমগন।
হে ধরণী, পদতলে
দিয়ো না দিয়ো না বাধা,
দাও মোরে দাও ছেড়ে দাও—
অনন্ত দিবস-নিশি
এমনি ডুবিতে থাকি,
তোমরা সুদূরে চলে যাও।
এ কী রে উদার জ্যোৎস্না
এ কী রে গভীর নিশি
দিশে দিশে স্তব্ধতা বিস্তারি!
আঁখি দুটি মুদে আমি
কোথা আছি কোথা গেছি
কিছু যেন বুঝিতে না পারি।
দেখি দেখি আরো দেখি,
অসীম উদার শূন্যে
আরো দূরে আরো দূরে যাই—
দেখি আজি এ অনন্তে
আপনা হারায়ে ফেলে
আর যেন খুঁজিয়া না পাই।
তোমরা চাহিয়া থাকো
জোছনা-অমৃত-পানে
বিহ্বল বিলীন তারাগুলি।

অপার দিগন্ত ওগো,
থাকো এ মাথার 'পরে
দুই দিকে দুই পাখা তুলি।

গান নাই, কথা নাই,
শব্দ নাই, স্পর্শ নাই,
নাই ঘুম, নাই জাগরণ—
কোথা কিছু নাহি জাগে,
সর্বাঙ্গে জোছনা লাগে,
সর্বাঙ্গ পুলকে অচেতন।
অসীমে সুনীলে শূন্যে
বিশ্ব কোথা ভেসে গেছে
তারে যেন দেখা নাহি যায়—
নিশীথের মাঝে শুধু
মহান্ একাকী আমি
অতলেতে ডুবি রে কোথায়।
গাও বিশ্ব গাও তুমি
সুদূর অদৃশ্য হতে
গাও তব নাবিকের গান—
শত লক্ষ যাত্রী লয়ে
কোথায় যেতেছ তুমি
তাই ভাবি মুদিয়া নয়ান।
অনন্ত রজনী শুধু
ডুবে যাই নিভে যাই
মরে যাই অসীম মধুরে—
বিন্দু হতে বিন্দু হয়ে
মিশায়ে মিলায়ে যাই
অনন্তের সুদূর সুদূরে।

পোড়ো বাড়ি

চারি দিকে কেহ নাই, একা ভাঙা বাড়ি,
  সন্ধেবেলা ছাদে বসে ডাকিতেছে কাক।
নিবিড় আঁধার, মুখ বাড়ায়ে রয়েছে
  যেথা আছে ভাঙা ভাঙা প্রাচীরের ফাঁক।
পড়েছে সন্ধ্যার ছায়া অশথের গাছে,
  থেকে থেকে শাখা তার উঠিছে নড়িয়া।
ভগ্ন শুষ্ক দীর্ঘ এক দেবদারু তরু
  হেলিয়া ভিত্তির 'পরে রয়েছে পড়িয়া।
আকাশেতে উঠিয়াছে আধখানি চাঁদ,
  তাকায় চাঁদের পানে গৃহের আঁধার।
প্রাঙ্গণে করিয়া মেলা উর্ধ্বমুখ হয়ে
  চন্দ্রালোকে শৃগালেরা করিছে চীৎকার।

শুধাই রে, ওই তোর ঘোর স্তব্ধ ঘরে
  কখনো কি হয়েছিল বিবাহ-উৎসব?
কোনো রজনীতে কি রে ফুল্ল দীপালোকে
  উঠেছিল প্রমোদের নৃত্যগীতরব?
হোথায় কি প্রতিদিন সন্ধ্যা হয়ে এলে
  তরুণীরা সন্ধ্যাদীপ জ্বালাইয়া দিত?
মায়ের কোলেতে শুয়ে চাঁদেরে দেখিয়া
  শিশুটি তুলিয়া হাত ধরিতে চাহিত?
বালকেরা বেড়াত কি কোলাহল করি?
  আঙিনায় খেলিত কি কোনো ভাইবোন?
মিলে মিশে স্নেহে প্রেমে আনন্দে উল্লাসে
    প্রতিদিবসের কাজ হত সমাপন?
কোন্ ঘরে কে ছিল রে! সে কি মনে আছে?
    কোথায় হাসিত বধূ শরমের হাস—

বিরহিণী কোন্ ঘরে কোন্ বাতায়নে
রজনীতে একা বসে ফেলিত নিশ্বাস ?
যেদিন শিয়রে তোর অশথের গাছ
নিশীথের বাতাসেতে করে মর্ মর্,
ভাঙা জানালার কাছে পশে অতি ধীরে
জাহ্নবীর তরঙ্গের দূর কলস্বর—
সে রাত্রে কি তাদের আবার পড়ে মনে
সেই সব ছেলেদের সেই কচি মুখ—
কত স্নেহময়ী মাতা তরুণ তরুণী
কত নিমেষের কত ক্ষুদ্র সুখ-দুখ ?
মনে পড়ে সেই সব হাসি আর গান—
মনে পড়ে— কোথা তারা, সব অবসান !

অভিমানিনী

ও আমার অভিমানী মেয়ে
ওরে কেউ কিছু বোলো না।
ও আমার কাছে এসেছে,
ও আমায় ভালো বেসেছে,
ওরে কেউ কিছু বোলো না।

এলোথেলো চুলগুলি ছড়িয়ে
ওই দেখো সে দাঁড়িয়ে রয়েছে,
নিমেষহারা আঁখির পাতা দুটি
চোখের জলে ভরে এয়েছে।
গ্রীবাখানি ঈষৎ বাঁকানো,
দুটি হাতে মুঠি আছে চাপি,
ছোটো ছোটো রাঙা রাঙা ঠোঁট
ফুলে ফুলে উঠিতেছে কাঁপি।

সাধিলে ও কথা কবে না,
ডাকিলে ও আসিবে না কাছে,
ও সবার 'পরে অভিমান করে
আপ্‌না নিয়ে দাঁড়িয়ে শুধু আছে।

কী হয়েছে কী হয়েছে বলে
বাতাস এসে চুলগুলি দোলায়,
রাঙা ওই কপোলখানিতে
রবির হাসি হেসে চুমো খায়।
কচি হাতে ফুল দুখানি ছিল,
রাগ করে ঐ ফেলে দিয়েছে—
পায়ের কাছে পড়ে পড়ে তারা
মুখের পানে চেয়ে রয়েছে।
আয় বাছা, তুই কোলে ব'সে বল্‌
কী কথা তোর বলিবার আছে,
অভিমানে রাঙা মুখখানি
আন্‌ দেখি তুই এ বুকের কাছে।
ধীরে ধীরে আধো আধো বল্‌
কেঁদে কেঁদে ভাঙা ভাঙা কথা,
আমায় যদি না বলিবি তুই
কে শুনিবে শিশুপ্রাণের ব্যথা।

নিশীথজগৎ

জন্মেছি নিশীথে আমি, তারার আলোকে
রয়েছি বসিয়া।
চারি দিকে নিশীথিনী মাঝে মাঝে হু হু করি
উঠিছে শ্বসিয়া।

পশ্চিমে করেছে মেঘ, নিবিড় মেঘের প্রান্তে
স্ফুরিছে দামিনী,
দুঃস্বপ্ন ভাঙিয়া যেন শিহরি মেলিছে আঁখি
চকিত যামিনী।
আঁধারে অরণ্যভূমি নয়ন মুদিয়া
করিতেছে ধ্যান,
অসীম আঁধার নিশা আপনার পানে চেয়ে
হারায়েছে জ্ঞান।
মাথার উপর দিয়া উড়িছে বাদুড়,
কাঁদিছে পেচক—
একেলা রয়েছি বসি, চেয়ে শূন্যপানে
না পড়ে পলক।

আঁধারের প্রাণী যত ভূমিতলে হাত দিয়া
ঘুরিয়া বেড়ায়—
চোখে উড়ে পড়ে ধুলা, কোন্‌খানে কী যে আছে
দেখিতে না পায়।
চরণে বাধিছে বাধা, পাষাণে বাজিছে মাথা,
কাঁদিছে বসিয়া—
অগ্নিহাসি উপহাসি উল্কা অভিশাপশিখা
পড়িছে খসিয়া।
তাদের মাথার 'পরে সীমাহীন অন্ধকার
স্তব্ধ গগনেতে,
আঁধারের ভারে যেন নুইয়া পড়িছে মাথা
মাটির পানেতে।
নড়িলে গাছের পাতা চকিতে চমকি উঠে,
চায় চারি ধারে—
ঘোর আঁধারের মাঝে কোথা কী লুকায়ে আছে
কে বলিতে পারে।

গহন বনের মাঝে চলিয়াছে শিশু
মার হাত ধরে,
মুহূর্ত ছেড়েছে হাত, পড়েছে পিছায়ে
খেলাবার তরে—
অমনি হারায়ে পথ কেঁদে ওঠে শিশু,
ডাকে "মা মা" বলে—
"আয় মা, আয় মা, আয়, কোথা চলে গেলি,
মোরে নে মা কোলে।"
মা অমনি চমকিয়া "বাছা বাছা" বলে ছোটে,
দেখিতে না পায়—
শুধু সেই অন্ধকারে "মা মা" ধ্বনি পশে কানে,
চারি দিকে চায়।

সহসা সমুখ দিয়া কে গেল ছায়ার মতো,
লাগিল তরাস,
কে জানে সহসা যেন কোথা কোন্ দিক হতে
শুনি দীর্ঘশ্বাস।
কে বসে রয়েছে পাশে ? কে ছুঁইল দেহ মোর
হিমহস্তে তার ?
ও কী ও ? এ কী রে শুনি ! কোথা হতে উঠিল রে
ঘোর হাহাকার ?
ও কী হোথা দেখা যায়— ওই দূরে অতি দূরে
ও কিসের আলো ?
ও কী ও উড়িছে শূন্যে দীর্ঘ নিশাচর পাখি ?
মেঘ কালো কালো ?

এই আঁধারের মাঝে কত-না অদৃশ্য প্রাণী
কাঁদিছে বসিয়া—
নীরবে টুটিছে প্রাণ, চাহিছে তারার পানে
অরণ্যে পশিয়া।

কেহ বা রয়েছে শুয়ে দগ্ধ হৃদয়ের 'পরে
স্মৃতিরে জড়ায়ে—
কেহ না দেখিছে তারে, অন্ধকারে অশ্রুধারা
পড়িছে গড়ায়ে।
কেহ বা শুনিছে সাড়া, ঊর্ধ্বকণ্ঠে নাম ধরে
ডাকিছে মরণে—
পশিয়া হৃদয়মাঝে আশার অঙ্কুরগুলি
দলিছে চরণে।
ও দিকে আকাশ-'পরে মাঝে মাঝে থেকে থেকে
উঠে অট্টহাস,
ঘন ঘন করতালি, উনমাদ কণ্ঠস্বরে
কাঁপিছে আকাশ।
জ্বালিয়া মশাল-আলো নাচিছে গাইছে তারা,
ক্ষণিক উল্লাস—
আঁধারমুহূর্ত-তরে হাসে যথা প্রাণপণে
আলেয়ার হাস।

অরণ্যের প্রান্তভাগে নদী এক চলিয়াছে
বাঁকিয়া বাঁকিয়া—
স্তব্ধ জল, শব্দ নাই, ফণীসম ফুঁসি উঠে
থাকিয়া থাকিয়া।
আঁধারে চলিতে পান্থ দেখিতে না পায় কিছু
জলে গিয়া পড়ে,
মুহূর্তের হাহাকার মুহূর্তে ভাসিয়া যায়
খরস্রোতভরে।
সখা তার তীরে বসি একেলা কাঁদিতে থাকে,
ডাকে ঊর্ধ্বশ্বাসে—
কাহারো না পেয়ে সাড়া শূন্যপ্রাণ প্রতিধ্বনি
কেঁদে ফিরে আসে।

নিশীথের কারাগারে কে বেঁধে রেখেছে মোরে
রয়েছি পড়িয়া—
কেবল রয়েছি বেঁচে স্বপন কুড়ায়ে লয়ে
ভাঙিয়া গড়িয়া।
আঁধারে নিজের পানে চেয়ে দেখি, ভালো করে
দেখিতে না পাই—
হৃদয়ে অজানা দেশে পাখি গায়, ফুল ফোটে,
পথ জানি নাই।
অন্ধকারে আপনারে দেখিতে না পাই যত
তত ভালোবাসি,
তত তারে বুকে করে বাহুতে বাঁধিয়া লয়ে
হরষেতে ভাসি।
তত যেন মনে হয় পাছে রে চলিতে পথে
তৃণ ফুটে পায়,
যতনের ধন পাছে চমকি কাঁদিয়া ওঠে
কুসুমের ঘায়!
সদা হয় অবিশ্বাস কারেও চিনি না হেথা,
সবি অনুমান,
ভালোবেসে কাছে গেলে দূরে চলে যায় সবে,
ভয়ে কাঁপে প্রাণ।
গোপনেতে অশ্রু ফেলে মুছে ফেলে, পাছে কেহ
দেখিবারে পায়—
মরমের দীর্ঘশ্বাস মরমে রুধিয়া রাখে,
পাছে শোনা যায়।
সখারে কাঁদিয়া বলে— "বড়ো সাধ যায় সখা,
দেখি ভালো করে!
তুই শৈশবের বঁধু, চিরজন্ম কেটে গেল
দেখিনু না তোরে!
বুঝি তুমি দূরে আছ, একবার কাছে এসে
দেখাও তোমায়।"

সে অমনি কেঁদে বলে— "আপনারে দেখি নাই
কী দেখাব হায়।"

অন্ধকার ভাগ করি, আঁধারের রাজ্য লয়ে
চলিছে বিবাদ।
সখারে বধিছে সখা, সন্তানে হানিছে পিতা—
ঘোর পরমাদ।
মৃতদেহ পড়ে থাকে, শকুনি বিবাদ করে
কাছে ঘুরে ঘুরে।
মাংস লয়ে টানাটানি, করিতেছে হানাহানি
শৃগালে কুকুরে।
অন্ধকার ভেদ করি অহরহ শুনা যায়
আকুল বিলাপ—
আহতের আর্তস্বর, হিংসার উল্লাসধ্বনি,
ঘোর অভিশাপ।
মাঝে মাঝে থেকে থেকে কোথা হতে ভেসে আসে
ফুলের সুবাস—
প্রাণ যেন কেঁদে ওঠে, অশ্রুজলে ভাসে আঁখি,
উঠে রে নিশ্বাস।
চারি দিক ভুলে যাই, প্রাণে যেন জেগে ওঠে
স্বপন-আবেশ—
কোথা রে ফুটেছে ফুল, আঁধারের কোন্ তীরে
কোথা কোন্ দেশ!

রুদ্ধপ্রাণ ক্ষুদ্র প্রাণী, রুদ্ধ প্রাণীদের সাথে
কত রে রহিব—
ছোটো ছোটো সুখ দুখ ছোটো ছোটো আশাগুলি
পুষিয়া রাখিব!

নিদ্রাহীন আঁখি মেলি পুরব-আকাশ-পানে
রয়েছি চাহিয়া—
কবে রে প্রভাত হবে, আনন্দে বিহঙ্গগুলি
উঠিবে গাহিয়া।

ওই যে পুরবে হেরি অরুণকিরণে সাজে
মেঘমরীচিকা।
না রে না, কিছুই নয়— পুরবশ্মশানে উঠে
চিতানলশিখা।

নিশীথচেতনা

স্তব্ধ বাদুড়ের মতো জড়ায়ে অযুত শাখা
দলে দলে অন্ধকার ঘুমায় মুদিয়া পাখা।
মাঝে মাঝে পা টিপিয়া বহিছে নিশীথবায়,
গাছে নড়ে ওঠে পাতা, শব্দটুকু শোনা যায়।

আকাশের পানে চেয়ে জাগিয়া রয়েছি বসি,
মাঝে মাঝে দু-একটি তারা পড়িতেছে খসি।
ঘুমাইছে পশুপাখি, বসুন্ধরা অচেতনা—
শুধু এবে দলে দলে আঁধারের তলে তলে
আকাশ করিয়া পূর্ণ স্বপ্ন করে আনাগোনা।

স্বপ্ন করে আনাগোনা! কোথা দিয়ে আসে যায়!
আঁধার আকাশ-মাঝে আঁখি চারি দিকে চায়।
মনে হয় আসিতেছে শত স্বপ্ননিশাচরী
আকাশের পার হতে, আঁধার ফেলিছে ভরি।

চারি দিকে ভাসিতেছে চারি দিকে হাসিতেছে,
এ উহারে ডাকিতেছে আকাশের পানে চেয়ে—
বলিতেছে, “আয় বোন, আয় তোরা আয় ধেয়ে।”
হাতে হাতে ধরি ধরি নাচে যত সহচরী,
চমকি ছুটিয়া যায় চপলা মায়ার মেয়ে।
যেন মোর কাছ দিয়ে এই তারা গেল চলে
কেহ বা মাথায় মোর, কেহ বা আমার কোলে।
কেহ বা মারিছে উঁকি হৃদয়-মাঝারে পশি,
আঁখির পাতার ’পরে কেহ বা ছুলিছে বসি।
মাথার উপর দিয়া কেহ বা উড়িয়া যায়,
নয়নের পানে মোর কেহ বা ফিরিয়া চায়।
এখনি শুনিব যেন অতি মৃদু পদধ্বনি,
ছোটো ছোটো নূপুরের অতিমৃদু রনরনি।
রয়েছি চকিত হয়ে আঁখির নিমেষ ভুলি—
এখনি দেখিব যেন স্বপ্নমুখী ছায়াগুলি।

অয়ি স্বপ্নমোহময়ী, দেখা দাও একবার।
কোথা দিয়ে আসিতেছ, কোথা দিয়ে চলিতেছ,
কোথা গিয়ে পশিতেছ বড়ো সাধ দেখিবার।
আঁধার পরানে পশি সারা রাত করি খেলা
কোন্‌খেনে কোন্‌ দেশে পালাও সকালবেলা!
অরুণের মুখ দেখে কেন এত হয় লাজ—
সারা দিন কোথা বসে না জানি কী কর কাজ।
ঘুম-ঘুম আঁখি মেলি তোমরা স্বপনবালা,
নন্দনের ছায়ে বসি শুধু বুঝি গাঁথ মালা।
শুধু বুঝি গুন্‌ গুন্‌ গুন্‌ গুন্‌ গান কর,
আপনার গান শুনে আপনি ঘুমায়ে পড়।
আজি এই রজনীতে অচেতন চারি ধার—
এই আবরণ ঘোর ভেদ করি মন মোর
স্বপনের রাজ্যমাঝে দাঁড়া দেখি একবার।

নিদ্রার সাগরজলে মহা-আঁধারের তলে
চারি দিকে প্রসারিত এ কী এ নূতন দেশ—
একত্রে স্বরগ-মর্ত, নাহিকো দিকের শেষ।
কী যে যায় কী যে আসে চারি দিকে আশেপাশে—
কেহ কাঁদে কেহ হাসে, কেহ থাকে কেহ যায়!
মিশিতেছে, ফুটিতেছে, গড়িতেছে, টুটিতেছে,
অবিশ্রাম লুকাচুরি— আঁখি না সন্ধান পায়।
কত আলো কত ছায়া, কত আশা কত মায়া,
কত ভয় কত শোক, কত কী যে কোলাহল—
কত পশু কত পাখি, কত মানুষের দল।

উপরেতে চেয়ে দেখো কী প্রশান্ত বিভাবরী—
নিশ্বাস পড়ে না, যেন জগৎ রয়েছে মরি।
একবার করো মনে আঁধারের সংগোপনে
কী গভীর কলরব, চেতনার ছেলেখেলা,
সমস্ত জগৎ ব্যেপে স্বপনের মহামেলা।
মনে মনে ভাবি তাই এও কি নহে রে ভাই,
চৌদিকে যা কিছু দেখি জাগিয়া সকালবেলা,
এও কি নহে রে শুধু চেতনার ছেলেখেলা!

স্বপ্ন, তুমি এস কাছে, মোর মুখপানে চাও,
তোমার পাখার 'পরে মোরে তুলে লয়ে যাও।
হৃদয়ের দ্বারে দ্বারে ভ্রমি মোরা সারা নিশি
প্রাণে প্রাণে খেলাইয়া প্রভাতে যাইব মিশি।
ওই-যে মায়ের কোলে মেয়েটি ঘুমায়ে আছে,
একবার নিয়ে যাও ওদের প্রাণের কাছে।
দেখিব কোমল প্রাণে সুখের প্রভাতহাসি
সুধায় ভরিয়া প্রাণ কেমনে বেড়ায় ভাসি।

ওই-যে প্রেমিক দুটি কুসুমকাননে শুয়ে
ঘুমাইছে মুখে মুখে চরণে চরণ থুয়ে,
ওদের প্রাণের ছায়ে বসিতে গিয়েছে সাধ—
মায়া করি ঘটাইব বিরহের পরমাদ।
ঘুমন্ত আঁখির কোণে দেখা দিবে আঁখিজল,
বিরহবিলাপগানে ছাইবে মরমতল।
সহসা উঠিবে জাগি, চমকি শিহরি কাঁপি
দ্বিগুণ আদরে পুন বুকেতে ধরিবে চাপি।
ছোটো দুটি শিশু ভাই ঘুমাইছে গলাগলি,
তাদের হৃদয়-মাঝে আমরা যাইব চলি।
কুসুমকোমল হিয়া কভু বা দুলিবে ভয়ে,
রবির কিরণে কভু হাসিবে আকুল হয়ে।

আমি যদি হইতাম স্বপনবাসনাময়
কত বেশ ধরিতাম, কত দেশ ভ্রমিতাম,
বেড়াতেম সাঁতারিয়া ঘুমের সাগরময়।
নীরব চন্দ্রমা-তারা, নীরব আকাশ-ধরা—
আমি শুধু চুপি চুপি ভ্রমিতাম বিশ্বময়।
প্রাণে প্রাণে রচিতাম কত আশা কত ভয়—
এমন করুণ কথা প্রাণে আসিতাম কয়ে,
প্রভাতে পুরবে চাহি ভাবিত তাহাই লয়ে।
জাগিয়া দেখিত যারে বুকেতে ধরিত তারে,
যতনে মুছায়ে দিত ব্যথিতের অশ্রুজল,
মুমূর্ষু প্রেমের প্রাণ পাইত নূতন বল।

ওরে স্বপ্ন, আমি যদি স্বপন হতেম হায়,
যাইতাম তার প্রাণে যে মোরে ফিরে না চায়।
প্রাণে তার ভ্রমিতাম, প্রাণে তার গাহিতাম,
প্রাণে তার খেলাতেম অবিরাম নিশি নিশি।
যেমনি প্রভাত হত আলোকে যেতাম মিশি।

দিবসে আমার কাছে কভু সে খোলে না প্রাণ,
শোনে না আমার কথা, বোঝে না আমার গান।
মায়ামন্ত্রে প্রাণ তার গোপনে দিতাম খুলি,
বুঝায়ে দিতেম তারে এই মোর গানগুলি।
পরদিন দিবসেতে যাইতাম কাছে তার,
তা হলে কি মুখপানে চাহিত না একবার?

নাটক ও প্রহসন

প্রকৃতির প্রতিশোধ

সূচনা

জীবনের প্রথম বয়স কেটেছে বদ্ধঘরে নিঃসঙ্গ নির্জনে। সন্ধ্যাসংগীত এবং প্রভাতসংগীতের অনেকটা সেই অবরুদ্ধ আলোকের কবিতা। নিজের মনের ভাবনা নিজের মনের প্রাচীরের মধ্যে প্রতিহত হয়ে আলোড়িত।

তার পরের অবস্থায় মনের মধ্যে মানুষের স্পর্শ লাগল, বাইরের হাওয়ায় জানলা গেল খুলে, উৎসুক মনের কাছে পৃথিবীর দৃশ্য খণ্ড খণ্ড চলচ্ছবির মতো দেখা দিতে লাগল। গুহাচরের মন তখন ঝুঁকল লোকালয়ের দিকে। তখনও বাইরের জগৎ সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে নি আবেগের বাষ্পপুঞ্জ থেকে। তবু দুঃস্বপ্নের মতো আপনার বাঁধন-জাল ছাড়াবার জন্যে জেগে উঠল বালকের আগ্রহ। এই সময়কার রচনা 'ছবি ও গান'। লেখনীর সেই নূতন বহির্‌মুখী প্রবৃত্তি তখন কেবল ভাবুকতার অস্পষ্টতার মধ্যে বন্ধন স্বীকার করলে না। বেদনার ভিতর দিয়ে ভাব-প্রকাশের প্রয়াসে সে শ্রান্ত, কল্পনার পথে সৃষ্টি করবার দিকে পড়েছে তার ঝোঁক। এই পথে তার দ্বার প্রথম খুলেছিল 'বাল্মীকিপ্রতিভা'য়। যদিও তার উপকরণ গান নিয়ে, কিন্তু তার প্রকৃতিই নাট্যীয়। তাকে গীতিকাব্য বলা চলে না। কিছুকাল পরে, তখন আমার বয়স বোধ হয় তেইশ কিংবা চব্বিশ হবে, কারোয়ার থেকে জাহাজে আসতে আসতে হঠাৎ যে গান সমুদ্রের উপর প্রভাতসূর্যালোকে সম্পূর্ণ হয়ে দেখা দিল তাকে নাট্যীয় বলা যেতে পারে, অর্থাৎ সে আত্মগত নয়, সে কল্পনায় রূপায়িত। 'হেদে গো নন্দরানী' গানটি একটি ছবি, যার রস নাট্যরস। রাখাল বালকেরা নন্দরানীর কাছে এসেছে আবদার করতে, তারা শ্যামকে নিয়ে গোষ্ঠে যাবে এই তাদের পণ। এই গানটি প্রকৃতির প্রতিশোধে ভুক্ত করেছি। এই আমার হাতের প্রথম নাটক যা গানের ছাঁচে ঢালা নয়। এই বইটি কাব্যে এবং নাট্যে মিলিত। সন্ন্যাসীর যা অন্তরের কথা তা প্রকাশ হয়েছে কবিতায়। সে তার একলার কথা। এই আত্ম-কেন্দ্রিত বৈরাগীকে ঘিরে প্রাত্যহিক সংসার নানা রূপে নানা কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠেছে। এই কলরবের বিশেষত্বই হচ্ছে তার অকিঞ্চিৎকরতা।

এই বৈপরীত্যকে নাট্যিক বলা যেতে পারে। এরই মাঝে মাঝে গানের রস এসে অনির্বচনীয়তার আভাস দিয়েছে। শেষ কথাটা এই দাঁড়ালো শূন্যতার মধ্যে নির্বিশেষের সন্ধান ব্যর্থ, বিশেষের মধ্যেই সেই অসীম প্রতিক্ষণে হয়েছে রূপ নিয়ে সার্থক, সেইখানেই যে তাকে পায় সেই যথার্থ পায়।

উৎসর্গ

তোমাকে দিলাম

প্রকৃতির প্রতিশোধ

প্রথম দৃশ্য

গুহা

সন্ন্যাসী

কোথা দিন, কোথা রাত্রি, কোথা বর্ষ মাস !
অবিশ্রাম কালস্রোত কোথায় বহিছে
সৃষ্টি যেথা ভাসিতেছে তৃণপুঞ্জসম !
আঁধারে গুহার মাঝে রয়েছি একাকী,
আপনাতে বসে আছি আপনি অটল।
অনাদি কালের রাত্রি সমাধিমগনা
নিশ্বাস করিয়া রোধ পাশে বসে আছে।
শিলার ফাটল দিয়া বিন্দু বিন্দু করি
ঝরিয়া পড়িছে বারি আর্দ্র গুহাতলে।
স্তব্ধ শীতজলে পড়ি অন্ধকার-মাঝে
প্রাচীন ভেকের দল রয়েছে ঘুমায়ে।
বাদুড় গুহায় পশি সুদূর হইতে
অমানিশীথের বার্তা আনিছে বাহিয়া।
কখনো বা কোনো দিন কে জানে কেমনে
একটি আলোর রেখা কোথা হতে আসে,
দিবসের গুপ্তচর রজনীর মাঝে
একটুকু উঁকি মেরে যায় পলাইয়া।
বসে বসে প্রলয়ের মন্ত্র পড়িতেছি,
তিল তিল জগতেরে ধ্বংস করিতেছি,
সাধনা হয়েছে সিদ্ধ, কী আনন্দ আজি।

জগৎ-কুয়াশা-মাঝে ছিনু মগ্ন হয়ে,
অদৃশ্যে আঁধারে বসি সুতীক্ষ্ণ কিরণে
ছিঁড়িয়া ফেলেছি সেই মায়া-আবরণ,
জগৎ চরণতলে গিয়াছে মিলায়ে—
সহসা প্রকাশ পাই দীপ্ত মহিমায়।
বসে বসে চন্দ্র সূর্য দিয়েছি নিবায়ে,
একে একে ভাঙিয়াছি বিশ্বের সীমানা,
দৃশ্য শব্দ স্বাদ গন্ধ গিয়েছে ছুটিয়া,
গেছে ভেঙে আশা ভয় মায়ার কুহক।
কোটি-কোটি-যুগ-ব্যাপী সাধনার পরে,
যুগান্তের অবসানে, প্রলয়সলিলে
সৃষ্টির মলিন রেখা মুছি শূন্য হতে—
ছায়াহীন নিষ্কলঙ্ক অনন্ত পুরিয়া
যে আনন্দে মহাদেব করেন বিরাজ
পেয়েছি পেয়েছি সেই আনন্দ-আভাস।
জগতের মহাশিলা বক্ষে চাপাইয়া
কে আমারে কারাগারে করেছিল রোধ!
পলে পলে যুঝি যুঝি তিল তিল করি
জগদ্দল সে পাষাণ ফেলেছি সরায়ে,
হৃদয় হয়েছে লঘু স্বাধীন স্ববশ।

কী কষ্ট না দিয়েছিস রাক্ষসী প্রকৃতি
অসহায় ছিনু যবে তোর মায়াফাঁদে।
আমার হৃদয়রাজ্যে করিয়া প্রবেশ
আমারি হৃদয় তুই করিলি বিদ্রোহী।
বিরাম বিশ্রাম নাই দিবসরজনী
সংগ্রাম বহিয়া বক্ষে বেড়াতেম ভ্রমি।
কানেতে বাজিত সদা প্রাণের বিলাপ,
হৃদয়ের রক্তপাতে বিশ্ব রক্তময়,
রাঙা হয়ে উঠেছিল দিবসের আঁখি।

বাসনার বহ্নিময় কশাঘাতে হায়
পথে পথে ছুটিয়াছি পাগলের মতো।
নিজের ছায়ারে নিজ বক্ষে ধরিবারে
দিনরাত্রি করিয়াছি নিষ্ফল প্রয়াস
সুখের বিদ্যুৎ দিয়া করিয়া আঘাত
দুঃখের ঘনান্ধকারে দেছিস ফেলিয়া।
বাসনারে ডেকে এনে প্রলোভন দিয়ে
নিয়ে গিয়েছিস মহা দুর্ভিক্ষ-মাঝারে।
খাদ্য বলে যাহা চায় ধূলিমুষ্টি হয়।
তৃষ্ণার সলিলরাশি যায় বাষ্প হয়ে।
প্রতিজ্ঞা করিনু শেষে যন্ত্রণায় জ্বলি
এক দিন— এক দিন নেব প্রতিশোধ।
সেই দিন হতে পশি গুহার মাঝারে
সাধিয়াছি মহা হত্যা আঁধারে বসিয়া।
আজ সে প্রতিজ্ঞা মোর হয়েছে সফল।
বধ করিয়াছি তোর স্নেহের সন্তানে,
বিশ্ব ভস্ম হয়ে গেছে জ্ঞানচিতানলে।
সেই ভস্মমুষ্টি আজি মাখিয়া শরীরে
গুহার আঁধার হতে হইব বাহির।
তোরি রঙ্গভূমিমাঝে বেড়াব গাহিয়া
অপার আনন্দময় প্রতিশোধ-গান।
দেখাব হৃদয় খুলে, কহিব তোমারে,
এই দেখ্‌ তোর রাজ্য মরুভূমি আজি,
তোর যারা দাস ছিল স্নেহ প্রেম দয়া
শ্মশানে পড়িয়া আছে তাদের কঙ্কাল,
প্রলয়ের রাজধানী বসেছে হেথায়।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপথ

সন্ন্যাসী

এ কী ক্ষুদ্র ধরা ! এ কী বদ্ধ চারি দিকে !
কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি গাছপালা গৃহ
চারি দিক হতে যেন আসিছে ঘেরিয়া,
গায়ের উপরে যেন চাপিয়া পড়িবে !
চরণ ফেলিতে যেন হতেছে সংকোচ,
মনে হয় পদে পদে রহিয়াছে বাধা।
এই কি নগর ! এই মহা রাজধানী !
চারি দিকে ছোটো ছোটো গৃহগুহাগুলি,
আনাগোনা করিতেছে নরপিপীলিকা।

চারি দিকে দেখা যায় দিনের আলোক,
চোখেতে ঠেকিছে যেন সৃষ্টির পঞ্জর।
আলোক তো কারাগার, নিষ্ঠুর কঠিন
বস্তু দিয়ে ঘিরে রাখে দৃষ্টির প্রসর।
পদে পদে বাধা খেয়ে মন ফিরে আসে,
কোথায় দাঁড়াবে গিয়া ভাবিয়া না পায়।
অন্ধকার স্বাধীনতা, শান্তি অন্ধকার,
অন্ধকার মানসের বিচরণভূমি,
অনন্তের প্রতিরূপ, বিশ্রামের ঠাঁই।
এক মুষ্টি অন্ধকারে সৃষ্টি ঢেকে ফেলে,
জগতের আদি অন্ত লুপ্ত হয়ে যায়,
স্বাধীন অনন্ত প্রাণ নিমেষের মাঝে
বিশ্বের বাহিরে গিয়ে ফেলে রে নিশ্বাস।

পথ দিয়ে চলিতেছে এরা সব কারা !
এদের চিনি নে আমি, বুঝিতে পারি নে

কেন এরা করিতেছে এত কোলাহল।
কী চায় ? কিসের লাগি এত ব্যস্ত এরা ?
এক কালে বিশ্ব যেন ছিল রে বৃহৎ,
তখন মানুষ ছিল মানুষের মতো,
আজ যেন এরা সব ছোটো হয়ে গেছে।
দেখি হেথা বসে বসে সংসারের খেলা।

কৃষকগণের প্রবেশ

গান

হেদে গো নন্দরানী,
আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও।
আমরা রাখাল-বালক দাঁড়িয়ে দ্বারে,
আমাদের শ্যামকে দিয়ে যাও।
হেরো গো প্রভাত হল, সুয্যি উঠে,
ফুল ফুটেছে বনে—
আমরা শ্যামকে নিয়ে গোষ্ঠে যাব
আজ করেছি মনে।
ওগো, পীতধড়া পরিয়ে তারে
কোলে নিয়ে আয়।
তার হাতে দিয়ো মোহন বেণু,
নূপুর দিয়ো পায়।
রোদের বেলায় গাছের তলায়
নাচব মোরা সবাই মিলে।
বাজবে নূপুর রুনুঝুনু,
বাজবে বাঁশি মধুর বোলে।
বনফুলে গাঁথব মালা,
পরিয়ে দিব শ্যামের গলে।

[প্রস্থান

বালকপুত্র-সমেত স্ত্রীলোকের প্রবেশ

স্ত্রীলোক। (ব্রাহ্মণ পথিকের প্রতি) হ্যাগা দাদাঠাকুর, এত ব্যস্ত হয়ে কম্‌নে চলেছ?

ব্রাহ্মণ। আজ শিষ্যবাড়ি চলেছি নাতনি। অনেকগুলি ঘর আজকের মধ্যে সেরে আসতে হবে, তাই সকাল সকাল বেরিয়েছি। তুমি কোথায় যাচ্ছ গা?

স্ত্রীলোক। আমি ঠাকুরের পুজো দিতে যাব। ঘরকন্নার কাজ ফেলে এসেছি, মিন্‌সে আবার রাগ করবে। পথে দু দণ্ড দাঁড়িয়ে যে জিগ্‌গেসপড়া করব তার জো নেই। বলি দাদাঠাকুর, আমাদের ও দিকে যে এক বার পায়ের ধুলো পড়ে না!

ব্রাহ্মণ। আর ভাই, বুড়োসুড়ো হয়ে পড়েছি, তোদের এখন নবীন বয়েস, কী জানি পছন্দ না হয়। যার দাঁত পড়ে গেছে, তার চালকড়াই ভাজার দোকানে না যাওয়াই ভালো।

স্ত্রীলোক। নাও, নাও, রঙ্গ রেখে দাও।

আর-এক স্ত্রীলোক। এই-যে ঠাকুর, আজকাল তুমি যে বড়ো মাগ্‌গি হয়েছ।

ব্রাহ্মণ। মাগ্‌গি আর হলেম কই। সকালবেলায় পথের মধ্যে তোরা পাঁচ জনে মিলে আমাকে টানাছেঁড়া আরম্ভ করেছিস। তবু তো আমার সেকাল নেই।

প্রথমা। আমি যাই ভাই, ঘরের সমস্ত কাজ পড়ে রয়েছে।

দ্বিতীয়া। তা এস।

প্রথমা। (পুনর্বার ফিরিয়া) হ্যাঁলা অলঙ্গ, তোদের পাড়ায় সেই-যে কথাটা শুনেছিলুম, সে কি সত্যি!

দ্বিতীয়া। সে ভাই বেস্তর কথা।

[সকলের চুপি চুপি কথোপকথন

আর-কতকগুলি পথিকের প্রবেশ

প্রথম। আমাকে অপমান! আমাকে চেনে না সে! তার কাঁধে কটা মাথা আছে দেখতে হবে! তার ভিটেমাটি উচ্ছন্ন করে তবে ছাড়ব।

দ্বিতীয়। ঠিক কথা। তা না হলে তো সে জব্দ হবে না।

প্রথম। জব্দ বলে জব্দ! তাকে নাকের জলে চোখের জলে করব।

তৃতীয়। শাবাশ দাদা, একবার উঠেপড়ে লাগো তো।

চতুর্থ। লোকটার বড়ো বাড় বেড়েছে।

পঞ্চম। পিঁপিড়ার পাখা ওঠে মরিবার তরে।

দ্বিতীয়। অতি দর্পে হত লঙ্কা।

চতুর্থ। আচ্ছা, তুমি কী করবে শুনি দাদা।

দ্বিতীয়। কী না করতে পারি! গাধার উপরে চড়িয়ে মাথায় ঘোল ঢালিয়ে শহর ঘুরিয়ে বেড়াতে পারি। তার এক গালে চুন এক গালে কালী লাগিয়ে দেশ থেকে দূর করে দিতে পারি, তার ভিটেয় ঘুঘু চরাতে পারি।

[ক্রোধে প্রস্থান। হাসিতে হাসিতে অন্য পথিকগণের অনুগমন

প্রথম স্ত্রী। মাইরি, দাদাঠাকুর, আর হাসতে পারি নে, তোমার রঙ্গ রেখে দাও। ওমা, বেলা হয়ে গেল। আজ আর মন্দিরে যাওয়া হল না। আবার আর-এক দিন আসতে হবে। (সক্রোধে) পোড়ারমুখো ছেলে, তোর জন্যেই তো যাওয়া হল না, তুই আবার পথের মধ্যে খেলতে গিয়েছিলি কোথা?

ছেলে। কেন মা, আমি তো এইখেনেই ছিলেম।

স্ত্রী। ফের আবার নেই করছিস! [প্রহার, ক্রন্দন ও প্রস্থান

দুই জন ব্রাহ্মণ-বটুর প্রবেশ

প্রথম। মাধব শাস্ত্রীরই জয়।

দ্বিতীয়। কখনো না জনার্দন পণ্ডিতই জয়ী।

প্রথম। শাস্ত্রী বলছেন, স্থূল থেকে সূক্ষ্ম উৎপন্ন হয়েছে।

দ্বিতীয়। গুরু জনার্দন বলছেন, সূক্ষ্ম থেকে স্থূল উৎপন্ন হয়েছে।

প্রথম। সে যে অসম্ভব কথা।

দ্বিতীয়। সেই তো বেদবাক্য।

প্রথম। কেমন করে হবে? বৃক্ষ থেকে তো বীজ।

দ্বিতীয়। দূর মূর্খ, বীজ থেকেই তো বৃক্ষ।

প্রথম। আগে দিন না আগে রাত?

দ্বিতীয়। আগে রাত।

প্রথম। কেমন করে! দিন না গেলে তো রাত হবে না।

দ্বিতীয়। রাত না গেলে তো দিন হবে না।

প্রথম। (প্রণাম করিয়া) ঠাকুর, একটা সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে।

সন্ন্যাসী। কী সংশয়?

দ্বিতীয়। প্রভু, আমাদের দুই গুরুর বিচার শুনে অবধি আমরা দুই জনে মিলে

তিন দিন তিন রাত্রি অনবরত ভাবছি স্থূল হতে সূক্ষ্ম না সূক্ষ্ম হতে স্থূল, কিছুতেই নির্ণয় করতে পারছি নে।

সন্ন্যাসী। স্থূল কোথা! স্থূল সূক্ষ্ম ভেদ কিছু নাই,
নানারূপে ব্যক্ত হয় শক্তি প্রকৃতির।
সবই সূক্ষ্ম, সবই শক্তি, স্থূল সে তো ভ্রম।

প্রথম। আমিও তো তাই বলি। আমার মাধব গুরুও তো তাই বলেন।

দ্বিতীয়। আমারও তো ওই মত। আমার জনার্দন গুরুরও তো ওই মত।

উভয়ে। (প্রণাম করিয়া) চললেম প্রভু!

[বিবাদ করিতে করিতে প্রস্থান

সন্ন্যাসী। হা রে মূর্খ, দুজনেই বুঝিল না কিছু।
এক খণ্ড কথা পেয়ে লভিল সান্ত্বনা।
জ্ঞানরত্ন খুঁজে খুঁজে খনি খুঁড়ে মরে—
মুঠো মুঠো বাক্যধুলা আঁচল পুরিয়া,
আনন্দে অধীর হয়ে ঘরে নিয়ে যায়।

একদল মালিনীর প্রবেশ

গান

বুঝি বেলা বহে যায়,
কাননে আয় তোরা আয়।
আলোতে ফুল উঠল ফুটে, ছায়ায় ঝরে পড়ে যায়।
সাধ ছিল রে পরিয়ে দেব মনের মতন মালা গেঁথে,
কই সে হল মালা গাঁথা, কই সে এল হায়!
যমুনার ঢেউ যাচ্ছে বয়ে, বেলা চলে যায়।

পথিক। কেন গো এত দুঃখ কিসের! মালা যদি থাকে তো গলাও ঢের আছে।

মালিনী। হাড়কাঠও তো কম নেই।

দ্বিতীয় মালিনী। পোড়ারমুখো মিন্‌সে, গোরুবাছুর নিয়েই আছে। আর, আমি যে গলা ভেঙে মরছি, আমার দিকে একবার তাকালেও না! (কাছে গিয়া গা ঘেঁষিয়া) মর্ মিন্‌সে গায়ের উপর পড়িস কেন?

সেই লোক। গায়ে প'ড়ে ঝগড়া কর কেন! আমি সাত হাত তফাতে দাঁড়িয়ে ছিলুম।

দ্বিতীয় মালিনী। কেনে গা! আমরা বাঘ না ভাল্লুক! নাহয় একটু কাছেই আসতে! খেয়ে তো ফেলতুম না।

[হাসিতে হাসিতে সকলের প্রস্থান

একজন বৃদ্ধ ভিক্ষুকের প্রবেশ

গান

ভিক্ষে দে গো ভিক্ষে দে।
দ্বারে দ্বারে বেড়াই ঘুরে, মুখ তুলে কেউ চাইলি নে।
লক্ষ্মী তোদের সদয় হোন, ধনের উপর বাড়ুক ধন—
আমি একটি মুঠো অন্ন চাই গো, তাও কেন পাই নে।
ওই রে সূর্য উঠল মাথায়, যে যার ঘরে চলেছে—
পিপাসাতে ফাটছে ছাতি, চলতে আর যে পারি নে।
ওরে, তোদের অনেক আছে, আরো অনেক হবে—
একটি মুঠো দিবি শুধু, আর কিছু চাহি নে।

একদল সৈনিক। (ধাক্কা মারিয়া) সরে যা, সরে যা, পথ ছেড়ে দে। বেটা, চোখ নেই! দেখছিস নে মন্ত্রীর পুত্র আসছেন!

[বাদ্য বাজাইয়া চতুর্দোলা চড়িয়া মন্ত্রিপুত্রের প্রবেশ ও প্রস্থান

সন্ন্যাসী। মধ্যাহ্ন আইল, অতি তীক্ষ্ণ রবিকর।
শূন্য যেন তপ্ত তাম্র-কটাহের মতো।
ঝাঁ ঝাঁ করে চারি দিক ; তপ্ত বায়ুভরে
থেকে থেকে ঘুরে ঘুরে উড়িছে বালুকা।
সকাল হইতে আছি, কী দেখিনু হেথা ?
এ দীর্ঘ পরান মোর সংকুচিত ক'রে
পারি কি এদের সাথে মিশিতে আবার।
কী ঘোর স্বাধীন আমি! কী মহা আলয়!
জগতের বাধা নাই— শূন্যে করি বাস।

তৃতীয় দৃশ্য

অপরাহ্ণ। পথ

প্রথম পথিক। পান্থগণ, সরে যাও। হেরো, আসিতেছে
ধর্মভ্রষ্ট অনাচারী রঘুর দুহিতা।

বালিকার প্রবেশ

প্রথম পথিক। ছুঁস নে ছুঁস নে মোরে—
দ্বিতীয় পথিক। সরে যা অশুচি।
তৃতীয় পথিক। হতভাগী জানিস নে রাজপথ দিয়ে
আনাগোনা করে যত নগরের লোক—
ম্লেচ্ছকন্যা, তুই কেন চলিস এ পথে!

বালিকার পথপার্শ্বে বৃক্ষতলে সরিয়া যাওন

এক জন বৃদ্ধা। কে তুমি গা, কার বাছা, চোখে অশ্রুজল,
ভিখারিনী বেশে কেন রয়েছ দাঁড়ায়ে
এক পাশে?

কাঁদিয়া উঠিয়া

বালিকা। জননী গো আমি অনাথিনী।
বৃদ্ধা। আহা মরে যাই!
পথিকগণ। ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ওরে—
কে গো তুমি, জান না কি অনাচারী রঘু,
তাহারি দুহিতা ও যে!
বৃদ্ধা। ছি ছি ছি, কী ঘৃণা! [প্রস্থান

দেবীমন্দিরের কাছে গিয়া

বালিকা। জগৎ-জননী মা গো, তুমিও কি মোরে
নেবে না? তুমিও মা ত্যেজিবে অনাথে?
ঘৃণায় সবাই যারে দেয় দূর করে
সে কি মা তোমারও কোলে পায় না আশ্রয়?
মন্দিররক্ষক। দূর হ! দূর হ তুই অনার্যা অশুচি!
কী সাহসে এসেছিস মন্দিরের মাঝে!

জননী ও দুহিতার প্রবেশ

জননী। আরতির বেলা হল, আয় বাছা আয়।
আয় রে আয় রে মোর বুক-চেরা ধন!
মন্দিরের দীপ হতে কাজল পরাব,
অকল্যাণ যত কিছু যাবে দূর হয়ে।
কন্যা। ও কেও মা!
জননী। ও কেউ না, সরে আয় বাছা! [প্রস্থান
বালিকা। এ কি কেউ না মা! এ কি নিতান্ত অনাথা!
এর কি মা ছিল না গো! ও মা, কোথা তুমি!

সন্ন্যাসীকে দেখিয়া

প্রভু, কাছে যাব আমি?
সন্ন্যাসী। এস বৎসে, এস।
বালিকা। অনার্যা অশুচি আমি।

হাসিয়া

সন্ন্যাসী। সকলেই তাই।
সেই শুচি ধুয়েছে যে সংসারের ধুলা।
দূরে দাঁড়াইয়া কেন! ভয় নাই বাছা।

চমকিয়া

বালিকা। ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, আমি রঘুর দুহিতা।
সন্ন্যাসী। নাম কি তোমার বৎসে?
বালিকা। কেমনে বলিব?
কে আমারে নাম ধরে ডাকিবে প্রভু গো,
বাল্যে পিতৃমাতৃহীনা আমি।
সন্ন্যাসী। বোসো হেথা।

কাঁদিয়া উঠিয়া

বালিকা। প্রভু, প্রভু, দয়াময়, তুমি পিতা মাতা,
একবার কাছে তুমি ডেকেছ যখন
আর মোরে দূর করে দিয়ো না কখনো।
সন্ন্যাসী। মুছ অশ্রুজল বৎসে, আমি যে সন্ন্যাসী।
নাইকো কাহারো 'পরে ঘৃণা-অনুরাগ।

যে আসে আস্থক কাছে, যায় যাক দূরে,
জেনো বৎসে মোর কাছে সকলি সমান।

বালিকা। আমি, প্রভু, দেব নর সবারি তাড়িত,
মোর কেহ নাই—

সন্ন্যাসী। আমারো তো কেহ নাই।
দেব নর সকলেরে দিয়েছি তাড়ায়ে।

বালিকা। তোমার কি মাতা নাই ?

সন্ন্যাসী। নাই।

বালিকা। পিতা নাই ?

সন্ন্যাসী। নাই বৎসে।

বালিকা। সখা কেহ নাই ?

সন্ন্যাসী। কেহ নাই।

বালিকা। আমি তবে কাছে রব, ত্যেজিবে না মোরে ?

সন্ন্যাসী। তুমি না ত্যেজিলে মোরে আমি ত্যেজিব না।

বালিকা। যখন সবাই এসে কহিবে তোমারে—
রঘুর দুহিতা ওরে ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না,
অনার্য অশুচি ও যে ম্লেচ্ছ ধর্মহীন—
তখনো কি ত্যেজিবে না ? রাখিবে কি কাছে ?

সন্ন্যাসী। ভয় নাই, চল্ বৎসে তোর গৃহ যেথা। [প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

পথপার্শ্বে বালিকার ভগ্নকুটির

বালিকা। পিতা !

সন্ন্যাসী। আহা পিতা বলে কে ডাকিলি ওরে।
সহসা শুনিয়া যেন চমকি উঠিনু।

বালিকা। কী শিক্ষা দিতেছ, প্রভু, বুঝিতে পারি নে।
শুধু বলে দাও মোরে আশ্রয় কোথায়।
কে আমারে ডেকে নেবে, কাছে করে নেবে,
মুখ তুলে মুখপানে কে চাহিবে মোর ?

সন্ন্যাসী। আশ্রয় কোথায় পাবি এ সংসারমাঝে।
এ জগৎ অন্ধকার প্রকাণ্ড গহ্বর—
আশ্রয় আশ্রয় ব'লে শত লক্ষ প্রাণী
বিকট গ্রাসের মাঝে ধেয়ে পড়ে গিয়া,
বিশাল জঠরকুণ্ডে কোথা পায় লোপ।
মিথ্যা রাক্ষসীরা মিলে বাঁধিয়াছে হাট,
মধুর দুর্ভিক্ষরাশি রেখেছে সাজায়ে,
তাই চারি দিক হতে আসিছে অতিথি।
যত খায় ক্ষুধা জলে, বাড়ে অভিলাষ,
অবশেষে সাধ যায় রাক্ষসের মতো
জগৎ মুঠায় করে মুখেতে পুরিতে।
হেথা হতে চলে আয়— চলে আয় তোরা।

বালিকা। এখানে তো সকলেই সুখে আছে পিতা।
দূরেতে দাঁড়িয়ে আমি চেয়ে চেয়ে দেখি!

সন্ন্যাসী। হায় হায়, ইহাদের বুঝাব কেমনে!
সুখ দুঃখ সে তো, বাছা, জগতের পীড়া।
জগৎ জীবন্ত মৃত্যু— অনন্ত যন্ত্রণা!
মরণ মরিতে চায়, মরিছে না তবু—
চিরদিন মৃত্যুরূপে রয়েছে বাঁচিয়া।
জগৎ মৃত্যুর নদী চিরকাল ধরে
পড়িছে সমুদ্রমাঝে, ফুরায় না তবু—
প্রতি ঢেউ, প্রতি তৃণ, প্রতি জলকণা
কিছুই থাকে না, তবু সে থাকে সমান।
বিশ্ব মহা মৃতদেহ, তারি কীট তোরা
মরণেরে খেয়ে খেয়ে রয়েছিস বেঁচে—
দু দণ্ড ফুরায়ে যাবে কিলিবিলি করি,
আবার মৃতের মাঝে রহিবি মরিয়া।

বালিকা। কী কথা বলিছ, পিতা, ভয় হয় শুনে।

পথে একজন ভিক্ষুক পথিকের প্রবেশ

পথিক। আশ্রয় কোথায় পাব? আশ্রয় কোথায়?

সন্ন্যাসী। আশ্রয় কোথাও নাই— কে চাহে আশ্রয় ?
আশ্রয় কেবল আছে আপনার মাঝে।
আমি ছাড়া যাহা-কিছু সকলি সংশয়।
আপনারে খুঁজে লও, ধরো তারে বুকে,
নহিলে ডুবিতে হবে সংশয়পাথারে।
পথিক। আশ্রয় কে দেবে মোরে ? আশ্রয় কোথায় ?

বাহিরে আসিয়া

বালিকা। আহা, কে গো, আসিবে কি এ মোর কুটিরে ?
কাল প্রাতে চলে যেয়ো শ্রান্তি দূর করে।
একপাশে পর্ণশয্যা রেখেছি বিছায়ে,
এনে দেব ফলমূল নির্ঝরের জল।
পথিক। কে তুমি গো ?
বালিকা। তোমাদেরি একজন আমি।
পথিক। পিতার কী নাম তব ? কে তুমি বালিকা ?
বালিকা। পরিচয় না পেলে কি আসিবে না ঘরে ?
তবে শুন পরিচয়— রঘু পিতা মম,
অনার্যা অশুচি আমি, বিশ্বের ঘৃণিত।

চমকিয়া

পথিক। রঘুর দুহিতা তুমি ? সুখে থাকো বাছা !
কাজ আছে অন্তরে, ত্বরা যেতে হবে। [প্রস্থান

একটা খাট মাথায় হাসিতে হাসিতে পথে একদল লোকের প্রবেশ

সকলে মিলিয়া। হরিবোল— হরিবোল !

প্রথম। বেটা এখনো জাগল না রে।

দ্বিতীয়। বিষম ভারী।

একজন পথিক। কে হে, কাকে নিয়ে যাও ?

তৃতীয়। বিন্দে তাঁতি মড়ার মতো ঘুমোচ্ছিল, বেটাকে খাটসুদ্ধ উঠিয়ে এনেছি।

সকলে। হরিবোল— হরিবোল !

দ্বিতীয়। আর ভাই, বইতে পারি নে, একবার ঝাঁকা দাও, শালা জেগে উঠুক।

বিন্দে। (সহসা জাগিয়া উঠিয়া) অঁ্যা অঁ্যা উ উ !

তৃতীয়। ওরে, শব্দ করে কে রে।

বিন্দে। ওগো, ওগো, এ কী! আমি কোথায় যাচ্ছি!

সকলে। (খাট নামাইয়া) চুপ কর্ বেটা!

দ্বিতীয়। শালা মরে গিয়েও কথা কয়!

চতুর্থ। তুই যে মরেছিস রে! হাত-পাগুলো সিধে করে চিত হয়ে পড়ে থাক্।

বিন্দে। আমি মরি নি, আমি ঘুমোচ্ছিলুম।

পঞ্চম। মরিছিস তোর হুঁশ নেই, তুই তর্ক করতে বসলি! এমনি বেটার বুদ্ধি বটে!

ষষ্ঠ। ওর কথা শোন কেন! বিপদে পড়ে এখন মিথ্যে কথা বলছে।

সপ্তম। মিছে দেরি কর কেন? ও কি আর কবুল করবে? চলো ওকে পুড়িয়ে দিয়ে আসি গে।

বিন্দে। দোহাই বাবা, আমি মরি নি। তোদের পায়ে পড়ি বাবা, আমি মরি নি।

প্রথম। আচ্ছা, আগে প্রমাণ কর্ তুই মরিস নি।

বিন্দে। হাঁ, আমি প্রমাণ করে দেব, আমার স্ত্রীর হাতে শাঁখা আছে দেখবে চলো।

দ্বিতীয়। না, তা না, ওকে মার্, দেখি ওর লাগে কি না।

তৃতীয়। (মারিয়া) লাগছে?

বিন্দে। উঃ!

চতুর্থ। এটা কেমন লাগল?

বিন্দে। ও বাবা!

পঞ্চম। এটা কেমন?

বিন্দে। তুমি আমার ধর্মবাপ।

[সহসা ছুটিয়া পলায়ন ও হাসিতে হাসিতে সকলের অনুগমন

সন্ন্যাসী।
আহা, শ্রান্তদেহে বালা ঘুমিয়ে পড়েছে!
ভুলে গেছে সংসারের অনাদর-জ্বালা।
কঠিন মাটিতে শুয়ে শিরে হাত দিয়ে
ঘুমের মায়ের কোলে রয়েছে আরামে।
যেন এই বালিকার ছোটো হাত দুটি
হৃদয়েরে অতি ধীরে করিছে বেষ্টন।
পালা, পালা, এইবেলা, পালা এইবেলা।

ঘুমিয়েছে, এইবেলা ওঠ্ রে সন্ন্যাসী !
পলায়ন ! পলায়ন ! ছিছি পলায়ন !
অবহেলা করি আমি বিশ্বজগতেরে,
বালিকা দেখিয়া শেষে পলাইতে হবে !
কখনো না, পালাব না, রহিব এমনি।
প্রকৃতি, এই কি তোর মায়াফাঁদ যত !
এ ঊর্ণাজালে তো শুধু পতঙ্গেরা পড়ে।

চমকিয়া জাগিয়া

বালিকা। প্রভু, চলে গেছ তুমি ! গেছ কি ফেলিয়া !
সন্ন্যাসী। কেন যাব ! কার ভয়ে পলাইব আমি !
ছায়ার মতন তোরে রাখিব কাছেতে,
তবুও রহিব আমি দূর হতে দূরে।
বালিকা। ওই শোনো, রাজপথে মহা কোলাহল।
সন্ন্যাসী। কোলাহল-মাঝে আমি রচিব নির্জন,
নগরে পথের মাঝে তপোবন মোর,
পাতিব প্রলয়াসন স্থষ্টির হৃদয়ে।

একদল পুরুষ ও স্ত্রীলোকের প্রবেশ

প্রথম স্ত্রী। (কোনো পুরুষের প্রতি) যাও, যাও, আর মুখের ভালোবাসা দেখাতে হবে না !

প্রথম পুরুষ। কেন, কী অপরাধ করলুম ?

স্ত্রী। জানি গো জানি, তোমরা পুরুষ মানুষ, তোমাদের পাষাণ প্রাণ।

প্রথম পুরুষ। আচ্ছা, আমাদের পাষাণ প্রাণই যদি হবে, তবে ফুলশরকে কেন ডরাই ? (অন্য সকলের প্রতি) কী বল ভাই ? যদি পাষাণই হবে তবে কি আর ফুল-শরের আঁচড় লাগে !

দ্বিতীয় পুরুষ। বাহবা, বেশ বলেছ।

তৃতীয় পুরুষ। শাবাশ খুড়ো, শাবাশ !

চতুর্থ পুরুষ। (স্ত্রীলোকের প্রতি) কেমন ! এখন জবাব দাও।

প্রথম পুরুষ। না, তাই বলছি। তোমরা তো দশজন আছ, তোমরাই বিচার করে বলো-না কেন, যদি পাষাণ প্রাণই হবে তবে—

পঞ্চম পুরুষ। ঠিক কথা বলেছ। তুমি না হলে আমাদের মুখরক্ষা করত কে!

ষষ্ঠ পুরুষ। খুড়ো এক-একটা কথা বড়ো সরেস বলে।

সপ্তম পুরুষ। হাঁঃ, আমিও অমন বলতে পারতুম। ও কি আর নিজে বলে? কোন্ এক পুঁথি থেকে পড়ে বলছে।

অষ্টম পুরুষ। (আসিয়া) কী হে কী কথাটা হচ্ছে? কী কথাটা হচ্ছে?

প্রথম পুরুষ। শোনো, তোমায় বুঝিয়ে বলি। এই উনি বলছিলেন, তোমরা পুরুষ মানুষ, তোমাদের পাষাণ প্রাণ। তাইতে আমি বললেম, আচ্ছা যদি পাষাণ প্রাণই হবে, তবে ফুলশরের আঁচড় লাগবে কী করে? বুঝেছ ভাবখানা? অর্থাৎ যদি—

অষ্টম পুরুষ। আমাকে আর বোঝাতে হবে না দাদা! আমি আর বুঝি নি! আজ বাইশ বৎসর ধরে আমি নিজ শহরে গুড়ের কারবার করে আসছি, আর একটা মানে বুঝতে পারব না এ কোন্ কথা!

প্রথম পুরুষ। (স্ত্রীলোকের প্রতি) কেমন, এখন একটা জবাব দাও।

সকল স্ত্রীলোক মিলিয়া গান

কথা কোস নে লো রাই, শ্যামের বড়াই বড়ো বেড়েছে।
কে জানে ও কেমন করে মন কেড়েছে।
শুধু ধীরে বাজায় বাঁশি, শুধু হাসে মধুর হাসি,
গোপিনীদের হৃদয় নিয়ে তবে ছেড়েছে।

একজন পুরুষের গান

প্রিয়ে, তোমার ঢেঁকি হলে যেতেম বেঁচে
রাঙা চরণতলে নেচে নেচে।
টিপ্‌টিপিয়ে যেতেম মারা, মাথা খুঁড়ে হতেম সারা,
কানের কাছে কচ্‌কচিয়ে মানটি তোমার নিতেম যেচে।

দ্বিতীয় পুরুষ। বাহবা দাদা, বেশ গেয়েছ।

তৃতীয় পুরুষ। বেশ, বেশ, শাবাশ!

সপ্তম পুরুষ। আরে দূর, ওকে কি আর গান বলে! গাইত বটে নিতাই, যে, হাঁ, শুনে চক্ষু দিয়ে অশ্রু পড়ত। [প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

গুহাদ্বারে

বালিকা। না পিতা ও-সব কথা বোলো না আমারে—
শুনে ভয় করে শুধু, বুঝিতে পারি নে।
সন্ন্যাসী। তবে থাক্, তবে তুই কাছে আয় মোর,
দেখি তোর অতিমৃদু স্পর্শ সুকোমল।
আহা, তোর স্পর্শ মোর ধ্যানের মতন—
সীমা হতে নিয়ে যায় অসীমের দ্বারে।
এ কি মায়া ? এ কি স্বপ্ন ? এ কি মোহ ঘোর ?
জগৎ কি মায়া করে ছায়া হয়ে গিয়ে
করিছে প্রাণের কাছে অনন্তের ভান ?

দূরে সরিয়া

বালিকা, এ-সব কথা না শুনিবি যদি
সন্ন্যাসীর কাছে তবে এলি কী আশায় ?
বালিকা। আমি শুধু কাছে কাছে রহিব তোমার,
মুখপানে চেয়ে রব বসি পদতলে।
নগরের পথে যবে হইবে বাহির
ওই হাত ধরে আমি যাব সাথে সাথে।
সন্ন্যাসী। পিঞ্জরের ছোটো পাখি আহা ক্ষীণ অতি,
এরে কেন নিয়ে যাই অনন্তের মাঝে !
ডানা দিয়ে মুখ ঢেকে ভয়ে হল সারা,
আমার বুকের কাছে লুকাইতে চায়।
আহা, তবে নেবে আয়। থাক্ মুখ ঢেকে।
বুকের মাঝেতে তবে থাক্ লুকাইয়া।
এ কি স্নেহ ? আমি কি রে স্নেহ করি এরে ?
না না। স্নেহ কোথা মোর ! কোথা দ্বেষ ঘৃণা !
কাছে যদি আসে কেহ তাড়াব না তারে,
দূরে যদি থাকে কেহ ডাকিব না কাছে।

প্রকাশ্যে

বাছা, এ আঁধারে তুই কেমনে রহিবি ?
তোরা সব ছোটো ছোটো আলোকের প্রাণী।
কুটির রয়েছে তোর নগরের মাঝে,
সেথা আছে লোকজন, গাছপালা, পাখি—
হেথায় কে আছে তোর !

বালিকা। তুমি আছ পিতা।
যে স্নেহ দিয়েছ তুমি তাই নিয়ে রব।

হাসিয়া। স্বগত

সন্ন্যাসী। বালিকা কি মনে করে স্নেহ করি ওরে ?
হায় হায় এ কী ভ্রম ! জানে না সরলা
নিষ্কলঙ্ক এ হৃদয় স্নেহরেখাহীন।
তাই মনে করে যদি সুখে থাকে, থাক্।
মোহ নিয়ে ভ্রম নিয়ে বেঁচে থাকে এরা।

প্রকাশ্যে

যাই বৎসে, গুহামাঝে করি গে প্রবেশ,
একবার বসি গিয়ে সমাধি-আসনে।

বালিকা। ফিরিবে কখন পিতা ?

সন্ন্যাসী। কেমনে বলিব !
ধ্যানে মগ্ন, নাহি থাকে সময়ের জ্ঞান। [প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

অপরাহ্ণ

গুহাদ্বারে সন্ন্যাসীর প্রবেশ

বালিকা। এলে তুমি এতক্ষণে, বসে আছি হেথা—
পিতা, আমি তোমা-তরে গিয়েছিনু বনে,
এনেছি আঁচল ভরে ফলফুল তুলে।
দেখো চেয়ে কী সুন্দর রাঙা দুটি ফুল।

হাসিয়া

সন্ন্যাসী। দিতে চাস যদি বাছা, দে তবে যা খুশি।
মোর কাছে কিছু নাই সুন্দর কুৎসিত।
এক মুঠা ফুল যদি ভালো লাগে তোর
এক মুঠা ধুলা সেও কী করিল দোষ?
ভালো মন্দ কেন লাগে? সবই অর্থহীন।
আজ বৎসে, সারাদিন কাটালি কী করে?

বালিকা। ওই দেখো— চুপি চুপি এস এই দিকে।
সারাদিন মোর সাথে খেলা করে করে
সাঁঝেতে লতাটি মোর ঘুমিয়ে পড়েছে।
নুইয়ে পড়েছে ভুঁয়ে কচি ডালগুলি,
পাতাগুলি মুদে গেছে জড়াজড়ি করে।
এস পিতা, এইখানে বোসো এর কাছে—
ধীরে ধীরে গায়ে দাও হাতটি বুলিয়ে।

স্বগত

সন্ন্যাসী। এ কী রে মদিরা আমি করিতেছি পান!
এ কী মধু অচেতনা পশিছে হৃদয়ে!
এ কী রে স্বপন-ঘোরে ছাইছে নয়ন!
আবেশে পরানে আসে গোধূলি ঘনায়ে।
পড়িছে জ্ঞানের চোখে মেঘ-আবরণ।
ধীরে ধীরে মোহময় মরণের ছায়া
কেন রে আমারে যেন আচ্ছন্ন করিছে!

সহসা ফুল ফল ছিঁড়িয়া ফেলিয়া
ভূমিতে পদাঘাত করিয়া

দূর হোক— এ-সকল কিছু ভালো নয়—
বালিকা, বালিকা তোর এ কী ছেলেখেলা!
আমি যে সন্ন্যাসী যোগী মুক্ত নির্বিকার,
সংসারের গ্রন্থিহীন, স্বাধীন সবল,
এ ধুলায় ঢাকিবি কি আমার নয়ন!

কিয়ৎক্ষণ থামিয়া

বাছা রে, অমন করে চাহিয়া কেন রে!

কেন রে নয়ন দুটি করে ছল ছল।
জানিস নে তুই মোরা সন্ন্যাসী বিরাগী,
আমাদের এ-সকল ভালো নাহি লাগে।
ছিছি, জনমিল প্রাণে একি এ বিকার!
সহসা কেন রে এত করিল চঞ্চল!
কোথা লুকাইয়া ছিল হৃদয়ের মাঝে
ক্ষুদ্র রোষ, অগ্নিজিহ্ব নরকের কীট!
কোন্ অন্ধকার হতে উঠিল ফুঁষিয়া!
এতদিন অনাহারে এখনো মরে নি!
হৃদয়ে লুকানো আছে এ কী বিভীষিকা!
কোথা যে কে আছে গুপ্ত কিছু তো জানি নে।
হৃদয়শ্মশান-মাঝে মৃতপ্রাণী যত
প্রাণ পেয়ে নাচিতেছে কঙ্কালের নাচ,
কেমনে নিশ্চিন্ত হয়ে রহি আমি আর!

প্রকাশ্যে

দাও, বৎসে, এনে দাও ফলফুল তব,
দেখাও কোথায় বাছা লতাটি তোমার—
না, না, আমি চলিলাম নগরে ভ্রমিতে।
দু দণ্ড বসিয়া থাকো, আসিব এখনি। [প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

পর্বতশিখরে সন্ন্যাসী

পর্বতপথে দুইজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ

গান

বনে এমন ফুল ফুটেছে,
মান করে থাকা আজ কি সাজে!
মান-অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে
চলো চলো কুঞ্জমাঝে।

আজ কোকিলে গেয়েছে কুহু, মুহুর্‌মুহু
আজ কাননে ঐ বাঁশি বাজে।
মান করে থাকা আজ কি সাজে!
আজ মধুরে মিশাবি মধু, পরান-বঁধু
চাঁদের আলোয় ঐ বিরাজে।
মান করে থাকা আজ কি সাজে!

সন্ন্যাসী। সহসা পড়িল চোখে এ কী মায়াঘোর।
জগতেরে কেন আজ মনোহর হেরি!
পশ্চিমে কনকসন্ধ্যা সমুদ্রের মাঝে
সুধীরে নীলের কোলে যেতেছে মিলায়ে।
নিম্নে বনভূমিমাঝে ঘনায় আঁধার,
সন্ধ্যার স্বর্ণছায়া উপরে পড়েছে।
চারি দিকে শান্তিময়ী স্তব্ধতার মাঝে
সিন্ধু শুধু গাহিতেছে অবিশ্রাম গান।
বামে, দূরে দেখা যায় শৈলপদতলে
শ্যামল তরুর মাঝে নগরের গৃহ।
কোলাহল থেমে গেছে, পথ জনহীন
দীপ জ্বলে উঠিতেছে দু একটি ক'রে—
সন্ধ্যার আরতি হয়, শঙ্খঘণ্টা বাজে।

প্রকৃতি, এমন তোরে দেখি নি কখনো—
এমন মধুর যদি মায়ামূর্তি তোর,
দূর হতে বসে বসে দেখি-না চাহিয়া!
হেথায় বসি-না কেন রাজার মতন,
জগতের রঙ্গভূমি সম্মুখে আমার!
আমি আজি প্রভু তোর, তুই দাসী মোর,
মায়াবিনী দেখা তোর মায়া অভিনয়,
দেখা তোর জগতের মহা ইন্দ্রজাল।

খেলা কর্ সমুখেতে চন্দ্রসূর্য নিয়ে,
নীলাকাশ রাজছত্র ধর্ মোর শিরে,
সমস্ত জগৎ দিয়ে কর্ মোরে পূজা।
উঠুক রে দিবানিশি সপ্তলোক হতে
বিচিত্র রাগিণীময়ী মায়াময়ী গাথা।

আর-একদল পথিকের প্রবেশ

গান

মরি লো মরি,
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে!
ভেবেছিলেম ঘরে রব, কোথাও যাব না—
ওই যে, বাহিরে বাজিল বাঁশি বলো কী করি?
শুনেছি কোন্ কুঞ্জবনে যমুনাতীরে
সাঁঝের বেলা বাজে বাঁশি ধীর সমীরে—
ওগো তোরা জানিস যদি
আমায় পথ বলে দে।
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে!
দেখি গে তার মুখের হাসি,
তারে ফুলের মালা পরিয়ে আসি,
তারে বলে আসি তোমার বাঁশি
আমার প্রাণে বেজেছে।
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে!

সন্ন্যাসী। জগৎ সম্মুখে মোর সমুদ্রের মতো,
আমি তীরে বসে আছি পর্বতশিখরে—
তরঙ্গেতে গ্রহতারা হতেছে আকুল,
ভাসিতেছে কোটি প্রাণী জীর্ণ কাষ্ঠ ধরি।
আমি শুধু শুনিতেছি কলধ্বনি তার,
আমি শুধু দেখিতেছি তরঙ্গের খেলা।

কিরণকুন্তলজাল এলায়ে চৌদিকে
রুদ্র তালে নৃত্য করে এ মহাপ্রকৃতি।
আলোক আঁধার ছায়া, জীবন মরণ,
রাত্রি দিন, আশা ভয়, উত্থান পতন,
এ কেবল তালে তালে পদক্ষেপ তার।
শত গ্রহ, শত তারা, শত কোটি প্রাণী
প্রতি পদক্ষেপে তার জন্মিছে মরিছে।
আমি তো ওদের মাঝে কেহ নই আর,
তবে কেন এই নৃত্য দেখি-না বসিয়া!

একজন পথিক

গান

যোগী হে, কে তুমি হৃদি-আসনে।
বিভূতিভূষিত শুভ্র দেহ,
নাচিছ দিক্‌-বসনে।
মহা আনন্দে পুলককায় গঙ্গা উথলি ছলি যায়,
ভালে শিশুশশী হাসিয়া চায়,
জটাজূট ছায় গগনে। [প্রস্থান

অষ্টম দৃশ্য

গুহাদ্বারে

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

সন্ন্যাসী। আয় তোরা, কাছে আয়, কে আসিবি আয়—
সকলি সুন্দর হেরি এ বিশ্বজগতে।
বালিকা। আমিও কি কাছে যাব! ডাকো পিতা, ডাকো!
কী দোষ করিয়াছিনু বলো বুঝাইয়া!

সন্ন্যাসী। কিছু ভয় করিস নে, কোনো দোষ নেই—
তোরে ফেলে আর কভু যাব না বালিকা।
গুহার কাছে গিয়া
এ কী অন্ধকার হেথা! এ কী বদ্ধ গুহা!
আয় বাছা, মোরা দোঁহে বাহিরেতে যাই,
চাঁদের আলোতে গিয়ে বসি একবার।
বাহিরে আসিয়া
আহা একি সুমধুর! একি শান্তিসুধা!
কী আরামে গাছগুলি রয়েছে দাঁড়ায়ে!
মনে সাধ যায় ওই তরু হয়ে গিয়ে
চন্দ্রালোকে দাঁড়াইয়া স্তব্ধ হয়ে থাকি।
ধীরে ধীরে কত কী যে মনে আসিতেছে।
অতীতের অতি দূর ফুলবন হতে
বায়ু যেন বহে আসে নিশ্বাসের মতো,
সাথে লয়ে পল্লবের মর্মরবিলাপ,
মিলিত জড়িত শত পুষ্পগন্ধরাশি।
এমনি জোছনা-রাত্রে কোন্‌খানে ছিনু,
কারা যেন চারি পাশে বসে ছিল মোর!
তোরি মতো দু-একটি মধুমাখা মুখ
চাঁদের আলোতে মিশে পড়িতেছে মনে।
আর না রে, আর না রে, আর ফিরিব না।
তোদের অনেক দূরে ফেলিয়া এসেছি।
অনন্তের পারাবারে ভাসায়েছি তরী,
মাঝে মাঝে অতি দূরে রেখা দেখা যায়—
তোদের সে মেঘময় মায়াদ্বীপগুলি।
সেথা হতে কারা তোরা বাঁশিটি বাজায়ে
আজিও ডাকিস মোরে! আমি ফিরিব না।
বন্দী করে রেখেছিলি মায়ামুগ্ধ করে,
পালায়ে এসেছি আমি, হয়েছি স্বাধীন।
তীরে বসে গা তোদের মায়াগানগুলি—

অনন্তের পানে আমি চলেছি ভাসিয়া।
বাছা, তুই কাছে আয়, দেখি তোরে আমি,
মুখেতে পড়েছে তোর চাঁদের কিরণ।

কাছে আসিয়া

বালিকা। গান পড়িতেছে মনে, গাই বসে পিতা!

গান

মেঘেরা চলে চলে যায়,
চাঁদেরে ডাকে 'আয় আয়'।
ঘুমঘোরে বলে চাঁদ, 'কোথায়— কোথায়!'
না জানি কোথা চলিয়াছে,
কী জানি কী যে সেথা আছে,
আকাশের মাঝে চাঁদ চারি দিকে চায়।
সুদূরে— অতি— অতি দূরে,
বুঝি রে কোন্ সুরপুরে
তারাগুলি ঘিরে বসে বাঁশরি বাজায়।
মেঘেরা তাই হেসে হেসে
আকাশে চলে ভেসে ভেসে,
লুকিয়ে চাঁদের হাসি চুরি করে যায়।

সন্ন্যাসী। এ কী রে চলেছি কোথা, এসেছি কোথায়!
বুঝি আর আপনারে পারি নে রাখিতে।
বুঝি মরি, ডুবি, বুঝি লুপ্ত হয়ে যাই।
ওরে কোন্ অতলেতে যেতেছি তলায়ে—
সর্বাঙ্গে চাপিছে ভার, আঁখি মুদে আসে।
চৌদিকে কী যেন তোরে আসিছে ঘিরিয়া!
কোথায় রাখিলি তোর পালাবার পথ!
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যে রে যেতেছিস চলি,
সহসা চরণে কোথা লাগিবে আঘাত,
বিনাশের মাঝখানে উঠিবি জাগিয়া।

এখনি ছিঁড়িয়া ফেল্‌ স্বপনের মায়া।
চল্‌ তোর নিজ রাজ্যে অনন্ত আঁধারে।
যত চন্দ্র সূর্য সেথা ডুবে নিবে যাবে।
ক্ষুদ্র এ আলোতে এসে হনু দিশেহারা,
আঁধার দেয় না কভু পথ ভুলাইয়া।

নবম দৃশ্য

গুহায় সন্ন্যাসী

আহা এ কী শান্তি, এ কী গভীর বিরাম!
অন্তর বাহির যাবে, যাবে দেশ কাল—
'আছি' মাত্র রবে শুধু, আর কিছু নয়।

দীপ হস্তে বালিকার প্রবেশ

বালিকা। দুই দিন দুই রাত্রি চলে গেছে পিতা
গুহার দুয়ারে আমি বসিয়া রয়েছি,
তাই আজ এক বার এসেছি দেখিতে।
একটিও জনপ্রাণী আসে নি হেথায়,
দীর্ঘ দিন, দীর্ঘ রাত্রি গিয়েছে কাটিয়া,
কেন হেথা অন্ধকারে একা বসে আছ!
কতক্ষণ বসে বসে শুনিনু সহসা
তুমি যেন স্নেহবাক্যে ডাকিছ আমারে।
নিতান্ত একেলা তুমি রয়েছ যে পিতা—
তাই আর পারিনু না, আসিলাম কাছে।
ওকি প্রভু, কথা কেন কহিছ না তুমি!
ও কী ভাবে চেয়ে আছ মোর মুখপানে!
ভালো লাগিছে না পিতা? যাব তবে চলে?
সন্ন্যাসী। না না, এলি যদি, তবে যাস নে চলিয়া।
আমি তো ডাকি নি তোরে, নিজে এসেছিস!

একটুকু দাঁড়া, তোরে দেখি ভালো করে।
সংসারের পরপারে ছিলেম যে আমি,
সহসা জগৎ হতে কে তোরে পাঠালে?
সেথা হতে সাথে করে কেন নিয়ে এলি
দিবালোক, পুষ্পগন্ধ, স্নিগ্ধ সমীরণ!
কিবা তোর সুধাকণ্ঠ, স্নেহমাখা স্বর!
মরি কী অমিয়াময়ী লাবণ্যপ্রতিমা!
সরলতাময় তোর মুখখানি দেখে
জগতের 'পরে মোর হতেছে বিশ্বাস।
তুই কিরে মিথ্যা মায়া, দু দণ্ডের ভ্রম!
জগতের গাছে তুই ফুটেছিস ফুল,
জগৎ কি তোরি মতো এত সত্য হবে!
চল্ বাছা, গুহা হতে বাহিরেতে যাই।
সমুদ্রের এক পারে রয়েছে জগৎ,
সমুদ্রের পরপারে আমি বসে আছি,
মাঝেতে রহিলি তুই সোনার তরণী—
জগৎ-অতীত এই পারাবার হতে
মাঝে মাঝে নিয়ে যাবি জগতের কূলে। [প্রস্থান

দশম দৃশ্য

গুহার বাহিরে

সন্ন্যাসী। আহা একি চারি দিকে প্রভাতবিকাশ!
এ জগৎ মিথ্যা নয়, বুঝি সত্য হবে,
মিথ্যা হয়ে প্রকাশিছে আমাদের চোখে।
অসীম হতেছে ব্যক্ত সীমারূপ ধরি।
যাহা-কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, অনন্ত সকলি!
বালুকার কণা সেও অসীম অপার,

তারি মধ্যে বাঁধা আছে অনন্ত আকাশ—
কে আছে, কে পারে তারে আয়ত্ত করিতে?
বড়ো ছোটো কিছু নাই, সকলি মহৎ।
আঁখি মুদে জগতেরে বাহিরে ফেলিয়া
অসীমের অন্বেষণে কোথা গিয়েছিনু!
সীমা তো কোথাও নাই— সীমা সে তো ভ্রম।
ভালো করে পড়িব এ জগতের লেখা,
শুধু এ অক্ষর দেখে করিব না ঘৃণা।
লোক হতে লোকান্তরে ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
একে একে জগতের পৃষ্ঠা উলটিয়া,
ক্রমে যুগে যুগে হবে জ্ঞানের বিস্তার।
বিশ্বের যথার্থ রূপ কে পায় দেখিতে!
আঁখি মেলি চারি দিকে করিব ভ্রমণ,
ভালোবেসে চাহিব এ জগতের পানে,
তবে তো দেখিতে পাব স্বরূপ ইহার।

দুই জন পথিকের প্রবেশ

প্রথম। আর কত দূরে যাবি, ফিরে যা রে ভাই!
আয় ভাই, এইখানে কোলাকুলি করি।
দ্বিতীয়। কে জানে আবার কবে দেখা হবে ফিরে।
প্রথম। আবার আসিব ফিরে যত শীঘ্র পারি।
দ্বিতীয়। যাবে যদি, একবার দাঁড়াও হেথায়।
একবার ফিরে চাও নগরের পানে।
ওই দেখো দূরে ওই গৃহটি তোমার—
চারি দিকে রহিয়াছে লতিকার বেড়া,
ওই সে অশোক গাছ বামে উঠিয়াছে,
ওই তরুতলে বসে আমরা দুজনে
কত রাত্রি জোছনাতে কথা কহিয়াছি।
প্রথম। দুদিনের এ বিরহ ত্বরায় ফুরাবে,
আনন্দের মাঝে পুন হইবে মিলন।

দ্বিতীয়। মনে যেন রেখো, সখা, সুদূর প্রবাসে—
পুরাতন এ বন্ধুরে ভুলিয়ো না যেন।
দেবতা রাখুন সুখে, আর কী কহিব। [প্রস্থান

সন্ন্যাসী। আহা, যেতে যেতে দোঁহে চায় ফিরে ফিরে,
অশ্রুজলে ভালো করে দেখিতে না পায়।
বিপুল জগৎ-মাঝে দিগন্তের পানে
সখা ওর কোথা গেল, কে জানে কোথায়!
এ কী সংশয়ের দেশে রয়েছি আমরা,
চোখের আড়ালে হেথা সবি অনিশ্চয়।
বারেক যে কাছ হতে দূরে চলে গেল
হয়তো সে কাছে ফিরে আর আসিবে না।
তাই সদা চোখে চোখে রেখে দিতে চাই,
তাই সদা টেনে নিই বুকের মাঝেতে।
কোথা কে অদৃশ্য হয় চারি দিক হতে,
যাহা-কিছু বাকি থাকে ভয়ে তাহাদের
আরো যেন দৃঢ় করে ধরি জড়াইয়া।
সবাই চলিয়া যায় ভিন্ন ভিন্ন দিশে,
অসীম জগতে মোরা কে কোথায় থাকি,
মাঝে লোক-লোকান্তের ব্যবধান পড়ে।
তবু কি গলায় দিবি মোহের বন্ধন!
সুখ দুঃখ নিয়ে তবু করিবি কি খেলা!
যে রবে না তবু তারে রাখিবারে চাস!
ওরে, আমি প্রতিদিন দেখিতেছি, যেন
কে আমারে অবিরত আনিতেছে টেনে।
প্রতিদিন যেন আমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া
জগৎ-চক্রের মাঝে যেতেছি পড়িতে—
চারি দিকে জড়াইছে অশ্রুর বাঁধন,
প্রতিদিন কমিতেছে চরণের বল।…

যাক্ ছিঁড়ে! গেল ছিঁড়ে! চল্ ছুটে চল্!
চল্ দূরে— যত দূরে চলে রে চরণ।
কে ও আসে অশ্রুনেত্রে শূন্যগুহা-মাঝে,
কে ও রে পশ্চাতে ডাকে 'পিতা পিতা' ব'লে!
ছিঁড়ে ফেল্, ভেঙে ফেল্ চরণের বাধা—
হেথা হতে চল্ ছুটে, আর দেরি নয়।

একাদশ দৃশ্য

পথে সন্ন্যাসী

এসেছি অনেক দূরে— আর ভয় নাই।

পায়েতে জড়ালো লতা, ছিন্ন হয়ে গেল।
সেই মুখ বার বার জাগিতেছে মনে।
সে যেন করুণ মুখে মনের দুয়ারে
বসে বসে কাঁদিতেছে, ডাকিতেছে সদা
যতই রাখিতে চাই দুয়ার রুধিয়া—
কিছুতেই যাবে না সে, ফিরে ফিরে আসে,
একটু মনের মাঝে স্থান পেতে চায়।

নির্ভয়ে গা ঢেলে দিয়ে সংসারের স্রোতে
এরা সবে কী আরামে চলেছে ভাসিয়া।
যে যাহার কাজ করে, গৃহে ফিরে যায়,
ছোটো ছোটো সুখে দুঃখে দিন যায় কেটে।
আমি কেন দিবানিশি প্রাণপণ করে
যুঝিতেছি সংসারের স্রোত-প্রতিকূলে।
পেরেছি কি এক তিল অগ্রসর হতে!
বিপরীতে মুখ শুধু ফিরাইয়া আছি,
উজানে যেতেছি বলে হইতেছে ভ্রম,

পশ্চাতে স্রোতের টানে চলেছি ভাসিয়া—
সবাই চলেছে যেথা ছুটেছি সেথাই !

দরিদ্র বালিকার প্রবেশ

বালিকা। ওগো, দয়া করো মোরে আমি অনাথিনী।

সহসা চমকিয়া উঠিয়া

সন্ন্যাসী। কে রে তুই ? কে রে বাছা ? কোথা হতে এলি ?
অনাথিনী ? তুইও কি তারি মতো তবে ?
তোরেও কি ফেলে কেউ গিয়েছে পলায়ে ?
তারেই কি চারি দিকে খুঁজিয়া বেড়াস ?
বৎসে, কাছে আয় তুই— দে রে পরিচয়।

বালিকা। ভিখারি বালিকা আমি, সন্ন্যাসী ঠাকুর,
অন্ধ বৃদ্ধ মাতা মোর রোগশয্যাশায়ী।
আসিয়াছি এক-মুঠা ভিক্ষান্নের তরে।

সন্ন্যাসী। আহা বৎসে, নিয়ে চল্ কুটিরেতে তোর।
রুগ্‌ণ তোর জননীরে দেখে আসি আমি। [প্রস্থান

কতকগুলি সন্তান লইয়া একজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ

স্ত্রী। দেখ্, দেখি, মিশ্রদের বাড়ির ছেলেগুলি কেমন রিষ্টপুষ্ট! দেখলে দু-দণ্ড চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে— আর এঁদের ছিরি দেখো-না, যেন বৃষকাষ্ঠ দাঁড়িয়ে আছেন, যেন সাত কুলে কেউ নেই, যেন সাত জন্মে খেতে পান না।

সন্তানগণ। তা আমরা কী করব মা ! আমাদের দোষ কী ?

মা। বললেম— বলি, রোজ সকালে ভালো করে হলুদ মেখে তেল মেখে স্নান কর্, ধাত পোষ্টাই হবে, ছিরি ফিরবে— তা তো কেউ শুনবে না ! আহা, ওদের দিকে চাইলে চোখ জুড়িয়ে যায়, রঙ যেন দুধে আলতায়—

সন্তানগণ। আমাদের রঙ কালো তা আমরা কী করব ?

মা। তোদের রঙ কালো কে বললে ? তোদের রঙ মন্দ কী ? তবে কেন ওদের মতো দেখায় না ? [প্রস্থান

সন্ন্যাসীর প্রবেশ। একটি কন্যা লইয়া স্ত্রীলোকের প্রবেশ

সন্ন্যাসী। কোথায় চলেছ বাছা?

স্ত্রী। প্রণাম ঠাকুর!
ঘরেতে যেতেছি মোরা।

সন্ন্যাসী। সেথায় কে আছে?

স্ত্রী। শাশুড়ি আছেন মোর, আছেন গোস্বামী,
শত্রুমুখে ছাই দিয়ে দুটি ছেলে আছে।

সন্ন্যাসী। কী কাজে কাটাও দিন বলো মোরে বাছা!

স্ত্রী। ঘরকন্না-কাজ আছে, ছেলেপিলে আছে,
গোয়ালে তিনটি গোরু তার করি সেবা,
বিকেলে চরকা কাটি মেয়েটিরে নিয়ে।

সন্ন্যাসী। সুখেতে কি কাটে দিন? দুঃখ কিছু নেই?

স্ত্রী। দয়ার শরীর রাজা প্রজার মা-বাপ,
কোনো দুঃখ নেই প্রভু! রামরাজ্যে থাকি।

সন্ন্যাসী। এটি কি তোমারি মেয়ে বাছা!

স্ত্রী। হাঁ ঠাকুর।

কন্যার প্রতি

যা না রে, প্রভুরে গিয়ে কর্ দণ্ডবৎ।

সন্ন্যাসী। আয় বৎসে, কাছে আয়, কোলে করি তোরে।
আসিবি নে! তুই মোরে চিনেছিস বুঝি—
নিষ্ঠুর কঠিন আমি পাষাণহৃদয়,
আমারে বিশ্বাস করে আসিস নে কাছে!

মাকে টানিয়া

কন্যা মা গো, ঘরে চলো।

স্ত্রী। তবে প্রণাম ঠাকুর।

সন্ন্যাসী। যাও বাছা, সুখে থাকো আশীর্বাদ করি।
[সন্ন্যাসী ব্যতীত সকলের প্রস্থান

বসে বসে কী দেখি এ, এই কি রে সুখ!
লঘু সুখ লঘু আশা বাহিয়া বাহিয়া

সংসারসাগরে এরা ভাসিয়া বেড়ায়,
তরঙ্গের নৃত্য-সনে নৃত্য করিতেছে।
দু দিনেতে জীর্ণ হবে এ ক্ষুদ্র তরণী,
আশ্রয়ের সাথে কোথা মজিবে পাথারে।
আমি তো পেয়েছি কূল অটল পর্বতে,
নিত্য যাহা তারি মাঝে করিতেছি বাস।
আবার কেন রে হোথা সন্তরণ-সাধ!
ওই অশ্রুসাগরের তরঙ্গহিল্লোলে
আবার কি দিবানিশি উঠিবি পড়িবি!

চক্ষু মুদিয়া

হৃদয় রে, শান্ত হও, যাক সব দূরে—
যাক দূরে, যাক চলে মায়া-মরীচিকা।
এস এস অন্ধকার, প্রলয়সমুদ্রে
তপ্ত দীপ্ত দগ্ধ প্রাণ দাও ডুবাইয়া।
অকূল স্তব্ধতা এস চারি দিকে ঘিরে,
কোলাহলে কর্ণ মোর হয়েছে বধির।
গেল, সব ডুবে গেল, হইল বিলীন,
হৃদয়ের অগ্নিজ্বালা সব নিবে গেল!

বালিকার প্রবেশ

বালিকা। পিতা, পিতা, কোথা তুমি পিতা!

চমকিয়া

সন্ন্যাসী। কে রে তুই!
চিনি নে, চিনি নে তোরে, কোথা হতে এলি!

বালিকা। আমি, পিতা, চাও পিতা, দেখো পিতা, আমি।

সন্ন্যাসী। চিনি নে, চিনি নে তোরে, ফিরে যা, ফিরে যা!
আমি কারো কেহ নই, আমি যে স্বাধীন।

পায়ে পড়িয়া

বালিকা। আমারে যেয়ো না ফেলে, আমি নিরাশ্রয়।
শুধায়ে শুধায়ে সবে তোমারে খুঁজিয়া
বহু দূর হতে পিতা, এসেছি যে আমি।

সহসা ফিরিয়া আসিয়া, বুকে টানিয়া

সন্ন্যাসী। আয় বাছা, বুকে আয়, ঢাল্ অশ্রুধারা!
ভেঙে যাক এ পাষাণ তোর অশ্রুস্রোতে!
আর তোরে ফেলে আমি যাব না বালিকা,
তোরে নিয়ে যাব আমি নূতন জগতে।
পদাঘাতে ভেঙেছিনু জগৎ আমার—
ছোটো এ বালিকা এর ছোটো দুটি হাতে
আবার ভাঙা জগৎ গড়িয়া তুলিল।
আহা, তোর মুখখানি শুকায়ে গিয়েছে,
চরণ দাঁড়াতে যেন পারিছে না আর।
অনিদ্রায়, অনাহারে, মধ্যাহ্নতপনে
তিন দিবসের পথ কেমনে এলি রে!
আয় রে বালিকা তোরে বুকে করে নিয়ে
যেথা ছিনু ফিরে যাই সেই গুহামাঝে। [প্রস্থান

দ্বাদশ দৃশ্য

গুহার দ্বারে

সন্ন্যাসী। এইখানে সব বুঝি শেষ হয়ে গেল!
যে ধ্যানে অনন্তকাল মগ্ন হব বলে
আসন পাতিয়াছিনু বিশ্বের বাহিরে,
আরম্ভ না হতে হতে ভেঙে গেল বুঝি!
তারি মুখ জাগে মনে সমাধিতে বসে,
তারি মুখ হৃদয়ের প্রলয়-আঁধারে
সহসা তারার মতো কোথা ফুটে ওঠে,
সেই দিকে আঁখি যেন বদ্ধ হয়ে থাকে,
ক্রমে ক্রমে অন্ধকার মিলাইয়া যায়,
জগতের দৃশ্য ধীরে ফুটে ফুটে ওঠে—
গাছপালা, সূর্যালোক, গৃহ, লোকজন

কোথা হতে জেগে ওঠে গুহার মাঝারে।
সদা মনে হয় বালা কোথায় না জানি,
হয়তো সে গেছে চলে নগরে ভ্রমিতে,
হয়তো কে অনাদর করেছে তাহারে,
এসেছে সে কাঁদো-কাঁদো মুখখানি করে
আমার বুকের কাছে লুকাইতে মাথা।

এইখানে সব বুঝি শেষ হয়ে গেল !
মিছে ধ্যান, মিছে জ্ঞান, মিছে আশা মোর !
আকাশবিহারী পাখি উড়িত আকাশে—
মাটি হতে ব্যাধ তারে মারিয়াছে বাণ,
ক্রমেই মাটির পানে যেতেছে পড়িয়া—
ক্রমেই দুর্বল দেহ, শ্রান্ত ভগ্ন পাখা,
ক্রমেই আসিছে নুয়ে অভ্রভেদী মাথা।
ধুলায়, মৃত্যুর মাঝে লুটাইতে হবে।
লৌহপিঞ্জরের মাঝে বসিয়া বসিয়া
আকাশের পানে চেয়ে ফেলিব নিশ্বাস।

তবে কি রে আর কিছু নাইকো উপায় !
বালিকা। দেখো পিতা, লতাটিতে কুঁড়ি ধরিয়াছে,
প্রভাতের আলো পেলে উঠিবে ফুটিয়া।

সন্ন্যাসী সবেগে গিয়া লতা ছিঁড়িয়া ফেলিল

বালিকা। ওকি হল ! ওকি হল ! কী করিলে পিতা !
সন্ন্যাসী। রাক্ষসী, পিশাচী, ওরে, তুই মায়াবিনী—
দূর হ, এখনি তুই যা রে দূর হয়ে।
এত বিষ ছিল তোর ওইটুকু-মাঝে
অনন্ত জীবন মোর ধ্বংস করে দিলি !
ওরে, তোরে চিনিয়াছি, আজ চিনিয়াছি—
প্রকৃতির গুপ্তচর তুই রে রাক্ষসী,
গলায় বাঁধিয়া দিলি লোহার শৃঙ্খল !

তুই রে আলেয়া-আলো, তুই মরীচিকা—
কোন্ পিপাসার মাঝে, দুর্ভিক্ষের মাঝে,
কোন্ মরুভূমি-মাঝে, শ্মশানের পথে,
কোন্ মরণের মুখে যেতেছিস নিয়ে!
ওই-যে দেখি রে তোর নিদারুণ হাসি,
প্রকৃতির হৃদিহীন উপহাস তুই—
শৃঙ্খলেতে বেঁধে ফেলে পরাজিত মোরে
হা হা করে হাসিতেছে প্রকৃতি রাক্ষসী!
এখনো কি আশা তোর পূরে নি পাষাণী?
এখনো করিবি মোরে আরো অপমান!
আরো ধুলা দিবি ফেলে এ মাথায় মোর!
আরো গহ্বরেতে মোরে টেনে নিয়ে যাবি!
না রে না, তা হবে না রে, এখনো যুঝিব—
এখনো হইব জয়ী, ছিঁড়িব শৃঙ্খল।

সন্ন্যাসীর সবেগে গুহা হইতে বহির্গমন
ও মূর্ছিত হইয়া বালিকার পতন

ত্রয়োদশ দৃশ্য

অরণ্য

ঝড়বৃষ্টি। রাত্রি

সন্ন্যাসী। কেও রে করুণকণ্ঠে করে আর্তনাদ!
এখনো কানেতে কেন পশিছে আসিয়া!
প্রলয়ের শব্দে আজি কাঁপিছে ধরণী—
বজ্রদন্ত কড়মড়ি ছুটিতেছে ঝড়,
ক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতো আঁধার অরণ্য
তরুর তরঙ্গ লয়ে উঠিছে পড়িছে!
তবুও ঝটিকা, তোর বজ্রগীত গেয়ে

ক্ষুদ্র এক বালিকার ক্ষীণ কণ্ঠধ্বনি
পারিলি নে ডুবাইতে! এখনো শুনি যে!
ওই-যে সে কাঁদিতেছে করুণ স্বরেতে,
নিশীথের বুক ফেটে উঠিছে সে ধ্বনি।
কোথা যাব, কোথা যাব, কোন্ অন্ধকারে—
জগতের কোন্ প্রান্তে, নিশীথের বুকে—
ধরণীর কোন্ ঘোর, ঘোর গর্ভতলে—
এ ধ্বনি কোথায় গেলে পশিবে না কানে!
যাই ছুটে আরো, আরো অরণ্যের মাঝে—
মহাকায় তরুদের জটিলতা-মাঝে
দিগ্বিদিক হারাইয়া মগ্ন হয়ে যাই।

চতুর্দশ দৃশ্য

প্রভাত

অরণ্য হইতে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া

সন্ন্যাসী। যাক, রসাতলে যাক সন্ন্যাসীর ব্রত!

ছুড়িয়া ফেলিয়া

দূর করো, ভেঙে ফেলো দণ্ড কমণ্ডলু!
আজ হতে আমি আর নহি রে সন্ন্যাসী!
পাষাণসংকল্পভার দিয়ে বিসর্জন
আনন্দে নিশ্বাস ফেলে বাঁচি একবার।
হে বিশ্ব, হে মহাতরী, চলেছ কোথায়,
আমারে তুলিয়া লও তোমার আশ্রয়ে—
একা আমি সাঁতারিয়া পারিব না যেতে।
কোটি কোটি যাত্রী ওই যেতেছে চলিয়া,
আমিও চলিতে চাই উহাদেরি সাথে।
যে পথে তপন শশী আলো ধ'রে আছে
সে পথ করিয়া তুচ্ছ, সে আলো ত্যজিয়া,

আপনারি ক্ষুদ্র এই খদ্যোত-আলোকে
কেন অন্ধকারে মরি পথ খুঁজে খুঁজে !
জগৎ, তোমারে ছেড়ে পারি নে যে যেতে,
মহা আকর্ষণে সবে বাঁধা আছি মোরা ।
পাখি যবে উড়ে যায় আকাশের পানে
মনে করে 'এনু বুঝি পৃথিবী ত্যজিয়া'
যত ওড়ে— যত ওড়ে— যত ঊর্ধ্বে যায়—
কিছুতে পৃথিবী তবু পারে না ছাড়িতে,
অবশেষে শ্রান্তদেহে নীড়ে ফিরে আসে ।

চারি দিকে চাহিয়া

আজি এ জগৎ হেরি কী আনন্দময় !
সবাই আমারে যেন দেখিতে আসিছে ।
নদী তরুলতা পাখি হাসিছে প্রভাতে ।
উঠিয়াছে লোকজন প্রভাত হেরিয়া,
হাসিমুখে চলিয়াছে আপনার কাজে ।
ওই ধান কাটে, ওই করিছে কর্ষণ,
ওই গাভী নিয়ে মাঠে চলেছে গাহিয়া ।
ওই-যে পূজার তরে তুলিতেছে ফুল,
ওই নৌকা লয়ে যাত্রী করিতেছে পার ।
কেহ বা করিছে স্নান, কেহ তুলে জল,
ছেলেরা ধুলায় বসে খেলা করিতেছে,
সখারা দাঁড়ায়ে পথে কহে কত কথা ।

আহা সে অনাথা বালা কোথায় না জানি !
কে তারে আশ্রয় দেবে, কে তারে দেখিবে !
ব্যথিত হৃদয় নিয়ে কার কাছে যাবে,
কে তারে পিতার মতো বুকে নিয়ে তুলে
নয়নের অশ্রুজল দিবে মুছাইয়া !
কী করেছি, কী বলেছি, সব গেছি ভুলে,
বিস্মৃত দুঃস্বপ্ন শুধু চেপে আছে প্রাণে—

একখানি মুখ শুধু মনে পড়িতেছে,
দুটি আঁখি চেয়ে আছে করুণ বিস্ময়ে।
আহা, কাছে যাই তার— বুকে নিয়ে তারে
শুধাই গে কী হয়েছে, কী করেছি আমি!
একটি কুটিরে মোরা রহিব দুজনে,
রামায়ণ হতে তারে শুনাব কাহিনী—
সন্ধ্যার প্রদীপ জেলে, শাস্ত্রকথা শুনে,
বালিকা কোলেতে মোর পড়িবে ঘুমায়ে। [প্রস্থান

পঞ্চদশ দৃশ্য

পথে

লোকারণ্য

প্রথম পুরুষ। ওরে, আজ আমাদের রাজপুত্রের বিয়ে।

দ্বিতীয় পুরুষ। তা তো জানি।

তৃতীয় পুরুষ। ছুটে চল্, ছুটে চল্, ছুটে চল্।

চতুর্থ পুরুষ। রাজার বাড়ি নবৎ বসেছে, কিন্তু ভাই আমাদের ডুগ্‌ডুগি না বাজলে আমোদ হয় না। তাই কাল সারা রাত্রি মোধোকে আর হরেকে ডেকে তিন জনে মিলে কেবল ডুগ্‌ডুগি বাজিয়েছি।

স্ত্রীলোক। হাঁ গা, রাজপুত্তুরের বিয়ে হবে, তা মুড়িমুড়কি বিলোনো হবে না?

প্রথম পুরুষ। দূর মাগি, রাজপুত্তুরের বিয়েতে কি মুড়িমুড়কি বিলোনো হয়? গুড়, ছোলা, চিনির পানা—

দ্বিতীয় পুরুষ। না রে না, খুড়ো আমার শহরে থাকে, তার কাছে শুনেছি, দই দিয়ে ছাতু দিয়ে ফলার হবে।

অনেকে। ওরে, তবে আজ আনন্দ করে নে রে, আনন্দ করে নে।

প্রথম পুরুষ। ওরে ও সর্দারের পো, আজ আবার কাজ করতে বসেছিস কেন। ঘর থেকে বেরিয়ে আয়।

দ্বিতীয় পুরুষ। আজ যে শালা কাজ করবে তার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেব।

তৃতীয় পুরুষ। না রে ভাই, বসে বসে মালা গাঁথছি, দরজায় ঝুলিয়ে দিতে হবে।

স্ত্রীলোক। (রুদ্যমান সন্তানের প্রতি) চুপ কর্, কাঁদিস নে, কাঁদিস নে, আজ রাজপুত্তুরের বিয়ে— আজ রাজবাড়িতে যাবি, মুঠো মুঠো চিনি খেতে পাবি।

[কোলাহল করিতে করিতে প্রস্থান

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

সন্ন্যাসী। জগতের মুখে আজি এ কী হাস্য হেরি!
আনন্দতরঙ্গ নাচে চন্দ্রসূর্য ঘেরি।
আনন্দহিল্লোল কাঁপে লতায় পাতায়,
আনন্দ উচ্ছ্বসি উঠে পাখির গলায়,
আনন্দ ফুটিয়া পড়ে কুসুমে কুসুমে।

কতকগুলি পথিকের প্রবেশ

প্রথম পথিক। ঠাকুর, প্রণাম হই।
দ্বিতীয় পথিক। প্রভু গো, প্রণাম।
তৃতীয় পথিক। এই ছেলেটিরে মোর আশীর্বাদ করো।
চতুর্থ পথিক। পদধূলি দাও প্রভু, নিয়ে যাই শিরে।
পঞ্চম পথিক। এনেছি চরণে দিতে গুটি-দুই ফুল।
সন্ন্যাসী। কেন এরা সবে মোরে করিছে প্রণাম,
আমি তো সন্ন্যাসী নই। ওঠো ভাই, ওঠো—
এস ভাই, আজ মোরা করি কোলাকুলি।
আমিও যে একজন তোমাদেরি মতো,
তোমাদেরি গৃহমাঝে নিয়ে যাও মোরে।

জান কি কোথায় আছে মেয়েটি আমার?
শুধাইতে কেন মোর করিতেছে ভয়!
তার ম্লান মুখ দেখে কেহ কি তোমরা
ডেকে নিয়ে যাও নাই গৃহে তোমাদের!
সে বালিকা কোথাও কি পায় নি আশ্রয়?

ষোড়শ দৃশ্য

গুহামুখ

ধুলায় পতিত বালিকা। সন্ন্যাসীর
দ্রুত প্রবেশ

সন্ন্যাসী। নয়ন-আনন্দ মোর, হৃদয়ের ধন,
স্নেহের প্রতিমা ওগো, মা, আমি এসেছি—
ধুলায় পড়িয়া কেন— ওঠ মা ওঠ মা—
পাষাণেতে মুখখানি রেখেছিস্ কেন ?
আয় রে বুকের মাঝে— এও তো পাষাণ !
ও মা, এত অভিমান করেছিস কেন !
মুখখানি তুলে দেখ্, দুটো কথা ক !
এ কী, এ যে হিম দেহ ! না পড়ে নিশ্বাস—
হৃদয় কেন রে স্তব্ধ, বিবর্ণ মুখানি !

বাছা, বাছা, কোথা গেলি ! কী করিলি রে—
হায় হায়, এ কী নিদারুণ প্রতিশোধ !

বাল্মীকিপ্রতিভা

সূচনা

বাল্মীকিপ্রতিভায় একটি নাট্যকথাকে গানের সূত্র দিয়ে গাঁথা হয়েছিল, মায়ার খেলায় গানগুলিকে গাঁথা হয়েছিল নাট্যসূত্রে। একটা সময় এসেছিল যখন আমার গীতিকাব্যিক মনোবৃত্তির ফাঁকের মধ্যে মধ্যে নাট্যের উঁকিঝুঁকি চলছিল। তখন সংসারের দেউড়ি পার হয়ে সবে ভিতর-মহলে পা দিয়েছি; মানুষে মানুষে সম্বন্ধের জাল-বুনোনিটাই তখন বিশেষ করে ঔৎসুক্যের বিষয় হয়ে উঠেছিল। বাল্মীকিপ্রতিভাতে দস্যুর নির্মমতাকে ভেদ করে উচ্ছ্বসিত হল তার অন্তর্গূঢ় করুণা। এইটেই ছিল তার স্বাভাবিক মানবত্ব যেটা ঢাকা পড়েছিল অভ্যাসের কঠোরতায়। একদিন দ্বন্দ্ব ঘটল, ভিতরকার মানুষ হঠাৎ এল বাইরে। প্রকৃতির প্রতিশোধেও এই দ্বন্দ্ব। সন্ন্যাসীর মধ্যে চিরকালের যে মানুষ প্রচ্ছন্ন ছিল তার বাঁধন ছিঁড়ল। কবির মনের মধ্যে বাজছিল মানুষের জয়গান। মায়ার খেলায় গানের ভিতর দিয়ে অল্প যে একটুখানি নাট্য দেখা দিচ্ছে সে হচ্ছে এই যে, প্রমদা আপনার স্বভাবকেই জানতে পারে নি অহংকারে, অবশেষে ভিতর থেকে বাজল বেদনা, ভাঙল মিথ্যে অহংকার, প্রকাশ পেল সত্যকার নারী। মায়াকুমারীদের কাছ থেকে এই ভর্ৎসনা কানে এল—

এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না—
শুধু সুখ চলে যায়, এমনি মায়ার ছলনা।



'বাল্মীকি-প্রতিভা' অভিনয়ে বাল্মীকির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ

বাল্মীকিপ্রতিভা

প্রথম দৃশ্য

অরণ্য

বনদেবীগণ

সহে না সহে না কাঁদে পরান।
সাধের অরণ্য হল শ্মশান।
দস্যুদলে আসি শান্তি করে নাশ,
ত্রাসে সকল দিশ কম্পমান।
আকুল কানন, কাঁদে সমীরণ,
চকিত মৃগ, পাখি গাহে না গান।
শ্যামল তৃণদল শোণিতে ভাসিল,
কাতর রোদনরবে ফাটে পাষাণ।
দেবী দুর্গে, চাহো, ত্রাহি এ বনে—
রাখো অধীনী জনে, করো শান্তি দান।

[প্রস্থান

প্রথম দস্যুর প্রবেশ

আঃ, বেঁচেছি এখন।
শর্মা ও দিকে আর নন।
গোলেমালে ফাঁকতালে পালিয়েছি কেমন।
লাঠালাঠি কাটাকাটি, ভাবতে লাগে দাঁত-কপাটি,
তাই মানটা রেখে প্রাণটা নিয়ে সটকেছি কেমন।
আসুক তারা আসুক আগে, দুনোদুনি নেব ভাগে—
স্যাঙাতমিতে আমার কাছে দেখব কে কেমন।

শুধু মুখের জোরে গলার চোটে লুট-করা ধন নেব লুটে।
শুধু দুলিয়ে ভুঁড়ি বাজিয়ে তুড়ি করব সরগরম।

লুটের দ্রব্য লইয়া দস্যুগণের প্রবেশ

এনেছি মোরা এনেছি মোরা রাশি রাশি লুটের ভার।
করেছি ছারখার—
কত গ্রাম পল্লী লুটেপুটে করেছি একাকার।

প্রথম দস্যু। আজকে তবে মিলে সবে করব লুটের ভাগ,
এ-সব আনতে কত লণ্ডভণ্ড করনু যজ্ঞ-যাগ।

দ্বিতীয় দস্যু। কাজের বেলায় উনি কোথা যে ভাগেন,
ভাগের বেলায় আসেন আগে আরে দাদা!

প্রথম দস্যু। এত বড়ো আস্পর্ধা তোদের, মোরে নিয়ে একি হাসি-তামাশা!
এখনি মুণ্ড করিব খণ্ড, খবরদার রে খবরদার!

দ্বিতীয় দস্যু। হাঃ হাঃ, ভায়া খাপ্পা বড়ো, একি ব্যাপার!
আজি বুঝিবা বিশ্ব করবে নস্য, এম্‌নি যে আকার।

তৃতীয় দস্যু। এম্‌নি যোদ্ধা উনি, পিঠেতেই দাগ,
তলোয়ারে মরিচা, মুখেতেই রাগ।

প্রথম দস্যু। আর যে এ-সব সহে না প্রাণে—
নাহি কি তোদের প্রাণের মায়া?
দারুণ রাগে কাঁপিছে অঙ্গ—
কোথা রে লাঠি? কোথা রে ঢাল?

সকলে। হাঃ হাঃ, ভায়া খাপ্পা বড়ো, একি ব্যাপার!
আজি বুঝিবা বিশ্ব করবে নস্য, এম্‌নি যে আকার।

বাল্মীকির প্রবেশ

সকলে। এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে।
না মানি বারণ, না মানি শাসন, না মানি কাহারে।
কে বা রাজা, কার রাজ্য, মোরা কী জানি—
প্রতি জনেই রাজা মোরা, বনই রাজধানী!

রাজা প্রজা, উঁচু নিচু, কিছু না গণি!
ত্রিভুবন-মাঝে আমরা সকলে কাহারে না করি ভয়—
মাথার উপরে রয়েছেন কালী, সমুখে রয়েছে জয়'

বাল্মীকির প্রতি

প্রথম দস্যু। এখন করব কী বল্।
সকলে। এখন করব কী বল্।
প্রথম দস্যু। হো রাজা, হাজির রয়েছে দল।
সকলে। বল্ রাজা, করব কী বল্, এখন করব কী বল্।
প্রথম দস্যু। পেলে মুখেরই কথা আনি যমেরই মাথা।
করে দিই রসাতল!
সকলে। করে দিই রসাতল!
সকলে। হো রাজা, হাজির রয়েছে দল—
বল্ রাজা, করব কী বল্, এখন করব কী বল্।
বাল্মীকি। শোন্ তোরা তবে শোন্।
অমানিশা আজিকে, পূজা দেব কালীকে—
ত্বরা করি যা তবে, সবে মিলি যা তোরা,
বলি নিয়ে আয়! [বাল্মীকির প্রস্থান

সকলে। ত্রিভুবন-মাঝে আমরা সকলে কাহারে না করি ভয়—
মাথার উপরে রয়েছেন কালী, সমুখে রয়েছে জয়!

—

তবে আয় সবে আয়, তবে আয় সবে আয়—
তবে ঢাল্ সুরা, ঢাল্ সুরা, ঢাল্ ঢাল্ ঢাল্!
দয়া মায়া কোন্ ছার, ছারখার হোক!
কে বা কাঁদে কার তরে, হাঃ হাঃ হাঃ!
তবে আন্ তলোয়ার, আন্ আন্ তলোয়ার,
তবে আন্ বরশা, আন্ আন্ দেখি ঢাল!
প্রথম দস্যু। আগে পেটে কিছু ঢাল্, পরে পিঠে নিবি ঢাল।
হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ!
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ!

উঠিয়া

সকলে। কালী কালী বলো রে আজ—
বলো হো, হো হো, বলো হো, হো হো, বলো হো!
নামের জোরে সাধিব কাজ,
বলো হো হো হো, বলো হো, বলো হো!
ওই ঘোর মত্ত করে নৃত্য রঙ্গ-মাঝারে
ওই লক্ষ লক্ষ যক্ষ রক্ষ ঘেরি শ্যামারে,
ওই লট্ট-পট্ট-কেশ অট্ট অট্ট হাসে রে—
হাহা হাহাহা হাহাহা!
আরে বল্ রে শ্যামা মায়ের জয়, জয় জয়!
জয় জয়, জয় জয়, জয় জয়, জয় জয়,
আরে বল্ রে শ্যামা মায়ের জয়, জয় জয়!
আরে বল্ রে শ্যামা মায়ের জয়! [গমনোদ্যম

একটি বালিকার প্রবেশ

বালিকা। ওই মেঘ করে বুঝি গগনে।
আঁধার ছাইল, রজনী আইল,
ঘরে ফিরে যাব কেমনে!
চরণ অবশ হায়, শ্রান্ত ক্লান্ত কায়
সারা দিবস বনভ্রমণে।
ঘরে ফিরে যাব কেমনে!

—

এ কী এ ঘোর বন!— এনু কোথায়!
পথ যে জানি না, মোরে দেখায়ে দে-না!
কী করি এ আঁধার রাতে!
কী হবে মোর হায়!
ঘন ঘোর মেঘ ছেয়েছে গগনে,
চকিত চপলা চমকে সঘনে,
একেলা বালিকা তরাসে কাঁপে কায়!

বালিকার প্রতি

প্রথম দস্যু। পথ ভুলেছিস সত্যি বটে ? সিধে রাস্তা দেখতে চাস ?
এমন জায়গায় পাঠিয়ে দেব, সুখে থাকবি বারো মাস।

সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ !

প্রথমের প্রতি

দ্বিতীয় দস্যু। কেমন হে ভাই ! কেমন সে ঠাঁই ?

প্রথম দস্যু। মন্দ নহে বড়ো,
এক দিন না এক দিন সবাই সেথায় হব জড়ো।

সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ !

তৃতীয় দস্যু। আয় সাথে আয়, রাস্তা তোরে দেখিয়ে দিই গে তবে—
আর তা হলে রাস্তা ভুলে ঘুরতে নাহি হবে।

সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ! [সকলের প্রস্থান

বনদেবীগণের প্রবেশ

মরি ও কাহার বাছা, ওকে কোথায় নিয়ে যায় !
আহা ঐ করুণ চোখে ও কার পানে চায় !
বাঁধা কঠিন পাশে, অঙ্গ কাঁপে ত্রাসে,
আঁখি জলে ভাসে, এ কী দশা হায় !
এ বনে কে আছে, যাব কার কাছে, কে ওরে বাঁচায়।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অরণ্যে কালীপ্রতিমা

বাল্মীকি স্তবে আসীন

বাল্মীকি। রাঙা-পদ-পদ্মযুগে প্রণমি গো ভবদারা !
আজি এ ঘোর নিশীথে পূজিব তোমারে তারা !
সুরনর থরহর— ব্রহ্মাণ্ড বিপ্লব করো,

রণরঙ্গে মাতো মা গো, ঘোরা উন্মাদিনী-পারা।
ঝলসিয়ে দিশি দিশি ঘুরাও তড়িৎ-অসি,
ছুটাও শোণিতস্রোত, ভাসাও বিপুল ধরা।
উরো কালী কপালিনী, মহাকালসীমন্তিনী,
লহো জবাপুষ্পাঞ্জলি মহাদেবী পরাৎপরা!

বালিকাকে লইয়া দস্যুগণের প্রবেশ

দস্যুগণ। দেখো, হো ঠাকুর, বলি এনেছি মোরা।
বড়ো সরেস, পেয়েছি বলি সরেস—
এমন সরেস মছ্‌লি, রাজা, জালে না পড়ে ধরা।
দেরি কেন ঠাকুর, সেরে ফেলো ত্বরা।

বাল্মীকি। নিয়ে আয় কৃপাণ, রয়েছে তৃষিতা শ্যামা মা,
শোণিত পিয়াও— যা ত্বরায়।
লোল জিহ্বা লক্‌লকে, তড়িৎ খেলে চোখে,
করিয়ে খণ্ড দিগ্‌দিগন্ত ঘোর দন্ত ভায়।

বালিকা। কী দোষে বাঁধিলে আমায়, আনিলে কোথায়!
পথহারা একাকিনী বনে অসহায়—
রাখো রাখো রাখো, বাঁচাও আমায়!
দয়া করো অনাথারে, কে আমার আছে—
বন্ধনে কাতরতনু মরি যে ব্যথায়!

নেপথ্যে

বনদেবী। দয়া করো অনাথারে, দয়া করো গো—
বন্ধনে কাতর তনু জর্জর ব্যথায়!

বাল্মীকি। এ কেমন হল মন আমার!
কী ভাব এ যে কিছুই বুঝিতে যে পারি নে—
পাষাণ হৃদয়ও গলিল কেন রে,
কেন আজি আঁখিজল দেখা দিল নয়নে!
কী মায়া এ জানে গো,
পাষাণের বাঁধ এ যে টুটিল,

সব ভেসে গেল গো, সব ভেসে গেল গো—
মরুভূমি ডুবে গেল করুণার প্লাবনে !

প্রথম দস্যু। আরে, কী এত ভাবনা কিছু তো বুঝি না।
দ্বিতীয় দস্যু। সময় বহে যায় যে।
তৃতীয় দস্যু। কখন্ এনেছি মোরা, এখনো তো হল না !
চতুর্থ দস্যু। এ কেমন রীতি তব, বাহ্ রে !
বাল্মীকি। না না হবে না, এ বলি হবে না—
অন্য বলির তরে যা রে যা !
প্রথম দস্যু। অন্য বলি এ রাতে কোথা মোরা পাব ?
দ্বিতীয় দস্যু। এ কেমন কথা কও, বাহ্ রে !
বাল্মীকি। শোন্ তোরা শোন্ এ আদেশ !
কৃপাণ খর্পর ফেলে দে দে !
বাঁধন কর্ ছিন্ন, মুক্ত কর্ এখনি রে।

যথাদিষ্ট কৃত

তৃতীয় দৃশ্য

অরণ্য

বাল্মীকি

বাল্মীকি। ব্যাকুল হয়ে বনে বনে,
ভ্রমি একেলা শূন্যমনে।
কে পুরাবে মোর কাতর প্রাণ,
জুড়াবে হিয়া সুধাবরিষণে ! [প্রস্থান

দস্যুগণ বালিকাকে পুনর্বার ধরিয়া আনিয়া

ছাড়ব না ভাই, ছাড়ব না ভাই,
এমন শিকার ছাড়ব না।
হাতের কাছে অম্‌নি এল, অম্‌নি যাবে !
অম্‌নি যেতে দেবে কে রে !
রাজাটা খেপেছে রে, তার কথা আর মানব না।

আজ রাতে ধুম হবে ভারি,
নিয়ে আয় কারণ বারি,
জ্বেলে দে মশালগুলো, মনের মতন পুজো দেব—
নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে— রাজাটা খেপেছে রে,
তার কথা আর মানব না।

প্রথম দস্যু। রাজা মহারাজা কে জানে, আমিই রাজাধিরাজ।
তুমি উজির, কোতোয়াল তুমি,
ওই ছোঁড়াগুলো বরকন্দাজ।
যত সব কুঁড়ে আছে ঠাঁই জুড়ে,
কাজের বেলায় বুদ্ধি যায় উড়ে।
পা ধোবার জল নিয়ে আয় ঝট্,
কর্ তোরা সব যে যার কাজ।

দ্বিতীয় দস্যু। আছে তোমার বিদ্যে-সাধ্যি জানা।
রাজত্ব করা এ কি তামাশা পেয়েছ!

প্রথম দস্যু। জানিস না কেটা আমি!

দ্বিতীয় দস্যু। ঢের ঢের জানি— ঢের ঢের জানি।

প্রথম দস্যু। হাসিস নে, হাসিস নে মিছে, যা যা—
সব আপন কাজে যা যা, যা আপন কাজে।

দ্বিতীয় দস্যু। খুব তোমার লম্বাচওড়া কথা!
নিতান্ত দেখি তোমায় কৃতান্ত ডেকেছে!

তৃতীয় দস্যু। আঃ কাজ কী গোলমালে, নাহয় রাজাই সাজালে।
মরবার বেলায় মরবে ওটাই, থাকব ফাঁকতালে।

প্রথম দস্যু। রাম রাম, হরি হরি, ওরা থাকতে আমি মরি!
তেমন তেমন দেখলে, বাবা, ঢুকব আড়ালে।

সকলে। ওরে, চল্ তবে শিগগিরি,
আনি পুজোর সামিগ্‌গিরি।
কথায় কথায় রাত পোহালো এমনি কাজের ছিরি।

[প্রস্থান

বালিকা। হা কী দশা হল আমার !
কোথা গো মা করুণাময়ী, অরণ্যে প্রাণ যায় গো !
মুহূর্তের তরে মা গো, দেখা দাও আমারে—
জনমের মতো বিদায় !

পূজার উপকরণ লইয়া দস্যুগণের প্রবেশ
ও কালীপ্রতিমা ঘিরিয়া নৃত্য

এত রঙ্গ শিখেছ কোথা মুণ্ডমালিনী !
তোমার নৃত্য দেখে চিত্ত কাঁপে, চমকে ধরণী।
ক্ষান্ত দে মা, শান্ত হ মা, সন্তানের মিনতি।
রাঙা নয়ন দেখে নয়ন মুদি, ও মা ত্রিনয়নী !

বাল্মীকির প্রবেশ

বাল্মীকি। অহো আস্পর্ধা এ কী তোদের নরাধম !
তোদের কারেও চাহি নে আর, আর, আর না রে—
দূর দূর দূর, আমারে আর ছুঁস নে।
এ-সব কাজ আর না, এ পাপ আর না,
আর না, আর না— ত্রাহি, সব ছাড়িনু !

প্রথম দস্যু। দীন হীন এ অধম আমি কিছুই জানি নে রাজা !
এরাই তো যত বাধালে জঞ্জাল,
এত করে বোঝাই বোঝে না—
কী করি, দেখো বিচারি।

দ্বিতীয় দস্যু। বাঃ— এও তো বড়ো মজা বাহবা !
যত কুয়ের গোড়া ওই তো, আরে বল্ না রে !

প্রথম দস্যু। দূর দূর দূর, নির্লজ্জ আর বকিস নে।

বাল্মীকি। তফাতে সব সরে যা। এ পাপ আর না,
আর না, আর না— ত্রাহি, সব ছাড়িনু।

[দস্যুগণের প্রস্থান

বাল্মীকি। আয় মা, আমার সাথে, কোনো ভয় নাহি আর।
কত দুঃখ পেলি বনে আহা মা আমার!
নয়নে ঝরিছে বারি, এ কি মা সহিতে পারি!
কোমল কাতর তনু কাঁপিতেছে বার বার।
[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

বনদেবীগণের প্রবেশ

রিম্ ঝিম্ ঘন ঘন রে বরষে।
গগনে ঘনঘটা, শিহরে তরুলতা,
ময়ূর ময়ূরী নাচিছে হরষে।
দিশি দিশি সচকিত দামিনী চমকিত,
চমকি উঠিছে হরিণী তরাসে!
[প্রস্থান

বাল্মীকির প্রবেশ

কোথায় জুড়াতে আছে ঠাঁই—
কেন প্রাণ কেন কাঁদে রে!
যাই দেখি শিকারেতে,
রহিব আমোদে মেতে,
ভুলি সব জ্বালা বনে বনে ছুটিয়ে—
কেন প্রাণ কেন কাঁদে রে!
আপনা ভুলিতে চাই, ভুলিব কেমনে—
কেমনে যাবে বেদনা!



'বাল্মীকি-প্রতিভা' অভিনয়

ক্ষিতীন্দ্র সুরেন্দ্র অরুণেন্দ্র বলেন্দ্র যশঃপ্রকাশ হিতেন্দ্র গগনেন্দ্র ঋতেন্দ্র অবনীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ

ধরি ধনু আনি বাণ, গাহিব ব্যাধের গান,
দলবল লয়ে মাতিব।
কেন প্রাণ কেন কাঁদে রে!

শৃঙ্গধ্বনিপূর্বক দস্যুগণকে আহ্বান

দস্যুগণের প্রবেশ

দস্যু। কেন রাজা, ডাকিস কেন, এসেছি সবে।
বুঝি আবার শ্যামা মায়ের পুজো হবে?
বাল্মীকি। শিকারে হবে যেতে, আয় রে সাথে।
প্রথম দস্যু। ওরে, রাজা কী বলছে শোন্।
সকলে। শিকারে চল্ তবে।
সবারে আন্ ডেকে যত দলবল সবে।

[বাল্মীকির প্রস্থান

এই বেলা সবে মিলে চল হো, চল হো!
ছুটে আয়, শিকারে কে রে যাবি আয়!—
এমন রজনী বহে যায় যে!
ধনুর্বাণ বল্লম লয়ে হাতে, আয় আয় আয় আয় রে।
বাজা শিঙা ঘন ঘন— শব্দে কাঁপিবে বন—
আকাশ ফেটে যাবে, চমকিবে পশু পাখি সবে,
ছুটে যাবে কাননে কাননে! চারি দিকে ঘিরে
যাব পিছে পিছে, হো হো হো হো!

বাল্মীকির প্রবেশ

বাল্মীকি। গহনে গহনে যা রে তোরা, নিশি বহে যায় যে।
তন্ন তন্ন করি অরণ্য, করী বরাহ খোঁজ্ গে!
এই বেলা যা রে।
নিশাচর পশু সবে, এখনি বাহির হবে—
ধনুর্বাণ নে রে হাতে, চল্ ত্বরা চল্।
জ্বালায়ে মশাল-আলো, এই বেলা আয় রে।

[প্রস্থান

প্রথম দস্যু। চল্ চল্ ভাই, ত্বরা করে মোরা আগে যাই।

দ্বিতীয় দস্যু। প্রাণপণ খোঁজ্ এ বন সে বন,
চল্ মোরা ক'জন ও দিকে যাই।

প্রথম দস্যু। না না ভাই, কাজ নাই।
হোথা কিছু নাই, কিছু নাই—
ওই ঝোপে যদি কিছু পাই।

দ্বিতীয় দস্যু। বরা বরা—

প্রথম দস্যু। আরে দাঁড়া দাঁড়া, অত ব্যস্ত হলে ফস্‌কাবে শিকার।
চুপি চুপি আয়, চুপি চুপি আয় অশথতলায়,—
এবার ঠিকঠাক হয়ে সব থাক্।
সাবধান ধরো বাণ, সাবধান ছাড়ো বাণ।
গেল গেল, ঐ, পালায় পালায়, চল্ চল্।
ছোট্ রে পিছে, আয় রে ত্বরা যাই।

বনদেবীগণের প্রবেশ

কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে,
সাধের কাননে শান্তি নাশিতে!
মত্ত করী যত পদ্মবন দলে
বিমল সরোবর মন্থিয়া,
ঘুমন্ত বিহগে কেন বধে রে
সঘনে খর শর সন্ধিয়া!
তরাসে চমকিয়ে হরিণ-হরিণী
স্খলিত চরণে ছুটিছে।
স্খলিত চরণে ছুটিছে কাননে,
করুণ নয়নে চাহিছে—
আকুল সরসী, সারস সারসী
শরবনে পশি কাঁদিছে।
তিমির দিগ্ ভরি ঘোর যামিনী
বিপদঘনছায়া ছাইয়া—

কী জানি কী হবে আজি এ নিশীথে,
তরাসে প্রাণ ওঠে কাঁপিয়া।

প্রথম দস্যুর প্রবেশ

প্রথম দস্যু। প্রাণ নিয়ে ত সট্‌কেছি রে, করবি এখন কী!
ওরে বরা, করবি এখন কী!
বাবা রে, আমি চুপ করে এই কচুবনে লুকিয়ে থাকি।
এই মরদের মুরদখানা, দেখেও কি রে ভড়কালি না!
বাহবা, শাবাশ তোরে, শাবাশ রে তোর ভরসা দেখি।

খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে
আর-একজন দস্যুর প্রবেশ

অন্য দস্যু। বলব কী আর বলব খুড়ো— উঁ উঁ!
আমার যা হয়েছে বলি কার কাছে—
একটা বুনো ছাগল তেড়ে এসে মেরেছে ঢুঁ।

প্রথম দস্যু। তখন যে ভারি ছিল জারিজুরি,
এখন কেন করছ বাপু উঁ উঁ উঁ—
কোন্‌খানে লেগেছে বাবা, দিই একটু ফুঁ।

দস্যুগণের প্রবেশ

দস্যুগণ। সর্দারমশায়, দেরি না সয়—
তোমার আশায় সবাই বসে।
শিকারেতে হবে যেতে,
মিছি কোমর বাঁধো কষে।
বন বাদাড় সব ঘেঁটে ঘুঁটে
আমরা মরি খেটে খুটে,
তুমি কেবল লুটে পুটে
পেট পোরাবে ঠেসে ঠুসে।

প্রথম দস্যু। কাজ কী খেয়ে, তোফা আছি—
আমায় কেউ না খেলেই বাঁচি।
শিকার করতে যায় কে মরতে,

ঢুঁসিয়ে দেবে বরা মোষে।
ঢুঁ খেয়ে তো পেট ভরে না—
সাধের পেটটি যাবে ফেঁসে।

হাসিতে হাসিতে প্রস্থান ও শিকারের
পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুনঃপ্রবেশ

বাল্মীকির দ্রুতপ্রবেশ

বাল্মীকি। রাখ্ রাখ্, ফেল্ ধনু, ছাড়িস নে বাণ।
হরিণশাবক দুটি প্রাণভয়ে ধায় ছুটি,
চাহিতেছে ফিরে ফিরে করুণ নয়ান।
কোনো দোষ করে নি তো, সুকুমার কলেবর—
কেমনে কোমল দেহে বিঁধিবি কঠিন শর!
থাক্ থাক্ ওরে থাক্, এ দারুণ খেলা রাখ্,
আজ হতে বিসর্জিনু এ ছার ধনুক বাণ।

[প্রস্থান

দস্যুগণের প্রবেশ

দস্যুগণ। আর না, আর না, এখানে আর না—
আয় রে সকলে চলিয়া যাই।
ধনুক বাণ ফেলেছে রাজা,
এখানে কেমনে থাকিব ভাই!
চল্ চল্ চল্ এখনি যাই।

বাল্মীকির প্রবেশ

দস্যুগণ। তোর দশা, রাজা, ভালো তো নয়!
রক্তপাতে পাস রে ভয়!
লাজে মোরা মরে যাই।
পাখিটি মারিলে কাঁদিয়া খুন,
না জানি কে তোরে করিল গুণ—
হেন কভু দেখি নাই।

[দস্যুগণের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

বাল্মীকি। জীবনের কিছু হল না হায়—
হল না গো, হল না হায় হায়!
গহনে গহনে কত আর ভ্রমিব, নিরাশার এ আঁধারে?
শূন্য হৃদয় আর বহিতে যে পারি না,
পারি না গো পারি না আর।
কী লয়ে এখন ধরিব জীবন, দিবসরজনী চলিয়া যায়—
দিবসরজনী চলিয়া যায়—
কত কী করিব বলি কত উঠে বাসনা,
কী করিব জানি না গো!
সহচর ছিল যারা ত্যেজিয়া গেল তারা। ধনুর্বাণ ত্যেজেছি,
কোনো আর নাহি কাজ—
কী করি কী করি বলি হাহা করি ভ্রমি গো—
কী করিব জানি না যে!

ব্যাধগণের প্রবেশ

প্রথম ব্যাধ। দেখ্‌, দেখ্‌, দুটো পাখি বসেছে গাছে।
দ্বিতীয় ব্যাধ। আয় দেখি চুপি চুপি আয় রে কাছে।
প্রথম ব্যাধ। আরে, ঝট্ করে এইবারে ছেড়ে দে রে বাণ।
দ্বিতীয় ব্যাধ। রোস্ রোস্ আগে আমি করি রে সন্ধান।
বাল্মীকি। থাম্ থাম্, কী করিবি বধি পাখিটির প্রাণ!
দুটিতে রয়েছে সুখে, মনের উল্লাসে গাহিতেছে গান।
প্রথম ব্যাধ। রাখো মিছে ও সব কথা,
কাছে মোদের এস নাকো হেথা।
চাই নে ও-সব শাস্তর কথা, সময় বহে যায় যে।
বাল্মীকি। শোনো শোনো, মিছে রোষ কোরো না।
ব্যাধ। থামো থামো ঠাকুর, এই ছাড়ি বাণ।

একটি ক্রৌঞ্চকে বধ

বাল্মীকি। মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।

কী বলিনু আমি! এ কী সুললিত বাণী রে!
কিছু না জানি কেমনে যে আমি প্রকাশিনু দেবভাষা,
এমন কথা কেমনে শিখিনু রে!
পুলকে পুরিল মনপ্রাণ, মধু বরষিল শ্রবণে,
এ কী! হৃদয়ে এ কী এ দেখি!—
ঘোর অন্ধকার-মাঝে, এ কী জ্যোতি ভায়!
অবাক্!— করুণা এ কার!

সরস্বতীর আবির্ভাব

বাল্মীকি। এ কী এ, এ কী এ, স্থিরচপলা!
কিরণে কিরণে হল সব দিক উজলা!
কী প্রতিমা দেখি এ, জোছনা মাখিয়ে
কে রেখেছে আঁকিয়ে
আ মরি কমলপুতলা!

[ব্যাধগণের প্রস্থান

বনদেবীগণের প্রবেশ

বনদেবী। নমি নমি ভারতী, তব কমলচরণে।
পুণ্য হল বনভূমি, ধন্য হল প্রাণ।
বাল্মীকি। পূর্ণ হল বাসনা, দেবী কমলাসনা!
ধন্য হল দস্যুপতি, গলিল পাষাণ।
বনদেবী। কঠিন ধরাভূমি এ, কমলালয়া তুমি যে—
হৃদয়কমলে চরণকমল করো দান।
বাল্মীকি। তব কমলপরিমলে রাখো হৃদি ভরিয়ে,
চিরদিবস করিব তব চরণসুধা পান।

[দেবীগণের অন্তর্ধান

কালীপ্রতিমার প্রতি বাল্মীকি

শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা !
পাষাণের মেয়ে পাষাণী, না বুঝে মা বলেছি মা !
এত দিন কী ছল করে তুই, পাষাণ করে রেখেছিলি—
আজ আপন মায়ের দেখা পেয়ে, নয়নজলে গলেছি মা !
কালো দেখে ভুলি নে আর, আলো দেখে ভুলেছে মন—
আমায় তুমি ছলেছিলে, এবার আমি তোমায় ছলেছি মা !
মায়ার মায়া কাটিয়ে এবার মায়ের কোলে চলেছি মা !

ষষ্ঠ দৃশ্য

বাল্মীকি। কোথা লুকাইলে !
সব আশা নিবিল, দশ দিশি অন্ধকার,
সবে গেছে চলে ত্যেজিয়ে আমারে—
তুমিও কি তেয়াগিলে !

লক্ষ্মীর আবির্ভাব

লক্ষ্মী। কেন গো আপন মনে ভ্রমিছ বনে বনে,
সলিল দু'নয়নে কিসের দুখে ?
কমলা দিতেছি আসি, রতন রাশি রাশি,
ফুটুক তবে হাসি মলিন মুখে।
কমলা যারে চায়, বলো সে কী না পায়,
দুখের এ ধরায় থাকে সে সুখে।
ত্যেজিয়া কমলাসনে, এসেছি এ ঘোর বনে,
আমারে শুভক্ষণে হেরো গো চোখে।

বাল্মীকি। কোথায় সে উষাময়ী প্রতিমা !
তুমি তো নহ সে দেবী কমলাসনা,
কোরো না আমারে ছলনা।

কী এনেছ ধন মান, তাহা যে চাহে না প্রাণ।
দেবী গো, চাহি না, চাহি না, মণিময় ধূলিরাশি চাহি না।
তাহা লয়ে সুখী যারা হয় হোক, হয় হোক—
আমি, দেবী, সে সুখ চাহি না।
যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এ বনে এসো না এসো না—
এসো না এ দীনজন কুটিরে।
যে বীণা শুনেছি কানে মন প্রাণ আছে ভোর,
আর কিছু চাহি না, চাহি না। [লক্ষ্মীর অন্তর্ধান
বাল্মীকির প্রস্থান

বনদেবীগণের প্রবেশ

বাণী বীণাপাণি, করুণাময়ী!
অন্ধজনে নয়ন দিয়ে অন্ধকারে ফেলিলে,
দরশ দিয়ে লুকালে কোথা দেবী অয়ি!
স্বপনসম মিলাবে যদি কেন গো দিলে চেতনা,
চকিতে শুধু দেখা দিয়ে চির মরমবেদনা,
তোমারে চাহি ফিরিছে, হেরো কাননে কাননে ওই।
[বনদেবীগণের প্রস্থান

বাল্মীকির প্রবেশ

সরস্বতীর আবির্ভাব

বাল্মীকি। এই-যে হেরি গো দেবী আমারই!
সব কবিতাময় জগত-চরাচর,
সব শোভাময় নেহারি।
ছন্দে উঠিছে চন্দ্রমা, ছন্দে কনকরবি উদিছে,
ছন্দে জগমণ্ডল চলিছে,
জ্বলন্ত কবিতা তারকা সবে—

এ কবিতার মাঝারে তুমি কে গো দেবী,
আলোকে আলো আঁধারি!
আজি মলয় আকুল, বনে বনে এ কী এ গীত গাহিছে,
ফুল কহিছে প্রাণের কাহিনী,
নব রাগ-রাগিণী উছাসিছে।
এ আনন্দে আজ গীত গাহে মোর হৃদয় সব অবারি।
তুমিই কি দেবী ভারতী, কৃপাগুণে অন্ধ আঁখি ফুটালে,
উষা আনিলে প্রাণের আঁধারে,
প্রকৃতির রাগিণী শিখাইলে!
তুমি ধন্য গো,
রব চিরকাল চরণ ধরি তোমারি।

সরস্বতী। দীনহীন বালিকার সাজে,
এসেছিনু এ ঘোর বনমাঝে,
গলাতে পাষাণ তোর মন—
কেন বৎস, শোন্, তাহা শোন্।
আমি বীণাপাণি, তোরে এসেছি শিখাতে গান,
তোর গানে গলে যাবে সহস্র পাষাণ-প্রাণ।
যে রাগিণী শুনে তোর গলেছে কঠোর মন
সে রাগিণী তোরই কণ্ঠে বাজিবে রে অনুক্ষণ।
অধীর হইয়া সিন্ধু কাঁদিবে চরণতলে,
চারি দিকে দিক্-বধূ আকুল নয়নজলে।
মাথার উপরে তোর কাঁদিবে সহস্র তারা,
অশনি গলিয়া গিয়া হইবে অশ্রুর ধারা।
যে করুণ রসে আজি ডুবিল রে ও হৃদয়
শতস্রোতে তুই তাহা ঢালিবি জগৎময়।
যেথায় হিমাদ্রি আছে সেথা তোর নাম রবে,
যেথায় জাহ্নবী বহে তোর কাব্যস্রোত ব'বে।
সে জাহ্নবী বহিবেক অযুত হৃদয় দিয়া
শ্মশান পবিত্র করি, মরুভূমি উর্বরিয়া।

মোর পদ্মাসনতলে রহিবে আসন তোর,
নিত্য নব নব গীতে সতত রহিবি ভোর!
বসি তোর পদতলে কবি-বালকেরা যত
শুনি তোর কণ্ঠস্বর শিখিবে সংগীত কত।
এই নে আমার বীণা, দিনু তোরে উপহার,
যে গান গাহিতে সাধ, ধ্বনিবে ইহার তার।

মায়ার খেলা

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

সখীসমিতির মহিলাশিল্পমেলায় অভিনীত হইবার উপলক্ষে এই গ্রন্থ উক্ত সমিতি-কর্তৃক মুদ্রিত হইল। ইহাতে সমস্তই কেবল গান, পাঠোপযোগী কবিতা অতি অল্প।

মাননীয়া শ্রীমতী সরলা রায়ের অনুরোধে এই নাট্য রচিত হয় এবং তাঁহাকেই সাদর উপহার-স্বরূপে সমর্পণ করিলাম।

ইহার আখ্যানভাগ কোনো সমাজবিশেষে দেশবিশেষে বদ্ধ নহে। সংগীতের কল্পরাজ্যে সমাজনিয়মের প্রাচীর তুলিবার আবশ্যক বিবেচনা করি নাই। কেবল বিনীত ভাবে ভরসা করি, এই গ্রন্থে সাধারণ মানব-প্রকৃতিবিরুদ্ধ কিছু নাই।

আমার পূর্বরচিত একটি অকিঞ্চিৎকর গদ্যনাটিকার সহিত এ গ্রন্থের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। পাঠকেরা ইহাকে তাহারই সংশোধনস্বরূপে গ্রহণ করিলে বাধিত হইব।

এই গ্রন্থের তিনটি গান ইতিপূর্বে আমার অন্য কাব্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

পাঠক ও দর্শকদিগকে বুঝিতে হইবে যে, মায়াকুমারীগণ এই কাব্যের অন্যান্য পাত্রগণের দৃষ্টি বা শ্রুতি -গোচর নহে।

এই নাট্যকাব্যের সংক্ষিপ্ত আখ্যায়িকা পরপৃষ্ঠায় বিবৃত হইল। নতুবা বিচ্ছিন্ন গানের মধ্য হইতে ইহার আখ্যান সংগ্রহ করা সহসা পাঠকদের পক্ষে দুরূহ বোধ হইতে পারে।

প্রথম দৃশ্য

প্রথম দৃশ্যে মায়াকুমারীগণের আবির্ভাব। মায়াকুমারীগণ কুহকশক্তিপ্রভাবে মানবহৃদয়ে নানাবিধ মায়া সৃজন করে। হাসি, কান্না, মিলন, বিরহ, বাসনা, লজ্জা, প্রেমের মোহ এ-সমস্ত মায়াকুমারীদের ঘটনা। একদিন নব বসন্তের রাত্রে তাহারা স্থির করিল, প্রমোদপুরের যুবক-যুবতীদের নবীন হৃদয়ে নবীন প্রেম রচনা করিয়া তাহারা মায়ার খেলা খেলিবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

নবযৌবনবিকাশে গ্রন্থের নায়ক অমর সহসা হৃদয়ের মধ্যে এক অপূর্ব আকাঙ্ক্ষা অনুভব করিতেছে। সে উদাসভাবে জগতে আপন মানসী মূর্তির অনুরূপ প্রতিমা খুঁজিতে বাহির হইতেছে। এ দিকে শান্তা আপন প্রাণমন অমরকেই সমর্পণ করিয়াছে। কিন্তু চিরদিন নিতান্ত নিকটে থাকাতে শান্তার প্রতি অমরের প্রেম জন্মিতে অবসর পায় নাই। অমর শান্তার হৃদয়ের ভাব না বুঝিয়া চলিয়া গেল। মায়াকুমারীগণ পরিহাসচ্ছলে গাহিল—

কাছে আছে দেখিতে না পাও,
কাহার সন্ধানে দূরে যাও!

তৃতীয় দৃশ্য

প্রমদার কুমারীহৃদয়ে প্রেমের উন্মেষ হয় নাই। সে কেবল মনের আনন্দে হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়। সখীরা ভালোবাসার কথা বলিলে সে অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দেয়। অশোক ও কুমার তাহার নিকটে আপন প্রেম ব্যক্ত করে, কিন্তু সে তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করে না। মায়াকুমারীগণ হাসিয়া বলিল, তোমার এ গর্ব চিরদিন থাকিবে না।—

প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে।
গরব সব হায় কখন টুটে যায়,
সলিল বহে যায় নয়নে।

চতুর্থ দৃশ্য

অমর পৃথিবী খুঁজিয়া কাহারও সন্ধান পাইল না। অবশেষে প্রমদার ক্রীড়াকাননে আসিয়া দেখিল, প্রমদার প্রেমলাভে অকৃতার্থ হইয়া অশোক আপন মর্মব্যথা পোষণ করিতেছে। অমর বলিল, যদি ভালোবাসিয়া কেবল কষ্টই সার তবে ভালোবাসিবার প্রয়োজন কী? কেন-যে লোকে সাধ করিয়া ভালোবাসে অমর বুঝিতেই পারিল না। এমন সময়ে সখীদের লইয়া প্রমদা কাননে প্রবেশ করিল। প্রমদাকে দেখিয়া অমরের মনে সহসা এক নূতন আনন্দ নূতন প্রাণের সঞ্চার হইল। প্রমদা দেখিল আর-সকলেই তৃষিত ভ্রমরের ন্যায় তাহার চারি দিকে ফিরিতেছে, কেবল অমর একজন অপরিচিত যুবক দূরে দাঁড়াইয়া আছে। সে আকৃষ্টহৃদয়ে

সখীদিগকে বলিল, 'উহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া আয় ও কী চায়!' সখীদের প্রশ্নের উত্তরে অমরের অনতিস্ফুট হৃদয়ের ভাব স্পষ্ট ব্যক্ত হইল না। সখীরা কিছু বুঝিল না। কেবল মায়াকুমারীগণ বুঝিল এবং গাহিল—

প্রেমপাশে ধরা পড়েছে দুজনে
দেখো-দেখো, সখী, চাহিয়া।
দুটি ফুল খসে ভেসে গেল ওই
প্রণয়ের স্রোত বাহিয়া।

পঞ্চম দৃশ্য

অমরের মনে ক্রমে প্রমদার প্রতি প্রেম প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রমদারও হৃদয়ের ব্যাকুলতা বাড়িয়া উঠিল, বাহিরের চঞ্চলতা দূর হইয়া গেল। সখীরা প্রমদার অবস্থা বুঝিতে পারিল। কিন্তু পূর্বদৃশ্যে অমরের অস্পষ্ট উত্তর এবং ভাবগতিক দেখিয়া অমরের প্রতি সখীদের বিশ্বাস নাই। এবং সখীদের নিকট হইতে সখীর হৃদয় হরণ করিয়া লইতেছে জানিয়া অমরের প্রতি হয়তো অলক্ষ্যে তাহাদের ঈষৎ মৃদু বিদ্বেষের ভাবও জন্মিয়াছে। অমর যখন প্রমদার নিকট আপনার প্রেম ব্যক্ত করিল প্রমদা কিছু বলিতে না বলিতে সখীরা তাড়াতাড়ি আসিয়া অমরকে প্রচুর ভর্ৎসনা করিল। সরলহৃদয় অমর প্রকৃত অবস্থা কিছু না বুঝিয়া হতাশাস হইয়া ফিরিয়া গেল। ব্যাকুলহৃদয় প্রমদা লজ্জায় বাধা দিবার অবসর পাইল না। মায়াকুমারীগণ গাহিল—

নিমেষের তরে শরমে বাধিল,
মরমের কথা হল না।
জনমের তরে তাহারি লাগিয়া
রহিল হৃদয়বেদনা।

ষষ্ঠ দৃশ্য

অমরের অসুখী অশান্ত আশ্রয়হীন হৃদয় সহজেই শান্তার প্রতি ফিরিল। এই দীর্ঘ বিরহে এবং অন্য সকলের প্রেম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অমর শান্তার প্রতি নিজের এবং নিজের প্রতি শান্তার অচ্ছেদ্য গূঢ় বন্ধন অনুভব করিবার অবসর পাইল। শান্তার নিকটে আসিয়া আত্মসমর্পণ করিল। এ দিকে প্রমদার সখীরা দেখিল অমর আর ফিরে না, তাহারা প্রত্যাশা করিয়াছিল বাধা পাইয়া অমরের প্রেমানল দ্বিগুণ

প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে। তাহাতে নিরাশ হইয়া তাহারা নানা কথার ছলে অমরকে আহ্বান করিতে লাগিল— অমর ফিরিল না ; সখীদের ইঙ্গিত বুঝিতেই পারিল না। ভগ্নহৃদয়া প্রমদা অমরের প্রেমের আশা একেবারেই পরিত্যাগ করিল। মায়াকুমারীগণ গাহিল—

বিদায় করেছ যারে নয়নজলে,
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে।

সপ্তম দৃশ্য

শান্তা ও অমরের মিলনোৎসবে পুরনরনারীগণ কাননে সমাগত হইয়া আনন্দ-গান গাহিতেছে। অমর যখন পুষ্পমালা লইয়া শান্তার গলে আরোপণ করিতে যাইতেছে এমন সময় ম্লান ছায়ার ন্যায় প্রমদা কাননে প্রবেশ করিল। সহসা অনপেক্ষিত ভাবে উৎসবের মধ্যে বিষাদপ্রতিমা প্রমদার নিতান্ত করুণ দীন ভাব অবলোকন করিয়া নিমেষের মতো আত্মবিস্মৃত অমরের হস্ত হইতে পুষ্পমালা খসিয়া পড়িয়া গেল। উভয়ের এই অবস্থা দেখিয়া শান্তা ও আর-সকলের মনে বিশ্বাস হইল যে, অমর ও প্রমদার হৃদয় গোপনে প্রেমের বন্ধনে বাঁধা আছে। তখন শান্তা ও সখীগণ অমর ও প্রমদার মিলনসংঘটনে প্রবৃত্ত হইল। প্রমদা কহিল, 'আর কেন! এখন বেলা গিয়াছে, খেলা ফুরাইয়াছে, এখন আর আমাকে কেন! এখন এ মালা তোমরা পরো, তোমরা সুখে থাকো।' অমর শান্তার প্রতি লক্ষ করিয়া কহিল, 'আমি মায়ার চক্রে পড়িয়া আপনার সুখ নষ্ট করিয়াছি, এখন আমার এই ভগ্ন সুখ এই ম্লান মালা কাহাকে দিব, কে লইবে?' শান্তা ধীরে ধীরে কহিল, 'আমি লইব। তোমার দুঃখের ভার আমি বহন করিব। তোমার সাধের ভুল, প্রেমের মোহ দূর হইয়া জীবনের সুখ-নিশা অবসান হইয়াছে— এই ভুলভাঙা দিবালোকে তোমার মুখের দিকে চাহিয়া আমার হৃদয়ের গভীর প্রশান্ত সুখের কথা তোমাকে শুনাইব।' অমর ও শান্তার এইরূপে মিলন হইল। প্রমদা শূন্য হৃদয় লইয়া কাঁদিয়া চলিয়া গেল। মায়াকুমারীগণ গাহিল—

এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মিলে না,
শুধু সুখ চলে যায়— এমনি মায়ার ছলনা।

মায়ার খেলা

প্রথম দৃশ্য

কানন

মায়াকুমারীগণ

সকলে। মোরা জলে স্থলে কত ছলে মায়াজাল গাঁথি।
প্রথমা। মোরা স্বপন রচনা করি অলস নয়ন ভরি।
দ্বিতীয়া। গোপনে হৃদয়ে পশি কুহক-আসন পাতি।
তৃতীয়া। মোরা মদির তরঙ্গ তুলি বসন্তসমীরে!
প্রথমা। দুরাশা জাগায় প্রাণে-প্রাণে আধো-তানে ভাঙা গানে
ভ্রমরগুঞ্জরাকুল বকুলের পাঁতি!
সকলে। মোরা মায়াজাল গাঁথি।
দ্বিতীয়া। নরনারী-হিয়া মোরা বাঁধি মায়াপাশে।
তৃতীয়া। কত ভুল করে তারা, কত কাঁদে হাসে।
প্রথমা। মায়া করে ছায়া ফেলি মিলনের মাঝে,
আনি মান-অভিমান।
দ্বিতীয়া। বিরহী স্বপনে পায় মিলনের সাথি।
সকলে। মোরা মায়াজাল গাঁথি।
প্রথমা। চলো সখী, চলো।
কুহক-স্বপন-খেলা খেলাবে চলো।
দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া। নবীন হৃদয়ে রচি নব প্রেমছল,
প্রমোদে কাটাব নব বসন্তের রাতি।
সকলে। মোরা মায়াজাল গাঁথি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গৃহ

গমনোন্মুখ অমর। শান্তার প্রবেশ

শান্তা। পথহারা তুমি পথিক যেন গো সুখের কাননে,
ওগো যাও, কোথা যাও!
সুখে ঢল ঢল বিবশ বিভল পাগল নয়নে
তুমি চাও, কারে চাও!
কোথা গেছে তব উদাস হৃদয়,
কোথা পড়ে আছে ধরণী!
মায়ার তরণী বাহিয়া যেন গো
মায়াপুরী-পানে ধাও।
কোন্ মায়াপুরী-পানে ধাও!

অমর। জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত!
নবীন বাসনাভরে হৃদয় কেমন করে,
নবীন জীবনে হল জীবন্ত।
সুখভরা এ ধরায় মন বাহিরিতে চায়,
কাহারে বসাতে চায় হৃদয়ে!
তাহারে খুঁজিব দিক্-দিগন্ত।

মায়াকুমারীগণের প্রবেশ

সকলে। কাছে আছে দেখিতে না পাও,
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও!

শান্তার প্রতি

অমর। যেমন দখিনে বায়ু ছুটেছে,
কে জানে কোথায় ফুল ফুটেছে।
তেমনি আমিও, সখী, যাব—
না জানি কোথায় দেখা পাব।
কার সুধাস্বর-মাঝে জগতের গীত বাজে—

প্রভাত জাগিছে কার নয়নে!
কাহার প্রাণের প্রেম অনন্ত!
তাহারে খুঁজিব দিক্‌-দিগন্ত। [প্রস্থান

মায়াকুমারীগণ। মনের মতো কারে খুঁজে মর,
সে কি আছে ভুবনে, সে তো রয়েছে মনে।
ওগো, মনের মতো সেই তো হবে,
তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও।

নেপথ্যে চাহিয়া

শান্তা। আমার পরান যাহা চায়,
তুমি তাই, তুমি তাই গো!
তোমা ছাড়া আর এ জগতে
মোর কেহ নাই কিছু নাই গো!
তুমি সুখ যদি নাহি পাও
যাও সুখের সন্ধানে যাও
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয়মাঝে,
আর কিছু নাহি চাই গো।
আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন,
তোমাতে করিব বাস,
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষ মাস।
যদি আর কারে ভালোবাস,
যদি আর ফিরে নাহি আস,
তবে তুমি যাহা চাও, তাই যেন পাও,
আমি যত দুখ পাই গো।

নেপথ্যে চাহিয়া

মায়াকুমারীগণ। কাছে আছে দেখিতে না পাও,
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও!
প্রথমা। মনের মতো কারে খুঁজে মর,
দ্বিতীয়া। সে কি আছে ভুবনে, সে যে রয়েছে মনে।

তৃতীয়া। ওগো, মনের মতো সেই তো হবে,
তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও।
প্রথমা। তোমার আপনার যে জন, দেখিলে না তারে।
দ্বিতীয়া। তুমি যাবে কার দ্বারে!
তৃতীয়া। যারে চাবে তারে পাবে না,
যে মন তোমার আছে যাবে তাও।

তৃতীয় দৃশ্য

কানন

প্রমদার সখীগণ

প্রথমা। সখী, সে গেল কোথায়,
তারে ডেকে নিয়ে আয়।
সকলে। দাঁড়াব ঘিরে তারে তরুতলায়।
প্রথমা। আজি এ মধুর সাঁঝে কাননে ফুলের মাঝে
হেসে হেসে বেড়াবে সে, দেখিব তায়।
দ্বিতীয়া। আকাশে তারা ফুটেছে, দখিনে বাতাস ছুটেছে,
পাখিটি ঘুমঘোরে গেয়ে উঠেছে।
প্রথমা। আয় লো আনন্দময়ী, মধুর বসন্ত লয়ে
সকলে। লাবণ্য ফুটাবি লো তরুলতায়!

প্রমদার প্রবেশ

প্রমদা। দে লো, সখী, দে পরাইয়ে গলে
সাধের বকুলফুলহার।
আধফুট' জুঁইগুলি যতনে আনিয়া তুলি
গাঁথি গাঁথি সাজায়ে দে মোরে
কবরী ভরিয়ে ফুলভার।
তুলে দে লো চঞ্চল কুন্তল
কপোলে পড়িছে বারেবার।

প্রথমা। আজি এত শোভা কেন, আনন্দে বিবশা যেন!

দ্বিতীয়া। বিম্বাধরে হাসি নাহি ধরে,
লাবণ্য ঝরিয়া পড়ে ধরাতলে!

প্রথমা। সখী, তোরা দেখে যা, দেখে যা—
তরুণ তনু এত রূপরাশি
বহিতে পারে না বুঝি আর!

তৃতীয়া। সখী, বহে গেল বেলা, শুধু হাসিখেলা,
এ কি আর ভালো লাগে!
আকুল তিয়াষ, প্রেমের পিয়াস
প্রাণে কেন নাহি জাগে!
কবে আর হবে থাকিতে জীবন
আঁখিতে আঁখিতে মদির মিলন,
মধুর হুতাশে মধুর দহন
নিত-নব অনুরাগে!
তরল কোমল নয়নের জল
নয়নে উঠিবে ভাসি,
সে বিষাদনীরে নিবে যাবে ধীরে
প্রখর চপল হাসি।
উদাস নিশ্বাস আকুলি উঠিবে,
আশা-নিরাশায় পরান টুটিবে,
মরমের আলো কপোলে ফুটিবে,
শরম-অরুণ-রাগে।

প্রমদা। ওলো, রেখে দে, সখী, রেখে দে,
মিছে কথা ভালোবাসা।
সুখের বেদনা— সোহাগযাতনা—
বুঝিতে পারি না ভাষা।
ফুলের বাঁধন, সাধের কাঁদন,
পরান সঁপিতে প্রাণের সাধন,
লহো লহো বলে পরে আরাধন—
পরের চরণে আশা!

তিলেক দরশ পরশ মাগিয়া
বরষ বরষ কাতরে জাগিয়া
পরের মুখের হাসির লাগিয়া
অশ্রুসাগরে ভাসা—
জীবনের সুখ খুঁজিবারে গিয়া
জীবনের সুখ নাশা।

মায়াকুমারীগণ। প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে!
গরব সব হায় কখন টুটে যায়,
সলিল বহে যায় নয়নে।

কুমারের প্রবেশ

প্রমদার প্রতি

কুমার। যেয়ো না, যেয়ো না ফিরে—
দাঁড়াও, বারেক দাঁড়াও হৃদয়-আসনে।
চঞ্চলসমীরসম ফিরিছ কেন
কুসুমে কুসুমে, কাননে কাননে।
তোমায় ধরিতে চাহি, ধরিতে পারি নে,
তুমি গঠিত যেন স্বপনে।
এস হে, তোমারে বারেক দেখি ভরিয়ে আঁখি,
ধরিয়ে রাখি যতনে।
প্রাণের মাঝে তোমারে ঢাকিব,
ফুলের পাশে বাঁধিয়ে রাখিব,
তুমি দিবস নিশি রহিবে মিশি
কোমল প্রেমশয়নে।

প্রথমা। কে ডাকে! আমি কভু ফিরে নাহি চাই।
কত ফুল ফুটে উঠে, কত ফুল যায় টুটে,
আমি শুধু বহে চলে যাই।
পরশ পুলকরস-ভরা রেখে যাই, নাহি দিই ধরা।

উড়ে আসে ফুলবাস, লতাপাতা ফেলে শ্বাস,
বনে বনে উঠে হা-হুতাশ—
চকিতে শুনিতে শুধু পাই,
চলে যাই।
আমি কভু ফিরে নাহি চাই।

অশোকের প্রবেশ

অশোক। এসেছি গো এসেছি, মন দিতে এসেছি
যারে ভালো বেসেছি!
ফুলদলে ঢাকি মন যাব রাখি চরণে—
পাছে কঠিন ধরণী পায়ে বাজে।
রেখো রেখো চরণ হৃদিমাঝে।
নাহয় দলে যাবে, প্রাণ ব্যথা পাবে—
আমি তো ভেসেছি, অকূলে ভেসেছি।

প্রমদা। ওকে বলো সখী, বলো, কেন মিছে করে ছল—
মিছে হাসি কেন সখী, মিছে আঁখিজল!
জানি নে প্রেমের ধারা, ভয়ে তাই হই সারা,
কে জানে কোথায় সুধা কোথা হলাহল।

সখীগণ। কাঁদিতে জানে না এরা, কাঁদাইতে জানে কল,
মুখের বচন শুনে মিছে কী হইবে ফল।
প্রেম নিয়ে শুধু খেলা, প্রাণ নিয়ে হেলাফেলা,
ফিরে যাই এই বেলা, চলো সখী, চলো! [প্রস্থান

মায়াকুমারীগণ। প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে।
গরব সব হায় কখন টুটে যায়,
সলিল বহে যায় নয়নে।
এ সুখধরণীতে, কেবলি চাহ নিতে—
জান না হবে দিতে আপনা,
সুখের ছায়া ফেলি কখন যাবে চলি,

বরিবে সাধ করি বেদনা।
কখন বাজে বাঁশি, গরব যায় ভাসি—
পরান পড়ে আসি বাঁধনে।

চতুর্থ দৃশ্য

কানন

অমর কুমার ও অশোক

অমর। মিছে ঘুরি এ জগতে কিসের পাকে,
মনের বাসনা যত মনেই থাকে।
বুঝিয়াছি এ নিখিলে, চাহিলে কিছু না মিলে,
এরা, চাহিলে আপন মন গোপনে রাখে।
এত লোক আছে, কেহ কাছে না ডাকে।

অশোক। তারে দেখাতে পারি নে কেন প্রাণ খুলে গো!
কেন বুঝাতে পারি নে হৃদয়বেদনা।
কেমনে সে হেসে চলে যায়,
কোন্ প্রাণে ফিরেও না চায়
এত সাধ এত প্রেম করে অপমান!
এত ব্যথাভরা ভালোবাসা, কেহ দেখে না—
প্রাণে গোপনে রহিল।
এ প্রেম কুসুম যদি হত,
প্রাণ হতে ছিঁড়ে লইতাম,
তার চরণে করিতাম দান—
বুঝি সে তুলে নিত না,
শুকাত অনাদরে,
তবু তার সংশয় হত অবসান।

কুমার। সখা, আপন মন নিয়ে কাঁদিয়ে মরি
পরের মন নিয়ে কী হবে!

আপন মন যদি বুঝিতে নারি
পরের মন বুঝে কে কবে !

অমর। অবোধ মন লয়ে ফিরি ভবে,
বাসনা কাঁদে প্রাণে হা হা রবে—
এ মন দিতে চাও দিয়ে ফেলো
কেন গো নিতে চাও মন তবে।
স্বপনসম সব জানিয়ো মনে,
তোমার কেহ নাই এ ত্রিভুবনে—
যে জন ফিরিতেছে আপন আশে,
তুমি ফিরিছ কেন তাহার পাশে ?
নয়ন মেলি শুধু দেখে যাও,
হৃদয় দিয়ে শুধু শান্তি পাও।

কুমার। তোমারে মুখ তুলে চাহে না যে,
থাক্ সে আপনার গরবে।

অশোক। আমি, জেনে শুনে বিষ করেছি পান,
প্রাণের আশা ছেড়ে সঁপেছি প্রাণ।
যতই দেখি তারে ততই দহি,
আপন মনোজ্বালা নীরবে সহি—
তবু পারি নে দূরে যেতে, মরিতে আসি,
লই গো বুক পেতে অনলবাণ।
যতই হাসি দিয়ে দহন করে
ততই বাড়ে তৃষা প্রেমের তরে,
প্রেম-অমৃতধারা ততই যাচি
যতই করে প্রাণে অশনি দান।

অমর। ভালোবেসে যদি সুখ নাহি তবে কেন,
তবে কেন মিছে ভালোবাসা।

অশোক। মন দিয়ে মন পেতে চাহি।

অমর ও কুমার। ওগো কেন,
ওগো কেন মিছে এ দুরাশা !

অশোক। হৃদয়ে জ্বালায়ে বাসনার শিখা,
নয়নে সাজায়ে মায়ামরীচিকা,
শুধু ঘুরে মরি মরুভূমে।

অমর ও কুমার। ওগো কেন,
ওগো কেন মিছে এ পিপাসা!

অমর। আপনি যে আছে আপনার কাছে,
নিখিল জগতে কী অভাব আছে!
আছে মন্দ সমীরণ, পুষ্পবিভূষণ,
কোকিলকূজিত কুঞ্জ।

অশোক। বিশ্বচরাচর লুপ্ত হয়ে যায়,
এ কী ঘোর প্রেম অন্ধ রাহুপ্রায়
জীবন যৌবন গ্রাসে!

অমর ও কুমার। তবে কেন.
তবে কেন মিছে এ কুয়াশা!

মায়াকুমারীগণ। দেখো চেয়ে, দেখো ঐ কে আসিছে!
চাঁদের আলোতে কার হাসি হাসিছে।
হৃদয়দুয়ার খুলিয়ে দাও, প্রাণের মাঝারে তুলিয়ে লও,
ফুলগন্ধ সাথে তার সুবাস ভাসিছে।

প্রমদা ও সখীগণের প্রবেশ

প্রমদা। সুখে আছি সুখে আছি, সখা, আপন মনে।

প্রমদা ও সখীগণ। কিছু চেয়ো না, দূরে যেয়ো না—
শুধু চেয়ে দেখো, শুধু ঘিরে থাকো কাছাকাছি।

প্রমদা। সখা, নয়নে শুধু জানাবে প্রেম, নীরবে দিবে প্রাণ,
রচিয়া ললিত মধুর বাণী আড়ালে গাবে গান।
গোপনে তুলিয়া কুসুম গাঁথিয়া রেখে যাবে মালাগাছি।

প্রমদা ও সখীগণ। মন চেয়ো না, শুধু চেয়ে থাকো,
শুধু ঘিরে থাকো কাছাকাছি।

প্রমদা। মধুর জীবন, মধুর রজনী, মধুর মলয়বায়।
এই মাধুরী-ধারা বহিছে আপনি, কেহ কিছু নাহি চায়।

আমি আপনার মাঝে আপনি হারা, আপন সৌরভে সারা,
যেন আপনার মন আপনার প্রাণ আপনারে সঁপিয়াছি।

অশোক। ভালোবেসে দুখ সেও সুখ, সুখ নাহি আপনাতে।

প্রমদা ও সখীগণ। না না না, সখা, ভুলি নে ছলনাতে।

কুমার। মন দাও দাও দাও, সখী, দাও পরের হাতে।

প্রমদা ও সখীগণ। না না না, মোরা ভুলি নে ছলনাতে।

অশোক। সুখের শিশির নিমেষে শুকায়, সুখ চেয়ে দুখ ভালো—
আনো, সজল বিমল প্রেম ছলছল নলিননয়ন-পাতে।

প্রমদা ও সখীগণ। না না না, মোরা ভুলি নে ছলনাতে।

কুমার। রবির কিরণে ফুটিয়া নলিনী আপনি টুটিয়া যায়,
সুখ পায় তায় সে।
চিরকলিকাজনম কে করে বহন চিরশিশিররাতে।

প্রমদা ও সখীগণ। না না না, মোরা ভুলি নে ছলনাতে।

অমর। ওই কে গো হেসে চায়, চায় প্রাণের পানে।
গোপনে হৃদয়তলে কী জানি কিসের ছলে
আলোক হানে।
এ প্রাণ নূতন করে কে যেন দেখালে মোরে,
বাজিল মরমবীণা নূতন তানে।
এ পুলক কোথা ছিল, প্রাণ ভরি বিকশিল,
তৃষা-ভরা তৃষা-হরা এ অমৃত কোথা ছিল!
কোন্ চাঁদ হেসে চাহে, কোন্ পাখি গান গাহে,
কোন্ সমীরণ বহে লতাবিতানে।

প্রমদা। দূরে দাঁড়ায়ে আছে, কেন আসে না কাছে!
ওলো যা তোরা, যা সখী, যা শুধা গে
ওই আকুল অধর আঁখি কী ধন যাচে।

সখীগণ। ছি, ওলো ছি, হল কী, ওলো সখী!

প্রথমা। লাজবাঁধ কে ভাঙিল, এত দিনে শরম টুটিল!

তৃতীয়া। কেমনে যাব, কী শুধাব!

প্রথমা। লাজে মরি, কী মনে করে পাছে।

প্রমদা। যা, তোরা যা সখী, যা শুধা গে
ওই আকুল অধর আঁখি কী ধন যাচে।

মায়াকুমারীগণ। প্রেমপাশে ধরা পড়েছে দুজনে
দেখো দেখো সখী, চাহিয়া—
দুটি ফুল খসে ভেসে গেল ওই,
প্রণয়ের স্রোত বাহিয়া।

অমরের প্রতি

সখীগণ। ওগো, দেখি, আঁখি তুলে চাও—
তোমার চোখে কেন ঘুমঘোর!

অমর। আমি কী যেন করেছি পান,
কোন্ মদিরা রস-ভোর।
আমার চোখে তাই ঘুমঘোর।

সখীগণ। ছি ছি ছি!

অমর। সখী, ক্ষতি কী!
এ ভবে কেহ জ্ঞানী অতি, কেহ ভোলামন,
কেহ সচেতন, কেহ অচেতন,
কাহারো নয়নে হাসির কিরণ
কাহারো নয়নে লোর।
আমার চোখে শুধু ঘুমঘোর।

সখীগণ। সখা, কেন গো অচলপ্রায়
হেথা, দাঁড়ায়ে তরুছায়।

অমর। অবশ হৃদয়ভারে, চরণ
চলিতে নাহি চায়,
তাই দাঁড়ায়ে তরুছায়।

সখীগণ। ছি ছি ছি!

অমর। সখী, ক্ষতি কী!
এ ভবে কেহ পড়ে থাকে, কেহ চলে যায়,
কেহ বা আলসে চলিতে না চায়,
কেহ বা আপনি স্বাধীন কাহারো
চরণে পড়েছে ডোর।

কাহারো নয়নে লেগেছে ঘোর।

সখীগণ। ওকে বোঝা গেল না— চলে আয় চলে আয়।
ও কী কথা যে বলে সখী, কী চোখে যে চায়!
চলে আয়, চলে আয়।
লাজ টুটে শেষে মরি লাজে,
মিছে কাজে,
ধরা দিবে না যে, বলো কে পারে তায়।
আপনি সে জানে তার মন কোথায়।
চলে আয় চলে আয়।

[প্রস্থান

মায়াকুমারীগণ। প্রেমপাশে ধরা পড়েছে দুজনে
দেখো দেখো, সখী, চাহিয়া।
দুটি ফুল খসে ভেসে গেল ওই
প্রণয়ের স্রোত বাহিয়া।
চাঁদিনী যামিনী, মধু সমীরণ,
আধো ঘুমঘোর, আধো জাগরণ,
চোখোচোখি হতে ঘটালে প্রমাদ
কুহুস্বরে পিক গাহিয়া
দেখো দেখো, সখী, চাহিয়া।

পঞ্চম দৃশ্য

কানন

অমর। দিবস রজনী, আমি যেন কার
আশায় আশায় থাকি।
তাই চমকিত মন, চকিত শ্রবণ,
তৃষিত আকুল আঁখি।

চঞ্চল হয়ে ঘুরিয়ে বেড়াই,
সদা মনে হয় যদি দেখা পাই,
'কে আসিছে' ব'লে চমকিয়ে চাই
কাননে ডাকিলে পাখি।
জাগরণে তারে না দেখিতে পাই,
থাকি স্বপনের আশে—
ঘুমের আড়ালে যদি ধরা দেয়,
বাঁধিব স্বপনপাশে।
এত ভালোবাসি, এত যারে চাই,
মনে হয় না তো সে যে কাছে নাই—
যেন এ বাসনা ব্যাকুল আবেগে
তাহারে আনিবে ডাকি।

প্রমদা সখীগণ অশোক ও কুমারের প্রবেশ

কুমার। সখী, সাধ করে যাহা দেবে তাই লইব।
সখীগণ। আহা মরি মরি সাধের ভিখারি,
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণমন।
কুমার। দাও যদি ফুল, শিরে তুলে রাখিব।
সখী। দেয় যদি কাঁটা—
কুমার। তাও সহিব।
সখীগণ। আহা মরি মরি সাধের ভিখারি,
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণমন।
কুমার। যদি এক বার চাও, সখী, মধুর নয়ানে
ওই আঁখি-সুধাপানে
চিরজীবন মাতি রহিব।
সখীগণ। যদি কঠিন কটাক্ষ মিলে—
কুমার। তাও হৃদয়ে বিঁধায়ে চিরজীবন বহিব।
সখীগণ। আহা মরি মরি সাধের ভিখারি,
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণমন।

প্রমদা। আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল,
শুধাইল না কেহ।
সে তো এল না, যারে সঁপিলাম
এই প্রাণ মন দেহ।
সে কি মোর তরে পথ চাহে,
সে কি বিরহগীত গাহে,
যার বাঁশরি-ধ্বনি শুনিয়ে
আমি ত্যজিলাম গেহ।

মায়াকুমারীগণ। নিমেষের তরে শরমে বাধিল,
মরমের কথা হল না।
জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে
রহিল মরমবেদনা।

প্রমদার প্রতি

অশোক। ওগো সখী, দেখি দেখি মন কোথা আছে।

সখীগণ। কত কাতর হৃদয় ঘুরে ঘুরে হেরো কারে যাচে।

অশোক। কী মধু, কী সুধা, কী সৌরভ,
কী রূপ রেখেছ লুকায়ে!

সখীগণ। কোন্ প্রভাতে কোন্ রবির আলোকে
দিবে খুলিয়ে কাহার কাছে।

অশোক। সে যদি না আসে এ জীবনে,
এ কাননে পথ না পায়!

সখীগণ। যারা এসেছে তারা বসন্ত ফুরালে
নিরাশ প্রাণে ফেরে পাছে!

প্রমদা। এ তো খেলা নয়, খেলা নয়—
এ যে হৃদয়দহনজ্বালা সখী!
এ যে প্রাণভরা ব্যাকুলতা,
গোপন মনের ব্যথা,
এ যে কাহার চরণোদ্দেশে জীবন মরণ ঢালা।

কে যেন সতত মোরে
ডাকিয়া আকুল করে—
যাই যাই করে প্রাণ, যেতে পারি নে।
যে কথা বলিতে চাহি
তা বুঝি বলিতে নাহি—
কোথায় নামায়ে রাখি, সখী, এ প্রেমের ডালা!
যতনে গাঁথিয়ে শেষে পরাতে পারি নে মালা।

প্রথমা সখী। সে জন কে, সখী, বোঝা গেছে
আমাদের সখী যারে মনপ্রাণ সঁপেছে।

দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া। ও সে কে, কে, কে?

প্রথমা। ওই-যে তরুতলে, বিনোদমালা গলে,
না জানি কোন্ ছলে বসে রয়েছে।

দ্বিতীয়া। সখী, কী হবে—
ও কি কাছে আসিবে কভু, কথা কবে?

তৃতীয়া। ও কি প্রেম জানে, ও কি বাঁধন মানে?
ও কী মায়াগুণে মন লয়েছে!

দ্বিতীয়া। বিভল আঁখি তুলে আঁখি-পানে চায়,
যেন পথ ভুলে এল কোথায় ওগো!

তৃতীয়া। যেন কী গানের স্বরে, শ্রবণ আছে ভরে,
যেন কোন্ চাঁদের আলোয় মগ্ন হয়েছে।

অমর। ওই মধুর মুখ জাগে মনে।
ভুলিব না এ জীবনে
কী স্বপনে কী জাগরণে।
তুমি জান বা না জান,
মনে সদা যেন মধুর বাঁশরি বাজে
হৃদয়ে সদা আছ বলে।
আমি প্রকাশিতে পারি নে,
শুধু চাহি কাতর নয়নে।

সখীগণ। তারে কেমনে ধরিবে, সখী, যদি ধরা দিলে।

প্রথমা। তারে কেমনে কাঁদাবে, যদি আপনি কাঁদিলে।

দ্বিতীয়া। যদি মন পেতে চাও, মন রাখো গোপনে।
তৃতীয়া। কে তারে বাঁধিবে, তুমি আপনায় বাঁধিলে!
সকলে। কাছে আসিলে তো কেহ কাছে রহে না।
কথা কহিলে তো কেহ কথা কহে না।
প্রথমা। হাতে পেলে ভূমিতলে ফেলে চলে যায়।
দ্বিতীয়া। হাসিয়ে ফিরায় মুখ কাঁদিয়ে সাধিলে।

নিকটে আসিয়া প্রমদার প্রতি

অমর। সকল হৃদয় দিয়ে ভালো বেসেছি যারে
সে কি ফিরাতে পারে সখী!
সংসারবাহিরে থাকি
জানি নে কী ঘটে সংসারে।
কে জানে, হেথায় প্রাণপণে প্রাণ যারে চায়
তারে পায় কি না পায় জানি নে।
ভয়ে ভয়ে তাই এসেছি গো, অজানা-হৃদয়-দ্বারে।
তোমার সকলি ভালোবাসি—
ওই রূপরাশি,
ওই খেলা, ওই গান, ওই মধুহাসি।
ওই দিয়ে আছ ছেয়ে জীবন আমারি,
কোথায় তোমার সীমা ভুবনমাঝারে!
সখীগণ। তুমি কে গো, সখীরে কেন জানাও বাসনা!
দ্বিতীয়া। কে জানিতে চায়, তুমি ভালোবাস কি ভালোবাস না!
প্রথমা। হাসে চন্দ্র, হাসে সন্ধ্যা, ফুল্ল কুঞ্জকানন,
হাসে হৃদয়বসন্তে বিকচ যৌবন।
তুমি কেন ফেল শ্বাস, তুমি কেন হাস না!
সকলে। এসেছ কি ভেঙে দিতে খেলা—
সখীতে সখীতে এই হৃদয়ের মেলা?
দ্বিতীয়া। আপন দুঃখ আপন ছায়া লয়ে যাও।
প্রথমা। জীবনের আনন্দপথ ছেড়ে দাঁড়াও।
তৃতীয়া। দূর হতে করো পূজা হৃদয়কমল-আসনা।

অমর। তবে সুখে থাকো, সুখে থাকো— আমি যাই— যাই।
প্রমদা। সখী, ওরে ডাকো, মিছে খেলায় কাজ নাই।
সখীগণ। অধীরা হোয়ো না, সখী,
আশ মেটালে ফেরে না কেহ,
আশ রাখিলে ফেরে।
অমর। ছিলাম একেলা সেই আপন ভুবনে,
এসেছি এ কোথায়!
হেথাকার পথ জানি নে, ফিরে যাই।
যদি সেই বিরামভবন ফিরে পাই।

[প্রস্থান

প্রমদা। সখী, ওরে ডাকো ফিরে।
মিছে খেলা মিছে হেলা কাজ নাই।
সখীগণ। অধীরা হোয়ো না, সখী,
আশ মেটালে ফেরে না কেহ,
আশ রাখিলে ফেরে।

[প্রস্থান

মায়াকুমারীগণ। নিমেষের তরে শরমে বাধিল,
মরমের কথা হল না।
জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে
রহিল মরমবেদনা।
চোখে চোখে সদা রাখিবারে সাধ,
পলক পড়িল, ঘটিল বিষাদ—
মেলিতে নয়ন মিলাল স্বপন
এমনি প্রেমের ছলনা।

ষষ্ঠ দৃশ্য

গৃহ

শান্তা। অমরের প্রবেশ

অমর। সেই শান্তিভবন ভুবন কোথা গেল!
সেই রবি শশী তারা, সেই শোকশান্ত সন্ধ্যাসমীরণ,
সেই শোভা, সেই ছায়া, সেই স্বপন!
সেই আপন হৃদয়ে আপন বিরাম কোথা গেল,
গৃহহারা হৃদয় লবে কাহার শরণ!

শান্তার প্রতি

এসেছি ফিরিয়ে, জেনেছি তোমারে,
এনেছি হৃদয় তব পায়—
শীতল স্নেহসুধা করো দান,
দাও প্রেম, দাও শান্তি, দাও নূতন জীবন।

মায়াকুমারীগণ। কাছে ছিলে দূরে গেলে, দূর হতে এস কাছে।
ভুবন ভ্রমিলে তুমি, সে এখনো বসে আছে।
ছিল না প্রেমের আলো, চিনিতে পার নি ভালো,
এখন বিরহানলে প্রেমানল জ্বলিয়াছে।

শান্তা। দেখো, সখা, ভুল করে ভালোবেসো না!
আমি ভালোবাসি ব'লে কাছে এসো না।
তুমি যাহে সুখী হও তাই করো সখা,
আমি সুখী হব বলে যেন হেসো না।
আপন বিরহ লয়ে আছি আমি ভালো,
কী হবে চির আঁধারে নিমেষের আলো!
আশা ছেড়ে ভেসে যাই, যা হবার হবে তাই—
আমার অদৃষ্টস্রোতে তুমি ভেসো না।

অমর। ভুল করেছিনু, ভুল ভেঙেছে।
এবার জেগেছি, জেনেছি—
এবার আর ভুল নয়, ভুল নয়।

ফিরেছি মায়ার পিছে পিছে,
জেনেছি স্বপন সব মিছে,
বিঁধেছে বাসনা-কাঁটা প্রাণে—
এ তো ফুল নয় ফুল নয়!
পাই যদি ভালোবাসা হেলা করিব না,
খেলা করিব না লয়ে মন।
ওই প্রেমময় প্রাণে লইব আশ্রয় সখী,
অতল সাগর এ সংসার,
এ তো কূল নয়, কূল নয়!

প্রমদার সখীগণের প্রবেশ

দূর হইতে

সখীগণ। অলি বার বার ফিরে যায়,
অলি বার বার ফিরে আসে,
তবে তো ফুল বিকাশে।
প্রথমা। কলি ফুটিতে চাহে— ফোটে না,
মরে লাজে, মরে ত্রাসে।
ভুলি মান অপমান, দাও মন প্রাণ,
নিশি দিন রহ পাশে।
দ্বিতীয়া। ওগো, আশা ছেড়ে তবু আশা রেখে দাও।
হৃদয়রতন-আশে।
সকলে। ফিরে এস, ফিরে এস, বন মোদিত ফুলবাসে।
আজি বিরহরজনী ফুল্ল কুসুম শিশিরসলিলে ভাসে।
অমর। ঐ কে আমায় ফিরে ডাকে!
ফিরে যে এসেছে তারে কে মনে রাখে!
মায়াকুমারীগণ। বিদায় করেছ যারে নয়নজলে
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে গো!
আজি মধু সমীরণে নিশীথে কুসুমবনে
তারে কি পড়েছে মনে বকুলতলে?
এখন ফিরাবে আর কিসের ছলে গো!

অমর। আমি চলে এনু বলে কার বাজে ব্যথা,
কাহার মনের কথা মনেই থাকে!
আমি শুধু বুঝি, সখী, সরল ভাষা—
সরল হৃদয় আর সরল ভালোবাসা।
তোমাদের কত আছে, কত মন প্রাণ—
আমার হৃদয় নিয়ে ফেলো না বিপাকে।

মায়াকুমারীগণ। সেদিনও তো মধুনিশি প্রাণে গিয়েছিল মিশি,
মুকুলিত দশদিশি কুসুমদলে।
দুটি সোহাগের বাণী যদি হত কানাকানি
যদি ঐ মালাখানি পরাতে গলে!
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে গো!

অমরের প্রতি

শান্তা। না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আঁখিজলে!
ওগো, কে আছে চাহিয়া শূন্য পথপানে—
কাহার জীবনে নাহি সুখ, কাহার পরান জ্বলে।
পড় নি কাহার নয়নের ভাষা,
বোঝ নি কাহার মরমের আশা,
দেখ নি ফিরে—
কার ব্যাকুল প্রাণের সাধ এসেছ দ'লে।

অমর। আমি কারেও বুঝি নে, শুধু বুঝেছি তোমারে।
তোমাতে পেয়েছি আলো সংশয়-আঁধারে।
ফিরিয়াছি এ ভুবন, পাই নি তো কারো মন,
গিয়েছি তোমারি শুধু মনের মাঝারে।
এ সংসারে কে ফিরাবে, কে লইবে ডাকি,
আজিও বুঝিতে নারি— ভয়ে ভয়ে থাকি।
কেবল তোমারে জানি, বুঝেছি তোমার বাণী—
তোমাতে পেয়েছি কূল অকূল পাথারে। [প্রস্থান

সখীগণ। প্রভাত হইল নিশি কানন ঘুরে,
বিরহবিধুর হিয়া মরিল ঝুরে।

ম্লান শশী অস্তে গেল, ম্লান হাসি মিলাইল,
কাঁদিয়া উঠিল প্রাণ কাতর স্বরে।

প্রমদার প্রবেশ

প্রমদা। চলো সখী, চলো তবে ঘরেতে ফিরে,
যাক ভেসে ম্লান আঁখি নয়ননীরে।
যাক ফেটে শূন্য প্রাণ, হোক্ আশা অবসান—
হৃদয় যাহারে ডাকে থাক্ সে দূরে।

[প্রস্থান

মায়াকুমারীগণ। মধুনিশি পূর্ণিমার ফিরে আসে বার বার,
সে জন ফেরে না আর যে গেছে চলে।
ছিল তিথি অনুকূল, শুধু নিমেষের ভুল—
চিরদিন তৃষাকুল পরান জ্বলে।
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে গো।

সপ্তম দৃশ্য

কানন

অমর শান্তা অন্যান্য পুরনারী ও পৌরজন

স্ত্রীগণ। এস এস, বসন্ত, ধরাতলে।
আনো কুহুতান, প্রেমগান,
আনো গন্ধমদভরে অলস সমীরণ,
আনো নবযৌবনহিল্লোল, নব প্রাণ,
প্রফুল্ল নবীন বাসনা ধরাতলে।

পুরুষগণ। এস থরথর-কম্পিত মর্মরমুখরিত
নব-পল্লব-পুলকিত
ফুল-আকুল-মালতী-বল্লি-বিতানে,
সুখছায়ে মধুবায়ে এস এস।
এস অরুণচরণ কমলবরণ তরুণ উষার কোলে।

এস জ্যোৎস্নাবিবশ নিশীথে,
কল-কল্লোল তটিনীতীরে,
সুখসুপ্ত সরসীনীরে এস এস।

স্ত্রীগণ। এস যৌবনকাতর হৃদয়ে,
এস মিলনসুখালস নয়নে,
এস মধুর শরমমাঝারে,
দাও বাহুতে বাহু বাঁধি,
নবীন কুসুমপাশে রচি দাও নবীন মিলনবাঁধন।

শান্তার প্রতি

অমর। মধুর বসন্ত এসেছে মধুর মিলন ঘটাতে,
মধুর মলয়সমীরে মধুর মিলন রটাতে।
কুহকলেখনী ছুটায়ে কুসুম তুলিছে ফুটায়ে,
লিখিছে প্রণয়কাহিনী বিবিধ বরনছটাতে।
হেরো পুরানো প্রাচীন ধরণী হয়েছে শ্যামলবরনী,
যেন যৌবনপ্রবাহ ছুটেছে কালের শাসন টুটাতে।
পুরানো বিরহ হানিছে, নবীন মিলন আনিছে—
নবীন বসন্ত আইল নবীন জীবন ফুটাতে।

স্ত্রীগণ। আজি আঁখি জুড়াল হেরিয়ে
মনোমোহন মিলনমাধুরী, যুগল মুরতি।

পুরুষগণ। ফুলগন্ধে আকুল করে, বাজে বাঁশরি উদাস স্বরে,
নিকুঞ্জ প্লাবিত চন্দ্রকরে—

স্ত্রীগণ। তারি মাঝে মনোমোহন মিলনমাধুরী, যুগল মুরতি।
আনো আনো ফুলমালা, দাও দোঁহে বাঁধিয়ে।

পুরুষগণ। হৃদয়ে পশিবে ফুলপাশ, অক্ষয় হবে প্রেমবন্ধন।

স্ত্রীগণ। চিরদিন হেরিব হে
মনোমোহন মিলনমাধুরী, যুগল মুরতি।

প্রমদা ও সখীগণের প্রবেশ

অমর। এ কি স্বপ্ন! এ কি মায়া!
এ কি প্রমদা! এ কি প্রমদার ছায়া!

প্রমদার প্রতি

শান্তা। আহা, কে গো তুমি মলিনবয়নে
আধ-নিমীলিত নলিননয়নে
যেন আপনারি হৃদয়শয়নে
আপনি রয়েছ লীন।

পুরুষগণ। তোমা-তরে সবে রয়েছে চাহিয়া,
তোমা লাগি পিক উঠিছে গাহিয়া,
ভিখারি সমীর কানন বাহিয়া
ফিরিতেছে সারা দিন।

অমর। এ কি স্বপ্ন! এ কি মায়া!
এ কি প্রমদা! এ কি প্রমদার ছায়া!

শান্তা। যেন শরতের মেঘখানি ভেসে
চাঁদের সভাতে দাঁড়ায়েছ এসে,
এখনি মিলাবে ম্লান হাসি হেসে—
কাঁদিয়া পড়িবে ঝরি!

পুরুষগণ। জাগিছে পূর্ণিমা পূর্ণ নীলাম্বরে,
কাননে চামেলি ফুটে থরে থরে,
হাসিটি কখন ফুটিবে অধরে
রয়েছি তিয়াষ ধরি।

অমর। এ কি স্বপ্ন! এ কি মায়া!
এ কি প্রমদা! এ কি প্রমদার ছায়া।

সখীগণ। আহা, আজি এ বসন্তে এত ফুল ফুটে,
এত বাঁশি বাজে, এত পাখি গায়,
সখীর হৃদয় কুসুমকোমল—
কার অনাদরে আজি ঝরে যায়!
কেন কাছে আস, কেন মিছে হাস,
কাছে যে আসিত সে তো আসিতে না চায়!
সুখে আছে যারা সুখে থাক তারা,
সুখের বসন্ত সুখে হোক্‌ সারা,
দুখিনী নারীর নয়নের নীর

সুখী জনে যেন দেখিতে না পায়।
তারা দেখেও দেখে না, তারা বুঝেও বোঝে না,
তারা ফিরেও না চায়।

শান্তা। আমি তো বুঝেছি সব— যে বোঝে না বোঝে—
গোপনে হৃদয় দুটি কে কাহারে খোঁজে।
আপনি বিরহ গড়ি আপনি রয়েছ পড়ি,
বাসনা কাঁদিছে বসি হৃদয়সরোজে।
আমি কেন মাঝে থেকে দুজনারে রাখি ঢেকে,
এমন ভ্রমের তলে কেন থাকি মজে।

প্রমদার প্রতি

অশোক। এতদিন বুঝি নাই, বুঝেছি ধীরে—
ভালো যারে বাস তারে আনিব ফিরে।
হৃদয়ে হৃদয় বাঁধা, দেখিতে না পায় আঁধা—
নয়ন রয়েছে ঢাকা নয়ননীরে।

শান্তা ও স্ত্রীগণ। চাঁদ, হাসো, হাসো—
হারা হৃদয় দুটি ফিরে এসেছে।

পুরুষগণ। কত দুখে কত দূরে আঁধার সাগর ঘুরে
সোনার তরণী দুটি তীরে এসেছে।
মিলন দেখিবে বলে ফিরে বায়ু কুতূহলে,
চারি ধারে ফুলগুলি ঘিরে এসেছে।

সকলে। চাঁদ, হাসো, হাসো—
হারা হৃদয় দুটি ফিরে এসেছে।

প্রমদা। আর কেন, আর কেন
দলিত কুসুমে বহে বসন্তসমীরণ।
ফুরায়ে গিয়াছে বেলা, এখন এ মিছে খেলা—
নিশান্তে মলিন দীপ কেন জ্বলে অকারণ!

সখীগণ। অশ্রু যবে ফুরায়েছে তখন মুছাতে এলে,
অশ্রু-ভরা হাসি-ভরা নবীন নয়ন ফেলে!

প্রমদা। এই লও, এই ধরো, এ মালা তোমরা পরো,
এ খেলা তোমরা খেলো— সুখে থাকো অনুক্ষণ।

অমর। এ ভাঙা সুখের মাঝে নয়নজলে,
এ মলিন মালা কে লইবে।
ম্লান আলো ম্লান আশা হৃদয়তলে,
এ চির বিষাদ কে বহিবে!
সুখনিশি অবসান— গেছে হাসি, গেছে গান,
এখন এ ভাঙা প্রাণ লইয়া গলে
নীরব নিরাশা কে সহিবে!

শান্তা। যদি কেহ নাহি চায় আমি লইব,
তোমার সকল দুখ আমি সহিব,
আমার হৃদয় মন সব দিব বিসর্জন—
তোমার হৃদয়ভার আমি বহিব।
ভুল-ভাঙা দিবালোকে চাহিব তোমার চোখে,
প্রশান্ত সুখের কথা আমি কহিব।

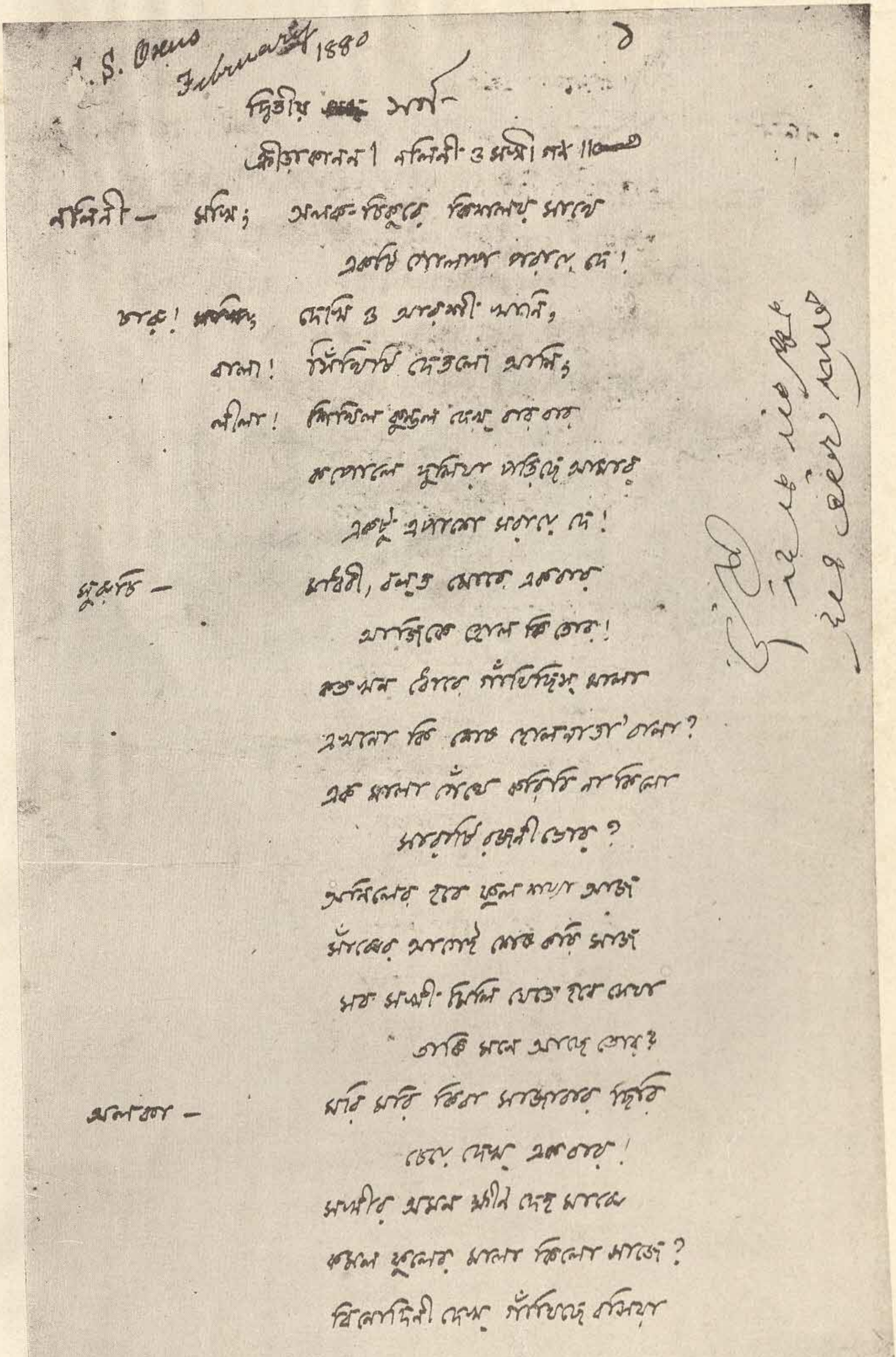
[অমর ও শান্তার প্রস্থান

মায়াকুমারীগণ। দুখের মিলন টুটিবার নয়—
নাহি আর ভয়, নাহি সংশয়।
নয়নসলিলে যে হাসি ফুটে গো
রয় তাহা রয় চিরদিন রয়।

প্রমদা। কেন এলি রে, ভালোবাসিলি, ভালোবাসা পেলি নে!
কেন সংসারেতে উঁকি মেরে চলে গেলি নে!

সখীগণ। সংসার কঠিন বড়ো কারেও সে ডাকে না,
কারেও সে ধরে রাখে না।
যে থাকে সে থাকে আর যে যায় সে যায়,
কারো তরে ফিরেও না চায়।

প্রমদা। হায় হায়, এ সংসারে যদি না পুরিল
আজন্মের প্রাণের বাসনা
চলে যাও ম্লান মুখে, ধীরে ধীরে ফিরে যাও,
থেকে যেতে কেহ বলিবে না।
তোমার ব্যথা তোমার অশ্রু তুমি নিয়ে যাবে,
আর তো কেহ অশ্রু ফেলিবে না। [প্রস্থান


S. Owens
February 1880
1

দ্বিতীয় সর্গ

ক্রীড়াকানন। নলিনী ও সখীগণ।

নলিনী — সখি; অলক-চিকুরে কিসলয় মাঝে
একটি গোলাপ পরায়ে দে!
চারু! দেখি ও আরশী আনি,
বালা! সিঁথিটি দে তলো আনি;
লীলা! ঝিকিমিকি কুন্তল দেখ্ তার তার
কপোলে দুলিয়া পড়িছে আমার
একটু এখানে সরায়ে দে!

সুরুচি — সজনী, বলত তোমার একি ভাব
আজিকে হোল কি তোর!
কত মন দিয়ে গাঁথিছিস মালা
এখনো কি তোর হোলনাক' ভোর?
এক মালা গেঁথে সাধ কি না মিলো
ফুরায়ে রজনী তোর?
অনিলের হাতে ফুল মালা আজি
সাঁঝের আগেই গেছে কবি সাজি
সব সখী মিলি যেতে হবে যেথা
তাকি মনে আছে তোর?

অলকা — সাধ্ সাধ্ কিবা সাজাবার ছিরি
চেয়ে দেখ্ একবার!
শরীরে অমন ক্ষীণ দেহ মাঝে
কমল ফুলের মালা কিলো সাজে?
বিনোদিনী দেখ্ গাঁথিছে বসিয়া

'ভগ্নহৃদয়' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা

মায়াকুমারীগণ

সকলে। এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না,
প্রথমা। শুধু সুখ চলে যায়—
দ্বিতীয়া। এমনি মায়ার ছলনা।
তৃতীয়া। এরা ভুলে যায় কারে ছেড়ে কারে চায়।
সকলে। তাই কেঁদে কাটে নিশি, তাই দহে প্রাণ,
তাই মান অভিমান—
প্রথমা। তাই এত হায়-হায়।
দ্বিতীয়া। প্রেমে সুখ দুখ ভুলে তবে সুখ পায়।
সকলে। সখী, চলো, গেল নিশি, স্বপন ফুরাল,
মিছে আর কেন বল।
প্রথমা। শশী ঘুমের কুহক নিয়ে গেল অস্তাচল।
সকলে। সখী চলো।
প্রথমা। প্রেমের কাহিনী-গান হয়ে গেল অবসান।
দ্বিতীয়া। এখন কেহ হাসে, কেহ বসে ফেলে অশ্রুজল।

রাজা ও রানী

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বড়দাদা মহাশয়ের
শ্রীচরণকমলে
এই গ্রন্থ উৎসৃষ্ট হইল

সূচনা

একদিন বড়ো আকারে দেখা দিল একটি নাটক— রাজা ও রানী। এর নাট্যভূমিতে রয়েছে লিরিকের প্লাবন, তাতে নাটককে করেছে দুর্বল। এ হয়েছে কাব্যের জলাভূমি। ওই লিরিকের টানে এর মধ্যে প্রবেশ করেছে ইলা এবং কুমারের উপসর্গ। সেটা অত্যন্ত শোচনীয়রূপে অসংগত। এই নাটকে যথার্থ নাট্যপরিণতি দেখা দিয়েছে যেখানে বিক্রমের দুর্দান্ত প্রেম প্রতিহত হয়ে পরিণত হয়েছে দুর্দান্ত হিংস্রতায়, আত্মঘাতী প্রেম হয়ে উঠেছে বিশ্বঘাতী।

প্রকৃতির প্রতিশোধের সঙ্গে 'রাজা ও রানী'র এক জায়গায় মিল আছে। অসীমের সন্ধানে সন্ন্যাসী বাস্তব হতে ভ্রষ্ট হয়ে সত্য হতে ভ্রষ্ট হয়েছে, বিক্রম তেমনি প্রেমে বাস্তবের সীমাকে লঙ্ঘন করতে গিয়ে সত্যকে হারিয়েছে। এই তত্ত্বকেই যে সজ্ঞানে লক্ষ্য করে লেখা হয়েছে তা নয়। এর মধ্যে এই কথাটাই প্রকাশ পাবার জন্যে স্বত উদ্যত হয়েছে যে, সংসারের জমি থেকে প্রেমকে উৎপাটিত করে আনলে সে আপনার রস আপনি জোগাতে পারে না, তার মধ্যে বিকৃতি ঘটতে থাকে।—

এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম,
প্রেম মেলে না।
শুধু সুখ চলে যায়
এমনি মায়ার ছলনা।

নাটকের পাত্রগণ

বিক্রমদেব	জালন্ধরের রাজা
দেবদত্ত	রাজার বাল্যসখা ব্রাহ্মণ
ত্রিবেদী	বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ
জয়সেন, যুধাজিৎ	রাজ্যের প্রধান নায়ক
মিহিরগুপ্ত	জয়সেনের অমাত্য
চন্দ্রসেন	কাশ্মীরের রাজা
কুমার	কাশ্মীরের যুবরাজ। চন্দ্রসেনের ভ্রাতুষ্পুত্র
শংকর	কুমারের পুরাতন বৃদ্ধ ভৃত্য
অমরুরাজ	ত্রিচূড়ের রাজা
সুমিত্রা	জালন্ধরের মহিষী। কুমারের ভগিনী
নারায়ণী	দেবদত্তের স্ত্রী
রেবতী	চন্দ্রসেনের মহিষী
ইলা	অমরুর কন্যা। কুমারের সহিত বিবাহপণে বদ্ধ

রাজা ও রানী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জালন্ধর

প্রাসাদের এক কক্ষ

বিক্রমদেব ও দেবদত্ত

দেবদত্ত । মহারাজ, এ কী উপদ্রব !

বিক্রমদেব । হয়েছে কী !

দেবদত্ত । আমাকে বরিবে নাকি পুরোহিতপদে ?
কী দোষ করেছি প্রভো ? কবে শুনিয়াছ
ত্রিষ্টুভ্ অনুষ্টুভ্ এই পাপমুখে ?
তোমার সংসর্গে পড়ে ভুলে বসে আছি
যত যাগযজ্ঞবিধি । আমি পুরোহিত ?
শ্রুতিস্মৃতি ঢালিয়াছি বিস্মৃতির জলে ।
এক বই পিতা নয় তাঁরি নাম ভুলি,
দেবতা তেত্রিশ কোটি গড় করি সবে ।
স্কন্ধে ঝুলে পড়ে আছে শুধু পৈতেখানা
তেজোহীন ব্রহ্মণ্যের নির্বিষ খোলষ ।

বিক্রমদেব । তাই তো নির্ভয়ে আমি দিয়েছি তোমারে
পৌরোহিত্যভার । শাস্ত্র নাই, মন্ত্র নাই,
নাই কোনো ব্রহ্মণ্য-বালাই ।

দেবদত্ত। তুমি চাও
নখদন্তভাঙা এক পোষা পুরোহিত ?
বিক্রমদেব। পুরোহিত, একেকটা ব্রহ্মদৈত্য যেন।
একে তো আহার করে রাজস্কন্ধে চেপে
সুখে বারো মাস, তার পরে দিন রাত
অনুষ্ঠান, উপদ্রব, নিষেধ, বিধান,
অনুযোগ, অনুস্বর-বিসর্গের ঘটা—
দক্ষিণায় পূর্ণ হস্তে শূন্য আশীর্বাদ।
দেবদত্ত। শাস্ত্রহীন ব্রাহ্মণের প্রয়োজন যদি
আছেন ত্রিবেদী— অতিশয় সাধুলোক,
সর্বদাই রয়েছেন জপমালা হাতে
ক্রিয়াকর্ম নিয়ে ; শুধু মন্ত্র-উচ্চারণে
লেশমাত্র নাই তাঁর ক্রিয়াকর্মজ্ঞান।
বিক্রমদেব। অতি ভয়ানক। সখা, শাস্ত্র নাই যার
শাস্ত্রের উপদ্রব তার চতুর্‌গুণ।
নাই যার বেদবিদ্যা, ব্যাকরণবিধি,
নাই তার বাধাবিঘ্ন— শুধু বুলি ছোটে
পশ্চাতে ফেলিয়া রেখে তদ্ধিতপ্রত্যয়
অমর-পাণিনি। একসঙ্গে নাহি সয়
রাজা আর ব্যাকরণ দোঁহারে পীড়ন।
দেবদত্ত। আমি পুরোহিত ! মহারাজ, এ সংবাদে
ঘন আন্দোলিত হবে কেশলেশহীন
যতেক চিক্কণ মাথা ; অমঙ্গল স্মরি
রাজ্যের টিকি যত হবে কণ্টকিত।
বিক্রমদেব। কেন অমঙ্গলশঙ্কা ?
দেবদত্ত। কর্মকাণ্ডহীন
এ দীন বিপ্রের দোষে কুলদেবতার
রোষহুতাশন—
বিক্রমদেব। রেখে দাও বিভীষিকা।
কুলদেবতার রোষ নতশির পাতি

সহিতে প্রস্তুত আছি ; সহে না কেবল
কুলপুরোহিত-আস্ফালন। জান সখা,
দীপ্ত সূর্য সহ্য হয় তপ্ত বালি চেয়ে।
দূর করো মিছে তর্ক যত। এস করি
কাব্য-আলোচনা। কাল বলেছিলে তুমি
পুরাতন কবিবাক্য 'নাহিকো বিশ্বাস
রমণীরে'— আর-বার বলো শুনি।

দেবদত্ত। শাস্ত্রং—

বিক্রমদেব। রক্ষা করো— ছেড়ে দাও অনুস্বরগুলো।

দেবদত্ত। অনুস্বর ধনুঃশর নহে, মহারাজ,
কেবল টংকারমাত্র। হে বীরপুরুষ,
ভয় নাই। ভালো, আমি ভাষায় বলিব।—
'যত চিন্তা কর শাস্ত্র চিন্তা আরো বাড়ে,
যত পূজা কর ভূপে ভয় নাহি ছাড়ে।
কোলে থাকিলেও নারী রেখো সাবধানে।
শাস্ত্র, নৃপ, নারী কভু বশ নাহি মানে।'

বিক্রমদেব। বশ নাহি মানে! ধিক্ স্পর্ধা, কবি, তব!
চাহে কে করিতে বশ? বিদ্রোহী সে জন।
বশ করিবার নহে নৃপতি, রমণী।

দেবদত্ত। তা বটে। পুরুষ রবে রমণীর বশে।

বিক্রমদেব। রমণীর হৃদয়ের রহস্য কে জানে?
বিধির বিধান-সম অজ্ঞেয়— তা ব'লে
অবিশ্বাস জন্মে যদি বিধির বিধানে,
রমণীর প্রেমে— আশ্রয় কোথায় পাবে?
নদী ধায়, বায়ু বহে কেমনে কে জানে।
সেই নদী দেশের কল্যাণপ্রবাহিণী,
সেই বায়ু জীবের জীবন।

দেবদত্ত। বন্যা আনে
সেই নদী, সেই বায়ু ঝঞ্ঝা নিয়ে আসে।

বিক্রমদেব। প্রাণ দেয়, মৃত্যু দেয়— লই শিরে তুলি।

তাই ব'লে কোন্ মূর্খ চাহে তাহাদের
বশ করিবারে! বদ্ধনদী বদ্ধবায়ু
রোগ-শোক-মৃত্যুর নিদান। হে ব্রাহ্মণ,
নারীর কী জান তুমি?

দেবদত্ত। কিছু না রাজন্!
ছিলাম উজ্জ্বল করে পিতৃমাতৃকুল
ভদ্র ব্রাহ্মণের ছেলে। তিন সন্ধ্যা ছিল
আহ্নিক তর্পণ। শেষে তোমারি সংসর্গে
বিসর্জন করিয়াছি সকল দেবতা,
কেবল অনঙ্গদেব রয়েছেন বাকি।
ভুলেছি মহিম্নস্তব, শিখেছি গাহিতে
নারীর মহিমা। সে বিদ্যাও পুঁথিগত—
তার পরে মাঝে মাঝে চক্ষু রাঙাইলে
সে বিদ্যাও ছুটে যায় স্বপ্নের মতন।

বিক্রমদেব। না না, ভয় নাই, সখা, মৌন রহিলাম—
তোমার নূতন বিদ্যা বলে যাও তুমি।

দেবদত্ত। শুন তবে— বলিছেন কবি ভর্তৃহরি—
'নারীর বচনে মধু, হৃদয়েতে হলাহল,
অধরে পিয়ায় সুধা, চিত্তে জ্বালে দাবানল।'

বিক্রমদেব। সেই পুরাতন কথা!

দেবদত্ত। সত্য পুরাতন।
কী করিব মহারাজ, যত পুঁথি খুলি
ওই এক কথা। যত প্রাচীন পণ্ডিত
প্রেয়সীরে ঘরে নিয়ে এক দণ্ড কভু
ছিল না সুস্থির। আমি শুধু ভাবি, যার
ঘরের ব্রাহ্মণী ফিরে পরের সন্ধানে
সে কেমনে কাব্য লেখে ছন্দ গেঁথে গেঁথে
পরম নিশ্চিন্ত মনে?

বিক্রমদেব। মিথ্যা অবিশ্বাস।
ও কেবল ইচ্ছাকৃত আত্মপ্রবঞ্চনা।

ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রেম নিতান্ত বিশ্বাসে
হয়ে আসে মৃত জড়বৎ, তাই তারে
জাগায়ে তুলিতে হয় মিথ্যা অবিশ্বাসে।
হেরো ওই আসিছেন মন্ত্রী, স্তূপাকার
রাজ্যভার স্কন্ধে নিয়ে। পলায়ন করি।

দেবদত্ত। রানীর রাজত্বে তুমি লও গে আশ্রয়।
ধাও অন্তঃপুরে। অসম্পূর্ণ রাজকার্য
দুয়ার-বাহিরে পড়ে থাক্, স্ফীত হোক
যত যায় দিন। তোমার দুয়ার ছাড়ি
ক্রমে উঠিবে সে ঊর্ধ্বদিকে, দেবতার
বিচার-আসন-পানে।

বিক্রমদেব। এ কি উপদেশ ?

দেবদত্ত। না রাজন্, প্রলাপবচন। যাও তুমি,
কাল নষ্ট হয়।

[বিক্রমদেবের প্রস্থান

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। ছিলেন না মহারাজ ?

দেবদত্ত। করেছেন অন্তর্ধান অন্তঃপুর-পানে।

বসিয়া পড়িয়া

মন্ত্রী। হা বিধাতঃ, এ রাজ্যের কী দশা করিলে !
কোথা রাজা, কোথা দণ্ড, কোথা সিংহাসন !
শ্মশানভূমির মতো বিষণ্ণ বিশাল
রাজ্যের বক্ষের 'পরে সগর্বে দাঁড়ায়ে
বধির পাষাণ রুদ্ধ অন্ধ অন্তঃপুর।
রাজশ্রী দুয়ারে বসি অনাথার বেশে
কাঁদে হাহাকাররবে।

দেবদত্ত। দেখে হাসি আসে।
রাজা করে পলায়ন, রাজ্য ধায় পিছে—
হল ভালো, মন্ত্রিবর, অহর্নিশি যেন
রাজ্য ও রাজায় মিলে লুকোচুরি খেলা।

মন্ত্রী। এ কি হাসিবার কথা ব্রাহ্মণঠাকুর?
দেবদত্ত। না হাসিয়া করিব কী? অরণ্যে ক্রন্দন
সে তো বালকের কাজ। দিবসরজনী
বিলাপ না হয় সহ্য, তাই মাঝে মাঝে
রোদনের পরিবর্তে শুষ্ক শ্বেত হাসি
জমাট অশ্রুর মতো তুষারকঠিন।
কী ঘটেছে বলো শুনি।
মন্ত্রী। জান তো সকলি।
রানীর কুটুম্ব যত বিদেশী কাশ্মীরী
দেশ জুড়ে বসিয়াছে। রাজার প্রতাপ
ভাগ করে লইয়াছে খণ্ড খণ্ড করি,
বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন মৃত সতীদেহ-সম।
বিদেশীর অত্যাচারে জর্জর কাতর
কাঁদে প্রজা। অরাজক রাজসভামাঝে
মিলায় ক্রন্দন। বিদেশী অমাত্য যত
বসে বসে হাসে। শূন্যসিংহাসন-পার্শ্বে
বিদীর্ণহৃদয় মন্ত্রী বসি নতশিরে।
দেবদত্ত। বহে ঝড়, ডোবে তরী, কাঁদে যাত্রী যত,
রিক্তহস্ত কর্ণধার উচ্চে একা বসি
বলে 'কর্ণ কোথা গেল!' মিছে খুঁজে মর,
রমণী নিয়েছে টেনে রাজকর্ণখানা,
বাহিছে প্রেমের তরী লীলাসরোবরে
বসন্তপবনে। রাজ্যের বোঝাই নিয়ে
মন্ত্রীটা মরুক ডুবে অকূল পাথারে।
মন্ত্রী। হেসো না ঠাকুর! ছি ছি, শোকের সময়ে
হাসি অকল্যাণ।
দেবদত্ত। আমি বলি মন্ত্রিবর,
রাজারে ডিঙায়ে, একেবারে পড়ো গিয়ে
রানীর চরণে।
মন্ত্রী। আমি পারিব না তাহা।

আপন আত্মীয়জনে করিবে বিচার
রমণী, এমন কথা শুনি নাই কভু।

দেবদত্ত। শুধু শাস্ত্র জান মন্ত্রী, চেন না মানুষ।
বরঞ্চ আপন জনে আপনার হাতে
দণ্ড দিতে পারে নারী, পারে না সহিতে
পরের বিচার।

মন্ত্রী। ওই শোনো কোলাহল।

দেবদত্ত। এ কি প্রজার বিদ্রোহ?

মন্ত্রী। চলো দেখে আসি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপথ

লোকারণ্য

কিনু নাপিত। ওরে ভাই, কান্নার দিন নয়। অনেক কেঁদেছি, তাতে কিছু হল কি?

মন্‌সুখ চাষা। ঠিক বলেছিস রে, সাহসে সব কাজ হয়— ওই-যে কথায় বলে 'আছে যার বুকের পাটা যমরাজকে সে দেখায় ঝাঁটা'।

কুঞ্জরলাল কামার। ভিক্ষে করে কিছু হবে না, আমরা লুঠ করব।

কিনু নাপিত। ভিক্ষেং নৈম নৈমচং। কী বল খুড়ো, তুমি তো স্মার্ত ব্রাহ্মণের ছেলে, লুঠপাটে দোষ আছে কি?

নন্দলাল। কিছু না, খিদের কাছে পাপ নেই রে বাবা! জানিস তো অগ্নিকে বলে পাবক, অগ্নিতে সকল পাপ নষ্ট করে। জঠরাগ্নির বাড়া তো আর অগ্নি নেই।

অনেকে। আগুন! তা ঠিক বলেছ। বেঁচে থাকো ঠাকুর! তবে তাই হবে। তা, আমরা আগুনই লাগিয়ে দেব। ওরে, আগুনে পাপ নেই রে। এবার ওঁদের বড়ো বড়ো ভিটেতে ঘুঘু চরাব।

কুঞ্জর। আমার তিনটে সড়কি আছে।

মনসুখ। আমার একগাছা লাঙল আছে, এবার তাজ-পরা মাথাগুলো মাটির ঢেলার মতো চষে ফেলব।

শ্রীহর কলু। আমার একগাছ বড়ো কুড়ুল আছে, কিন্তু পালাবার সময় সেটা বাড়িতে ফেলে এসেছি।

হরিদীন কুমোর। ওরে, তোরা মরতে বসেছিস না কি? বলিস কী রে! আগে রাজাকে জানা, তার পরে যদি না শোনে তখন অন্য পরামর্শ হবে।

কিনু নাপিত। আমিও তো সেই কথা বলি।

কুঞ্জর। আমিও তো তাই ঠাওরাচ্ছি।

শ্রীহর। আমি বরাবর বলে আসছি, ঐ কায়স্থর পো'কে বলতে দাও। আচ্ছা, দাদা, তুমি রাজাকে ভয় করবে না?

মন্নুরাম কায়স্থ। ভয় আমি কাউকে করি নে। তোরা লুঠ করতে যাচ্ছিস, আর আমি দুটো কথা বলতে পারি নে?

মনসুখ। দাঙ্গা করা এক, আর কথা বলা এক। এই তো বরাবর দেখে আসছি হাত চলে, কিন্তু মুখ চলে না।

কিনু। মুখের কোনো কাজটাই হয় না— অন্নও জোটে না, কথাও ফোটে না।

কুঞ্জর। আচ্ছা, তুমি কী বলবে বলো।

মন্নুরাম। আমি ভয় করে বলব না, আমি প্রথমেই শাস্ত্র বলব।

শ্রীহর। বল কী! তোমার শাস্তর জানা আছে? আমি তো তাই গোড়াগুড়িই বলছিলুম কায়স্থর পো'কে বলতে দাও— ও জানে শোনে।

মন্নুরাম। আমি প্রথমেই বলব—

অতিদর্পে হতা লঙ্কা, অতিমানে চ কৌরবঃ।
অতিদানে বলির্বদ্ধঃ সর্বমত্যন্তগর্হিতম্‌॥

হরিদীন। হাঁ, এ শাস্ত্র বটে।

কিনু। (ব্রাহ্মণের প্রতি) কেমন খুড়ো, তুমি তো ব্রাহ্মণের ছেলে, এ শাস্ত্র কি না? তুমি তো এ সমস্তই বোঝ।

নন্দ। হাঁ—তা—ইয়ে—ওর নাম কী—তা বুঝি বইকি। কিন্তু রাজা যদি না বোঝে, তুমি কী করে বুঝিয়ে দেবে বলো তো শুনি।

মন্নুরাম। অর্থাৎ, বাড়াবাড়িটে কিছু নয়।

জওহর তাঁতি। ওই অতবড়ো কথাটার এইটুকু মানে হল?

শ্রীহর। তা না হলে আর শাস্তর কিসের?

নন্দ। চাষাভুষোর মুখে যে কথাটা ছোট্ট বড়োলোকের মুখে সেইটেই কত বড়ো শোনায়।

মনসুখ। কিন্তু কথাটা ভালো, 'বাড়াবাড়ি কিছু নয়' শুনে রাজার চোখ ফুটবে।

জওহর। কিন্তু ওই একটাতে হবে না, আরও শাস্তর চাই।

মন্নুরাম। তা আমার পুঁজি আছে, আমি বলব—

লালনে বহবো দোষাস্তাড়নে বহবো গুণাঃ।
তস্মাৎ মিত্রঞ্চ পুত্রঞ্চ তাড়য়েৎ ন তু লালয়েৎ ॥

তা আমরা কি পুত্র নই? হে মহারাজ, আমাদের তাড়না করবে না— ওইটে ভালো নয়।

হরিদীন। এ ভালো কথা, মস্ত কথা, ওই-যে কী বললে ও কথাগুলো শোনাচ্ছে ভালো।

শ্রীহর। কিন্তু কেবল শাস্তর বললে তো চলবে না— আমার ঘানির কথাটা কখন আসবে? অমনি ওই সঙ্গে জুড়ে দিলে হয় না?

নন্দ। বেটা, তুমি ঘানির সঙ্গে শাস্তর জুড়বে? এ কি তোমার গোরু পেয়েছ?

জওহর। কলুর ছেলে, ওর আর কত বুদ্ধি হবে!

কুঞ্জর। দু ঘা না পিঠে পড়লে ওর শিক্ষা হবে না। কিন্তু আমার কথাটা কখন পাড়বে? মনে থাকবে তো? আমার নাম কুঞ্জরলাল। কাঞ্জিলাল নয়— সে আমার ভাইপো সে বুধকোটে থাকে— সে যখন সবে তিন বছর তখন তাকে—

হরিদীন। সব বুঝলুম, কিন্তু যে-রকম কাল পড়েছে, রাজা যদি শাস্তর না শোনে?

কুঞ্জর। তখন আমরাও শাস্তর ছেড়ে অস্তর ধরব।

কিনু। শাবাশ বলেছ, শাস্তর ছেড়ে অস্তর!

মনসুখ। কে বললে হে? কথাটা কে বললে?

কুঞ্জর। (সগর্বে) আমি বলেছি। আমার নাম কুঞ্জরলাল, কাঞ্জিলাল আমার ভাইপো।

কিনু। তা ঠিক বলেছ ভাই— শাস্তর আর অস্তর— কখনো শাস্তর কখনো অস্তর— আবার কখনো অস্তর কখনো শাস্তর।

জওহর। কিন্তু বড়ো গোলমাল হচ্ছে। কথাটা কী যে স্থির হল বুঝতে পারছি নে। শাস্তর না অস্তর?

শ্রীহর। বেটা তাঁতি কি না, এইটে আর বুঝতে পারলি নে? তবে এতক্ষণ

ধরে কথাটা হল কী? স্থির হল যে শাস্তরের মহিমা বুঝতে ঢের দেরি হয়, কিন্তু অস্তরের মহিমা খুব চট্‌পট্‌ বোঝা যায়।

অনেকে। (উচ্চস্বরে) তবে শাস্তর চুলোয় যাক— অস্তর ধরো।

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত। বেশি ব্যস্ত হবার দরকার করে না, চুলোতেই যাবে শিগগির, তার আয়োজন হচ্ছে। বেটা, তোরা কি বলছিলি রে?

শ্রীহর। আমরা ওই ভদ্রলোকের ছেলেটির কাছে শাস্তর শুনছিলুম ঠাকুর!

দেবদত্ত। এমনি মন দিয়েই শাস্তর শোনে বটে! চীৎকারের চোটে রাজ্যের কানে তালা ধরিয়ে দিলে। যেন ধোবাপাড়ায় আগুন লেগেছে।

কিনু। তোমার কী ঠাকুর! তুমি তো রাজবাড়ির সিধে খেয়ে খেয়ে ফুলছ— আমাদের পেটে নাড়ীগুলো জ্বলে জ্বলে ম'ল— আমরা কি বড়ো সুখে চেঁচাচ্ছি!

মন্‌সুখ। আজকালের দিনে আস্তে বললে শোনে কে? এখন চেঁচিয়ে কথা কইতে হয়।

কুঞ্জর। কান্নাকাটি ঢের হয়েছে, এখন দেখছি অন্য উপায় আছে কি না।

দেবদত্ত। কী বলিস রে! তোদের বড়ো আস্পর্ধা হয়েছে। তবে শুনবি? তবে বলব?—

নসমানসমানসমানসমাগমমাপ সমীক্ষ্য বসন্তনভঃ।
ভ্রমদভ্রমদভ্রমদভ্রমদভ্রমরচ্ছলতঃ খলু কামিজনঃ॥

হরিদীন। ও বাবা, শাপ দিচ্ছে নাকি?

দেবদত্ত। (মন্নুর প্রতি) তুমি তো ভদ্রলোকের ছেলে, তুমি তো শাস্তর বোঝ- কেমন, এ ঠিক কথা কি না? নস মানস মানস মানসং—

মন্নুরাম। আহা ঠিক! শাস্ত্র যদি চাও তো এই বটে। তা, আমিও তো ঠিক ওই কথাটাই বোঝাচ্ছিলুম।

দেবদত্ত। (নন্দর প্রতি) নমস্কার! তুমি তো ব্রাহ্মণ দেখছি। কী বল ঠাকুর, পরিণামে এই সব মূর্খরা 'ভ্রমদভ্রমদভ্রমৎ' হয়ে মরবে না?

নন্দ। বরাবর তাই বলছি, কিন্তু বোঝে কে? ছোটোলোক কিনা।

দেবদত্ত। (মন্‌সুখের প্রতি) তোমাকেই এর মধ্যে বুদ্ধিমানের মতো দেখাচ্ছে, আচ্ছা, তুমি বলো দেখি, কথাগুলো কি ভালো হচ্ছিল? (কুঞ্জরের প্রতি) আর তোমাকেও তো বেশ ভালোমানুষ দেখছি হে, তোমার নাম কী?

কুঞ্জর। আমার নাম কুঞ্জরলাল— কাঞ্জিলাল আমার ভাইপোর নাম।

দেবদত্ত। ওঃ! তোমারই ভাইপোর নাম কাঞ্জিলাল বটে? তা, আমি রাজার কাছে বিশেষ করে তোমাদের নাম করব।

হরিদীন। আর আমাদের কী হবে?

দেবদত্ত। তা আমি বলতে পারি নে বাপু! এখন তো তোরা কান্না ধরেছিস— এই একটু আগে আর-এক সুর বের করিছিলি। সে কথাগুলো কি রাজা শোনে নি? রাজা সব শুনতে পায়।

অনেকে। দোহাই ঠাকুর, আমরা কিছু বলি নি, ওই কাঞ্জুলাল না মাঞ্জুলাল অস্তরের কথা পেড়েছিল।

কুঞ্জর। চুপ্ কর্। আমার নাম খারাপ করিস নে। আমার নাম কুঞ্জরলাল। তা, মিছে কথা বলব না, আমি বলছিলুম, 'যেমন শাস্তর আছে তেমনি অস্তরও আছে, রাজা যদি শাস্তরের দোহাই না মানে তখন অস্তর আছে।' কেমন বলেছি ঠাকুর?

দেবদত্ত। ঠিক বলেছ, তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছ। অস্ত্র কী? না, বল। তা তোমাদের বল কী? না, 'দুর্বলস্য বলং রাজা'। কি না, রাজাই দুর্বলের বল। আবার 'বালানাং রোদনং বলং'। রাজার কাছে তোমরা বালক বই নও। অতএব এখানে কান্নাই তোমাদের অস্ত্র। অতএব শাস্তর যদি না খাটে তো তোমাদের অস্ত্র আছে কান্না। বড়ো বুদ্ধিমানের মতো কথা বলেছ। প্রথমে আমাকেই ধাঁধা লেগে গিয়েছিল। তোমার নামটা মনে রাখতে হবে। কী হে, তোমার নাম কী?

কুঞ্জর। আমার নাম কুঞ্জরলাল। কাঞ্জিলাল আমার ভাইপো।

অন্য সকলে। ঠাকুর, আমাদের মাপ করো ঠাকুর, মাপ করো।

দেবদত্ত। আমি মাপ করবার কে? তবে দেখ্ কান্নাকাটি করে দেখ্, রাজা যদি মাপ করে।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুর

প্রমোদকানন

বিক্রমদেব ও সুমিত্রা

বিক্রমদেব। মৌনমুগ্ধ সন্ধ্যা ওই মন্দ মন্দ আসে
কুঞ্জবনমাঝে, প্রিয়তমে, লজ্জানম্র
নববধূসম— সম্মুখে গম্ভীর নিশা
বিস্তার করিয়া অন্তহীন অন্ধকার
এ কনককান্তিটুকু চাহে গ্রাসিবারে।
তেমনি দাঁড়ায়ে আছি হৃদয় প্রসারি
ওই হাসি, ওই রূপ, ওই তব জ্যোতি
পান করিবারে— দিবালোকতট হতে
এস, নেমে এস, কনকচরণ দিয়ে
এ অগাধ হৃদয়ের নিশীথ-সাগরে।
কোথা ছিলে প্রিয়ে?

সুমিত্রা। নিতান্ত তোমারি আমি
সদা মনে রেখো এ বিশ্বাস। থাকি যবে
গৃহকাজে, জেনো নাথ; তোমারি সে গৃহ,
তোমারি সে কাজ।

বিক্রমদেব। থাক্‌ গৃহ, গৃহকাজ।
সংসারের কেহ নহ, অন্তরের তুমি।
অন্তরে তোমার গৃহ, আর গৃহ নাই—
বাহিরে কাঁদুক পড়ে বাহিরের কাজ।

সুমিত্রা। কেবল অন্তরে তব? নহে, নাথ, নহে—
রাজন্‌, তোমারি আমি অন্তরে বাহিরে।
অন্তরে প্রেয়সী তব, বাহিরে মহিষী।

বিক্রমদেব। হায়, প্রিয়ে, আজ কেন স্বপ্ন মনে হয়
সে সুখের দিন ? সেই প্রথম মিলন—
প্রথম প্রেমের ছটা, দেখিতে দেখিতে
সমস্ত হৃদয়ে দেহে যৌবনবিকাশ,
সেই নিশিসমাগমে দুরুদুরু হিয়া—
নয়নপল্লবে লজ্জা ফুলদলপ্রান্তে
শিশিরবিন্দুর মতো, অধরের হাসি
নিমেষে জাগিয়া ওঠে, নিমেষে মিলায়
সন্ধ্যার বাতাস লেগে কাতরকম্পিত
দীপশিখাসম, নয়নে-নয়নে হয়ে
ফিরে আসে আঁখি, বেধে যায় হৃদয়ের
কথা, হাসে চাঁদ কৌতুকে আকাশে, চাহে
নিশীথের তারা লুকায়ে জানালা-পাশে—
সেই নিশি-অবসানে আঁখি ছলছল,
সেই বিরহের ভয়ে বদ্ধ আলিঙ্গন,
তিলেক বিচ্ছেদ লাগি কাতর হৃদয়।
কোথা ছিল গৃহকাজ! কোথা ছিল, প্রিয়ে,
সংসারভাবনা ?

সুমিত্রা। তখন ছিলাম শুধু
ছোটো দুটি বালক বালিকা, আজ মোরা
রাজা রানী।

বিক্রমদেব। রাজা রানী! কে রাজা ? কে রানী ?
নহি আমি রাজা। শূন্য সিংহাসন কাঁদে।
জীর্ণ রাজকার্যরাশি চূর্ণ হয়ে যায়
তোমার চরণতলে ধূলির মাঝারে।

সুমিত্রা। শুনিয়া লজ্জায় মরি। ছি ছি মহারাজ,
এ কি ভালোবাসা ? এ যে মেঘের মতন
রেখেছে আচ্ছন্ন করে মধ্যাহ্ন-আকাশে
উজ্জ্বল প্রতাপ তব। শোনো প্রিয়তম,
আমার সকলি তুমি, তুমি মহারাজ,

তুমি স্বামী— আমি শুধু অনুগত ছায়া,
তার বেশি নই। আমারে দিয়ো না লাজ,
আমারে বেসো না ভালো রাজশ্রীর চেয়ে।

বিক্রমদেব। চাহ না আমার প্রেম?

সুমিত্রা। কিছু চাই নাথ,
সব নহে। স্থান দিয়ো হৃদয়ের পাশে,
সমস্ত হৃদয় তুমি দিয়ো না আমারে।

বিক্রমদেব। আজো রমণীর মন নারিনু বুঝিতে।

সুমিত্রা। তোমরা পুরুষ, দৃঢ় তরুর মতন
আপনি অটল রবে আপনার 'পরে
স্বতন্ত্র উন্নত, তবে তো আশ্রয় পাব
আমরা লতার মতো তোমাদের শাখে।
তোমরা সকল মন দিয়ে ফেল যদি
কে রহিবে আমাদের ভালবাসা নিতে,
কে রহিবে বহিবারে সংসারের ভার?
তোমরা রহিবে কিছু স্নেহময় কিছু
উদাসীন, কিছু মুক্ত কিছু বা জড়িত—
সহস্র পাখির গৃহ, পান্থের বিশ্রাম,
তপ্ত ধরণীর ছায়া, মেঘের বান্ধব,
ঝটিকার প্রতিদ্বন্দ্বী, লতার আশ্রয়।

বিক্রমদেব। কথা দূর করো প্রিয়ে! হেরো সন্ধ্যাবেলা
মৌনপ্রেমসুখে সুপ্ত বিহঙ্গের নীড়,
নীরব কাকলি। তবে মোরা কেন দোঁহে
কথার উপরে কথা করি বরিষন?
অধর অধরে বসি প্রহরীর মতো
চপল কথার দ্বার রাখুক রুধিয়া।

কঞ্চুকীর প্রবেশ

কঞ্চুকী। এখনি দর্শনপ্রার্থী মন্ত্রীমহাশয়,
গুরুতর রাজকার্য, বিলম্ব সহে না।

বিক্রমদেব। ধিক্ তুমি! ধিক্ মন্ত্রী! ধিক্ রাজকার্য!
রাজ্য রসাতলে যাক মন্ত্রী লয়ে সাথে।

[কঞ্চুকীর প্রস্থান

সুমিত্রা। যাও, নাথ, যাও!
বিক্রমদেব। বার বার এক কথা!
নির্মম! নিষ্ঠুর! কাজ, কাজ! যাও, যাও!
যেতে কি পারি নে আমি? কে চাহে থাকিতে?
সবিনয় করপুটে কে মাগে তোমার
সযত্নে ওজন-করা বিন্দু বিন্দু কৃপা?
এখনি চলিনু।
অয়ি হৃদিলগ্না লতা,
ক্ষম মোরে, ক্ষম অপরাধ। মোছো আঁখি,
ম্লান মুখে হাসি আনো, অথবা ভ্রূকুটি—
দাও শাস্তি, করো তিরস্কার।
সুমিত্রা। মহারাজ,
এখন সময় নয়— আসিয়ো না কাছে,
এই মুছিয়াছি অশ্রু, যাও রাজ-কাজে।
বিক্রমদেব। হায় নারী, কী কঠিন হৃদয় তোমার!
কোনো কাজ নাই প্রিয়ে, মিছে উপদ্রব।
ধান্যপূর্ণ বসুন্ধরা, প্রজা সুখে আছে,
রাজকার্য চলিছে অবাধে— এ কেবল
সামান্য কী বিঘ্ন নিয়ে তুচ্ছ কথা তুলে
বিজ্ঞ বৃদ্ধ অমাত্যের অতি-সাবধান।
সুমিত্রা। ওই শোনো ক্রন্দনের ধ্বনি— সকাতরে
প্রজার আহ্বান। ওরে বৎস, মাতৃহীন
নোস তোরা কেহ, আমি আছি— আমি আছি—
আমি এ রাজ্যের রানী, জননী তোদের।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

অন্তঃপুরের কক্ষ

সুমিত্রা

সুমিত্রা। এখনো এল না কেন? কোথায় ব্রাহ্মণ?
ওই ক্রমে বেড়ে ওঠে ক্রন্দনের ধ্বনি।

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত। জয় হোক।
সুমিত্রা। ঠাকুর, কিসের কোলাহল?
দেবদত্ত। শোন কেন মাতঃ! শুনিলেই কোলাহল।
সুখে থাকো, রুদ্ধ করো কান। অন্তঃপুরে
সেথাও কি পশে কোলাহল? শান্তি নেই
সেখানেও? বল তো এখনি সৈন্য লয়ে
তাড়া করে নিয়ে যাই পথ হতে পথে
জীর্ণচীর ক্ষুধিত তৃষিত কোলাহল।
সুমিত্রা। বলো শীঘ্র কী হয়েছে।
দেবদত্ত। কিছু না, কিছু না।
শুধু ক্ষুধা, হীন ক্ষুধা, দরিদ্রের ক্ষুধা।
অভদ্র অসভ্য যত বর্বরের দল
মরিছে চীৎকার করি ক্ষুধার তাড়নে
কর্কশ ভাষায়। রাজকুঞ্জে ভয়ে মৌন
কোকিল পাপিয়া যত।
সুমিত্রা। আহা, কে ক্ষুধিত?
দেবদত্ত। অভাগ্যের দুরদৃষ্ট। দীন প্রজা যত
চিরদিন কেটে গেছে অর্ধাশনে যার
আজও তার অনশন হল না অভ্যাস
এমনি আশ্চর্য।

স্থমিত্রা। হে ঠাকুর, এ কী শুনি!
ধান্যপূর্ণ বসুন্ধরা, তবু প্রজা কাঁদে
অনাহারে?

দেবদত্ত। ধান্য তার বসুন্ধরা যার।
দরিদ্রের নহে বসুন্ধরা। এরা শুধু
যজ্ঞভূমে কুক্কুরের মতো লোলজিহ্বা
এক পাশে পড়ে থাকে, পায় ভাগ্যক্রমে
কভু যষ্টি উচ্ছিষ্ট কখনো। বেঁচে যায়
দয়া হয় যদি, নহে তো কাঁদিয়া ফেরে
পথপ্রান্তে মরিবার তরে।

স্থমিত্রা। কী বলিলে,
রাজা কি নির্দয় তবে? দেশ অরাজক?

দেবদত্ত। অরাজক কে বলিবে? সহস্ররাজক।

স্থমিত্রা। রাজকার্যে অমাত্যের দৃষ্টি নাই বুঝি?

দেবদত্ত। দৃষ্টি নাই? সে কী কথা! বিলক্ষণ আছে।
গৃহপতি নিদ্রাগত, তা বলিয়া গৃহে
চোরের কি দৃষ্টি নাই? সে যে শনিদৃষ্টি।
তাদের কী দোষ? এসেছে বিদেশ হতে
রিক্ত হস্তে, সে কি শুধু দীন প্রজাদের
আশীর্বাদ করিবারে দুই হাত তুলে?

স্থমিত্রা। বিদেশী! কে তারা? তবে, আমার আত্মীয়?

দেবদত্ত। রানীর আত্মীয় তারা প্রজার মাতুল,
যেমন মাতুল কংস, মামা কালনেমি।

স্থমিত্রা। জয়সেন?

দেবদত্ত। ব্যস্ত তিনি প্রজা-সুশাসনে।
প্রবল শাসনে তাঁর সিংহগড় দেশে
যত উপসর্গ ছিল অন্নবস্ত্র আদি
সব গেছে, আছে শুধু অস্থি আর চর্ম।

স্থমিত্রা। শিলাদিত্য?

দেবদত্ত। তাঁর দৃষ্টি বাণিজ্যের প্রতি।

বণিকের ধনভার করিয়া লাঘব
নিজস্কন্ধে করেন বহন।

স্থমিত্রা। যুধাজিৎ?

দেবদত্ত। নিতান্তই ভদ্রলোক, অতি মিষ্টভাষী।
থাকেন বিজয়কোটে, মুখে লেগে আছে
'বাপু বাছা', আড়চক্ষে চাহেন চৌদিকে,
আদরে বুলান হাত ধরণীর পিঠে—
যাহা-কিছু হাতে ঠেকে যত্নে লন তুলি।

স্থমিত্রা। এ কী লজ্জা! এ কী পাপ! আমার আত্মীয়!
পিতৃকুল-অপযশ! ছি ছি এ কলঙ্ক
করিব মোচন। তিলেক বিলম্ব নহে।

[প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

দেবদত্তের গৃহ

নারায়ণী গৃহকার্যে নিযুক্ত

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত। প্রিয়ে, বলি ঘরে কিছু আছে কি?

নারায়ণী। তোমার থাকার মধ্যে আছি আমি। তাও না থাকলেই আপদ চোকে।

দেবদত্ত। ও আবার কী কথা!

নারায়ণী। তুমি রাস্তা থেকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে যত রাজ্যের ভিক্ষুক জুটিয়ে আন, ঘরে খুদকুঁড়ো আর বাকি রইল না। খেটে খেটে আমার শরীরও আর থাকে না।

দেবদত্ত। আমি সাধে আনি? হাতে কাজ থাকলে তুমি থাক ভালো, স্থতরাং আমিও ভালো থাকি। আর কিছু না হোক, তোমার ওই মুখখানি বন্ধ থাকে।

নারায়ণী। বটে? তা, আমি এই চুপ করলুম। আমার কথা যে তোমার অসহ্য হয়ে উঠেছে তা কে জানত! তা, কে বলে আমার কথা শুনতে—

দেবদত্ত। তুমিই বল, আবার কে বলবে? এক কথা না শুনলে দশ কথা শুনিয়ে দাও।

নারায়ণী। বটে! আমি দশ কথা শোনাই? তা, আমি এই চুপ করলুম। আমি একেবারে থামলেই তুমি বাঁচ। এখন কি আর সেদিন আছে— সেদিন গেছে। এখন আবার নতুন মুখের নতুন কথা শুনতে সাধ গিয়েছে— এখন আমার কথা পুরোনো হয়ে গেছে।

দেবদত্ত। বাপ রে! আবার নতুন মুখের নতুন কথা! শুনলে আতঙ্ক হয়। তবু পুরোনো কথাগুলো অনেকটা অভ্যেস হয়ে এসেছে।

নারায়ণী। আচ্ছা বেশ। এতই জালাতন হয়ে থাক তো আমি এই চুপ করলুম। আমি আর একটি কথাও কব না। আগে বললেই হত— আমি তো জানতুম না। জানলে কে তোমাকে—

দেবদত্ত। আগে বলি নি? কত বার বলেছি। কই, কিছু হল না তো।

নারায়ণী। বটে! তা বেশ, আজ থেকে তবে এই চুপ করলুম। তুমিও সুখে থাকবে, আমিও সুখে থাকব। আমি সাধে বকি? তোমার রকম দেখে—

দেবদত্ত। এই বুঝি তোমার চুপ করা?

নারায়ণী। আচ্ছা। [বিমুখ

দেবদত্ত। প্রিয়ে! প্রেয়সী! মধুরভাষিণী! কোকিলগঞ্জিনী!

নারায়ণী। চুপ করো।

দেবদত্ত। রাগ কোরো না প্রিয়ে, কোকিলের মত রঙ বলছি নে, কোকিলের মতো পঞ্চমস্বর।

নারায়ণী। যাও যাও, বোকো না। কিন্তু তা বলছি, তুমি যদি আরো ভিখিরি জুটিয়ে আন তা হলে হয় তাদের ঝেঁটিয়ে বিদেয় করব, নয় নিজে বনবাসিনী হয়ে বেরিয়ে যাব।

দেবদত্ত। তা হলে আমিও তোমার পিছনে পিছনে যাব, এবং ভিক্ষুকগুলোও যাবে।

নারায়ণী। মিছে না। ঢেঁকির স্বর্গেও সুখ নেই। [নারায়ণীর প্রস্থান

ত্রিবেদীর মালা জপিতে জপিতে প্রবেশ

ত্রিবেদী। শিব শিব শিব! তুমি রাজপুরোহিত হয়েছ?

দেবদত্ত। তা হয়েছি, কিন্তু রাগ কেন ঠাকুর? কোনো দোষ ছিল না। মালাও জপি নে, ভগবানের নামও করি নে। রাজার মর্জি।

ত্রিবেদী। পিপীলিকার পক্ষচ্ছেদ হয়েছে। শ্রীহরি!

দেবদত্ত। আমার প্রতি রাগ করে শব্দশাস্ত্রের প্রতি উপদ্রব কেন? পক্ষচ্ছেদ নয়, পক্ষোদ্ভেদ।

ত্রিবেদী। তা ও একই কথা। ছেদও যা ভেদও তা। কথায় বলে ছেদভেদ। হে ভবকাণ্ডারী! যা হোক, তোমার যতদূর বার্ধক্য হবার তা হয়েছে।

দেবদত্ত। ব্রাহ্মণী সাক্ষী, এখনো আমার যৌবন পেরোয় নি।

ত্রিবেদী। আমিও তাই বলছি। যৌবনের দর্পেই তোমার এতটা বার্ধক্য হয়েছে। তা তুমি মরবে। হরি হে দীনবন্ধু!

দেবদত্ত। ব্রাহ্মণবাক্য মিথ্যে হবে না— তা আমি মরব। কিন্তু সেজন্যে তোমার বিশেষ আয়োজন করতে হবে না, স্বয়ং যম রয়েছেন। ঠাকুর, তোমার চেয়ে আমার সঙ্গে যে তাঁর বেশি কুটুম্বিতে তা নয়— সকলেরই প্রতি তাঁর সমান নজর।

ত্রিবেদী। তোমার সময় নিতান্ত এগিয়ে এসেছে। দয়াময় হরি!

দেবদত্ত। তা কী করে জানব? দেখেছি বটে আজকাল মরে ঢের লোক— কেউ বা গলায় দড়ি দিয়ে মরে, কেউ বা গলায় কলসী বেঁধে মরে, আবার সর্পাঘাতেও মরে, কিন্তু ব্রহ্মশাপে মরে না। ব্রাহ্মণের লাঠিতে কেউ কেউ মরেছে শুনেছি, কিন্তু ব্রাহ্মণের কথায় কেউ মরে না। অতএব যদি শীঘ্র না মরে উঠতে পারি তো রাগ কোরো না ঠাকুর— সে আমার দোষ নয়, সে কালের দোষ।

ত্রিবেদী। প্রণিপাত! শিব শিব শিব!

দেবদত্ত। আর-কিছু প্রয়োজন আছে?

ত্রিবেদী। না। কেবল এই খবরটা দিতে এলুম। দয়াময়! তা, তোমার চালে যদি দু-একটা বেশি কুমড়ো ফলে থাকে তো দিতে পার— আমার দরকার আছে।

দেবদত্ত। এনে দিচ্ছি।

[প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

অন্তঃপুর

পুষ্পোদ্যান

বিক্রমদেব ও রাজমাতুল বৃদ্ধ অমাত্য

বিক্রমদেব। শুনো না অলীক কথা, মিথ্যা অভিযোগ—
যুধাজিৎ, জয়সেন, উদয়ভাস্কর,
সুযোগ্য সুজন। একমাত্র অপরাধ
বিদেশী তাহারা। তাই এ রাজ্যের মনে
বিদ্বেষ-অনল উদ্গারিছে কৃষ্ণধূম
নিন্দা রাশি রাশি।

অমাত্য। সহস্র প্রমাণ আছে,
বিচার করিয়া দেখো।

বিক্রমদেব। কী হবে প্রমাণ?
চলিছে বৃহৎ রাজ্য বিশ্বাসের বলে—
যার 'পরে রয়েছে যে ভার, সযতনে
তাই সে পালিছে। প্রতিদিন তাহাদের
বিচার করিতে হবে নিন্দাবাক্য শুনে,
নহে ইহা রাজধর্ম। আর্য, যাও ঘরে,
করিয়ো না বিশ্রামে ব্যাঘাত।

অমাত্য। পাঠায়েছে
মন্ত্রী মোরে; সানুনয়ে করিছে প্রার্থনা
দর্শন তোমার, গুরু রাজকার্য-তরে।

বিক্রমদেব। চিরকাল আছে রাজ্য, আছে রাজকার্য—
সুমধুর অবসর শুধু মাঝে মাঝে
দেখা দেয়, অতি ভীরু, অতি সুকুমার।
ফুটে ওঠে পুষ্পটির মতো, টুটে যায়
বেলা না ফুরাতে। কে তারে ভাঙিতে চাহে

অকালে চিন্তার ভারে ? বিশ্রামেরে জেনো
কর্তব্য কাজের অঙ্গ।

অমাত্য। যাই মহারাজ। [প্রস্থান

রানীর আত্মীয় অমাত্যের প্রবেশ

অমাত্য। বিচারের আজ্ঞা হোক।

বিক্রমদেব। কিসের বিচার ?

অমাত্য। শুনি নাকি, মহারাজ, নির্দোষীর নামে
মিথ্যা অভিযোগ—

বিক্রমদেব। সত্য হবে। কিন্তু যতক্ষণ
বিশ্বাস রেখেছি আমি তোমাদের 'পরে
ততক্ষণ থাকো মৌন হয়ে। এ বিশ্বাস
ভাঙিবে যখন, তখন আপনি আমি
সত্য মিথ্যা করিব বিচার। যাও চলে। [অমাত্যের প্রস্থান

বিক্রমদেব। হায় কষ্ট মানবজীবন ! পদে পদে
নিয়মের বেড়া ! আপন রচিত জালে
আপনি জড়িত। অশান্ত আকাঙ্ক্ষা-পাখি
মরিতেছে মাথা খুঁড়ে পিঞ্জরে পিঞ্জরে !
কেন এ জটিল অধীনতা ? কেন এত
আত্মপীড়া ? কেন এ কর্তব্যকারাগার ?
তুই সুখী অয়ি মাধবিকা, বসন্তের
আনন্দমঞ্জরী ! শুধু প্রভাতের আলো,
নিশার শিশির, শুধু গন্ধ, শুধু মধু,
শুধু মধুপের গান, বায়ুর হিল্লোল,
স্নিগ্ধ পল্লবশয়ন, প্রস্ফুট শোভায়
সুনীল আকাশ-পানে নীরবে উত্থান,
তার পরে ধীরে ধীরে শ্যাম দূর্বাদলে
নীরবে পতন। নাই তর্ক, নাই বিধি,
নিদ্রিত নিশায় মর্মে সংশয়দংশন,
নিরাশ্বাস প্রণয়ের নিষ্ফল আবেগ।

সুমিত্রার প্রবেশ

এসেছ পাষাণী ! দয়া হয়েছে কি মনে ?
হল সারা সংসারের যত কাজ ছিল ?
মনে কি পড়িল তবে অধীন এ জনে
সংসারের সব শেষে ? জান না কি, প্রিয়ে,
সকল কর্তব্য চেয়ে প্রেম গুরুতর !
প্রেম এই হৃদয়ের স্বাধীন কর্তব্য।

সুমিত্রা। হায়, ধিক্ মোরে। কেমনে বোঝাব, নাথ,
তোমারে যে ছেড়ে যাই সে তোমারি প্রেমে।
মহারাজ, অধীনীর শোনো নিবেদন—
এ রাজ্যের প্রজার জননী আমি। প্রভু,
পারি নে শুনিতে আর কাতর অভাগা
সন্তানের করুণ ক্রন্দন। রক্ষা করো
পীড়িত প্রজারে।

বিক্রমদেব। কী করিতে চাহ রানী ?

সুমিত্রা। আমার প্রজারে যারা করিছে পীড়ন
রাজ্য হতে দূর করে দাও তাহাদের।

বিক্রমদেব। কে তাহারা জান ?

সুমিত্রা। জানি।

বিক্রমদেব। তোমার আত্মীয়।

সুমিত্রা। নহে মহারাজ ! আমার সন্তান চেয়ে
নহে তারা অধিক আত্মীয়। এ রাজ্যের
অনাথ আতুর যত তাড়িত ক্ষুধিত
তারাই আমার আপনার। সিংহাসন-
রাজচ্ছত্রছায়ে ফিরে যারা গুপ্তভাবে
শিকারসন্ধানে— তারা দস্যু, তারা চোর।

বিক্রমদেব। যুধাজিৎ, শিলাদিত্য, জয়সেন তারা।

সুমিত্রা। এই দণ্ডে তাহাদের দাও দূর করে।

বিক্রমদেব। আরামে রয়েছে তারা, যুদ্ধ ছাড়া কভু
নড়িবে না এক পদ।

স্থমিত্রা। তবে যুদ্ধ করো।

বিক্রমদেব। যুদ্ধ করো! হায় নারী, তুমি কি রমণী!
ভালো, যুদ্ধে যাব আমি। কিন্তু তার আগে
তুমি মানো অধীনতা, তুমি দাও ধরা—
ধর্মাধর্ম, আত্মপর, সংসারের কাজ
সব ছেড়ে হও তুমি আমারি কেবল।
তবেই ফুরাবে কাজ— তৃপ্তমন হয়ে
বাহিরিব বিশ্বরাজ্য জয় করিবারে।
অতৃপ্ত রাখিবে মোরে যতদিন তুমি
তোমার অদৃষ্ট-সম রব তব সাথে।

স্থমিত্রা। আজ্ঞা করো মহারাজ, মহিষী হইয়া
আপনি প্রজারে আমি করিব রক্ষণ।

[প্রস্থান

বিক্রমদেব। এমনি করেই মোরে করেছ বিকল।
আছ তুমি আপনার মহত্বশিখরে
বসি একাকিনী; আমি পাই নে তোমারে।
দিবানিশি চাহি তাই। তুমি যাও কাজে,
আমি ফিরি তোমারে চাহিয়া। হায় হায়,
তোমায় আমায় কভু হবে কি মিলন?

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত। জয় হোক মহারানী— কোথা মহারানী,
একা তুমি মহারাজ?

বিক্রমদেব। তুমি কেন হেথা?
ব্রাহ্মণের ষড়যন্ত্র অন্তঃপুরমাঝে?
কে দিয়েছে মহিষীরে রাজ্যের সংবাদ?

দেবদত্ত। রাজ্যের সংবাদ রাজ্য আপনি দিয়েছে।
উর্ধ্বস্বরে কেঁদে মরে রাজ্য উৎপীড়িত
নিতান্ত প্রাণের দায়ে— সে কি ভাবে কভু
পাছে তব বিশ্রামের হয় কোনো ক্ষতি?

ভয় নাই, মহারাজ, এসেছি কিঞ্চিৎ
ভিক্ষা মাগিবার তরে রানীমার কাছে।
ব্রাহ্মণী বড়োই রুক্ষ, গৃহে অন্ন নাই,
অথচ ক্ষুধার কিছু নাই অপ্রতুল।

[প্রস্থান

বিক্রমদেব। সুখী হোক, সুখে থাক্ এ রাজ্যের সবে।
কেন দুঃখ, কেন পীড়া, কেন এ ক্রন্দন!
অত্যাচার, উৎপীড়ন, অন্যায় বিচার,
কেন এ-সকল! কেন মানুষের 'পরে
মানুষের এত উপদ্রব! দুর্বলের
ক্ষুদ্র সুখ, ক্ষুদ্র শান্তিটুকু, তার 'পরে
সবলের শ্যেনদৃষ্টি কেন? যাই, দেখি,
যদি কিছু খুঁজে পাই শান্তির উপায়

সপ্তম দৃশ্য

মন্ত্রগৃহ

বিক্রমদেব ও মন্ত্রী

বিক্রমদেব। এই দণ্ডে রাজ্য হতে দাও দূর করে
যত সব বিদেশী দস্যুরে। সদা দুঃখ,
সদা ভয়, রাজ্য জুড়ে কেবল ক্রন্দন!
আর যেন এক দিন না শুনিতে হয়
পীড়িত প্রজার এই নিত্য কোলাহল
মন্ত্রী। মহারাজ, ধৈর্য চাই। কিছুদিন ধরে
রাজার নিয়ত দৃষ্টি পড়ুক সর্বত্র,
ভয় শোক বিশৃঙ্খলা তবে দূর হবে।

অন্ধকারে বাড়িয়াছে বহুকাল ধরে
অমঙ্গল— এক দিনে কী করিবে তার ?

বিক্রমদেব। এক দিনে চাহি তারে সমূলে নাশিতে,
শত বরষের শাল যেমন সবলে
এক দিনে কাঠুরিয়া করে ভূমিসাৎ।

মন্ত্রী। অস্ত্র চাই, লোক চাই—

বিক্রমদেব। সেনাপতি কোথা ?

মন্ত্রী। সেনাপতি নিজেই বিদেশী।

বিক্রমদেব। বিড়ম্বনা !
তবে ডেকে নয়ে এস দীন প্রজাদের,
খাদ্য দিয়ে তাহাদের বন্ধ করো মুখ,
অর্থ দিয়ে করহ বিদায়। রাজ্য ছেড়ে
যাক চলে, যেথা গিয়ে সুখী হয় তারা। [প্রস্থান

দেবদত্তের সহিত সুমিত্রার প্রবেশ

সুমিত্রা। আমি এ রাজ্যের রানী— তুমি মন্ত্রী বুঝি ?

মন্ত্রী। প্রণাম জননী ! দাস আমি। কেন মাতঃ,
অন্তঃপুর ছেড়ে আজ মন্ত্রগৃহে কেন ?

সুমিত্রা। প্রজার ক্রন্দন শুনে পারি নে তিষ্ঠিতে
অন্তঃপুরে। এসেছি করিতে প্রতিকার।

মন্ত্রী। কী আদেশ মাতঃ ?

সুমিত্রা। বিদেশী নায়ক
এ রাজ্যে যতেক আছে করহ আহ্বান
মোর নামে ত্বরা করি।

মন্ত্রী। সহসা আহ্বানে
সংশয় জন্মিবে মনে, কেহ আসিবে না।

সুমিত্রা। মানিবে না রানীর আদেশ ?

দেবদত্ত। রাজা রানী
ভুলে গেছে সবে। কদাচিৎ জনশ্রুতি
শোনা যায় !

সুমিত্রা। কালভৈরবের পুজোৎসবে
করো নিমন্ত্রণ। সেদিন বিচার হবে।
গর্বে অন্ধ দণ্ড যদি না করে স্বীকার
সৈন্যবল কাছাকাছি রাখিয়ো প্রস্তুত। [প্রস্থান

দেবদত্ত। কাহারে পাঠাবে দূত?

মন্ত্রী। ত্রিবেদী ঠাকুরে।
নির্বোধ সরলমন ধার্মিক ব্রাহ্মণ,
তার 'পরে কারো আর সন্দেহ হবে না।

দেবদত্ত। ত্রিবেদী সরল? নির্বুদ্ধিই বুদ্ধি তার,
সরলতা বক্রতার নির্ভরের দণ্ড।

অষ্টম দৃশ্য

ত্রিবেদীর কুটির

মন্ত্রী ও ত্রিবেদী

মন্ত্রী। বুঝেছ ঠাকুর, এ কাজ তোমাকে ছাড়া আর কাউকে দেওয়া যায় না।

ত্রিবেদী। তা বুঝেছি। হরি হে! কিন্তু মন্ত্রী, কাজের সময় আমাকে ডাক, আর পৈরহিত্যের বেলায় দেবদত্তের খোঁজ পড়ে।

মন্ত্রী। তুমি তো জান ঠাকুর, দেবদত্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, ওঁকে দিয়ে আর তো কোনো কাজ হয় না। উনি কেবল মন্ত্র পড়তে আর ঘণ্টা নাড়তে পারেন।

ত্রিবেদী। কেন, আমার কি বেদের উপর কম ভক্তি? আমি বেদ পুজো করি, তাই বেদ পাঠ করবার সুবিধে হয়ে ওঠে না। চন্দনে আর সিঁদুরে আমার বেদের একটা অক্ষরও দেখবার জো নেই। আজই আমি যাব। হে মধুসূদন!

মন্ত্রী। কী বলবে?

ত্রিবেদী। তা আমি বলব কালভৈরবের পুজো, তাই রাজা তোমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন। আমি খুব বড়োরকম সালংকার দিয়েই বলব। সব কথা এখন মনে আসছে না— পথে যেতে যেতে ভেবে নেব। হরি হে, তুমিই সত্য।

মন্ত্রী। যাবার আগে একবার দেখা করে যেয়ো ঠাকুর। [প্রস্থান

ত্রিবেদী। আমি নির্বোধ, আমি শিশু, আমি সরল, আমি তোমাদের কাজ উদ্ধার করবার গোরু! পিঠে বস্তা, নাকে দড়ি, কিছু বুঝব না, শুধু লেজে মোড়া খেয়ে চলব— আর সন্ধেবেলায় ছটিখানি শুকনো বিচিলি খেতে দেবে! হরি হে, তোমারি ইচ্ছে। দেখা যাবে কে কতখানি বোঝে। ওরে, এখনো পুজোর সামগ্রী দিলি নে? বেলা যায় যে। নারায়ণ! নারায়ণ!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সিংহগড়

জয়সেনের প্রাসাদ

জয়সেন ত্রিবেদী ও মিহিরগুপ্ত

ত্রিবেদী। তা বাপু, তুমি যদি চক্ষু অমন রক্তবর্ণ কর তা হলে আমার আপ্ত-বিশ্রুতি হবে। ভক্তবৎসল হরি! দেবদত্ত আর মন্ত্রী আমাকে অনেক করে শিখিয়ে দিয়েছে— কী বলছিলেম ভালো? আমাদের রাজা কালভৈরবের পুজো -নামক একটা উপলক্ষ করে—

জয়সেন। উপলক্ষ করে?

ত্রিবেদী। হাঁ, তা নয় উপলক্ষই হল, তাতে দোষ হয়েছে কী? মধুসূদন! তা তোমার চিন্তা হতে পারে বটে। উপলক্ষ শব্দটা কিঞ্চিৎ কাঠিন্যরসাসক্ত হয়ে পড়েছে — ওর যা যথার্থ অর্থ সেটা নিরাকার করতে অনেকেরই গোল ঠেকে দেখেছি।

জয়সেন। তাই তো ঠাকুর, ওর যথার্থ অর্থ টাই ঠাওরাচ্ছি।

ত্রিবেদী। রাম নাম সত্য! তা নাহয় উপলক্ষ না ব'লে উপসর্গ বলা গেল। শব্দের অভাব কী বাপু? শাস্ত্রে বলে শব্দ ব্রহ্ম। অতএব উপলক্ষই বল আর উপসর্গ ই বল অর্থ সমানই রইল।

জয়সেন। তা বটে। রাজা যে আমাদের আহ্বান করেছেন তার উপলক্ষ এবং উপসর্গ পর্যন্ত বোঝা গেল— কিন্তু তার যথার্থ কারণটা কী খুলে বলো দেখি।

ত্রিবেদী। ওইটে বলতে পারলুম না বাপু— ওইটে আমায় কেউ বুঝিয়ে বলে নি। হরি হে!

জয়সেন। ব্রাহ্মণ, তুমি বড়ো কঠিন স্থানে এসেছ, কথা গোপন কর তো বিপদে পড়বে।

ত্রিবেদী। হে ভগবান! হাঁ দেখো বাপু, তুমি রাগ কোরো না, তোমার স্বভাবটা নিতান্ত যে মধুমত্ত মধুকরের মতো তা বোধ হচ্ছে না।

জয়সেন। বেশি বোকো না ঠাকুর, যথার্থ কারণ যা জান বলে ফেলো।

ত্রিবেদী। বাসুদেব! সকল জিনিসেরই কি যথার্থ কারণ থাকে? যদি বা থাকে তো সকল লোকে কি টের পায়? যারা গোপনে পরামর্শ করেছে তারাই জানে। মন্ত্রী জানে, দেবদত্ত জানে। তা বাপু, তুমি অধিক ভেবো না, বোধ করি সেখানে যাবা-মাত্রই যথার্থ কারণ অবিলম্বে টের পাবে!

জয়সেন। মন্ত্রী তোমাকে আর কিছুই বলে নি?

ত্রিবেদী। নারায়ণ নারায়ণ! তোমার দিব্য, কিছু বলে নি। মন্ত্রী বললে, 'ঠাকুর, যা বললুম তা ছাড়া একটি কথা বোলো না। দেখো, তোমাকে যেন একটুও সন্দেহ না করে।' আমি বললুম, 'হে রাম! সন্দেহ কেন করবে? তবে বলা যায় না! আমি তো সরলচিত্তে বলে যাব, যিনি সন্দগ্ধ হবেন তিনি হবেন!' হরি হে, তুমিই সত্য।

জয়সেন। পুজো উপলক্ষে নিমন্ত্রণ, এ তো সামান্য কথা, এতে সন্দেহ হবার কী কারণ থাকতে পারে?

ত্রিবেদী। তোমরা বড়োলোক, তোমাদের এইরকমই হয়। নইলে 'ধর্মস্য সূক্ষ্মা গতি' বলবে কেন? যদি তোমাদের কেউ এসে বলে, 'আয় তো রে পাষণ্ড, তোর মুণ্ডুটা টান মেরে ছিঁড়ে ফেলি' অমনি তোমাদের উপলুব্ধ হয় যে, আর যাই হোক লোকটা প্রবঞ্চনা করছে না, মুণ্ডুটার উপরে বাস্তবিক তার নজর আছে বটে। কিন্তু যদি কেউ বলে 'এস তো বাপধন, আস্তে আস্তে তোমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিই', অমনি তোমাদের সন্দেহ হয়। যেন আস্ত মুণ্ডুটা ধরে টান মারার চেয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দেওয়া শক্ত কাজ! হে ভগবান, যদি রাজা স্পষ্ট করেই বলত— একবার হাতের কাছে এস তো, তোমাদের এক-একটাকে ধরে রাজ্য থেকে নির্বাসন করে পাঠাই— তা হলে এটা কখনও সন্দেহ করতে না যে, হয়তো বা রাজকন্যার সঙ্গে পরিণাম-বন্ধন করবার জন্যেই রাজা ডেকে থাকবেন। কিন্তু রাজা বলেছেন নাকি, 'হে বন্ধুসকল, রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধব, অতএব তোমরা পুজো উপলক্ষে এখানে

এসে কিঞ্চিৎ ফলাহার করবে'— অমনি তোমাদের সন্দেহ হয়েছে, সে ফলাহারটা কী রকমের না জানি। হে মধুসূদন! তা এমনি হয় বটে। বড়োলোকের সামান্য কথায় সন্দেহ হয়, আবার সামান্য লোকের বড়ো কথায় সন্দেহ হয়।

জয়সেন। ঠাকুর, তুমি অতি সরল প্রকৃতির লোক। আমার যেটুকু বা সন্দেহ ছিল, তোমার কথায় সমস্ত ভেঙে গেছে।

ত্রিবেদী। তা লেহ্য কথা বলেছ। আমি তোমাদের মতো বুদ্ধিমান নই, সকল কথা তলিয়ে বুঝতে পারি নে, কিন্তু, বাবা, সরল— পুরাণ-সংহিতায় যাকে বলে 'অন্যে পরে কা কথা', অর্থাৎ, অন্যের কথা নিয়ে কখনো থাকি নে।

জয়সেন। আর কাকে কাকে তুমি নিমন্ত্রণ করতে বেরিয়েছ?

ত্রিবেদী। তোমাদের পোড়া নাম আমার মনে থাকে না। তোমাদের কাশ্মীরী স্বভাব যেমন তোমাদের নামগুলোও ঠিক তেমনি শ্রুতিপৌরুষ। তা এ রাজ্যে তোমাদের গুষ্টির যেখানে যে আছে সকলকেই ডাক পড়েছে। শূলপাণি! কেউ বাদ যাবে না।

জয়সেন। যাও, ঠাকুর, এখন বিশ্রাম করো গে।

ত্রিবেদী। যা হোক, তোমার মন থেকে যে সমস্ত সন্দেহ দূর হয়েছে, মন্ত্রী এ কথা শুনলে ভারি খুশি হবে! মুকুন্দ মুরহর মুরারে! [প্রস্থান

জয়সেন। মিহিরগুপ্ত, সমস্ত অবস্থা বুঝলে তো? এখন গৌরসেন যুধাজিৎ উদয়ভাস্কর ওদের কাছে শীঘ্র লোক পাঠাও। বলো, অবিলম্বে সকলে একত্র মিলে একটা পরামর্শ করা আবশ্যক।

মিহিরগুপ্ত। যে আজ্ঞা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুর

বিক্রমদেব ও রানীর আত্মীয় সভাসদ

সভাসদ। ধন্য মহারাজ!
বিক্রমদেব। কেন এত ধন্যবাদ?
সভাসদ। মহত্ত্বের এই তো লক্ষণ, দৃষ্টি তার
সকলের 'পরে। ক্ষুদ্রপ্রাণ ক্ষুদ্র জনে

পায় না দেখিতে। প্রবাসে পড়িয়া আছে
সেবক যাহারা, জয়সেন, যুধাজিৎ—
মহোৎসবে তাহাদের করেছ স্মরণ।
আনন্দে বিহ্বল তারা। সত্বর আসিছে
দলবল নিয়ে।

বিক্রমদেব। যাও, যাও। তুচ্ছ কথা,
তার লাগি এত যশোগান। জানিও নে
আহূত হয়েছে কারা পূজার উৎসবে।

সভাসদ। রবির উদয়মাত্রে আলোকিত হয়
চরাচর, নাই চেষ্টা, নাহি পরিশ্রম,
নাহি তাহে ক্ষতিবৃদ্ধি তার। জানেও না
কোথা কোন্ তৃণতলে কোন্ বনফুল
আনন্দে ফুটিছে তার কনককিরণে।
কৃপাবৃষ্টি কর অবহেলে, যে পায় সে
ধন্য হয়।

বিক্রমদেব। থামো থামো, যথেষ্ট হয়েছে।
আমি যত অবহেলে কৃপাবৃষ্টি করি
তার চেয়ে অবহেলে সভাসদ্‌গণ
করে স্তুতিবৃষ্টি। বলা তো হয়েছে শেষ
যত কথা করেছ রচনা? যাও এবে।

[সভাসদের প্রস্থান

সুমিত্রার প্রবেশ

কোথা যাও, একবার ফিরে চাও রানী!
রাজা আমি পৃথিবীর কাছে, তুমি শুধু
জান মোরে দীন ব'লে। ঐশ্বর্য আমার
বাহিরে বিস্তৃত— শুধু তোমার নিকটে
ক্ষুধার্ত কঙ্কালসার কাঙাল বাসনা।
তাই কি ঘৃণার দর্পে চলে যাও দূরে
মহারানী, রাজরাজেশ্বরী!

সুমিত্রা। মহারাজ,
যে প্রেম করিছে ভিক্ষা সমস্ত বসুধা
একা আমি সে প্রেমের যোগ্য নই কভু।
বিক্রমদেব। অপদার্থ আমি! দীন কাপুরুষ আমি!
কর্তব্যবিমুখ আমি, অন্তঃপুরচারী!
কিন্তু মহারানী, সে কি স্বভাব আমার?
আমি ক্ষুদ্র, তুমি মহীয়সী? তুমি উচ্চে,
আমি ধূলিমাঝে? নহে তাহা। জানি আমি
আপন ক্ষমতা। রয়েছে দুর্জয় শক্তি
এ হৃদয়-মাঝে, প্রেমের আকারে তাহা
দিয়েছি তোমারে। বজ্রাগ্নিরে করিয়াছি
বিদ্যুতের মালা, পরায়েছি কণ্ঠে তব।
সুমিত্রা। ঘৃণা করো মহারাজ, ঘৃণা করো মোরে
সেও ভালো— একেবারে ভুলে যাও যদি
সেও সহ্য হয়— ক্ষুদ্র এ নারীর 'পরে
করিয়ো না বিসর্জন সমস্ত পৌরুষ।
বিক্রমদেব। এত প্রেম, হায়, তার এত অনাদর!
চাহ না এ প্রেম? না চাহিয়া দস্যুসম
নিতেছ কাড়িয়া। উপেক্ষার ছুরি দিয়া
কাটিয়া তুলিছ— রক্তসিক্ত তপ্ত প্রেম
মর্ম বিদ্ধ করি। ধূলিতে দিতেছ ফেলি
নির্মম নিষ্ঠুর! পাষাণপ্রতিমা তুমি,
যত বক্ষে চেপে ধরি অনুরাগভরে
তত বাজে বুকে।
সুমিত্রা। চরণে পতিত দাসী,
কী করিতে চাও করো। কেন তিরস্কার?
নাথ, কেন আজি এত কঠিন বচন!
কত অপরাধ তুমি করেছ মার্জনা,
কেন রোষ বিনা অপরাধে!
বিক্রমদেব। প্রিয়তমে,

উঠ উঠ, এস বুকে— স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে
এ দীপ্ত হৃদয়জ্বালা করহ নির্বাণ।
কত সুধা, কত ক্ষমা ওই অশ্রুজলে
অয়ি প্রিয়ে, কত প্রেম, কতই নির্ভর!
কোমল হৃদয়তলে তীক্ষ্ণ কথা বিঁধে
প্রেম-উৎস ছুটে— অর্জুনের শরাঘাতে
মর্মাহত ধরণীর ভোগবতী-সম।

নেপথ্যে। মহারানী!

অশ্রু মুছিয়া

সুমিত্রা। দেবদত্ত! আর্য, কী সংবাদ?

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত। রাজ্যের নায়কগণ রাজনিমন্ত্রণ
করিয়াছে অবহেলা, বিদ্রোহের তরে
হয়েছে প্রস্তুত।

সুমিত্রা। শুনিতেছ মহারাজ?

বিক্রমদেব। দেবদত্ত, অন্তঃপুর নহে মন্ত্রগৃহ।

দেবদত্ত। মহারাজ, মন্ত্রগৃহ অন্তঃপুর নহে,
তাই সেথা নৃপতির পাই নে দর্শন।

সুমিত্রা। স্পর্ধিত কুক্কুর যত বর্ধিত হয়েছে
রাজ্যের উচ্ছিষ্ট অন্নে! রাজার বিরুদ্ধে
বিদ্রোহ করিতে চাহে! এ কী অহংকার!
মহারাজ, মন্ত্রণার আছে কি সময়?
মন্ত্রণার কী আছে বিষয়! সৈন্য লয়ে
যাও অবিলম্বে, রক্তশোষী কীটদের
দলন করিয়া ফেলো চরণের তলে।

বিক্রমদেব। সেনাপতি শত্রুপক্ষ—

সুমিত্রা। নিজে যাও তুমি।

বিক্রমদেব। আমি কি তোমার উপদ্রব, অভিশাপ,
দুরদৃষ্ট, দুঃস্বপন, করলগ্ন কাঁটা?

হেথা হতে এক পদ নড়িব না, রানী,
পাঠাইব সন্ধির প্রস্তাব। কে ঘটালে
এই উপদ্রব! ব্রাহ্মণে নারীতে মিলে
বিবরের সুপ্তসর্প জাগাইয়া তুলি
একি খেলা! আত্মরক্ষা-অসমর্থ যারা
নিশ্চিন্তে ঘটায় তারা পরের বিপদ।

সুমিত্রা। ধিক্ এ অভাগা রাজ্য, হতভাগ্য প্রজা!
ধিক্ আমি, এ রাজ্যের রানী!

[প্রস্থান

বিক্রমদেব। দেবদত্ত,
বন্ধুত্বের এই পুরস্কার? বৃথা আশা!
রাজার অদৃষ্টে বিধি লেখে নি প্রণয়;
ছায়াহীন সঙ্গীহীন পর্বতের মতো
একা মহাশূন্যমাঝে দগ্ধ উচ্চ শিরে
প্রেমহীন নীরস মহিমা— ঝঞ্ঝাবায়ু
করে আক্রমণ, বজ্র এসে বিঁধে, সূর্য
রক্তনেত্রে চাহে— ধরণী পড়িয়া থাকে
চরণ ধরিয়া। কিন্তু, ভালোবাসা কোথা!
রাজার হৃদয় সেও হৃদয়ের তরে
কাঁদে। হায় বন্ধু, মানবজীবন লয়ে
রাজত্বের ভান করা শুধু বিড়ম্বনা।
দম্ভ-উচ্চ সিংহাসন চূর্ণ হয়ে গিয়ে
ধরা-সাথে হোক সমতল, একবার
হৃদয়ের কাছাকাছি পাই তোমাদের।
বাল্যসখা, রাজা ব'লে ভুলে যাও মোরে,
একবার ভালো করে করো অনুভব
বান্ধবহৃদয়ব্যথা বান্ধবহৃদয়ে।

দেবদত্ত। সখা, এ হৃদয় মোর জানিয়ো তোমার।
কেবল প্রণয় নয়, অপ্রণয় তব
সেও আমি সব' অকাতরে, রোষানল

নব বক্ষ পাতি— যেমন অগাধ সিন্ধু
আকাশের বজ্র লয় বুকে।

বিক্রমদেব। দেবদত্ত,
সুখনীড়মাঝে কেন হানিছ বিরহ?
সুখস্বর্গমাঝে কেন আনিছ বহিয়া
হাহাধ্বনি?

দেবদত্ত। সখা, আগুন লেগেছে ঘরে,
আমি শুধু এনেছি সংবাদ— সুখনিদ্রা
দিয়েছি ভাঙায়ে।

বিক্রমদেব। এর চেয়ে সুখস্বপ্নে
মৃত্যু ছিল ভালো।

দেবদত্ত। ধিক্ লজ্জা, মহারাজ,
রাজ্যের মৃত্যুর চেয়ে তুচ্ছ স্বপ্নসুখ
বেশি হল?

বিক্রমদেব। যোগাসনে লীন যোগিবর
তার কাছে কোথা আছে বিশ্বের প্রলয়?
স্বপ্ন এ সংসার। অর্ধশত বর্ষপরে
আজিকার সুখদুঃখ কার মনে রবে?
যাও যাও, দেবদত্ত, যেথা ইচ্ছা তব।
আপন সান্ত্বনা আছে আপনার কাছে।
দেখে আসি ঘৃণাভরে কোথা গেল রানী। [প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

মন্দির

পুরুষবেশে রানী সুমিত্রা। বাহিরে অনুচর

সুমিত্রা। জগৎ-জননী মাতা, দুর্বলহৃদয়
তনয়ারে করিয়ো মার্জনা। আজ সব

পূজা ব্যর্থ হল— শুধু সে সুন্দর মুখ
পড়ে মনে, সেই প্রেমপূর্ণ চক্ষু দুটি,
সেই শয্যা-'পরে একা সুপ্ত মহারাজ।
হায় মা, নারীর প্রাণ এত কি কঠিন!
দক্ষযজ্ঞে তুই যবে গিয়েছিলি সতী,
প্রতিপদে আপন হৃদয়খানি তোর
আপন চরণ দুটি জড়ায়ে কাতরে
বলে নি কি ফিরে যেতে পতিগৃহ-পানে।
সেই কৈলাসের পথে আর ফিরিল না
ও রাঙা চরণ। মা গো, সে দিনের কথা
দেখ্ মনে করে। জননী, এসেছি আমি
রমণীহৃদয় বলি দিতে, রমণীর
ভালোবাসা ছিন্নশতদলসম দিতে
পদতলে। নারী তুমি, নারীর হৃদয়
জান তুমি, বল দাও জননী আমারে।
থেকে থেকে ওই শুনি রাজগৃহ হতে
'ফিরে এস, ফিরে এস রানী'— প্রেমপূর্ণ
পুরাতন সেই কণ্ঠস্বর। খড়্গ নিয়ে
তুমি এস, দাঁড়াও রুধিয়া পথ, বলো,
'তুমি যাও, রাজধর্ম উঠুক জাগিয়া—
ধন্য হোক রাজা, প্রজা হোক সুখী, রাজ্যে
ফিরে আসুক কল্যাণ— দূর হোক যত
অত্যাচার— ভূপতির যশোরশ্মি হতে
ঘুচে যাক কলঙ্ককালিমা। তুমি নারী
ধরাপ্রান্তে যেথা স্থান পাও, একাকিনী
বসে বসে নিজ দুঃখে মরো বুক ফেটে।'
পিতৃসত্যপালনের তরে রামচন্দ্র
গিয়াছেন বনে, পতিসত্যপালনের
লাগি আমি যাব। যে সত্যে আছেন বাঁধা
মহারাজ রাজ্যলক্ষ্মী-কাছে, কভু তাহা

সামান্য নারীর তরে ব্যর্থ হইবে না।

বাহিরে একজন পুরুষ ও স্ত্রীর প্রবেশ

অনুচর। কে তোরা? দাঁড়া এইখানে।

পুরুষ। কেন বাবা? এখেনেও কি স্থান নেই।

স্ত্রী। মা গো! এখেনেও সেই সিপাই!

সুমিত্রার বাহিরে আগমন

সুমিত্রা। তোমরা কে গো?

পুরুষ। মিহিরগুপ্ত আমাদের ছেলেটিকে ধরে রেখে আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের চাল নেই, চুলো নেই, মরবার জায়গাটুকু নেই— তাই আমরা মন্দিরে এসেছি। মার কাছে হত্যা দিয়ে পড়ব, দেখি তিনি আমাদের কী গতি করেন।

স্ত্রী। তা, হাঁ গা, এখেনেও তোমরা সিপাই রেখেছ? রাজার দরজা বন্ধ, আবার মায়ের দরজাও আগলে দাঁড়িয়েছ?

সুমিত্রা। না বাছা, এস তোমরা। এখানে তোমাদের কোনো ভয় নেই। কে তোমাদের উপর দৌরাত্ম্য করেছে?

পুরুষ। এই জয়সেন। আমরা রাজার কাছে দুঃখু জানাতে গিয়েছিলেম, রাজদর্শন পেলেম না। ফিরে এসে দেখি আমাদের ঘরদোর জালিয়ে দিয়েছে, আমাদের ছেলেটিকে বেঁধে রেখেছে।

সুমিত্রা। (স্ত্রীলোকের প্রতি) হাঁ গা, তা তুমি রানীকে গিয়ে জানালে না কেন?

স্ত্রী। ওগো, রানীই তো রাজাকে জাদু করে রেখেছে। আমাদের রাজা ভালো, রাজার দোষ নেই— ওই বিদেশ থেকে এক রানী এসেছে, সে আপন কুটুম্বদের রাজ্য জুড়ে বসিয়েছে। প্রজার বুকের রক্ত শুষে খাচ্ছে গো!

পুরুষ। চুপ কর্ মাগী! তুই রানীর কি জানিস? যে কথা জানিস নে তা মুখে আনিস নে।

স্ত্রী। জানি গো জানি। ওই রানীই তো বসে বসে রাজার কাছে আমাদের নামে যত কথা লাগায়।

সুমিত্রা। ঠিক বলেছ বাছা! ওই রানী সর্বনাশীই তো যত নষ্টের মূল। তা, সে আর বেশি দিন থাকবে না, তার পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে। এই নাও, আমার সাধ্যমত কিছু দিলাম, সব দুঃখ দূর করতে পারি নে।

পুরুষ। আহা, তুমি কোনো রাজার ছেলে হবে, তোমার জয় হোক।

সুমিত্রা। আর বিলম্ব নয়, এখনি যাব। [প্রস্থান

ত্রিবেদীর প্রবেশ

ত্রিবেদী। হে হরি, কী দেখলুম! পুরুষমূর্তি ধরে রানী সুমিত্রা ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন। মন্দিরে দেবপুজোর ছলে এসে রাজ্য ছেড়ে পালিয়েছেন। আমাকে দেখে বড়ো খুশি। মধুসূদন! ভাবলে 'ব্রাহ্মণ বড়ো সরল-হৃদয়, মাথার তেলোয় যেমন এক-গাছি চুল দেখা যায় না, তলায় তেমনি বুদ্ধির লেশমাত্র নেই। একে দিয়ে একটা কাজ করিয়ে নেওয়া যাক। এর মুখ দিয়ে রাজাকে দুটো মিষ্টি কথা পাঠিয়ে দেওয়া যাক।' বাবা, তোমরা বেঁচে থাকো। যখনি তোমাদের কিছু দরকার পড়বে বুড়ো ত্রিবেদীকে ডেকো, আর দান-দক্ষিণের বেলায় দেবদত্ত আছেন। দয়াময়! তা বলব। খুব মিষ্টি মিষ্টি করেই বলব। আমার মুখে মিষ্টি কথা আরো বেশি মিষ্টি হয়ে ওঠে। কমললোচন! রাজা কী খুশিই হবে। কথাগুলো যত বড়ো বড়ো করে বলব রাজার মুখের হাঁ তত বেড়ে যাবে। দেখেছি, আমার মুখে বড়ো কথাগুলো শোনায় ভালো। লোকের বিশেষ আমোদ বোধ হয়। বলে, ব্রাহ্মণ বড়ো সরল। পতিতপাবন! এবারে কতটা আমোদ হবে বলতে পারি নে। কিন্তু শব্দশাস্ত্র একেবারে উলট-পালট করে দেব। আঃ কী দুর্যোগ! আজ সমস্ত দিন দেবপুজো হয় নি, এইবার একটু পুজো-অর্চনায় মন দেওয়া যাক। দীনবন্ধু ভক্তবৎসল!

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

প্রাসাদ

বিক্রমদেব মন্ত্রী ও দেবদত্ত

বিক্রমদেব। পলায়ন! রাজ্য ছেড়ে পলায়ন! এ রাজ্যেতে
যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার,
যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে
পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ়বলে
ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয়? এই রাজা?

এই কি মহিমা তার? বৃহৎ প্রতাপ,
লোকবল অর্থবল নিয়ে পড়ে থাকে
শূন্য স্বর্ণপিঞ্জরের মতো, ক্ষুদ্র পাখি
উড়ে চলে যায়!

মন্ত্রী। হায় হায়, মহারাজ,
লোকনিন্দা, ভগ্নবাঁধ জলস্রোত-সম,
ছুটে চারি দিক হতে।

বিক্রমদেব। চুপ করো মন্ত্রী!
লোকনিন্দা, লোকনিন্দা সদা! নিন্দাভারে
রসনা খসিয়া যাক অলস লোকের।
দিবা যদি গেল, উঠুক-না চুপি চুপি
ক্ষুদ্র পঙ্ককুণ্ড হতে দুষ্ট বাষ্পরাশি,
অমার আঁধার তাহে বাড়িবে না কিছু।
লোকনিন্দা!

দেবদত্ত। মন্ত্রী, পরিপূর্ণ সূর্য-পানে
কে পারে তাকাতে? তাই গ্রহণের বেলা
ছুটে আসে যত মর্তলোক, দীননেত্রে
চেয়ে দেখে দুর্দিনের দিনপতি-পানে,
আপনার কালীমাখা কাচখণ্ড দিয়ে
কালো দেখে গগনের আলো। মহারানী,
মা-জননী, এই ছিল অদৃষ্টে তোমার?
তব নাম ধুলায় লুটায়? তব নাম
ফিরে মুখে মুখে? একি এ দুর্দিন আজি!
তবু তুমি তেজস্বিনী সতী, এরা সব
পথের কাঙাল।

বিক্রমদেব। ত্রিবেদী কোথায় গেল?
মন্ত্রী, ডেকে আনো তারে। শোনা হয় নাই
তার সব কথা, ছিনু অন্যমনে।

মন্ত্রী। যাই
ডেকে আনি তারে। [প্রস্থান

বিক্রমদেব। এখনো সময় আছে,
এখনো ফিরাতে পারি পাইলে সন্ধান।
আবার সন্ধান ? এমনি কি চিরদিন
কাটিবে জীবন ? সে দিবে না ধরা, আমি
ফিরিব পশ্চাতে ? প্রেমের শৃঙ্খল হাতে
রাজ্য রাজধর্ম ফেলে শুধু রমণীর
পলাতক হৃদয়ের সন্ধানে ফিরিব ?
পলাও, পলাও নারী, চির দিনরাত
করো পলায়ন গৃহহীন, প্রেমহীন,
বিশ্রামবিহীন, অনাবৃত পৃথ্বীমাঝে
কেবল পশ্চাতে লয়ে আপনার ছায়া।

ত্রিবেদীর প্রবেশ

চলে যাও, দূর হও, কে ডাকে তোমারে ?
বার বার তার কথা কে চাহে শুনিতে—
প্রগল্‌ভ ব্রাহ্মণ, মূর্খ !

ত্রিবেদী। হে মধুসূদন ! [প্রস্থানোদ্যম

বিক্রমদেব। শোনো, শোনো, দুটো কথা শুধাবার আছে।
চোখে অশ্রু ছিল ?

ত্রিবেদী। চিন্তা নেই বাপু ! অশ্রু
দেখি নাই।

বিক্রমদেব। মিথ্যা করে বলো। অতি ক্ষুদ্র
সকরুণ দুটি মিথ্যে কথা। হে ব্রাহ্মণ,
বৃদ্ধ তুমি ক্ষীণদৃষ্টি কী করে জানিলে
চোখে তার অশ্রু ছিল কি না ? বেশি নয়,
একবিন্দু জল ! নহে তো নয়নপ্রান্তে
ছলছল ভাব, কম্পিত কাতর কণ্ঠে
অশ্রুবদ্ধ বাণী ! তাও নয় ? সত্য বলো,
মিথ্যা বলো। বোলো না বোলো না, চলে যাও।

[প্রস্থান

ত্রিবেদী। হরি হে তুমিই সত্য !

বিক্রমদেব। অন্তর্যামী দেব,
তুমি জান জীবনের সব অপরাধ
তারে ভালোবাসা। পুণ্য গেল, স্বর্গ গেল,
রাজ্য যায়, অবশেষে সেও চলে গেল !
তবে দাও, ফিরে দাও ক্ষাত্রধর্ম মোর—
রাজধর্ম ফিরে দাও, পুরুষহৃদয়
মুক্ত করে দাও এই বিশ্বরঙ্গমাঝে।
কোথা কর্মক্ষেত্র ! কোথা জনস্রোত ! কোথা
জীবনমরণ ! কোথা সেই মানবের
অবিশ্রাম সুখদুঃখ-বিপদসম্পদ-
তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস !

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। মহারাজ, অশ্বারোহী
পাঠায়েছি চারি দিকে রাজ্ঞীর সন্ধানে।

বিক্রমদেব। ফিরাও ফিরাও মন্ত্রী ! স্বপ্ন ছুটে গেছে,
অশ্বারোহী কোথা তারে পাইবে খুঁজিয়া ?
সৈন্যদল করহ প্রস্তুত। যুদ্ধে যাব,
নাশিব বিদ্রোহ।

মন্ত্রী। যে আদেশ মহারাজ ! [প্রস্থান

বিক্রমদেব। দেবদত্ত, কেন নত মুখ, ম্লান দৃষ্টি ?
ক্ষুদ্র সান্ত্বনার কথা বোলো না ব্রাহ্মণ !
আমারে পশ্চাতে ফেলে চলে গেছে চোর,
আপনারে পেয়েছি কুড়ায়ে। আজি সখা,
আনন্দের দিন। এস আলিঙ্গনপাশে।

আলিঙ্গন করিয়া

বন্ধু, বন্ধু, মিথ্যা কথা, মিথ্যা এই ভান।
থেকে থেকে বজ্রশেল ছুটিছে বিঁধিছে
মর্মে। এস, এস, একবার অশ্রুজল
ফেলি বন্ধুর হৃদয়ে। মেঘ যাক কেটে।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কাশ্মীর

প্রাসাদসম্মুখে রাজপথ। দ্বারে শংকর

শংকর। এতটুকু ছিল, আমার কোলে খেলা করত। যখন কেবল চারটি দাঁত উঠেছে তখন সে আমাকে 'সংকল দাদা' বলত। এখন বড়ো হয়ে উঠেছে, এখন সংকল দাদার কোলে আর ধরে না, এখন সিংহাসন চাই। স্বর্গীয় মহারাজ মরবার সময় তোদের দুটি ভাইবোনকে আমার কোলে দিয়ে গিয়েছিল। বোনটি তো দুদিন বাদে স্বামীর কোলে গেল। মনে করেছিলুম কুমারসেনকে আমার কোল থেকে একেবারে সিংহাসনে উঠিয়ে দেব। কিন্তু খুড়ো-মহারাজ আর সিংহাসন থেকে নাবেন না। শুভলগ্ন কতবার হল, কিন্তু আজ কাল ক'রে আর সময় হল না। কত ওজর কত আপত্তি! আরে ভাই, সংকলের কোল এক, আর সিংহাসন এক। বুড়ো হয়ে গেলুম — তোকে কি আর রাজাসনে দেখে যেতে পারব!

দুইজন সৈনিকের প্রবেশ

প্রথম সৈনিক। আমাদের যুবরাজ কবে রাজা হবে রে ভাই? সেদিন আমি তোদের সকলকে মহুয়া খাওয়াব।

দ্বিতীয় সৈনিক। আরে, তুই তো মহুয়া খাওয়াবি— আমি জান্ দেব, আমি লড়াই করে করে বেড়াব, আমি পাঁচটা গাঁ লুট করে আনব। আমি আমার মহাজন বেটার মাথা ভেঙে দেব। বলিস তো, আমি খুশি হয়ে যুবরাজের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অম্‌নি মরে পড়ে যাব।

প্রথম সৈনিক। তা কি আমি পারি নে? মরবার কথা কী বলিস? আমার যদি সওয়া-শো বরষ পরমায়ু থাকে আমি যুবরাজের জন্যে রোজ নিয়মিত দু-সন্ধে দুবার করে মরতে পারি। তা ছাড়া উপরি আছে।

দ্বিতীয় সৈনিক। ওরে, যুবরাজ তো আমাদেরই। স্বর্গীয় মহারাজ তাকে আমাদেরই হাতে দিয়ে গেছেন। আমরা তাকে কাঁধে করে ঢাক বাজিয়ে রাজা করে দেব। তা, কাউকে ভয় করব না—

প্রথক সৈনিক। খুড়ো-মহারাজকে গিয়ে বলব, তুমি নেমে এস, আমরা রাজ-

পুতুরকে সিংহাসনে চড়িয়ে আনন্দ করতে চাই।

দ্বিতীয় সৈনিক। শুনেছিস পূর্ণিমাতিথিতে যুবরাজের বিয়ে?

প্রথম সৈনিক। সে তো পাঁচ বৎসর ধরে শুনে আসছি।

দ্বিতীয় সৈনিক। এইবার পাঁচ বৎসর পূর্ণ হয়ে গেছে। ত্রিচূড়ের রাজবংশে নিয়ম চলে আসছে যে, পাঁচ বৎসর রাজকন্যার অধীন হয়ে থাকতে হবে। তার পর তার হুকুম হলে বিয়ে হবে।

প্রথম সৈনিক। বাবা, এ আবার কী নিয়ম! আমরা ক্ষত্রিয়, আমাদের চিরকাল চলে আসছে, শ্বশুরের গালে চড় মেরে মেয়েটার ঝুঁটি ধরে টেনে নিয়ে আসি— ঘণ্টা দুয়ের মধ্যে সমস্ত পরিষ্কার হয়ে যায়। তার পরে আবার দশটা বিয়ে করবার ফুরসৎ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় সৈনিক। যোধমল, সেদিন কী করবি বল্ দেখি।

প্রথম সৈনিক। সেদিন আমিও আর-একটা বিয়ে করে ফেলব।

দ্বিতীয় সৈনিক। শাবাশ বলেছিস রে ভাই!

প্রথম সৈনিক। মহিচাঁদের মেয়ে! খাসা দেখতে ভাই! কী চোখ রে! সেদিন বিতস্তায় জল আনতে যাচ্ছিল, দুটো কথা বলতে গেলুম, কঙ্কণ তুলে মারতে এল। দেখলুম চোখের চেয়ে তার কঙ্কণ ভয়ানক। চট্‌পট্ সরে পড়তে হল।

গান

ঐ আঁখি রে!
ফিরে ফিরে চেয়ো না, চেয়ো না, ফিরে যাও
কী আর রেখেছ বাকি রে!
মরমে কেটেছ সিঁধ, নয়নের কেড়েছ নিদ—
কী সুখে পরান আর রাখি রে!

দ্বিতীয় সৈনিক। শাবাশ ভাই!

প্রথম সৈনিক। ওই দেখ্ শংকরদাদা। যুবরাজ এখানে নেই— তবু বুড়ো সাজসজ্জা করে সেই দুয়োরে বসে আছে। পৃথিবী যদি উলট-পালট হয়ে যায় তবু বুড়োর নিয়মের ত্রুটি হবে না।

দ্বিতীয় সৈনিক। আয় ভাই, ওকে যুবরাজের দুটো কথা জিজ্ঞাসা করা যাক।

প্রথম সৈনিক। জিজ্ঞাসা করলে ও কি উত্তর দেবে? ও তেমন বুড়ো নয়। যেন

ভরতের রাজত্বে রামচন্দ্রের জুতোজোড়াটার মতো পড়ে আছে, মুখে কথাটি নেই।

দ্বিতীয় সৈনিক। (শংকরের নিকটে গিয়া) হাঁ দাদা, বলো-না দাদা, যুবরাজ রাজা হবে কবে ?

শংকর। তোদের সে খবরে কাজ কী ?

প্রথম সৈনিক। না না, বলছি, আমাদের যুবরাজের বয়স হয়েছে, এখন খুড়ো-রাজা নাবছে না কেন ?

শংকর। তাতে দোষ হয়েছে কী ? হাজার হোক, খুড়ো তো বটে।

দ্বিতীয় সৈনিক। তা তো বটেই। কিন্তু যে দেশের যেমন নিয়ম— আমাদের নিয়ম আছে যে—

শংকর। নিয়ম তোরা মানবি, আমরা মানব, বড়োলোকের আবার নিয়ম কী ? সবাই যদি নিয়ম মানবে তবে নিয়ম গড়বে কে !

প্রথম সৈনিক। আচ্ছা, দাদা, তা যেন হল— কিন্তু এই পাঁচ বছর ধরে বিয়ে করা এ কেমন নিয়ম দাদা ? আমি তো বলি, বিয়ে করা বাণ খাওয়ার মতো— চট্‌ করে লাগল তীর, তার পরে ইহজন্মের মতো বিঁধে রইল। আর ভাবনা রইল না। কিন্তু দাদা, পাঁচ বৎসর ধরে এ কী রকম কারখানা !

শংকর। তোদের আশ্চর্য ঠেকবে বলে কি যে দেশের যা নিয়ম তা উলটে যাবে ? নিয়ম তো কারো ছাড়বার জো নেই। এ সংসার নিয়মেই চলছে। যা যা, আর বকিস নে, যা ! এ-সকল কথা তোদের মুখে ভালো শোনায় না।

প্রথম সৈনিক। তা চললুম। আজকাল আমাদের দাদার মেজাজ ভালো নেই। একেবারে শুকিয়ে যেন খড়্‌ খড়্‌ করছে। [সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান

পুরুষবেশী সুমিত্রার প্রবেশ

সুমিত্রা। তুমি কি শংকরদাদা ?

শংকর। কে তুমি ডাকিলে
পুরাতন পরিচিত স্নেহভরা স্বরে ?
কে তুমি পথিক ?

সুমিত্রা। এসেছি বিদেশ হতে।

শংকর। এ কি স্বপ্ন দেখি আমি ? কী মন্ত্রকুহকে
কুমার আবার এল বালক হইয়া
শংকরের কাছে ! যেন সেই সন্ধ্যাবেলা

খেলাশ্রান্ত সুকুমার বাল্যতনুখানি,
চরণকমল ক্লিষ্ট, বিবর্ণ কপোল,
ক্লান্ত শিশু-হিয়া, বৃদ্ধ শংকরের বুকে
বিশ্রাম মাগিছে।

সুমিত্রা। জালন্ধর হতে আমি
এসেছি সংবাদ লয়ে কুমারের কাছে।

শংকর। কুমারের বাল্যকাল এসেছে আপনি
কুমারের কাছে! শৈশবের খেলাধুলা
মনে করে দিতে, ছোটো বোন পাঠায়েছে
তারে! দূত, তুমি এ মূর্তি কোথায় পেলে?
মিছে বকিতেছি কত! ক্ষমা করো মোরে।
বলো বলো কী সংবাদ। রানীদিদি মোর
ভালো আছে, সুখে আছে, পতির সোহাগে,
মহিষীগৌরবে? সুখে প্রজাগণ তারে
মা বলিয়া করে আশীর্বাদ? রাজ্যলক্ষ্মী
অন্নপূর্ণা বিতরিছে রাজ্যের কল্যাণ?
ধিক্ মোরে, শ্রান্ত তুমি পথশ্রমে, চলো
গৃহে চলো। বিশ্রামের 'পরে একে একে
বোলো তুমি সকল সংবাদ। গৃহে চলো।

সুমিত্রা। শংকর, মনে কি আছে এখনো রানীরে?

শংকর। সেই কণ্ঠস্বর! সেই গভীর গম্ভীর
দৃষ্টি স্নেহভারনত। এ কি মরীচিকা!
এনেছ কি চুরি করে মোর সুমিত্রার
ছায়াখানি? মনে নাই তারে? তুমি বুঝি
তাহারি অতীত স্মৃতি বাহিরিয়া এলে
আমারি হৃদয় হতে আমারে ছলিতে?
বার্ধক্যের মুখরতা ক্ষমা করো যুবা!
বহুদিন মৌন ছিনু— আজ কত কথা
আসে মুখে, চোখে আসে জল। নাহি জানি
কেন এত স্নেহ আসে মনে, তোমা-'পরে।

যেন তুমি চিরপরিচিত। যেন তুমি
চিরজীবনের মোর আদরের ধন।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

ত্রিচূড়

ক্রীড়াকানন

কুমারসেন ইলা ও সখীগণ

ইলা। যেতে হবে? কেন যেতে হবে যুবরাজ?
ইলারে লাগে না ভালো দু দণ্ডের বেশি
ছি ছি চঞ্চলহৃদয়?

কুমারসেন। প্রজাগণ সবে—

ইলা। তারা কি আমার চেয়ে হয় ম্রিয়মাণ
তব অদর্শনে? রাজ্যে তুমি চলে গেলে
মনে হয়, আর আমি নেই। যতক্ষণ
তুমি মোরে মনে কর ততক্ষণ আছি,
একাকিনী কেহ নই আমি। রাজ্যে তব
কত লোক, কত চিন্তা, কত কার্যভার,
কত রাজ-আড়ম্বর! আর সব আছে,
শুধু সেথা ক্ষুদ্র ইলা নাই।

কুমারসেন। সব আছে
তবু কিছু নাই, তুমি না থেকেও আছ
প্রাণতমে!

ইলা। মিছে কথা বোলো না কুমার!
তুমি রাজা আপন রাজত্বে— এ অরণ্যে
আমি রানী, তুমি প্রজা মোর। কোথা যাবে?

যেতে আমি দিব না তোমারে। সখী, তোরা
আয়। এরে বাঁধ্ ফুলপাশে, কর্ গান,
কেড়ে নে সকলে মিলি রাজ্যের ভাবনা।

সখীদের গান

যদি আসে তবে কেন যেতে চায়?
দেখা দিয়ে তবে কেন গো লুকায়?
চেয়ে থাকে ফুল হৃদয় আকুল, বায়ু বলে এসে 'ভেসে যাই'।
ধরে রাখো, ধরে রাখো, সুখপাখি ফাঁকি দিয়ে উড়ে যায়।
পথিকের বেশে সুখনিশি এসে বলে হেসে হেসে 'মিশে যাই'।
জেগে থাকো, জেগে থাকো, বরষের সাধ নিমেষে মিলায়।

কুমারসেন। আমারে কী করেছিস, অয়ি কুহকিনী!
নির্বাপিত আমি। সমস্ত জীবন মন
নয়ন বচন ধাইছে তোমার পানে
কেবল বাসনাময় হয়ে। যেন আমি
আমারে ভাঙিয়ে দিয়ে ব্যাপ্ত হয়ে যাব
তোমার মাঝারে প্রিয়ে! যেন মিশে রব
সুখস্বপ্ন হয়ে ওই নয়নপল্লবে।
হাসি হয়ে ভাসিব অধরে। বাহু দুটি
ললিত লাবণ্যসম রহিব বেড়িয়া,
মিলনসুখের মতো কোমল হৃদয়ে
রহিব মিলায়ে।

ইলা। তার পরে অবশেষে
সহসা টুটিবে স্বপ্নজাল, আপনারে
পড়িবে স্মরণে। গীতহীনা বীণাসম
আমি পড়ে রব ভূমে, তুমি চলে যাবে
গুন্‌গুন্ গাহি অন্যমনে। না না সখা,
স্বপ্ন নয়, মোহ নয়, এ মিলনপাশ
কখন বাঁধিয়া যাবে বাহুতে বাহুতে,
চোখে চোখে, মর্মে মর্মে, জীবনে জীবনে!

কুমারসেন। সে তো আর দেরি নাই— আজি সপ্তমীর
অর্ধচাঁদ ক্রমে ক্রমে পূর্ণশশী হয়ে
দেখিবেক আমাদের পূর্ণ সে মিলন
ক্ষীণ বিচ্ছেদের বাধা মাঝখানে রেখে
কম্পিত আগ্রহবেগে মিলনের সুখ—
আজি তার শেষ। দূরে থেকে কাছাকাছি,
কাছে থেকে তবু দূর— আজি তার শেষ।
সহসা সাক্ষাৎ, সহসা বিস্ময়রাশি,
সহসা মিলন, সহসা বিরহব্যথা—
বনপথ দিয়ে ধীরে ধীরে ফিরে যাওয়া
শূন্য গৃহপানে সুখস্মৃতি সঙ্গে নিয়ে,
প্রতি কথা প্রতি হাসিটুকু শতবার
উলটি পালটি মনে— আজি তার শেষ।
মৌন লজ্জা প্রতিবার প্রথম মিলনে,
অশ্রুজল প্রতি বারে বিদায়ের বেলা—
আজি তার শেষ।

ইলা। আহা, তাই যেন হয়।
সুখের ছায়ার চেয়ে সুখ ভালো, দুঃখ
সেও ভালো। তৃষ্ণা ভালো মরীচিকা চেয়ে।
কখন তোমারে পাব, কখন পাব না,
তাই সদা মনে হয়— কখন হারাব।
একা বসে বসে ভাবি কোথা আছ তুমি,
কী করিছ। কল্পনা কাঁদিয়া ফিরে আসে
অরণ্যের প্রান্ত হতে। বনের বাহিরে
তোমারে জানি নে আর, পাই নে সন্ধান।
সমস্ত ভুবনে তব রহিব সর্বদা—
কিছুই রবে না আর অচেনা, অজানা,
অন্ধকার। ধরা দিতে চাহ না কি নাথ?

কুমারসেন। ধরা তো দিয়েছি আমি আপন ইচ্ছায়,
তবু কেন বন্ধনের পাশ? বলো দেখি

কী তুমি পাও নি, কোথা রয়েছে অভাব।

ইলা। যখন তোমার কাছে সুমিত্রার কথা
শুনি ব'সে, মনে মনে ব্যথা যেন বাজে।
মনে হয় সে যেন আমায় ফাঁকি দিয়ে
চুরি করে রাখিয়াছে শৈশব তোমার
গোপনে আপন-কাছে। কভু মনে হয়
যদি সে ফিরিয়া আসে, বাল্যসহচরী
ডেকে নিয়ে যায় সেই সুখশৈশবের
খেলাঘরে, সেথা তারি তুমি। সেথা মোর
নাই অধিকার। মাঝে মাঝে সাধ যায়,
তোমার সে সুমিত্রারে দেখি একবার।

কুমারসেন। সে যদি আসিত, আহা, কত সুখ হত!
উৎসবের আনন্দকিরণখানি হয়ে
দীপ্তি পেত পিতৃগৃহে শৈশবভবনে।
অলংকারে সাজাত তোমারে, বাহুপাশে
বাঁধিত সাদরে, চুরি করে হাসিমুখে
দেখিত মিলন। আর কি সে মনে করে
আমাদের? পরগৃহে পর হয়ে আছে।

ইলার গান

এরা পরকে আপন করে, আপনারে পর—
বাহিরে বাঁশির রবে ছেড়ে যায় ঘর।
ভালোবাসে সুখে দুখে,
ব্যথা সহে হাসিমুখে,
মরণেরে করে চির জীবননির্ভর।

কুমারসেন। কেন এ করুণ সুর? কেন দুঃখগান?
বিষণ্ণ নয়ন কেন?

ইলা। এ কি দুঃখগান?
শোনায় গভীর সুখ দুঃখের মতন

উদার উদাস। সুখদুঃখ ছেড়ে দিয়ে
আত্মবিসর্জন করি রমণীর সুখ।

কুমারসেন। পৃথিবী করিব বশ তোমার এ প্রেমে।
আনন্দে জীবন মোর উঠে উচ্ছ্বসিয়া
বিশ্বমাঝে। শ্রান্তিহীন কর্মসুখতরে
ধায় হিয়া। চিরকীর্তি করিয়া অর্জন
তোমারে করিব তার অধিষ্ঠাত্রী দেবী।
বিরলে বিলাসে ব'সে এ অগাধ প্রেম
পারি নে করিতে ভোগ অলসের মতো।

ইলা। ওই দেখো রাশি রাশি মেঘ উঠে আসে
উপত্যকা হতে, ঘিরিতে পর্বতশৃঙ্গ—
সৃষ্টির বিচিত্র লেখা মুছিয়া ফেলিতে।

কুমারসেন। দক্ষিণে চাহিয়া দেখো— অস্তরবিকরে
সুবর্ণসমুদ্রসম সমতলভূমি
গেছে চলে নিরুদ্দেশ কোন্ বিশ্ব-পানে।
শস্যক্ষেত্র, বনরাজি, নদী, লোকালয়
অস্পষ্ট সকলি— যেন স্বর্ণ চিত্রপটে
শুধু নানা বর্ণসমাবেশ, চিত্ররেখা
এখনো ফোটে নি। যেন আকাঙ্ক্ষা আমারই
শৈল-অন্তরাল ছেড়ে ধরণীর পানে
চলেছে বিস্তৃত হয়ে হৃদয়ে বহিয়া
কল্পনার স্বর্ণলেখা ছায়াস্ফুট ছবি।
আহা, হোথা কত দেশ, নব দৃশ্য কত,
কত নব কীর্তি, কত নব রঙ্গভূমি!

ইলা। অনন্তের মূর্তি ধরে ওই মেঘ আসে
মোদের করিতে গ্রাস। নাথ, কাছে এস।
আহা, যদি চিরকাল এই মেঘমাঝে
লুপ্ত বিশ্বে থাকিতাম তোমাতে আমাতে,
দুটি পাখি একমাত্র মহামেঘনীড়ে।
পারিতে থাকিতে তুমি? মেঘ-আভরণ

ভেদ করে কোথা হতে পশিত শ্রবণে
ধরার আহ্বান, তুমি ছুটে চলে যেতে
আমারে ফেলিয়া রেখে প্রলয়ের মাঝে।

পরিচারিকার প্রবেশ

পরিচারিকা। কাশ্মীরে এসেছে দূত জালন্ধর হতে
গোপন সংবাদ লয়ে।

কুমারসেন। তবে যাই, প্রিয়ে,
আবার আসিব ফিরে, পূর্ণিমার রাতে
নিয়ে যাব হৃদয়ের চিরপূর্ণিমারে—
হৃদয়দেবতা আছ, গৃহলক্ষ্মী হবে।

[প্রস্থান

ইলা। যাও তুমি, আমি একা কেমনে পারিব
তোমারে রাখিতে ধরে! হায়, কত ক্ষুদ্র,
কত ক্ষুদ্র আমি! কী বৃহৎ এ সংসার,
কী উদ্দাম তোমার হৃদয়! কে জানিবে
আমার বিরহ! কে গণিবে অশ্রু মোর!
কে মানিবে এ নিভৃত বনপ্রান্তভাগে
শূন্যহিয়া বালিকার মর্মকাতরতা!

তৃতীয় দৃশ্য

কাশ্মীর

যুবরাজের প্রাসাদ

কুমারসেন ও ছদ্মবেশী সুমিত্রা

কুমারসেন। কত-যে আগ্রহ মোর কেমনে দেখাব
তোমারে ভগিনী! আমারে ব্যথিছে যেন
প্রত্যেক নিমেষ পল— যেতে চাই আমি

এখনি লইয়া সৈন্য, দুর্বিনীত সেই
দস্যুদের করিতে দমন, কাশ্মীরের
কলঙ্ক করিতে দূর। কিন্তু পিতৃব্যের
পাই নে আদেশ। ছদ্মবেশ দূর করো
বোন! চলো মোরা যাই দোঁহে, পড়ি গিয়ে
রাজার চরণে।

সুমিত্রা। সে কী কথা ভাই! আমি
এসেছি তোমার কাছে, জানাতে তোমারে
ভগিনীর মনোব্যথা। আমি কি এসেছি
জালন্ধর রাজ্য হতে ভিখারিনী রানী
ভিক্ষা মাগিবার তরে কাশ্মীরের কাছে?
ছদ্মবেশ দহিছে হৃদয়। আপনার
পিতৃগৃহে আসিলাম এতদিন পরে
আপনারে করিয়া গোপন! কতবার
বৃদ্ধ শংকরের কাছে কণ্ঠ রুদ্ধ হল
অশ্রুভরে— কতবার মনে করেছিনু
কাঁদিয়া তাহারে বলি, 'শংকর, শংকর,
তোদের সুমিত্রা সেই ফিরিয়া এসেছে
দেখিতে তোদের।' হায়, বৃদ্ধ, কত অশ্রু
ফেলে গিয়েছিনু সেই বিদায়ের দিনে,
মিলনের অশ্রুজল নারিলাম দিতে।
শুধু আমি নহি আর কন্যা কাশ্মীরের,
আজ আমি জালন্ধর-রানী।

কুমারসেন। বুঝিয়াছি
বোন! যাই দেখি, অন্য কী উপায় আছে।

চতুর্থ দৃশ্য

কাশ্মীর-প্রাসাদ

অন্তঃপুর

রেবতী ও চন্দ্রসেন

রেবতী। যেতে দাও মহারাজ! কী ভাবিছ বসি?
ভাবিছ কী লাগি? যাক যুদ্ধে, তার পরে
দেবতাকৃপায় আর যেন নাহি আসে
ফিরে।

চন্দ্রসেন। ধীরে রানী, ধীরে।

রেবতী। ক্ষুধিত মার্জার
বসে ছিলে এতদিন সময় চাহিয়া,
আজ তো সময় এল— তবু আজও কেন
সেই বসে আছ?

চন্দ্রসেন। কে বসিয়া ছিল, রানী,
কিসের লাগিয়া?

রেবতী। ছি ছি, আবার ছলনা?
লুকাবে আমার কাছে? কোন্ অভিপ্রায়ে
এতদিন কুমারের দাও নি বিবাহ?
কেন বা সম্মতি দিলে ত্রিচূড়রাজ্যের
এই অনার্য প্রথায়? পঞ্চবর্ষ ধরে
কন্যার সাধনা!

চন্দ্রসেন। ধিক্! চুপ করো রানী—
কে বোঝে কাহার অভিপ্রায়?

রেবতী। তবে, বুঝে
দেখো ভালো করে। যে কাজ করিতে চাও
জেনে শুনে করো। আপনার কাছ হতে
রেখো না গোপন করে উদ্দেশ্য আপন।
দেবতা তোমার হয়ে অলক্ষ্য সন্ধানে

করিবে না তব লক্ষ্যভেদ। নিজহাতে
উপায় রচনা করো অবসর বুঝে।
বাসনার পাপ সেই হতেছে সঞ্চয়,
তার পরে কেন থাকে অসিদ্ধির ক্লেশ ?
কুমারে পাঠাও যুদ্ধে।

চন্দ্রসেন। বাহিরে রয়েছে
কাশ্মীরের যত উপদ্রব। পররাজ্যে
আপনার বিষদন্ত করিতেছে ক্ষয়।
ফিরায়ে আনিতে চাও তাদের আবার ?

রেবতী। অনেক সময় আছে সে কথা ভাবিতে।
আপাতত পাঠাও কুমারে। প্রজাগণ
ব্যগ্র অতি যৌবরাজ্য-অভিষেক-তরে,
তাদের থামাও কিছুদিন। ইতিমধ্যে
কত কী ঘটিতে পারে, পরে ভেবে দেখো।

কুমারের প্রবেশ

কুমারের প্রতি

রেবতী। যাও যুদ্ধে, পিতৃব্যের হয়েছে আদেশ।
বিলম্ব কোরো না আর, বিবাহ-উৎসব
পরে হবে। দীপ্ত যৌবনের তেজ ক্ষয়
করিয়ো না গৃহে ব'সে আলস্য-উৎসবে।

কুমারসেন। জয় হোক, জয় হোক জননী তোমার!
একি আনন্দসংবাদ! নিজমুখে তাত,
করহ আদেশ।

চন্দ্রসেন। যাও তবে। দেখো বৎস,
থেকো সাবধানে। দর্পমদে ইচ্ছা ক'রে
বিপদে দিয়ো না ঝাঁপ। আশীর্বাদ করি
ফিরে এসো জয়গর্বে অক্ষত শরীরে
পিতৃসিংহাসন-'পরে।

কুমারসেন। মাগি জননীর
আশীর্বাদ।

রেবতী। কী হইবে মিথ্যা আশীর্বাদে?
আপনারে রক্ষা করে আপনার বাহু।

পঞ্চম দৃশ্য

ত্রিচূড়

ক্রীড়াকানন

ইলার সখীগণ

প্রথম সখী। আলো কোথায় কোথায় দেবে ভাই?

দ্বিতীয় সখী। আলোর জন্যে ভাবি নে। আলো তো কেবল এক রাত্রি জ্বলবে। কিন্তু বাঁশি এখনো এল না কেন? বাঁশি না বাজলে আমোদ নেই ভাই!

তৃতীয় সখী। বাঁশি কাশ্মীর থেকে আনতে গেছে, এতক্ষণে এল বোধ হয়। কখন বাজবে ভাই?

প্রথম সখী। বাজবে লো বাজবে। তোর অদৃষ্টেও একদিন বাজবে।

তৃতীয় সখী। পোড়াকপাল আর-কি! আমি সেইজন্যেই ভেবে মরছি।

প্রথম সখীর গান

বাজিবে, সখী, বাঁশি বাজিবে—
হৃদয়রাজ হৃদে রাজিবে।
বচন রাশি রাশি, কোথা যে যাবে ভাসি
অধরে লাজহাসি সাজিবে।
নয়নে আঁখিজল করিবে ছলছল,
সুখবেদনা মনে বাজিবে।
মরমে মুরছিয়া মিলাতে চাবে হিয়া
সেই চরণযুগরাজীবে।

দ্বিতীয় সখী। তোর গান রেখে দে। এক-একবার মন কেমন হু হু করে

উঠছে। মনে পড়ছে কেবল একটি রাত আলো হাসি বাঁশি আর গান। তার পরদিন থেকে সমস্ত অন্ধকার।

প্রথম সখী। কাঁদবার সময় ঢের আছে বোন! এ দুটো দিন একটু হেসে আমোদ করে নে। ফুল যদি না শুকোত তা হলে আমি আজ থেকেই মালা গাঁথতে বসতুম।

দ্বিতীয় সখী। আমি বাসরঘর সাজাব।

প্রথম সখী। আমি সখীকে সাজিয়ে দেব।

তৃতীয় সখী। আর আমি কী করব?

প্রথম সখী। ওলো, তুই আপনি সাজিস। দেখিস যদি যুবরাজের মন ভোলাতে পারিস।

তৃতীয় সখী। তুই তো ভাই, চেষ্টা করতে ছাড়িস নি। তা, তুই যখন পারলি নে তখন কি আর আমি পারব? ওলো, আমাদের সখীকে যে একবার দেখেছে তার মন কি আর অমনি পথে-ঘাটে চুরি যায়? ওই বাঁশি এসেছে। ওই শোন্ বেজে উঠেছে।

প্রথম সখীর গান

ঐ বুঝি বাঁশি বাজে—
বনমাঝে কি মনোমাঝে?
বসন্তবায় বহিছে কোথায়, কোথায় ফুটেছে ফুল!
বলো গো সজনী, এ সুখরজনী কোন্‌খানে উদিয়াছে—
বনমাঝে কি মনোমাঝে?
যাব কি যাব না মিছে এ ভাবনা, মিছে মরি লোকলাজে।
কে জানে কোথা সে বিরহহুতাশে ফিরে অভিসারসাজে—
বনমাঝে কি মনোমাঝে?

দ্বিতীয় সখী। ওলো থাম্— ওই দেখ যুবরাজ কুমারসেন এসেছেন।

তৃতীয় সখী। চল্ চল্ ভাই, আমরা একটু আড়ালে দাঁড়াই গে। তোরা পারিস, কিন্তু কে জানে ভাই, যুবরাজের সামনে যেতে আমার কেমন করে।

দ্বিতীয় সখী। কিন্তু কুমার আজ হঠাৎ অসময়ে এলেন কেন?

প্রথম সখী। ওলো, এর কি আর সময়-অসময় আছে? রাজার ছেলে বলে কি পঞ্চশর ওকে ছেড়ে কথা কয়? থাকতে পারবে কেন?

তৃতীয় সখী। চল্ ভাই, আড়ালে চল্। [অন্তরালে গমন

কুমারসেন ও ইলার প্রবেশ

ইলা। থাক্ নাথ, আর বেশি বোলো না আমারে।
কাজ আছে, যেতে হবে রাজ্য ছেড়ে, তাই
বিবাহ স্থগিত রবে কিছুকাল, এর
বেশি কী আর শুনিব ?

কুমারসেন। এমনি বিশ্বাস
মোর 'পরে রেখো চিরদিন। মন দিয়ে
মন বোঝা যায়, গভীর বিশ্বাস শুধু
নীরব প্রাণের কথা টেনে নিয়ে আসে।
প্রবাসীরে মনে করো এই উপবনে,
এই নির্ঝরিণীতীরে, এই লতাগৃহে,
এই সন্ধ্যালোকে, পশ্চিমগগনপ্রান্তে
ওই সন্ধ্যাতারা-পানে চেয়ে। মনে কোরো,
আমিও প্রদোষে, প্রবাসে তরুর তলে
একেলা বসিয়া ওই তারকার 'পরে
তোমারি আঁখির তারা পেতেছি দেখিতে।
মনে কোরো মিশিতেছে এই নীলাকাশে
পুষ্পের সৌরভ-সম তোমার আমার
প্রেম। এক চন্দ্র উঠিয়াছে উভয়ের
বিরহরজনী-'পরে।

ইলা। জানি, জানি, নাথ,
জানি আমি তোমার হৃদয়।

কুমারসেন। যাই তবে,
অয়ি তুমি অন্তরের ধন, জীবনের
মর্মস্বরূপিণী, অয়ি সবার অধিক! [প্রস্থান

সখীগণের প্রবেশ

দ্বিতীয় সখী। হায় একি শুনি!

তৃতীয় সখী। সখী, কেন যেতে দিলে!

প্রথম সখী। ভালোই করেছ। স্বেচ্ছায় না দিলে ছাড়ি

বাঁধন ছিঁড়িয়া যায় চিরদিন তরে।
হায় সখী, হায়, শেষে নিবাতে হল কি
উৎসবের দীপ ?

ইলা। সখী, তোরা চুপ কর্,
টুটিছে হৃদয়। ভেঙে দে ভেঙে দে ওই
দীপমালা। বল্ সখী, কে দিবে নিবায়ে
লজ্জাহীনা পূর্ণিমার আলো ? কেন আজ
মনে হয়, আমার এ জীবনের সুখ
আজি দিবসের সাথে ডুবিল পশ্চিমে ?
অমনি ইলারে কেন অস্তপথ-পানে
সঙ্গে নাহি নিয়ে গেল ছায়ার মতন ?

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জালন্ধর

রণক্ষেত্র। শিবির

বিক্রমদেব ও সেনাপতি

সেনাপতি। বন্দীকৃত শিলাদিত্য উদয়ভাস্কর,
শুধু যুধাজিৎ পলাতক— সঙ্গে লয়ে
সৈন্যদলবল।

বিক্রমদেব। চলো তবে অবিলম্বে
তাহার পশ্চাতে। উঠাও শিবির তবে।
ভালোবাসি আমি এই ব্যগ্র উর্ধ্বশ্বাস
মানবমৃগয়া ; গ্রাম হতে গ্রামান্তরে,
বন গিরি নদীতীরে দিবারাত্রি এই

কৌশলে কৌশলে খেলা। বাকি আছে আর
কেবা বিদ্রোহীদলের ?

সেনাপতি। শুধু জয়সেন।
কর্তা সে'ই বিদ্রোহের। সৈন্যবল তার
সব চেয়ে বেশি।

বিক্রমদেব। চলো তবে সেনাপতি,
তার কাছে। আমি চাই উদগ্র সংগ্রাম,
বুকে বুকে বাহুতে বাহুতে— অতি তীব্র
প্রেম-আলিঙ্গন-সম। ভালো নাহি লাগে
অস্ত্রে অস্ত্রে মৃদু ঝন্‌ঝনি— ক্ষুদ্র যুদ্ধে
ক্ষুদ্র জয়লাভ।

সেনাপতি। কথা ছিল আসিবে সে
গোপনে সহসা, করিবে পশ্চাৎ হতে
আক্রমণ। বুঝি শেষে জাগিয়াছে মনে
বিপদের ভয়, সন্ধির প্রস্তাব-তরে
হয়েছে উন্মুখ।

বিক্রমদেব। ধিক্‌, ভীরু, কাপুরুষ!
সন্ধি নহে— যুদ্ধ চাই আমি। রক্তে রক্তে
মিলনের স্রোত, অস্ত্রে অস্ত্রে সংগীতের
ধ্বনি। চলো সেনাপতি!

সেনাপতি। যে আদেশ প্রভু!

[প্রস্থান

বিক্রমদেব। একি মুক্তি! একি পরিত্রাণ! কী আনন্দ
হৃদয়মাঝারে! অবলার ক্ষীণ বাহু
কী প্রচণ্ড সুখ হতে রেখেছিল মোরে
বাঁধিয়া বিবরমাঝে! উদ্দাম হৃদয়
অপ্রশস্ত অন্ধকার গভীরতা খুঁজে
ক্রমাগত যেতেছিল রসাতল-পানে।
মুক্তি, মুক্তি আজি! শৃঙ্খল বন্দীরে
ছেড়ে আপনি পলায়ে গেছে। এতদিন

এ জগতে কত যুদ্ধ, কত সন্ধি, কত
কীর্তি, কত রঙ্গ— কত কী চলিতেছিল
কর্মের প্রবাহ— আমি ছিনু অন্তঃপুরে
পড়ে, রুদ্ধদল চম্পককোরকমাঝে
সুপ্তকীটসম। কোথা ছিল লোকলাজ,
কোথা ছিল বীরপরাক্রম! কোথা ছিল
এ বিপুল বিশ্বতটভূমি! কোথা ছিল
হৃদয়ের তরঙ্গতর্জন! কে বলিবে
আজি মোরে দীন কাপুরুষ! কে বলিবে
অন্তঃপুরচারী! মৃদু গন্ধবহ আজি
জাগিয়া উঠেছে বেগে ঝঞ্ঝাবায়ুরূপে।
এ প্রবল হিংসা ভালো ক্ষুদ্র প্রেম চেয়ে
প্রলয় তো বিধাতার চরম আনন্দ।
হিংসা এই হৃদয়ের বন্ধনমুক্তির
সুখ। হিংসা জাগরণ। হিংসা স্বাধীনতা।

সেনাপতির প্রবেশ

সেনাপতি। আসিছে বিদ্রোহী সৈন্য।
বিক্রমদেব। চলো, তবে চলো।

চরের প্রবেশ

চর। রাজন্‌, বিপক্ষদল নিকটে এসেছে।
নাই বাদ্য, নাই জয়ধ্বজা, নাই কোনো
যুদ্ধ-আস্ফালন, মার্জনা-প্রার্থনা-তরে
আসিতেছে যেন।
বিক্রমদেব। থাক্‌, চাহি না শুনিতে
মার্জনার কথা। আগে আমি আপনারে
করিব মার্জনা, অপযশ রক্তস্রোতে
করিব ক্ষালন। যুদ্ধে চলো সেনাপতি!

দ্বিতীয় চরের প্রবেশ

দ্বিতীয় চর। বিপক্ষশিবির হতে আসিছে শিবিকা
বোধ করি সন্ধিদূত লয়ে।

সেনাপতি। মহারাজ,
তিলেক অপেক্ষা করো— আগে শোনা যাক
কী বলে বিপক্ষদূত—

বিক্রমদেব। যুদ্ধ তার পরে।

সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। মহারানী এসেছেন বন্দী ক'রে লয়ে
যুধাজিৎ আর জয়সেনে।

বিক্রমদেব। কে এসেছে?

সৈনিক। মহারানী।

বিক্রমদেব। মহারানী! কোন্ মহারানী?

সৈনিক। আমাদের মহারানী।

বিক্রমদেব। বাতুল উন্মাদ!
যাও সেনাপতি, দেখে এস কে এসেছে।
[সেনাপতি প্রভৃতির প্রস্থান

মহারানী এসেছেন বন্দী ক'রে লয়ে
যুধাজিৎ-জয়সেনে! এ কি স্বপ্ন নাকি!
এ কি রণক্ষেত্র নয়? এ কি অন্তঃপুর?
এতদিন ছিলাম কি যুদ্ধের স্বপনে
মগ্ন? সহসা জাগিয়া আজ দেখিব কি
সেই ফুলবন, সেই মহারানী, সেই
পুষ্পশয্যা, সেই সুদীর্ঘ অলস দিন,
দীর্ঘনিশি বিজড়িত ঘুমে জাগরণে?
বন্দী? কারে বন্দী? কী শুনিতে কী শুনেছি?
এসেছে কি আমারে করিতে বন্দী? দূত!
সেনাপতি! কে এসেছে? কারে বন্দী লয়ে?

সেনাপতির প্রবেশ

সেনাপতি। মহারানী এসেছেন লয়ে কাশ্মীরের
সৈন্যদল— সোদর কুমারসেন-সাথে।
এসেছেন পথ হতে যুদ্ধে বন্দী করে
পলাতক যুধাজিৎ আর জয়সেনে।
আছেন শিবিরদ্বারে, সাক্ষাতের তরে
অভিলাষী।

বিক্রমদেব। সেনাপতি, পালাও, পালাও।
চলো চলো সৈন্য লয়ে— আর কি কোথাও
নাই শত্রু, আর কেহ নাই কি বিদ্রোহী ?
সাক্ষাৎ ? কাহার সাথে ? রমণীর সনে
সাক্ষাতের এ নহে সময়।

সেনাপতি। মহারাজ—

বিক্রমদেব। চুপ করো সেনাপতি, শোনো যাহা বলি।
রুদ্ধ করো দ্বার— এ শিবিরে শিবিকার
প্রবেশ নিষেধ।

সেনাপতি। যে আদেশ মহারাজ!

দ্বিতীয় দৃশ্য

দেবদত্তের কুটির

দেবদত্ত ও নারায়ণী

দেবদত্ত। প্রিয়ে, তবে অনুমতি করো— দাস বিদায় হয়।

নারায়ণী। তা যাও না, আমি তোমাকে বেঁধে রেখেছি না কি ?

দেবদত্ত। ওই তো, ওইজন্যেই তো কোথাও যাওয়া হয়ে ওঠে না— বিদায় নিয়েও সুখ নেই। যা বলি তা করো। ওইখানটায় আছাড় খেয়ে পড়ো। বলো, হা হতোঽস্মি, হা ভগবতি ভবিতব্যতে! হা ভগবন্ মকরকেতন!

নারায়ণী। মিছে বোকো না। মাথা খাও, সত্যি করে বলো কোথায় যাবে।

দেবদত্ত। রাজার কাছে।

নারায়ণী। রাজা তো যুদ্ধু করতে গেছে। তুমি যুদ্ধু করবে নাকি? দ্রোণাচার্য হয়ে উঠেছ?

দেবদত্ত। তুমি থাকতে আমি যুদ্ধ করব? যা হোক, এবার যাওয়া যাক।

নারায়ণী। সেই অবধি তো ওই এক কথাই বলছ। তা যাও-না। কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে ধরে রেখেছে?

দেবদত্ত। হায় মকরকেতন, এখানে তোমার পুষ্পশরের কর্ম নয়— একেবারে আস্ত শক্তিশেল না ছাড়লে মর্মে গিয়ে পৌঁছয় না। বলি ও শিখরদশনা, পক্ব-বিম্বাধরোষ্ঠী, চোখ দিয়ে জল-টল কিছু বেরোবে কি? সেগুলো শীঘ্র শীঘ্র সেরে ফেলো— আমি উঠি।

নারায়ণী। পোড়া কপাল! চোখের জল ফেলব কী দুঃখে? হাঁ গা, তুমি না গেলে কি রাজার যুদ্ধু চলবে না? তুমি কি মহাবীর ধূম্রলোচন হয়েছ?

দেবদত্ত। আমি না গেলে রাজার যুদ্ধ থামবে না। মন্ত্রী বার বার লিখে পাঠাচ্ছে রাজ্য ছারখারে যায়, কিন্তু মহারাজ কিছুতেই যুদ্ধ ছাড়তে চান না। এ দিকে বিদ্রোহ সমস্ত থেমে গেছে।

নারায়ণী। বিদ্রোহই যদি থেমে গেল তো মহারাজ কার সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবেন?

দেবদত্ত। মহারানীর ভাই কুমারসেনের সঙ্গে।

নারায়ণী। হাঁ গা, সে কী কথা! শালার সঙ্গে যুদ্ধু? বোধ করি রাজায় রাজায় এই রকম করেই ঠাট্টা চলে। আমরা হলে শুধু কান মলে দিতুম। কী বল?

দেবদত্ত। বড়ো ঠাট্টা নয়। মহারানী কুমারসেনের সাহায্যে জয়সেন ও যুধাজিৎকে যুদ্ধে বন্দী করে মহারাজের কাছে নিয়ে আসেন। মহারাজ তাঁকে শিবিরে প্রবেশ করতে দেন নি।

নারায়ণী। হাঁ গা, বল কী! তা, তুমি এতদিন যাও নি কেন! এ খবর শুনেও বসে আছ? যাও, যাও, এখনি যাও। আমাদের রানীর মতো অমন সতীলক্ষ্মীকে অপমান করলে? রাজার শরীরে কলি প্রবেশ করেছে।

দেবদত্ত। বন্দী বিদ্রোহীরা রাজাকে বলেছে— মহারাজ, আমরা তোমারই প্রজা, অপরাধ করে থাকি তুমি শাস্তি দেবে। একজন বিদেশী এসে আমাদের অপমান করবে এতে তোমাকেই অপমান করা হল— যেন তোমার নিজরাজ্য নিজে

শাসন করবার ক্ষমতা নেই। একটা সামান্য যুদ্ধ, এর জন্যে অমনি কাশ্মীর থেকে সৈন্য এল, এর চেয়ে উপহাস আর কী হতে পারে! এই শুনে মহারাজ আগুন হয়ে কুমারসেনকে পাঁচটা ভর্ৎসনা করে এক দূত পাঠিয়ে দেন। কুমারসেন উদ্ধত যুবা-পুরুষ সহ্য করতে পারবে কেন? বোধ করি সেও দূতকে দু কথা শুনিয়ে দিয়ে থাকবে।

নারায়ণী। তা, বেশ তো— কুমারসেন তো রাজার পর নয়, আপনার লোক, তা কথা চলছিল বেশ তাই চলুক। তুমি কাছে না থাকলে রাজার ঘটে কি দুটো কথাও জোগায় না? কথা বন্ধ করে অস্ত্র চালাবার দরকার কী বাপু! ওই ওতেই তো হার হল।

দেবদত্ত। আসল কথা, একটা যুদ্ধ করবার ছুতো। রাজা এখন কিছুতেই যুদ্ধ ছাড়তে পারছেন না। নানা ছল অন্বেষণ করছেন। রাজাকে সাহস করে দুটো ভালো কথা বলে এমন বন্ধু কেউ নেই। আমি তো আর থাকতে পারছি নে— আমি চললুম।

নারায়ণী। যেতে ইচ্ছে হয় যাও, আমি কিন্তু একলা তোমার ঘরকন্না করতে পারব না তা আমি বলে রাখলুম। এই রইল, তোমার সমস্ত পড়ে রইল। আমি বিবাগী হয়ে বেরিয়ে যাব।

দেবদত্ত। রোসো, আগে আমি ফিরে আসি, তার পরে যেয়ো। বল তো আমি থেকে যাই।

নারায়ণী। না না, তুমি যাও। আমি কি আর তোমাকে সত্যি থাকতে বলছি? ওগো, তুমি চলে গেলে আমি একেবারে বুক ফেটে মরব না, সেজন্যে ভেবো না। আমার বেশ চলে যাবে।

দেবদত্ত। তা কি আর আমি জানি নে? মলয়সমীরণ তোমার কিছু করতে পারবে না। বিরহ তো সামান্য, বজ্রাঘাতেও তোমার কিছু হয় না!

[প্রস্থানোন্মুখ

নারায়ণী। হে ঠাকুর, রাজাকে সুবুদ্ধি দাও ঠাকুর! শীঘ্র শীঘ্র ফিরিয়ে আনো।

দেবদত্ত। এ ঘর ছেড়ে কখনো কোথাও যাই নি। হে ভগবান, এদের সকলের উপর তোমার দৃষ্টি রেখো।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

জালন্ধর

কুমারসেনের শিবির

কুমারসেন ও সুমিত্রা

সুমিত্রা। ভাই, রাজারে মার্জনা করো ; করো রোষ
আমার উপরে। আমি মাঝে না থাকিলে
যুদ্ধ করে 'বীর' নাম করিতে উদ্ধার।
যুদ্ধের আহ্বান শুনে অটল রহিলে
তবু তুমি ; জানি না কি অসম্মানশেল
চিরজীবী মৃত্যু-সম মানীর হৃদয়ে ?
আপন ভায়ের হৃদে দুর্ভাগিনী আমি
হানিতে দিলাম হেন অপমানশর
যেন আপনারি হস্তে। মৃত্যু ভালো ছিল,
ভাই, মৃত্যু ভালো ছিল।

কুমারসেন। জানিস তো বোন,
যুদ্ধ বীরধর্ম বটে— ক্ষমা তার চেয়ে
বীরত্ব অধিক। অপমান অবহেলা
কে পারে করিতে মানী ছাড়া ?

সুমিত্রা। ধন্য ভাই,
ধন্য তুমি। সঁপিলাম এ জীবন মোর
তোমার লাগিয়া। তোমার এ স্নেহঋণ
প্রাণ দিয়ে কেমনে করিব পরিশোধ ?
বীর তুমি, মহাপ্রাণ, তুমি নরপতি
এ নরসমাজ-মাঝে—

কুমারসেন। আমি ভাই তোর।
চল্ বোন, আমাদের সেই শৈলগৃহে
তুষারশিখর-ঘেরা শুভ্র সুশীতল
আনন্দকাননে। দুটি নির্ঝরের মতো

একত্রে করেছি খেলা দুই ভাইবোনে—
এখন আর কি ফিরে যেতে পারিবি নে
সেই উচ্চ, সেই শুভ্র শৈশবশিখরে ?

সুমিত্রা। চলো ভাই, চলো। যে ঘরেতে ভাইবোনে
করিতাম খেলা সেই ঘরে নিয়ে এসো
প্রেয়সী নারীরে— সন্ধ্যাবেলা বসে তারে
তোমার মনের মতো সাজাব যতনে।
শিখাইয়া দিব তারে তুমি ভালোবাস
কোন্ ফুল, কোন্ গান, কোন্ কাব্যরস।
শুনাব বাল্যের কথা ; শৈশবমহত্ত্ব
তব শিশু-হৃদয়ের।

কুমারসেন। মনে পড়ে মোর,
দোঁহে শিখিতাম বীণা। আমি ধৈর্যহীন
যেতেম পালায়ে। তুই শয্যাপ্রান্তে বসে
কেশবেশ ভুলে গিয়ে সারা সন্ধ্যাবেলা
বাজাতিস, গম্ভীর আনন্দমুখখানি।
সংগীতেরে করে তুলেছিলি তোর সেই
ছোটো ছোটো অঙ্গুলির বশ।

সুমিত্রা। মনে আছে,
খেলা হতে ফিরে এসে শোনাতে আমারে
অদ্ভুত কল্পনাকথা— কোথা দেখেছিলে
অজ্ঞাত নদীর ধারে স্বর্ণস্বর্গপুর,
অলৌকিক কল্পকুঞ্জে কোথায় ফলিত
অমৃতমধুর ফল ! ব্যথিত হৃদয়ে
সবিস্ময়ে শুনিতাম, স্বপ্নে দেখিতাম
সেই কিন্নরকানন।

কুমারসেন। বলিতে বলিতে
নিজের কল্পনা শেষে নিজেরে ছলিত।
সত্য মিথ্যা হত একাকার মেঘ আর
গিরির মতন ; দেখিতে পেতেম যেন

দূর শৈলপরপারে রহস্যনগরী।—
শংকর আসিছে ওই ফিরে। শোনা যাক
কী সংবাদ।

শংকরের প্রবেশ

শংকর। প্রভু তুমি, তুমি মোর রাজা,
ক্ষমা করো বৃদ্ধ এ শংকরে। ক্ষমা করো
রানীদিদি মোর। মোরে কেন পাঠাইলে
দূত করে রাজার শিবিরে? আমি বৃদ্ধ,
নহি পটু সাবধান বচনবিন্যাসে,
আমি কি সহিতে পারি তব অপমান?
শান্তির প্রস্তাব শুনে যখন হাসিল
ক্ষুদ্র জয়সেন, হাসিমুখে ভৃত্য যুধাজিৎ
করিল সুতীব্র উপহাস, সভ্রূভঙ্গে
কহিলা বিক্রমদেব জালন্ধররাজ
তোমারে বালক, ভীরু— মনে হল যেন
চারি দিকে হাসিতেছে সভাসদ্ যত
পরস্পর মুখ চেয়ে, হাসিতেছে দূরে
দ্বারের প্রহরী— পশ্চাতে আছিল যারা
তাদের নীরব হাসি ভুজঙ্গের মতো
যেন পৃষ্ঠে আসি মোর দংশিতে লাগিল।
তখন ভুলিয়া গেনু শিখেছিনু যত
শান্তিপূর্ণ মৃদুবাক্য। কহিলাম রোষে—
'কলহেরে জান তুমি বীরত্ব বলিয়া,
নারী তুমি, নহ ক্ষত্রবীর। সেই খেদে
মোর রাজা কোষে লয়ে কোষরুদ্ধ অসি
ফিরে যেতেছেন দেশে, জানাইনু সবে।'
শুনিয়া কম্পিততনু জালন্ধরপতি।
প্রস্তুত হতেছে সৈন্য

সুমিত্রা। ক্ষমা করো ভাই!

শংকর। এই কি উচিত তব, কাশ্মীরতনয়া
তুমি, ভারতে রটায়ে যাবে কাশ্মীরের
অপমানকথা? বীরের স্বধর্ম হতে
বিরত কোরো না তুমি আপন ভ্রাতারে,
রাখো এ মিনতি।

সুমিত্রা। বোলো না, বোলো না আর
শংকর! মার্জনা করো ভাই! পদতলে
পড়িলাম। ওই তব রুদ্ধ কম্পমান
রোষানল নির্বাণ করিতে চাও? আছে
মোর হৃদয়শোণিত। মৌন কেন ভাই?
বাল্যকাল হতে আমি ভালোবাসা তব
পেয়েছি না চেয়ে, আজ আমি ভিক্ষা মাগি
ওই রোষ তব, দাও তাহা।

শংকর। শোনো প্রভু!

কুমারসেন। চুপ করো বৃদ্ধ! যাও তুমি, সৈন্যদের
জানাও আদেশ— এখনি ফিরিতে হবে
কাশ্মীরের পথে।

শংকর। হায় একি অপমান,
পলাতক ভীরু বলে রটিবে অখ্যাতি!

সুমিত্রা। শংকর, বারেক তুই মনে করে দেখ্‌
সেই ছেলেবেলা। দুটি ছোটো ভাইবোনে
কোলে বেঁধে রেখেছিলি এক স্নেহপাশে।
তার চেয়ে বেশি হল খ্যাতি ও অখ্যাতি?
প্রাণের সম্পর্ক এ যে চিরজীবনের—
পিতা-মাতা-বিধাতার-আশীর্বাদে-ঘেরা
পুণ্য স্নেহতীর্থখানি। বাহির হইতে
হিংসানলশিখা আনি এ কল্যাণভূমি,
শংকর, করিতে চাস অঙ্গারমলিন!

শংকর। চল্‌ দিদি, চল্‌ ভাই, ফিরে চলে যাই
সেই শান্তিসুধাস্নিগ্ধ বাল্যকাল-মাঝে।

চতুর্থ দৃশ্য

বিক্রমদেবের শিবির

বিক্রমদেব যুধাজিৎ ও জয়সেন

বিক্রমদেব। পলাতক অরাতিরে আক্রমণ করা
নহে ক্ষাত্রধর্ম।

যুধাজিৎ। পলাতক অপরাধী
সহজে নিষ্কৃতি পায় যদি, রাজদণ্ড
ব্যর্থ হয় তবে।

বিক্রমদেব। বালক সে, শাস্তি তার
যথেষ্ট হয়েছে। পলায়ন, অপমান,
আর শাস্তি কিবা ?

যুধাজিৎ। গিরিরুদ্ধ কাশ্মীরের
বাহিরে পড়িয়া রবে যত অপমান।
সেথায় সে যুবরাজ, কে জানিবে তার
কলঙ্কের কথা ?

জয়সেন। চলো মহারাজ, চলো
সেই কাশ্মীরের মাঝে যাই— সেথা গিয়ে
দোষীরে শাসন করে আসি, সিংহাসনে
দিয়ে আসি কলঙ্কের ছাপ।

বিক্রমদেব। তাই চলো।
বাড়ে চিন্তা যত চিন্তা কর। কার্যস্রোতে
আপনারে ভাসাইয়া দিনু, দেখি কোথা
গিয়ে পড়ি, কোথা পাই কূল।

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। মহারাজ,
এসেছে সাক্ষাৎ-তরে ব্রাহ্মণতনয়
দেবদত্ত।

বিক্রমদেব। দেবদত্ত ? নিয়ে এস, নিয়ে
এস তারে। না না, রোসো, থামো, ভেবে দেখি।
কী লাগিয়ে এসেছে ব্রাহ্মণ ? জানি তারে
ভালোমতে। এসেছে সে যুদ্ধক্ষেত্র হতে
ফিরাতে আমারে। হায় বিপ্র, তোমরাই
ভাঙিয়াছ বাঁধ, এখন প্রবল স্রোত
শুধু কি শস্যের ক্ষেত্রে জলসেক করে
ফিরে যাবে, তোমাদের আবশ্যক বুঝে
পোষ-মানা প্রাণীর মতন ? চূর্ণিবে সে
লোকালয়, উচ্ছন্ন করিবে দেশ গ্রাম।
সকম্পিত পরামর্শ উপদেশ নিয়ে
তোমরা চাহিয়া থাকো— আমি ধেয়ে চলি
কার্যবেগে, অবিশ্রাম গতিসুখে, মত্ত
মহানদী যে আনন্দে শিলারোধ ভেঙে
ছুটে চিরদিন। প্রচণ্ড আনন্দ অন্ধ,
মুহূর্ত তাহার পরমায়ু— তারি মধ্যে
উৎপাটিয়া নিয়ে আসে অনন্তের সুখ
মত্ত করীশুণ্ডে ছিন্ন রক্তপদ্মসম।
বিচার বিবেক পরে হবে। চিরকাল
জড় সিংহাসনে পড়ি করিব মন্ত্রণা।—
চাহি না করিতে দেখা ব্রাহ্মণের সনে।

জয়সেন। যে আদেশ।

জনান্তিকে জয়সেনের প্রতি

যুধাজিৎ। ব্রাহ্মণেরে জেনো শত্রু বলে।
বন্দী করে রাখো।

জয়সেন। বিলক্ষণ জানি তারে।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কাশ্মীর। প্রাসাদ

রেবতী ও চন্দ্রসেন

রেবতী। যুদ্ধসজ্জা ? কেন যুদ্ধসজ্জা ? শত্রু কোথা ?
মিত্র আসিতেছে। সমাদরে ডেকে আনো
তারে। করুক সে অধিকার কাশ্মীরের
সিংহাসন। রাজ্যরক্ষা-তরে তুমি এত
ব্যস্ত কেন ? এ কি তব আপনার ধন ?
আগে তারে নিতে দাও, তার পরে ফিরে
নিয়ো বন্ধুভাবে। তখন এ পররাজ্য
হবে আপনার।

চন্দ্রসেন। চুপ করো, চুপ করো,
বোলো না অমন করে। কর্তব্য আমার
করিব পালন, তার পরে দেখা যাবে
অদৃষ্ট কী করে।

রেবতী। তুমি কী করিতে চাও
আমি জানি তাহা। যুদ্ধের ছলনা করে
পরাজয় মানিবারে চাও। তার পর
চারি দিক রক্ষা করে সুবিধা বুঝিয়া
কৌশলে করিতে চাও উদ্দেশ্যসাধন।

চন্দ্রসেন। ছি ছি রানী, এ-সকল কথা শুনি যবে
তব মুখে, ঘৃণা হয় আপনার 'পরে।
মনে হয় সত্য বুঝি এমনি পাষণ্ড
আমি ; আপনারে ছদ্মবেশী চোর ব'লে
সন্দেহ জনমে।— কর্তব্যের পথ হতে
ফিরায়ো না মোরে।

রেবতী। আমিও পালিব তবে
কর্তব্য আপন। নিশ্বাস করিয়া রোধ
বধিব আপন হস্তে সন্তান আপন।
রাজা যদি না করিবে তারে, কেন তবে
রোপিলে সংসারে পরাধীন ভিক্ষুকের
বংশ। অরণ্যে গমন ভালো, মৃত্যু ভালো,
রিক্তহস্তে পরের সম্পদছায়ে ফেরা—
ধিক্ বিড়ম্বনা! জেনো তুমি, রাজভ্রাতা,
আমার গর্ভের ছেলে সহিবে না কভু
পরের শাসনপাশ, সমস্ত জীবন
পরদত্ত সাজ 'পরে রহিবে না বসে
রাজসভাপুত্তলিকা হয়ে। আমি তারে
দিয়েছি জনম, আমি তারে সিংহাসন
দিব— নহে আমি নিজহস্তে মৃত্যু দিব
তারে। নতুবা সে কুমাতা বলিয়া মোরে
দিবে অভিশাপ।

কঞ্চুকীর প্রবেশ

কঞ্চুকী। যুবরাজ এসেছেন
রাজধানীমাঝে। আসিছেন অবিলম্বে
রাজসাক্ষাতের তরে।

[প্রস্থান

রেবতী। অন্তরালে রব
আমি। তুমি তারে বোলো, অস্ত্রশস্ত্র ছাড়ি
জালন্ধর-রাজপদে অপরাধীভাবে
করিতে হইবে তারে আত্মসমর্পণ।
চন্দ্রসেন। যেয়ো না চলিয়া।
রেবতী। পারি নে লুকাতে আমি
হৃদয়ের ভাব। স্নেহের ছলনা করা

অসাধ্য আমার। তার চেয়ে অন্তরালে
গুপ্ত থেকে শুনি বসে তোমাদের কথা।

[প্রস্থান

কুমারসেন ও সুমিত্রার প্রবেশ

কুমারসেন। প্রণাম!
সুমিত্রা। প্রণাম তাত!
চন্দ্রসেন। দীর্ঘজীবী হও।
কুমারসেন। বহু পূর্বে পাঠায়েছি সংবাদ, রাজন্,
শত্রুসৈন্য আসিছে পশ্চাতে আক্রমণ
করিতে কাশ্মীর। কই রণসজ্জা কই?
কোথা সৈন্যবল?
চন্দ্রসেন। শত্রুপক্ষ কারে বল?
বিক্রম কি শত্রু হল? জননী সুমিত্রা,
বিক্রম কি নহে, বৎসে, কাশ্মীর-জামাতা?
সে যদি আসিল গৃহে এতকাল পরে,
অসি দিয়ে তারে কি করিব সম্ভাষণ?
সুমিত্রা। হায় তাত, মোরে কিছু কোরো না জিজ্ঞাসা।
আমি দুর্ভাগিনী নারী কেন আসিলাম
অন্তঃপুর ছাড়ি! কোথা লুকাইয়া ছিল
এত অকল্যাণ! অবলা নারীর ক্ষীণ
ক্ষুদ্র পদক্ষেপে সহসা উঠিল রুষি
সর্প শতফণা! মোরে কিছু শুধায়ো না।
বুদ্ধিহীনা আমি।— তুমি সব জান ভাই!
তুমি জ্ঞানী, তুমি বীর আমি পদপ্রান্তে
মৌন ছায়া। তুমি জান সংসারের গতি,
আমি শুধু তোমারেই জানি।
কুমারসেন। মহারাজ,
আমাদের শত্রু নহে জালন্ধরপতি,
নিতান্তই আপনার জন। কাশ্মীরের

শক্র তিনি, আসিছেন শক্রভাব ধরি।
অকাতরে সহিয়াছি নিজ অপমান,
কেমনে উপেক্ষা করি রাজ্যের বিপদ?

চন্দ্রসেন। সেজন্য ভেবো না বৎস, যথেষ্ট রয়েছে
বল। কাশ্মীরের তরে আশঙ্কা কিছুই
নাই।

কুমারসেন। মোর হাতে দাও সৈন্যভার।

চন্দ্রসেন। দেখা
যাবে পরে। আগে হতে প্রস্তুত হইলে
অকারণে জেগে ওঠে যুদ্ধের কারণ।
আবশ্যককালে তুমি পাবে সৈন্যভার।

রেবতীর প্রবেশ

রেবতী। কে চাহিছে সৈন্যভার?

সুমিত্রা ও কুমারসেন। প্রণাম জননী!

রেবতী। যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়ে তুমি এসেছ পলায়ে,
নিতে চাও অবশেষে ঘরে ফিরে এসে
সৈন্যভার? তুমি রাজপুত্র? তুমি চাও
কাশ্মীরের সিংহাসন? ছি ছি লজ্জাহীন!
বনে গিয়ে থাকো লুকাইয়া। সিংহাসনে
বসো যদি, বিশ্বসুদ্ধ সকলে দেখিবে
কনককিরীটচূড়া কলঙ্কে অঙ্কিত।

কুমারসেন। জননী, কী অপরাধ করেছি চরণে?
কী কঠিন বচন তোমার! এ কি মাতা
স্নেহের ভর্ৎসনা? বহুদিন হতে তুমি
অপ্রসন্ন অভাগার 'পরে। রোষদীপ্ত
দৃষ্টি তব বিঁধে মোর মর্মস্থলে সদা;
কাছে গেলে চলে যাও কথা না কহিয়া
অন্য ঘরে; অকারণে কহ তীব্র বাণী।

বলো মাতা, কী করিলে আমারে তোমার
আপন সন্তান বলে হইবে বিশ্বাস।

রেবতী। বলি তবে—

চন্দ্রসেন। ছি ছি, চুপ করো রানী!

কুমারসেন। মাতঃ,
অধিক কহিতে কথা নাহিক সময়।
দ্বারে এল শত্রুদল আমারে করিতে
আক্রমণ। তাই আমি সৈন্য ভিক্ষা মাগি।

রেবতী। তোমারে করিয়া বন্দী অপরাধীভাবে
জালন্ধর-রাজকরে করিব অর্পণ।
মার্জনা করেন ভালো, নতুবা যেমন
বিধান করেন শাস্তি নিয়ো নতশিরে।

সুমিত্রা। ধিক্ পাপ! চুপ করো মাতা! নারী হয়ে
রাজকার্যে দিয়ো না, দিয়ো না হাত। ঘোর
অমঙ্গলপাশে সবারে আনিবে টানি,
আপনি পড়িবে। হেথা হতে চলো ফিরে
দয়ামায়াহীন ওই সদাঘূর্ণমান
কর্মচক্র ছাড়ি। তুমি শুধু ভালোবাসো,
শুধু স্নেহ করো, দয়া করো, সেবা করো—
জননী হইয়া থাকো প্রাসাদ-মাঝারে।
যুদ্ধ দ্বন্দ্ব রাজ্যরক্ষা আমাদের কার্য
নহে।

কুমারসেন। কাল যায় মহারাজ, কী আদেশ?

চন্দ্রসেন। বৎস, তুমি অনভিজ্ঞ, মনে করো তাই
শুধু ইচ্ছামাত্রে সব কার্য সিদ্ধ হয়
চক্ষের নিমেষে। রাজকার্য মনে রেখো
সুকঠিন অতি। সহস্রের শুভাশুভ
কেমনে করিব স্থির মুহূর্তের মাঝে?

কুমারসেন। নির্দয় বিলম্ব তব পিতঃ! বিপদের
মুখে মোরে ফেলি অনায়াসে, স্থিরভাবে

বিচারমন্ত্রণা ? প্রণাম, বিদায় হই।

[সুমিত্রাকে লইয়া প্রস্থান

চন্দ্রসেন। তোমার নিষ্ঠুর বাক্য শুনে দয়া হয়
কুমারের 'পরে— প্রাণে বাজে, ইচ্ছা করে
ডেকে নিয়ে বেঁধে তারে রাখি বক্ষোমাঝে,
স্নেহ দিয়ে দূর করি আঘাতবেদনা।

রেবতী। শিশু তুমি! মনে কর আঘাত না ক'রে
আপনি ভাঙিবে বাধা ? পুরুষের মতো
যদি তুমি কার্যে দিতে হাত, আমি তবে
দয়ামায়া করিতাম ঘরে ব'সে ব'সে
অবসর বুঝে। এখন সময় নাই।

[প্রস্থান

চন্দ্রসেন। অতি-ইচ্ছা চলে অতি-বেগে। দেখিতে না
পায় পথ, আপনারে করে সে নিষ্ফল।
বায়ুবেগে ছুটে গিয়ে মত্ত অশ্ব যথা
চূর্ণ করে ফেলে রথ পাষাণপ্রাচীরে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কাশ্মীর। হাট

লোকসমাগম

প্রথম। কেমন হে খুড়ো, গোলা ভরে ভরে যে গম জমিয়ে রেখেছিলে, আজ বেচবার জন্যে এত তাড়াতাড়ি কেন ?

দ্বিতীয়। না বেচলে কি আর রক্ষে আছে ? এ দিকে জালন্ধরের সৈন্য এল ব'লে। সমস্ত লুটে নেবে। আমাদের এই মহাজনদের বড়ো বড়ো গোলা আর মোটা মোটা পেট বেবাক ফাঁসিয়ে দেবে। গম আর রুটি দুইয়েরই জায়গা থাকবে না।

মহাজন। আচ্ছা ভাই, আমোদ করে নে। কিন্তু শিগ্‌গির তোদের ওই দাঁতের পাটি ঢাকতে হবে। গুঁতো সকলেরই উপর পড়বে।

প্রথম। সেই সুখেই তো হাসছি বাবা! এবারে তোমায় আমায় একসঙ্গে মরব। তুমি রাখতে গম জমিয়ে, আর আমি মরতুম পেটের জ্বালায়। সেইটে হবে না। এবার তোমাকেও জ্বালা ধরবে। সেই শুকনো মুখখানি দেখে যেন মরতে পারি।

দ্বিতীয়। আমাদের ভাবনা কী ভাই? আমাদের আছে কী? প্রাণখানা এমনেও বেশিদিন টিকবে না, অম্‌নেও বেশিদিন টিকবে না। এ কটা দিন কষে মজা করে নে রে ভাই!

প্রথম। ও জনার্দন, এতগুলি থলে এনেছ কেন? কিছু কিনবে নাকি?

জনার্দন। একেবারে বছরখানেকের মতো গম কিনে রাখব।

দ্বিতীয়। কিনলে যেন, রাখবে কোথায়?

জনার্দন। আজ রাত্তিরেই মামার বাড়ি পালাচ্ছি।

প্রথম। মামার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছলে তো! পথে অনেক মামা বসে আছে, আদর করে ডেকে নেবে।

কোলাহল করিতে করিতে

এক দল লোকের প্রবেশ

পঞ্চম। ওরে, কে তোরা লড়াই করতে চাস, আয়।

প্রথম। রাজি আছি। কার সঙ্গে লড়তে হবে বলে দে।

পঞ্চম। খুড়ো-রাজা জালন্ধরের সঙ্গে ষড় করে যুবরাজকে ধরিয়ে দিতে চায়।

দ্বিতীয়। বটে! খুড়ো-রাজার দাড়িতে আমরা মশাল ধরিয়ে দেব।

অনেকে। আমাদের যুবরাজকে আমরা রক্ষা করব।

পঞ্চম। খুড়ো-রাজা গোপনে যুবরাজকে বন্দী করতে চেষ্টা করেছিল, তাই আমরা যুবরাজকে লুকিয়ে রেখেছি।

প্রথম। চল্‌ ভাই, খুড়ো-রাজাকে গুঁড়ো করে দিয়ে আসি গে।

দ্বিতীয়। চল্‌ ভাই, তার মুণ্ডুখানা খসিয়ে তাকে মুড়ো করে দিই গে।

পঞ্চম। সে-সব পরে হবে রে। আপাতত লড়তে হবে।

প্রথম। তা লড়ব। এই হাট থেকেই লড়াই শুরু করে দেওয়া যাক-না। প্রথমে

ওই মহাজনদের গমের বস্তাগুলো লুটে নেওয়া যাক। তার পরে ঘি আছে, চামড়া আছে, কাপড় আছে।

ষষ্ঠের প্রবেশ

ষষ্ঠ। শুনেছিস? যুবরাজ লুকিয়েছেন শুনে জালন্ধরের রাজা রটিয়েছে, যে তার সন্ধান বলে দেবে তাকে পুরস্কার দেবে।

পঞ্চম। তোর এ-সব খবরে কাজ কী?

দ্বিতীয়। তুই পুরস্কার নিবি নাকি?

প্রথম। আয়-না ভাই, ওকে সবাই মিলে পুরস্কার দিই। যা হয় একটা কাজ আরম্ভ করে দেওয়া যাক। চুপ করে বসে থাকতে পারি নে।

ষষ্ঠ। আমাকে মারিস নে ভাই, দোহাই বাপ-সকল! আমি তোদের সাবধান করে দিতে এসেছি।

দ্বিতীয়। বেটা, তুই আপনি সাবধান হ।

পঞ্চম। এ খবর যদি তুই রটাবি তা হলে তোর জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব।

দূরে কোলাহল

অনেকে মিলিয়া। এসেছে— এসেছে!

সকলে। ওরে, এসেছে রে, জালন্ধরের সৈন্য এসে পৌঁচেছে।

প্রথম। তবে আর কী! এবারে লুঠ করতে চললুম। ওই জনার্দন থলে ভরে গোরুর পিঠে বোঝাই করছে। এই বেলা চল্। ওই জনার্দনটাকে বাদ দিয়ে বাকি ক'টা গোরু বোঝাই-সুদ্ধ তাড়া করা যাক।

দ্বিতীয়। তোরা যা ভাই! আমি তামাশা দেখে আসি। সার বেঁধে খোলা তলোয়ার হাতে যখন সৈন্য আসে আমার দেখতে বড়ো মজা লাগে।

গান

যমের দুয়োর খোলা পেয়ে
ছুটেছে সব ছেলেমেয়ে।
হরিবোল হরিবোল!
রাজ্য জুড়ে মস্ত খেলা
মরণ-বাঁচন অবহেলা—

ও ভাই, সবাই মিলে প্রাণটা দিলে
সুখ আছে কি মরার চেয়ে !
হরিবোল হরিবোল !
বেজেছে ঢোল, বেজেছে ঢাক,
ঘরে ঘরে পড়েছে ডাক,
এখন কাজকর্ম চুলোতে যাক—
কেজো লোক সব আয় রে ধেয়ে।
হরিবোল হরিবোল !
রাজা প্রজা হবে জড়ো,
থাকবে না আর ছোটো বড়ো,
একই স্রোতের মুখে ভাসবে সুখে
বৈতরণীর নদী বেয়ে।
হরিবোল হরিবোল !

তৃতীয় দৃশ্য

ত্রিচূড়। প্রাসাদ

অমরুরাজ ও কুমারসেন

অমরুরাজ। পালাও, পালাও। এসো না আমার রাজ্যে।
আপনি মজিবে তুমি আমারে মজাবে।
তোমারে আশ্রয় দিয়ে চাহি নে হইতে
অপরাধী জালন্ধর রাজ-কাছে। হেথা
তব নাহি স্থান।

কুমারসেন। আশ্রয় চাহি নে আমি।
অনিশ্চিত অদৃষ্টের পারাবার-মাঝে
ভাসাইব জীবনতরণী— তার আগে
ইলারে দেখিয়া যাব একবার শুধু
এই ভিক্ষা মাগি।

অমরুরাজ। ইলারে দেখিয়া যাবে ?
কী হইবে দেখে তারে ! কী হইবে দেখা
দিয়ে ! স্বার্থপর ! রয়েছ মৃত্যুর মুখে
অপমান বহি— গৃহহীন, আশাহীন,
কেন আসিয়াছ ইলার হৃদয়মাঝে
জাগাতে প্রেমের স্মৃতি ?

কুমারসেন। কেন আসিয়াছি ?
হায় আর্য, কেমনে তা বুঝাব তোমায় !

অমরুরাজ। বিপদের খরস্রোতে ভেসে চলিয়াছ,
তুমি কেন চাহিছ ধরিতে ক্ষীণপ্রাণ
কুসুমিত তীরলতা ? যাও, ভেসে যাও।

কুমারসেন। আমার বিপদ আজ দোঁহার বিপদ,
মোর দুঃখ দুজনের দুখ। প্রেম শুধু
সম্পদের নহে। মহারাজ, একবার
বিদায় লইতে দাও দু দণ্ডের তরে।

অমরুরাজ। চিরকাল-তরে তুমি লয়েছ বিদায়।
আর নহে। যাও চলে। ভুলে যেতে দাও
তারে অবসর। হাসিমুখখানি তার
দিয়ো না আঁধার করি এ জন্মের মতো।

কুমারসেন। ভুলিতে পারিত যদি দিতাম ভুলিতে—
ফিরে এসে দেখা দিব বলে গিয়েছিনু ;
জানি সে রয়েছে বসি আমার লাগিয়া
পথপানে চাহি, আমারে বিশ্বাস করি।
সে সরল সে অগাধ বিশ্বাস তাহার
কেমনে ভাঙিতে দিব !

অমরুরাজ। সে বিশ্বাস ভেঙে
যাক একেবারে। নতুবা নূতন পথে
জীবন তাহার ফিরাতে সে পারিবে না।
চিরকাল দুঃখতাপ চেয়ে কিছুকাল
এ যন্ত্রণা ভালো।

কুমারসেন। তার সুখদুঃখ তুমি
দিয়েছ আমার হাতে, কিছুতে ফিরায়ে
নিতে পারিবে না আর। তারে তুমি আর
নাহি জান। তারে আর নারিবে বুঝিতে।
তুমি যারে সুখ দুঃখ ব'লে মনে কর
তার সুখ দুঃখ তাহা নহে। একবার
দেখে যাই তারে।

অমরুরাজ। আমি তারে জানায়েছি,
কাশ্মীরে রয়েছ তুমি রাজমর্যাদায়,
ক্ষুদ্র বলে আমাদের অবহেলা ক'রে ;
বিদেশে সংগ্রামযাত্রা মিছে ছল শুধু
বিবাহ ভাঙিতে।

কুমারসেন। ধিক্, ধিক্ প্রতারণা !
সরল বালিকা সে কি তোমার দুহিতা ?
এ নিষ্ঠুর মিথ্যা তারে কহিলে যখন
বিধাতা কি ঘুমাইতেছিল ? শিরে তব
বজ্র পড়িল না ভেঙে ? এখনো সে বেঁচে
রয়েছে কি ! যেতে দাও, যেতে দাও মোরে—
দিবে না কি যেতে ? হানো তবে তরবারি—
বোলো তারে মরে গেছি আমি। প্রতারণা
কোরো না তাহারে।

শংকরের প্রবেশ

শংকর। আসিছে সন্ধানে তব
শত্রুচর, পেয়েছি সংবাদ। এইবেলা
চলো যাই।

কুমারসেন। কোথা যাব ? কী হবে লুকায়ে ?
এ জীবন পারি নে বহিতে।

শংকর। বনপ্রান্তে
তোমার অপেক্ষা করি আছেন সুমিত্রা।

কুমারসেন। চলো, যাই চলো। ইলা, কোথা আছ ইলা!
ফিরে গেনু দুয়ারে আসিয়া। দুর্ভাগ্যের
দিনে জগতের চারি দিকে রুদ্ধ হয়
আনন্দের দ্বার। প্রিয়ে, হতভাগ্য আমি,
তাই ব'লে নহি অবিশ্বাসী।— চলো, যাই।

চতুর্থ দৃশ্য

ত্রিচূড়। অন্তঃপুর

ইলা ও সখীগণ

ইলা। মিছে কথা, মিছে কথা! তোরা চুপ কর্।
আমি তার মন জানি। সখী, ভালো করে
বেঁধে দে কবরী মোর ফুলমালা দিয়ে।
নিয়ে আয় সেই নীলাম্বর। স্বর্ণথালে
আন্ তুলে শুভ্র ফুল্ল মালতীর ফুল।
নির্ঝরিণীতীরে ওই বকুলের তলা
ভালো সে বাসিত; ওইখানে শিলাতলে
পেতে দে আসনখানি। এমনি যতনে
প্রতিদিন করি সাজ, এমনি করিয়া
প্রতিদিন থাকি বসে, কে জানে কখন
সহসা আসিবে ফিরে প্রিয়তম মোর।
এসেছিল আমাদের মিলন দেখিতে
পরে পরে দুটি পূর্ণিমার রাত, অস্ত
গেছে নিরাশ হইয়া। মনে স্থির জানি
এবার পূর্ণিমানিশি হবে না নিষ্ফল।
আসিবে সে দেখা দিতে। না'ই যদি আসে
তোদের কী! আমারে সে ভুলে যায় যদি

আমিই সে বুঝিব অন্তরে। কেনই বা
না ভুলিবে, কী আছে আমার! ভুলে যদি
সুখী হয় সেই ভালো— ভালোবেসে যদি
সুখী হয় সেও ভালো। তোরা সখী, মিছে
বকিস নে আর। একটুকু চুপ কর্।

গান

আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি,
তুমি অবসরমত বাসিয়ো।
আমি নিশিদিন হেথায় বসে আছি,
তোমার যখন মনে পড়ে আসিয়ো।
আমি সারা নিশি তোমা লাগিয়া
রব বিরহশয়নে জাগিয়া,
তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে
এসে মুখপানে চেয়ে হাসিয়ো।
তুমি চিরদিন মধুপবনে
চির- বিকশিত বনভবনে
যেয়ো মনোমত পথ ধরিয়া,
তুমি নিজ সুখস্রোতে ভাসিয়ো।
যদি তার মাঝে পড়ি আসিয়া
তবে আমিও চলিব ভাসিয়া,
যদি দূরে পড়ি তাহে ক্ষতি কী,
মোর স্মৃতি মন হতে নাশিয়ো।

পঞ্চম দৃশ্য

কাশ্মীর। শিবির

বিক্রমদেব জয়সেন ও যুধাজিৎ

জয়সেন। কোথায় সে পালাবে রাজন্! ধরে এনে
দিব তারে রাজপদে। বিবরদুয়ারে
অগ্নি দিলে বাহিরিয়া আসে ভুজঙ্গম
উত্তাপকাতর। সমস্ত কাশ্মীর ঘিরি
লাগাব আগুন— আপনি সে ধরা দিবে।

বিক্রমদেব। এতদূর এনু পিছে পিছে— কত বন,
কত নদী, কত তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ ভাঙি!
আজ সে পালাবে হাত ছেড়ে? চাহি তারে,
চাহি তারে আমি। সে না হলে সুখ নাই,
নিদ্রা নাই মোর। শীঘ্র না পাইলে তারে,
সমস্ত কাশ্মীর আমি খণ্ড দীর্ণ করি
দেখিব কোথা সে আছে।

যুধাজিৎ। ধরিবারে তারে
পুরস্কার করেছি ঘোষণা।

বিক্রমদেব। তারে পেলে
অন্য কার্যে দিতে পারি হাত। রাজ্য মোর
রয়েছে পড়িয়া, শূন্যপ্রায় রাজকোষ,
দুর্ভিক্ষ হয়েছে রাজা অরাজক দেশে—
ফিরিতে পারি নে তবু। একি দৃঢ়পাশে
আমারে করেছে বন্দী শত্রু পলাতক!
সচকিতে সদা মনে হয়, এই এল,
এই এল, ওই দেখা যায়, ওই বুঝি
উড়ে ধুলা, আর দেরি নাই, এইবার
বুঝি পাব তারে— ধাবমান, ঘনশ্বাস,
ত্রস্ত-আঁখি মৃগ-সম। শীঘ্র আনো তারে

জীবিত কি মৃত। ছিন্নভিন্ন হয়ে যাক
মায়াপাশ। নতুবা যা-কিছু আছে মোর
সব যাবে অধঃপাতে।

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। রাজা চন্দ্রসেন,
মহিষী রেবতী, এসেছেন ভেটিবার
তরে।

বিক্রমদেব। তোমরা সরিয়া যাও।

প্রহরীকে

নিয়ে এস
তাঁহাদের প্রণাম জানায়ে।

[অন্য সকলের প্রস্থান

কী বিপদ!
আসিছেন শাশুড়ী আমার। কী বলিব
শুধাইলে কুমারের কথা! কী বলিব
মার্জনা চাহেন যদি যুবরাজ-তরে!
সহিতে পারি নে আমি অশ্রু রমণীর।

চন্দ্রসেন ও রেবতীর প্রবেশ

প্রণাম! প্রণাম আর্যা!

চন্দ্রসেন। চিরজীবী হও।

রেবতী। জয়ী হও, পূর্ণ হোক মনস্কাম তব।

চন্দ্রসেন। শুনেছি, তোমার কাছে কুমার হয়েছে
অপরাধী।

বিক্রমদেব। অপমান করেছে আমারে।

চন্দ্রসেন। বিচারে কী শাস্তি তার করেছ বিধান?

বিক্রমদেব। বন্দীভাবে অপমান করিলে স্বীকার,
করিব মার্জনা।

রেবতী। এই শুধু? আর কিছু

নয় ? অবশেষে মার্জনা করিবে যদি
তবে কেন এত ক্লেশে এত সৈন্য লয়ে
এত দূরে আসা !

বিক্রমদেব। ভর্ৎসনা কোরো না মোরে।
রাজার প্রধান কাজ, আপনার মান
রক্ষা করা। যে মস্তক মুকুট বহিছে
অপমান পারে না বহিতে। মিছে কাজে
আসি নি হেথায়।

চন্দ্রসেন। ক্ষমা তারে করো বৎস,
বালক সে অল্পবুদ্ধি। ইচ্ছা কর যদি
রাজ্য হতে করিয়ো বঞ্চিত— কেড়ে নিয়ো
সিংহাসন-অধিকার। নির্বাসন সেও
ভালো, প্রাণে বধিয়ো না।

বিক্রমদেব। চাহি না বধিতে।

রেবতী। তবে কেন এত অস্ত্র এনেছ বহিয়া ?
এত অসি শর ? নির্দোষী সৈনিকদের
বধ করে যাবে, যথার্থ যে জন দোষী
ক্ষমিবে তাহারে ?

বিক্রমদেব। বুঝিতে পারি নে দেবী,
কী বলিছ তুমি।

চন্দ্রসেন। কিছু নয়, কিছু নয়।
আমি তবে বলি বুঝাইয়া। সৈন্য যবে
মোর কাছে মাগিল কুমার, আমি তারে
কহিলাম, বিক্রম স্নেহের পাত্র মোর—
তার সনে যুদ্ধ নাহি সাজে। সেই ক্ষোভে
ক্রুদ্ধ যুবা প্রজাদের ঘরে ঘরে গিয়া
বিদ্রোহে করিল উত্তেজিত। অসন্তুষ্ট
মহারানী তাই ; রাজবিদ্রোহীর শাস্তি
করিছে প্রার্থনা তোমা-কাছে। গুরুদণ্ড
দিয়ো না তাহারে, সে যে অবোধ বালক।

বিক্রমদেব। আগে তারে বন্দী করে আনি। তার পরে
যথাযোগ্য করিব বিচার।

রেবতী। প্রজাগণ
লুকায়ে রেখেছে তারে। আগুন জ্বালাও
ঘরে ঘরে তাহাদের। শস্যক্ষেত্র করো
ছারখার। ক্ষুধা-রাক্ষসীর হাতে সঁপি
দাও দেশ, তবে তারে করিবে বাহির।

চন্দ্রসেন। চুপ করো, চুপ করো রানী! চলো বৎস,
শিবির ছাড়িয়া চলো কাশ্মীর প্রাসাদে।

বিক্রমদেব। পরে যাব, অগ্রসর হও মহারাজ।

[চন্দ্রসেন ও রেবতীর প্রস্থান

ওরে হিংস্রনারী! ওরে নরকাগ্নিশিখা!
বন্ধুত্ব আমার সনে! এতদিন পরে
আপনার হৃদয়ের প্রতিমূর্তিখানা
দেখিতে পেলেম ওই রমণীর মুখে।
অমনি শাণিত ক্রূর বক্র জ্বালারেখা
আছে কি ললাটে মোর? রুদ্ধ হিংসাভারে
অধরের দুই প্রান্ত পড়েছে কি নুয়ে?
অমনি কি তীক্ষ্ণ মোর উষ্ণ তিক্ত বাণী
খুনীর ছুরির মতো বাঁকা বিষ-মাখা?
নহে নহে, কভু নহে। এ হিংসা আমার
চোর নহে, ক্রূর নহে, নহে ছদ্মবেশী।
প্রচণ্ড প্রেমের মতো প্রবল এ জ্বালা
অভ্রভেদী সর্বগ্রাসী উদ্দাম উন্মাদ
দুর্নিবার! নহি আমি তোদের আত্মীয়।
হে বিক্রম, ক্ষান্ত করো এ সংহার-খেলা।
এ শ্মশাননৃত্য তব থামাও থামাও,
নিবাও এ চিতা। পিশাচ-পিশাচী যত
অতৃপ্ত হৃদয়ে লয়ে দীপ্ত হিংসাতৃষা
ফিরে যাক রুদ্ধ রোষে, লালায়িত লোভে।

একদিন দিব বুঝাইয়া, নহি আমি
তোমাদের কেহ। নিরাশ করিব এই
গুপ্ত লোভ, বক্র রোষ, দীপ্ত হিংসাতৃষা।
দেখিব কেমন ক'রে আপনার বিষে
আপনি জ্বলিয়া মরে নর-বিষধর।
রমণীর হিংস্র মুখ সূচিময় যেন—
কী ভীষণ, কী নিষ্ঠুর, একান্ত কুৎসিত!

চরের প্রবেশ

চর। ত্রিচূড়ের অভিমুখে গেছেন কুমার।
বিক্রমদেব। এ সংবাদ রাখিয়ো গোপনে। একা আমি
যাব সেথা মৃগয়ার ছলে।
চর। যে আদেশ।

ষষ্ঠ দৃশ্য

অরণ্য

শুষ্ক পর্ণশয্যায় কুমারসেন শয়ান। সুমিত্রা আসীন

কুমারসেন। কত রাত্রি?
সুমিত্রা। রাত্রি আর নাই ভাই! রাঙা
হয়ে উঠেছে আকাশ। শুধু বনচ্ছায়া
অন্ধকার রাখিয়াছে বেঁধে।
কুমারসেন। সারা রাত্রি
জেগে বসে আছ, বোন, ঘুম নেই চোখে?
সুমিত্রা। জাগিয়াছি দুঃস্বপন দেখে। সারা রাত
মনে হয় শুনি যেন পদশব্দ কার
শুষ্ক পল্লবের 'পরে। তরু-অন্তরালে
শুনি যেন কাহাদের চুপিচুপি কথা,

বিজন মন্ত্রণা। শ্রান্ত আঁখি যদি কভু
মুদে আসে, দারুণ দুঃস্বপ্ন দেখে কেঁদে
জেগে উঠি। সুখসুপ্ত মুখখানি তব
দেখে পুন প্রাণ পাই প্রাণে।

কুমারসেন। দুর্ভাবনা
দুঃস্বপ্নজননী। ভেবো না আমার তরে
বোন! সুখে আছি। মগ্ন হয়ে জীবনের
মাঝখানে, কে জেনেছে জীবনের সুখ?
মরণের তটপ্রান্তে ব'সে, এ যেন গো
প্রাণপণে জীবনের একান্ত সম্ভোগ।
এ সংসারে যত সুখ, যত শোভা, যত
প্রেম আছে, সকলি প্রগাঢ় হয়ে যেন
আমারে করিছে আলিঙ্গন। জীবনের
প্রতি বিন্দুটিতে যত মিষ্ট আছে, সব
আমি পেতেছি আস্বাদ। ঘন বন,
তুঙ্গ শৃঙ্গ, উদার আকাশ, উচ্ছ্বসিত
নির্ঝরিণী— আশ্চর্য এ শোভা। অযাচিত
ভালোবাসা অরণ্যের পুষ্পবৃষ্টি-সম
অবিশ্রাম হতেছে বর্ষণ। চারি দিকে
ভক্ত প্রজাগণ। তুমি আছ প্রীতিময়ী
শিয়রে বসিয়া। উড়িবার আগে বুঝি
জীবনবিহঙ্গ বিচিত্র-বরন পাখা
করিছে বিস্তার।— ওই শোনো কাঠুরিয়া
গান গায়— শোনা যাবে রাজ্যের সংবাদ।

কাঠুরিয়ার প্রবেশ ও গান

বঁধু, তোমায় করব রাজা তরুতলে।
বনফুলের বিনোদ-মালা দেব গলে।
সিংহাসনে বসাইতে
হৃদয়খানি দেব পেতে—

অভিষেক করব তোমায় আঁখিজলে।

অগ্রসর হইয়া

কুমারসেন। বন্ধু, আজি কী সংবাদ ?

কাঠুরিয়া। ভালো নয় প্রভু!
জয়সেন কালরাত্রে জ্বালায়ে দিয়েছে
নন্দীগ্রাম, আজ আসে পাণ্ডুপুর-পানে।

কুমারসেন। হায়, ভক্ত প্রজা মোর, কেমনে তোদের
রক্ষা করি ? ভগবান, নির্দয় কেন গো
নির্দোষ দীনের 'পরে ?

সুমিত্রার প্রতি

কাঠুরিয়া। জননী, এনেছি
কাষ্ঠভার, রাখি শ্রীচরণে।

সুমিত্রা। বেঁচে থাকো।

[কাঠুরিয়ার প্রস্থান

মধুজীবীর প্রবেশ

কুমারসেন। কী সংবাদ ?

মধুজীবী। সাবধানে থেকো যুবরাজ!
তোমারে যে ধরে দেবে জীবিত কি মৃত
পুরস্কার পাইবে সে, ঘোষণা করেছে
যুধাজিৎ। বিশ্বাস কোরো না কারে প্রভু!

কুমারসেন। বিশ্বাস করিয়া মরা ভালো। অবিশ্বাস
কাহারে করিব ? তোরা সব অনুরক্ত
বন্ধু মোর সরলহৃদয়।

মধুজীবী। মা-জননী,
এনেছি সঞ্চয় করে কিছু বনমধু—
দয়া করে করো মা গ্রহণ।

সুমিত্রা। ভগবান
মঙ্গল করুন তোর! [মধুজীবীর প্রস্থান

শিকারীর প্রবেশ

শিকারী। জয় হোক প্রভু!

ছাগ-শিকারের তরে যেতে হবে দূর
গিরিদেশে, দুর্গম সে পথ। তব পদে
প্রণাম করিয়া যাব। জয়সেন গৃহ
মোর দিয়েছে জ্বালায়ে।

কুমারসেন। ধিক্ সে পিশাচ!

শিকারী। আমরা শিকারী। যতদিন বন আছে
আমাদের কে পারে করিতে গৃহহীন?
কিছু খাদ্য এনেছি জননী, দরিদ্রের
তুচ্ছ উপহার। আশীর্বাদ করো যেন
ফিরে এসে আমাদের যুবরাজে দেখি
সিংহাসনে।

বাহু বাড়াইয়া

কুমারসেন। এস তুমি, এস আলিঙ্গনে।

[শিকারীর প্রস্থান

ওই দেখো পল্লব ভেদিয়া পড়িতেছে
রবিকররেখা। যাই নির্ঝরের ধারে,
স্নানসন্ধ্যা করি সমাপন। শিলাতটে
বসে বসে কতক্ষণ দেখি আপনার
ছায়া, আপনারে ছায়া বলে মনে হয়।
নদী হয়ে গেছে চলে এই নির্ঝরিণী
ত্রিচূড়-প্রমোদবন দিয়ে। ইচ্ছা করে
ছায়া মোর ভেসে যায় স্রোতে, যেথা সেই
সন্ধ্যাবেলা বসে থাকে তীরতরুতলে
ইলা— তার ম্লান ছায়াখানি সঙ্গে নিয়ে
চিরকাল ভেসে যায় সাগরের পানে।
থাক্ থাক্ কল্পনা-স্বপন। চলো বোন,
যাই নিত্য কাজে। ওই শোনো চারি দিকে
অরণ্য উঠেছে জেগে বিহঙ্গের গানে।

সপ্তম দৃশ্য

ত্রিচূড়। প্রমোদবন

বিক্রমদেব ও অমরুরাজ

অমরুরাজ। তোমারে করিনু সমর্পণ যাহা আছে
মোর। তুমি বীর, তুমি রাজ অধিরাজ।
তব যোগ্য কন্যা মোর, তারে লহো তুমি।
সহকার মাধবিকা-লতার আশ্রয়।
ক্ষণেক বিলম্ব করো, মহারাজ, তারে
দিই পাঠাইয়া। [প্রস্থান

বিক্রমদেব। কী মধুর শান্তি হেথা!
চিরন্তন অরণ্য আবাস, সুখসুপ্ত
ঘনচ্ছায়া, নির্ঝরিণী নিরন্তরধ্বনি।
শান্তি যে শীতল এত, এমন গম্ভীর,
এমন নিস্তব্ধ তবু এমন প্রবল,
উদার সমুদ্রসম, বহুদিন ভুলে
ছিনু যেন। মনে হয়, আমার প্রাণের
অনন্ত অনলদাহ সেও যেন হেথা
হারাইয়া ডুবে যায়, না থাকে নির্দেশ—
এত ছায়া, এত স্থান, এত গভীরতা!
এমনি নিভৃত সুখ ছিল আমাদের—
গেল কার অপরাধে? আমার কি তার?
যারই হোক— এ জনমে আর কি পাব না?
যাও তবে! একেবারে চলে যাও দূরে!
জীবনে থেকো না জেগে অনুতাপ রূপে!
দেখা যাক যদি এইখানে— সংসারের
নির্জন নেপথ্যদেশে পাই নব প্রেম,
তেমনি অতলস্পর্শ, তেমনি মধুর।

সখীর সহিত ইলার প্রবেশ

এ কী অপরূপ মূর্তি! চরিতার্থ আমি।
আসন গ্রহণ করো দেবী! কেন মৌন,
নতশির, কেন ম্লানমুখ, দেহলতা
কম্পিত কাতর? কিসের বেদনা তব?

নতজানু

ইলা। শুনিয়াছি মহারাজ-অধিরাজ তুমি
সসাগরা ধরণীর পতি। ভিক্ষা আছে
তোমার চরণে।

বিক্রমদেব। উঠ উঠ হে সুন্দরী!
তব পদস্পর্শযোগ্য নহে এ ধরণী,
তুমি কেন ধুলায় পতিত? চরাচরে
কিবা আছে অদেয় তোমারে?

ইলা। মহারাজ,
পিতা মোরে দিয়াছেন সঁপি তব হাতে;
আপনারে ভিক্ষা চাহি আমি। ফিরাইয়া
দাও মোরে। কত ধন রত্ন রাজ্য দেশ
আছে তব, ফেলে রেখে যাও মোরে এই
ভূমিতলে। তোমার অভাব কিছু নাই।

বিক্রমদেব। আমার অভাব নাই? কেমনে দেখাব
গোপন হৃদয়? কোথা সেথা ধনরত্ন?
কোথা সসাগরা ধরা? সব শূন্যময়।
রাজ্যধন না থাকিত যদি, শুধু তুমি
থাকিতে আমার—

উঠিয়া

ইলা। লহো তবে এ জীবন।
তোমরা যেমন ক'রে বনের হরিণী
নিয়ে যাও, বুকে তার তীক্ষ্ণ তীর বিঁধে,
তেমনি হৃদয় মোর বিদীর্ণ করিয়া
জীবন কাড়িয়া আগে, তার পরে মোরে

নিয়ে যাও।

বিক্রমদেব। কেন দেবী, মোর 'পরে এত
অবহেলা ? আমি কি নিতান্ত তব যোগ্য
নহি ? এত রাজ্য দেশ করিলাম জয়,
প্রার্থনা করেও আমি পাব না কি তবু
হৃদয় তোমার ?

ইলা। সে কি আর আছে মোর ?
সমস্ত সঁপেছি যারে, বিদায়ের কালে
হৃদয় সে নিয়ে চলে গেছে, বলে গেছে—
ফিরে এসে দেখা দেবে এই উপবনে।
কতদিন হল ; বনপ্রান্তে দিন আর
কাটে নাকো। পথ চেয়ে সদা পড়ে আছি ;
যদি এসে দেখিতে না পায়, ফিরে যায়,
আর যদি ফিরিয়া না আসে ! মহারাজ,
কোথা নিয়ে যাবে ? রেখে যাও তার তরে
যে আমারে ফেলে রেখে গেছে।

বিক্রমদেব। না জানি সে
কোন্ ভাগ্যবান ! সাবধান, অতিপ্রেম
সহে না বিধির। শুন তবে মোর কথা।
এক কালে চরাচর তুচ্ছ করি আমি
শুধু ভালোবাসিতাম ; সে প্রেমের 'পরে
পড়িল বিধির হিংসা, জেগে দেখিলাম
চরাচর পড়ে আছে, প্রেম গেছে ভেঙে।
বসে আছ যার তরে কী নাম তাহার ?

ইলা। কাশ্মীরের যুবরাজ— কুমার তাহার
নাম।

বিক্রমদেব। কুমার ?

ইলা। তারে জান তুমি ! কেই বা
না জানে ! সমস্ত কাশ্মীর তারে দিয়েছে
হৃদয়।

বিক্রমদেব। কুমার ? কাশ্মীরের যুবরাজ ?

ইলা। সেই বটে মহারাজ ! তার নাম সদা
ধ্বনিছে চৌদিকে। তোমারি সে বন্ধু বুঝি !
মহৎ সে, ধরণীর যোগ্য অধিপতি।

বিক্রমদেব। তাহার সৌভাগ্যরবি গেছে অস্তাচলে,
ছাড়ো তার আশা। শিকারের মৃগ-সম
সে আজ তাড়িত, ভীত, আশ্রয়বিহীন,
গোপন অরণ্যছায়ে রয়েছে লুকায়ে।
কাশ্মীরের দীনতম ভিক্ষাজীবী আজ
সুখী তার চেয়ে।

ইলা। কী বলিলে মহারাজ ?

বিক্রমদেব। তোমরা বসিয়া থাক ধরাপ্রান্তভাগে,
শুধু ভালোবাস। জান না বাহিরে বিশ্বে
গরজে সংসার, কর্মস্রোতে কে কোথায়
ভেসে যায়, ছলছল বিশাল নয়নে
তোমরা চাহিয়া থাক। বৃথা তার আশা।

ইলা। সত্য বলো মহারাজ, ছলনা কোরো না।
জেনো এই অতিক্ষুদ্র রমণীর প্রাণ
শুধু আছে তারি তরে, তারি পথ চেয়ে।
কোন্ গৃহহীন পথে কোন্ বনমাঝে
কোথা ফিরে কুমার আমার ? আমি যাব,
বলে দাও— গৃহ ছেড়ে কখনো যাই নি—
কোথা যেতে হবে ? কোন্ দিকে, কোন্ পথে ?

বিক্রমদেব। বিদ্রোহী সে, রাজসৈন্য ফিরিতেছে সদা
সন্ধানে তাহার।

ইলা। তোমরা কি বন্ধু নহ
তার ? তোমরা কি কেহ রক্ষা করিবে না তারে ?
রাজপুত্র ফিরিতেছে বনে, তোমরা কি
রাজা হয়ে দেখিবে চাহিয়া ? এতটুকু
দয়া নেই কারো ? প্রিয়তম, প্রিয়তম,

আমি তো জানি নে, নাথ, সংকটে পড়েছ—
আমি হেথা বসে আছি তোমার লাগিয়া।
অনেক বিলম্ব দেখে মাঝে মাঝে মনে
চকিত বিদ্যুৎ-সম বেজেছে সংশয়।—
শুনেছিনু এত লোক ভালোবাসে তারে
কোথা তারা বিপদের দিনে? তুমি নাকি
পৃথিবীর রাজা? বিপন্নের কেহ নহ?
এত সৈন্য, এত যশ, এত বল নিয়ে
দূরে বসে রবে? তব পথ বলে দাও।
জীবন সঁপিব একা অবলা রমণী।

বিক্রমদেব। কী প্রবল প্রেম! ভালোবাসো ভালোবাসো
এমনি সবেগে চিরদিন। যে তোমার
হৃদয়ের রাজা, শুধু তারে ভালোবাসো।
প্রেমস্বর্গচ্যুত আমি, তোমাদের দেখে
ধন্য হই। দেবী, চাহি নে তোমার প্রেম।
শুষ্ক শাখে ঝরে ফুল, অন্য তরু হতে
ফুল ছিঁড়ে নিয়ে তারে কেমনে সাজাব?
আমারে বিশ্বাস করো— আমি বন্ধু তব।
চলো মোর সাথে, আমি তারে এনে দেব।
সিংহাসনে বসায়ে কুমারে, তার হাতে
সঁপি দিব তোমারে কুমারী।

ইলা। মহারাজ,
প্রাণ দিলে মোরে। যেথা যেতে বল, যাব।

বিক্রমদেব। এস তবে প্রস্তুত হইয়া। যেতে হবে
কাশ্মীরের রাজধানী-মাঝে। [ইলা ও সখীর প্রস্থান
যুদ্ধ নাহি
ভালো লাগে। শান্তি আরো অসহ্য দ্বিগুণ।
গৃহহীন পলাতক, তুমি সুখী মোর
চেয়ে। এ সংসারে যেথা যাও, সাথে থাকে
রমণীর অনিমেষ প্রেম, দেবতার

ধ্রুবদৃষ্টি-সম ; পবিত্র কিরণে তারি
দীপ্তি পায় বিপদের মেঘ, স্বর্ণময়
সম্পদের মতো। আমি কোন্ সুখে ফিরি
দেশ-দেশান্তরে, স্কন্ধে বহে জয়ধ্বজা,
অন্তরেতে অভিশপ্ত হিংসাতপ্ত প্রাণ।
কোথা আছে কোন্ স্নিগ্ধ হৃদয়ের মাঝে
প্রস্ফুটিত শুভ্র প্রেম শিশিরশীতল।
ধুয়ে দাও, প্রেমময়ী, পুণ্য অশ্রুজলে
এ মলিন হস্ত মোর রক্তকলুষিত।

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। ব্রাহ্মণ এসেছে মহারাজ, তব সাথে
সাক্ষাতের তরে।

বিক্রমদেব। নিয়ে এস, দেখা যাক।

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত। রাজার দোহাই, ব্রাহ্মণেরে রক্ষা করো।

বিক্রমদেব। একি! তুমি কোথা হতে এলে? অনুকূল
দৈব মোর 'পরে। তুমি বন্ধুরত্ন মোর।

দেবদত্ত। তাই বটে মহারাজ, রত্ন বটে আমি।
অতি যত্নে বদ্ধ করে রেখেছিলে তাই।
ভাগ্যবলে পলায়েছি খোলা পেয়ে দ্বার।
আবার দিয়ো না সঁপি প্রহরীর হাতে
রত্নভ্রমে। আমি শুধু বন্ধুরত্ন নহি,
ব্রাহ্মণীর স্বামীরত্ন আমি। সে কি হায়
এতদিন বেঁচে আছে আর?

বিক্রমদেব। একি কথা!
আমি তো জানি নে কিছু, এতদিন রুদ্ধ
আছ তুমি!

দেবদত্ত। তুমি কী জানিবে মহারাজ!
তোমার প্রহরী দুটো জানে। কত শাস্ত্র
বলি তাহাদের, কত কাব্যকথা, শুনে

মূর্খ দুটো হাসে। একদিন বর্ষা দেখে
বিরহব্যথায় মেঘদূত কাব্যখানা
শুনালেম দোঁহে ডেকে ; গ্রাম্য মূর্খ দুটো
পড়িল কাতর হয়ে নিদ্রার আবেশে।
তখনি ধিক্কারভরে কারাগার ছাড়ি
আসিনু চলিয়া। বেছে বেছে ভালো লোক
দিয়েছিলে বিরহী এ ব্রাহ্মণের 'পরে !
এত লোক আছে সখা, অধীনে তোমার,
শাস্ত্র বোঝে এমন কি ছিল না দুজন ?

বিক্রমদেব। বন্ধুবর, বড়ো কষ্ট দিয়েছে তোমারে।
সমুচিত শাস্তি দিব তারে, যে পাষণ্ড
রেখেছিল রুধিয়া তোমায়। নিশ্চয় সে
ক্রূরমতি জয়সেন।

দেবদত্ত। শাস্তি পরে হবে।
আপাতত যুদ্ধ রেখে অবিলম্বে দেশে
ফিরে চলো। সত্য কথা বলি মহারাজ,
বিরহ সামান্য ব্যথা নয় এবার তা
পেরেছি বুঝিতে। আগে আমি ভাবিতাম
শুধু বড়ো বড়ো লোক বিরহেতে মরে।
এবার দেখেছি, সামান্য এ ব্রাহ্মণের
ছেলে, এরেও ছাড়ে না পঞ্চবাণ ; ছোটো
বড়ো করে না বিচার।

বিক্রমদেব। যম আর প্রেম
উভয়েরই সমদৃষ্টি সর্বভূতে। বন্ধু,
ফিরে চলো দেশে। কেবল যাবার আগে
এক কাজ বাকি আছে। তুমি লহো ভার।
অরণ্যে কুমারসেন আছে লুকাইয়া,
ত্রিচূড়রাজের কাছে সন্ধান পাইবে
সখে, তার কাছে যেতে হবে। বোলো তারে,
আর আমি শত্রু নহি। অস্ত্র ফেলে দিয়ে

বসে আছি প্রেমে বন্দী করিবারে তারে।
আর সখা— আর কেহ যদি থাকে সেথা—
যদি দেখা পাও আর কারো—

দেবদত্ত। জানি, জানি—
তাঁর কথা জাগিতেছে হৃদয়ে সতত।
এতক্ষণ বলি নাই কিছু। মুখে যেন
সরে না বচন। এখন তাঁহার কথা
বচনের অতীত হয়েছে। সাধ্বী তিনি,
তাই এত দুঃখ তাঁর। তাঁরে মনে ক'রে
মনে পড়ে পুণ্যবতী জানকীর কথা।
চলিলাম তবে।

বিক্রমদেব। বসন্ত না আসিতেই
আগে আসে দক্ষিণপবন, তার পরে
পল্লবে কুসুমে বনশ্রী প্রফুল্ল হয়ে
ওঠে। তোমারে হেরিয়া আশা হয় মনে,
আবার আসিবে ফিরে সেই পুরাতন
দিন মোর, নিয়ে তার সব সুখভার।

অষ্টম দৃশ্য

অরণ্য

কুমারের দুইজন অনুচর

প্রথম। হ্যা দেখ্ মাধু, কাল যে স্বপ্নটা দেখলুম তার কোনো মানে ভেবে পাচ্ছি নে। শহরে গিয়ে দৈবিজ্ঞি ঠাকুরের কাছে শুনিয়ে নিয়ে আসতে হবে।

দ্বিতীয়। কী স্বপ্নটা বল্ তো শুনি।

প্রথম। যেন এক জন মহাপুরুষ ওই জল থেকে উঠে আমাকে তিনটে বড়ো বড়ো বেল দিতে এল। আমি দুটো দু হাতে নিলুম, আর একটা কোথায় নেব ভাবনা পড়ে গেল।

দ্বিতীয়। দূর মূর্খ, তিনটেই চাদরে বেঁধে নিতে হয়।

প্রথম। আরে, জেগে থাকলে তো সকলেরই বুদ্ধি জোগায়— সে সময়ে তুই কোথায় ছিলি? তার পর শোন্-না; সেই বাকি বেলটা মাটিতে পড়েই গড়াতে আরম্ভ করলে, আমি তার পিছন পিছন ছুটলুম। হঠাৎ দেখি যুবরাজ অশথতলায় বসে আহ্নিক করছেন। বেলটা ধপ্ করে তাঁর কোলের উপর গিয়ে লাফিয়ে উঠল। আমার ঘুম ভেঙে গেল।

দ্বিতীয়। এটা আর বুঝতে পারলি নে? যুবরাজ শিগ্‌গির রাজা হবে।

প্রথম। আমিও তাই ঠাউরেছিলুম। কিন্তু আমি যে দুটো বেল পেলুম, আমার কী হবে?

দ্বিতীয়। তোর আবার হবে কী? তোর খেতে বেগুন বেশি করে ফলবে।

প্রথম। না ভাই, আমি ঠাউরে রেখেছি আমার দুই পুত্তুর-সন্তান হবে।

দ্বিতীয়। হ্যা দেখ্ ভাই, বললে পিত্তয় যাবি নে, কাল ভারি আশ্চর্য কাণ্ড হয়ে গেছে। ওই জলের ধারে বসে রামচরণে আমাতে চিঁড়ে ভিজিয়ে খাচ্ছিলুম; তা আমি কথায় কথায় বললুম, আমাদের দোবেজী গুনে বলেছে যুবরাজের ফাঁড়া প্রায় কেটে এসেছে। আর দেরি নেই। এবার শিগ্‌গির রাজা হবে। হঠাৎ মাথার উপর কে তিন বার বলে উঠল 'ঠিক ঠিক ঠিক'। উপরে চেয়ে দেখি ডুমুরের ডালে এতবড়ো একটা টিকটিকি!

রামচরণের প্রবেশ

প্রথম। কী খবর রামচরণ?

রামচরণ। ওরে ভাই, আজ একটা ব্রাহ্মণ এই বনের আশেপাশে যুবরাজের সন্ধান নিয়ে ফিরছিল। আমাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কত কথাই জিজ্ঞেসা করলে। আমি তেমনি বোকা আর-কি! আমিও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জবাব দিতে লাগলুম। অনেক খোঁজ করে শেষকালে চলে গেল। তাকে আমি চিত্তলের রাস্তা দেখিয়ে দিলুম। ব্রাহ্মণ না হলে তাকে আজ আর আমি আস্ত রাখতুম না।

দ্বিতীয়। কিন্তু তা হলে তো এ বন ছাড়তে হচ্ছে। বেটারা সন্ধান পেয়েছে দেখছি।

প্রথম। এইখানে বসে পড়ো-না ভাই রামচরণ— দুটো গল্প করা যাক।

রামচরণ। যুবরাজের সঙ্গে আমাদের মা-ঠাকরুন এই দিকে আসছেন। চল্ ভাই তফাতে গিয়ে বসি গে।

[প্রস্থান



রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহধর্মিণী

কুমারসেন ও সুমিত্রার প্রবেশ

কুমারসেন। শংকর পড়েছে ধরা। রাজ্যের সংবাদ
নিতে গিয়েছিল বৃদ্ধ, গোপনে ধরিয়া
ছদ্মবেশ। শত্রুচর ধরেছে তাহারে।
নিয়ে গেছে জয়সেন-কাছে। শুনিয়াছি
চলিতেছে নিষ্ঠুর পীড়ন তার 'পরে—
তবু সে অটল। একটি কথাও তারা
পারে নাই মুখ হতে করিতে বাহির।

সুমিত্রা। হায় বৃদ্ধ প্রভুবৎসল! প্রাণাধিক
ভালোবাস যারে সেই কুমারের কাজে
সঁপি দিলে তোমার কুমারগত প্রাণ।

কুমারসেন। এ সংসারে সব চেয়ে বন্ধু সে আমার,
আজন্মের সখা। আপনার প্রাণ দিয়ে
আড়াল করিয়া, চাহে সে রাখিতে মোরে
নিরাপদে। অতিবৃদ্ধ ক্ষীণ জীর্ণ দেহ,
কেমনে সে সহিছে যন্ত্রণা! আমি হেথা
সুখে আছি লুকায়ে বসিয়া!

সুমিত্রা। আমি যাই
ভাই! ভিখারিনীবেশে সিংহাসনতলে
গিয়া শংকরের প্রাণভিক্ষা মেগে আসি।

কুমারসেন। বাহির হইতে তারা আবার তোমারে
দিবে ফিরাইয়া। তোমার পিতার রাজ্য
হবে নতশির। বজ্রসম বাজিবে সে
মর্মে গিয়ে মোর।

চরের প্রবেশ

চর। গত রাত্রে গিধ্‌কূট
জালায়ে দিয়েছে জয়সেন। গৃহহীন
গ্রামবাসীগণ আশ্রয় নিয়েছে গিয়ে
মন্দুর অরণ্য-মাঝে। [প্রস্থান

কুমারসেন। আর তো সহে না।
ঘৃণা হয় এ জীবন করিতে বহন
সহস্রের জীবন করিয়া ক্ষয়।

সুমিত্রা। চলো
মোরা দুই জনে যাই রাজসভা-মাঝে—
দেখিব কেমনে, কোন্ ছলে, জালন্ধর
স্পর্শ করে কেশ তব।

কুমারসেন। শংকর বলিত,
'প্রাণ যায় সেও ভালো, তবু বন্দীভাবে
কখনো দিয়ো না ধরা।' পিতৃসিংহাসনে
বসি বিদেশের রাজা দণ্ড দিবে মোরে
বিচারের ছল করি, এ কি সহ্য হবে?
অনেক সহেছি বোন, পিতৃপুরুষের
অপমান সহিব কেমনে!

সুমিত্রা। তার চেয়ে
মৃত্যু ভালো।

কুমারসেন। বলো বোন, বলো, 'তার চেয়ে
মৃত্যু ভালো।' এই তো তোমার যোগ্য কথা।
তার চেয়ে মৃত্যু ভালো! ভালো করে ভেবে
দেখো— বেঁচে থাকা ভীরুতা কেবল। বলো,
এ কি সত্য নয়? থেকো না নীরব হয়ে,
বিষাদ-আনত নেত্রে চেয়ো না ভূতলে।
মুখ তোলো, স্পষ্ট করে বলো একবার,
ঘৃণিত এ প্রাণ লয়ে লুকায়ে লুকায়ে
নিশিদিন মরে থাকা, এক দণ্ড এ কি
উচিত আমার?

সুমিত্রা। ভাই—

কুমারসেন। আমি রাজপুত্র—
ছারখার হয়ে যায় সোনার কাশ্মীর,
পথে পথে বনে বনে ফিরে গৃহহীন

প্রজা, কেঁদে মরে পতিপুত্রহীনা নারী,
তবু আমি কোনোমতে বাঁচিব গোপনে ?

সুমিত্রা। তার চেয়ে মৃত্যু ভালো।

কুমারসেন। বলো, তাই বলো।
ভক্ত যারা অনুরক্ত মোর— প্রতিদিন
সঁপিছে আপন প্রাণ নির্যাতন সহি।
তবু আমি তাহাদের পশ্চাতে লুকায়ে
জীবন করিব ভোগ ! এ কি বেঁচে থাকা !

সুমিত্রা। এর চেয়ে মৃত্যু ভালো।

কুমারসেন। বাঁচিলাম শুনে।
কোনোমতে রেখেছিনু তোমারি লাগিয়া
এ হীন জীবন, প্রত্যেক নিশ্বাসে মোর
নির্দোষের প্রাণবায়ু করিয়া শোষণ।—
আমার চরণ ছুঁয়ে করহ শপথ
যে কথা বলিব তাহা করিবে পালন
যতই কঠিন হোক।

সুমিত্রা। করিনু শপথ।

কুমারসেন। এ জীবন দিব বিসর্জন। তার পরে
তুমি মোর ছিন্নমুণ্ড নিয়ে, নিজ হস্তে
জালন্ধর রাজ-করে দিবে উপহার।
বলিয়ো তাহারে— 'কাশ্মীরে অতিথি তুমি ;
ব্যাকুল হয়েছ এত যে দ্রব্যের তরে
কাশ্মীরের যুবরাজ দিতেছেন তাহা
আতিথ্যের অর্ঘ্যরূপে তোমারে পাঠায়ে।'
মৌন কেন বোন ? সঘনে কাঁপিছে কেন
চরণ তোমার ? বোসো এই তরুতলে।
পারিবে না তুমি ? একান্ত অসাধ্য এ কি ?
তবে কি ভৃত্যের হস্তে পাঠাইতে হবে
তুচ্ছ উপহার-সম এ রাজমস্তক ?
সমস্ত কাশ্মীর তারে ফেলিবে যে রোষে

ছিন্নভিন্ন করি।

সুমিত্রার মূর্ছা

ছি ছি বোন! উঠ, উঠ!
পাষাণে হৃদয় বাঁধো। হোয়ো না বিহ্বল।
দুঃসহ এ কাজ— তাই তো তোমার 'পরে
দিতেছি দুরূহ ভার। অয়ি প্রাণাধিকে,
মহৎহৃদয় ছাড়া কাহারা সহিবে
জগতের মহাক্লেশ যত? বলো বোন,
পারিবে করিতে?

সুমিত্রা। পারিব?

কুমারসেন। দাঁড়াও তবে।
ধরো বল, তোলো শির। উঠাও জাগায়ে
সমস্ত হৃদয়-মন। ক্ষুদ্রনারী-সম
আপন বেদনাভারে পোড়ো না ভাঙিয়া।

সুমিত্রা। অভাগিনী ইলা!

কুমারসেন। তারে কি জানি নে আমি?
হেন অপমান লয়ে সে কি মোরে কভু
বাঁচিতে বলিত? সে আমার ধ্রুবতারা
মহৎমৃত্যুর দিকে দেখাইছে পথ।
কাল পূর্ণিমার তিথি মিলনের রাত।
জীবনের গ্লানি হতে মুক্ত ধৌত হয়ে
চিরমিলনের বেশ করিব ধারণ।
চলো বোন, আগে হতে সংবাদ পাঠাই
দূতমুখে রাজসভামাঝে— কাল আমি
যাব ধরা দিতে। তাহা হলে অবিলম্বে
শংকর পাইবে ছাড়া— বান্ধব আমার।

নবম দৃশ্য

কাশ্মীর। রাজসভা

বিক্রমদেব ও চন্দ্রসেন

বিক্রমদেব। আর্য, তুমি কেন আজ নীরব এমন ?
মার্জনা তো করেছি কুমারে।

চন্দ্রসেন। তুমি তারে
মার্জনা করেছ। আমি তো এখনো তার
বিচার করি নি। বিদ্রোহী সে মোর কাছে।
এবার তাহার শাস্তি দিব।

বিক্রমদেব। কোন্ শাস্তি
করিয়াছ স্থির ?

চন্দ্রসেন। সিংহাসন হতে তারে
করিব বঞ্চিত।

বিক্রমদেব। অতি অসম্ভব কথা।
সিংহাসন দিব তারে নিজ হস্তে আমি।

চন্দ্রসেন। কাশ্মীরের সিংহাসনে তোমার কী আছে
অধিকার ?

বিক্রমদেব। বিজয়ীর অধিকার।

চন্দ্রসেন। তুমি
হেথা আছ বন্ধুভাবে অতিথির মতো।
কাশ্মীরের সিংহাসন কর নাই জয়।

বিক্রমদেব। বিনা যুদ্ধে করিয়াছে কাশ্মীর আমারে
আত্মসমর্পণ। যুদ্ধ চাও যুদ্ধ করো,
রয়েছি প্রস্তুত। আমার এ সিংহাসন।
যারে ইচ্ছা দিব।

চন্দ্রসেন। তুমি দিবে! জানি আমি
গর্বিত কুমারসেনে জন্মকাল হতে।
সে কি লবে আপনার পিতৃসিংহাসন
ভিক্ষার স্বরূপে ? প্রেম দাও প্রেম লবে,

হিংসা দাও প্রতিহিংসা লবে, ভিক্ষা দাও
ঘৃণাভরে পদাঘাত করিবে তাহাতে।

বিক্রমদেব। এত গর্ব যদি তার, তবে সে কি কভু
ধরা দিতে মোর কাছে আপনি আসিত?

চন্দ্রসেন। তাই ভাবিতেছি, মহারাজ, নহে ইহা
কুমারসেনের মতো কাজ। দৃপ্ত যুবা
সিংহসম। সে কি আজ স্বেচ্ছায় আসিবে
শৃঙ্খল পরিতে গলে? জীবনের মায়া
এতই কি বলবান?

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। শিবিকার দ্বার
রুদ্ধ করি প্রাসাদে আসিছে যুবরাজ।

বিক্রমদেব। শিবিকার দ্বার রুদ্ধ?

চন্দ্রসেন। সে কি আর কভু
দেখাইবে মুখ? আপনার পিতৃরাজ্যে
আসিছে সে স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে; রাজপথে
লোকারণ্য চারি দিকে, সহস্রের আঁখি
রয়েছে তাকায়ে। কাশ্মীরললনা যত
গবাক্ষে দাঁড়ায়ে। উৎসবের পূর্ণচন্দ্র
চেয়ে আছে আকাশের মাঝখান হতে।
সেই চিরপরিচিত গৃহ পথ হাট
সরোবর মন্দির কানন, পরিচিত
প্রত্যেক প্রজার মুখ। কোন্‌ লাজে আজি
দেখা দিবে সবারে সে? মহারাজ, শোনো
নিবেদন। গীতবাদ্য বন্ধ করে দাও।
এ উৎসব উপহাস মনে হবে তার।
আজ রাত্রে দীপালোক দেখে ভাবিবে সে,
নিশীথতিমিরে পাছে লজ্জা ঢাকা পড়ে
তাই এত আলো। এ আলোক শুধু বুঝি
অপমানপিশাচের পরিহাসহাসি।

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত। জয়োস্তু রাজন্! কুমারের অন্বেষণে
বনে বনে ফিরিয়াছি, পাই নাই দেখা।
আজ শুনিলাম নাকি আসিছেন তিনি
স্বেচ্ছায় নগরে ফিরি। তাই চলে এনু।

বিক্রমদেব। করিব রাজার মতো অভ্যর্থনা তারে।
তুমি হবে পুরোহিত অভিষেককালে।
পূর্ণিমানিশীথে আজ কুমারের সনে
ইলার বিবাহ হবে, করেছি তাহার
আয়োজন।

নগরের ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ

সকলে। মহারাজ, জয় হোক।

প্রথম। করি
আশীর্বাদ, ধরণীর অধীশ্বর হও।
লক্ষ্মী হোন অচলা তোমার গৃহে সদা।
আজ যে আনন্দ তুমি দিয়েছ সবারে
বলিতে শকতি নাই— লহো মহারাজ,
কৃতজ্ঞ এ কাশ্মীরের কল্যাণ-আশিস।

রাজার মস্তকে ধান্যদূর্বা দিয়া আশীর্বাদ

বিক্রমদেব। ধন্য আমি কৃতার্থ জীবন। [ব্রাহ্মণগণের প্রস্থান

যষ্টিহস্তে কষ্টে শংকরের প্রবেশ

চন্দ্রসেনের প্রতি

শংকর। মহারাজ!
এ কি সত্য? যুবরাজ আসিছেন নিজে
শত্রুকরে করিবারে আত্মসমর্পণ?
বলো, এ কি সত্য কথা?

চন্দ্রসেন। সত্য বটে।

শংকর। ধিক্,
সহস্র মিথ্যার চেয়ে এই সত্যে ধিক্!

হায় যুবরাজ, বৃদ্ধ ভৃত্য আমি তব,
সহিলাম এত যে যন্ত্রণা, জীর্ণ অস্থি
চূর্ণ হয়ে গেল, মূকসম রহিলাম
তবু, সে কি এরি তরে? অবশেষে তুমি
আপনি ধরিলে বন্দীবেশ, কাশ্মীরের
রাজপথ দিয়ে চলে এলে নতশিরে
বন্দীশালা-মাঝে? এই কি সে রাজসভা
পিতামহদের? যেথা বসি পিতা তব
উঠিতেন ধরণীর সর্বোচ্চ শিখরে
সে আজ তোমার কাছে ধরার ধুলার
চেয়ে নীচে! তার চেয়ে নিরাশ্রয় পথ
গৃহতুল্য, অরণ্যের ছায়া সমুজ্জ্বল,
কঠিনপর্বতশৃঙ্গ অনুর্বরমরু
রাজার সম্পদে পূর্ণ। চিরভৃত্য তব
আজি দুর্দিনের আগে মরিল না কেন?

বিক্রমদেব। ভালো হতে মন্দটুকু নিয়ে, বৃদ্ধ, মিছে
এ তব ক্রন্দন।

শংকর। রাজন্, তোমার কাছে
আসি নি কাঁদিতে। স্বর্গীয় রাজেন্দ্রগণ
রয়েছেন জাগি ওই সিংহাসন-কাছে,
আজি তাঁরা ম্লানমুখ, লজ্জানতশির,
তাঁরা বুঝিবেন মোর হৃদয়বেদনা।

বিক্রমদেব। কেন মোরে শত্রু বলে করিতেছ ভ্রম?
মিত্র আমি আজি।

শংকর। অতিশয় দয়া তব
জালন্ধরপতি! মার্জনা করেছ তুমি!
দণ্ড ভালো মার্জনার চেয়ে।

বিক্রমদেব। এর মতো
হেন ভক্ত বন্ধু হায় কে আমার আছে?

দেবদত্ত। আছে বন্ধু, আছে মহারাজ!

বাহিরে হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, কোলাহল

শংকরের দুই হস্তে মুখ আচ্ছাদন

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। আসিয়াছে
দুয়ারে শিবিকা।

বিক্রমদেব। বাদ্য কোথা, বাজাইতে
বলো। চলো সখা, অগ্রসর হয়ে তারে
অভ্যর্থনা করি। [বাদ্যোদ্যম

সভামধ্যে শিবিকার প্রবেশ

অগ্রসর হইয়া

বিক্রমদেব। এস, এস, বন্ধু এস।

স্বর্ণথালে ছিন্নমুণ্ড লইয়া সুমিত্রার শিবিকাবাহিরে
আগমন। সহসা সমস্ত বাদ্য নীরব

বিক্রমদেব। সুমিত্রা! সুমিত্রা!

চন্দ্রসেন। এ কী, জননী সুমিত্রা!

সুমিত্রা। ফিরেছ সন্ধানে যার রাত্রিদিন ধরে
কাননে কান্তারে শৈলে রাজ্য ধর্ম দয়া
রাজলক্ষ্মী সব বিসর্জিয়া, যার লাগি
দিগ্বিদিকে হাহাকার করেছ প্রচার,
মূল্য দিয়ে চেয়েছিলে কিনিবারে যারে,
লহ মহারাজ, ধরণীর রাজবংশে
শ্রেষ্ঠ সেই শির। আতিথ্যের উপহার
আপনি ভেটিলা যুবরাজ। পূর্ণ তব
মনস্কাম। এবে শান্তি হোক, শান্তি হোক
এ জগতে, নিবে যাক নরকাগ্নিরাশি—
সুখী হও তুমি।

ঊর্ধ্বস্বরে

মা গো জগৎজননী,
দয়াময়ী, স্থান দাও কোলে। [পতন ও মৃত্যু

ছুটিয়া ইলার প্রবেশ

ইলা। এ কী! এ কী!
মহারাজ, কুমার আমার— [মূর্ছা

অগ্রসর হইয়া

শংকর। প্রভু, স্বামী,
বৎস, প্রাণাধিক, বৃদ্ধের জীবনধন,
এই ভালো, এই ভালো! মুকুট পরেছ
তুমি, এসেছ রাজার মতো আপনার
সিংহাসনে। মৃত্যুর অমর রশ্মিরেখা
উজ্জ্বল করেছে তব ভাল। এতদিন
এ বৃদ্ধেরে রেখেছিল বিধি, আজি তব
এ মহিমা দেখাবার তরে। গেছ তুমি
পুণ্যধামে— ভৃত্য আমি চিরজনমের
আমিও যাইব সাথে।

মাথা হইতে মুকুট ভূমে ফেলিয়া

চন্দ্রসেন। ধিক্ এ মুকুট!
ধিক্ এই সিংহাসন! [সিংহাসনে পদাঘাত

রেবতীর প্রবেশ

রাক্ষসী, পিশাচী,
দূর হ, দূর হ— আমারে দিস নে দেখা
পাপীয়সী!

রেবতী। এ রোষ রবে না চিরদিন। [প্রস্থান

নতজানু

বিক্রমদেব। দেবী, যোগ্য নহি আমি তোমার প্রেমের,
তাই ব'লে মার্জনাও করিলে না? রেখে
গেলে চির অপরাধী করে? ইহজন্ম
নিত্য অশ্রুজলে লইতাম ভিক্ষা মাগি
ক্ষমা তব; তাহারও দিলে না অবকাশ?
দেবতার মতো তুমি নিশ্চল নিষ্ঠুর,
অমোঘ তোমার দণ্ড, কঠিন বিধান!

উপন্যাস ও গল্প

বউ-ঠাকুরানীর হাট

সূচনা

অন্তর্বিষয়ী ভাবের কবিত্ব থেকে বহির্বিষয়ী কল্পনালোকে এক সময়ে মন যে প্রবেশ করলে, ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে লাগল, এ বোধ হয় কৌতূহল থেকে।

প্রাচীর-ঘেরা মন বেরিয়ে পড়ল বাইরে, তখন সংসারের বিচিত্র পথে তার যাতায়াত আরম্ভ হয়েছে। এইসময়টাতে তার লেখনী গদ্যরাজ্যে নূতন ছবি নূতন নূতন অভিজ্ঞতা খুঁজতে চাইলে। তারই প্রথম প্রয়াস দেখা দিল বউ-ঠাকুরানীর হাট গল্পে— একটা রোমান্টিক ভূমিকায় মানবচরিত্র নিয়ে খেলার ব্যাপারে, সেও অল্পবয়সেরই খেলা। চরিত্রগুলির মধ্যে যেটুকু জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে সেটা পুতুলের ধর্ম ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি। তারা আপন চরিত্রবলে অনিবার্য পরিণামে চালিত নয়, তারা সাজানো জিনিস একটা নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে। আজও হয়তো এই গল্পটার দিকে ফিরে চাওয়া যেতে পারে। এ যেন অশিক্ষিত আঙুলের আঁকা ছবি; সুনিশ্চিত মনের পাকা হাতের চিহ্ন পড়ে নি তাতে। কিন্তু আর্টের খেলাঘরে ছেলেমানুষিরও একটা মূল্য আছে। বুদ্ধির বাধাহীন পথে তার খেয়াল যা-তা কাণ্ড করতে বসে, তার থেকে প্রাথমিক মনের একটা কিছু কারিগরি বেরিয়ে পড়ে।

সজীবতার স্বতশ্চাঞ্চল্য মাঝে মাঝে এই লেখার মধ্যে দেখা দিয়ে থাকবে তার একটা প্রমাণ এই যে, এই গল্প বেরোবার পরে বঙ্কিমের কাছ থেকে একটি অযাচিত প্রশংসাপত্র পেয়েছিলুম, সেটি ইংরেজি ভাষায় লেখা। সে পত্রটি হারিয়েছে কোনো বন্ধুর অযত্নকরক্ষেপে। বঙ্কিম এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে, বইটি যদিও কাঁচাবয়সের প্রথম লেখা তবু এর মধ্যে ক্ষমতার প্রভাব দেখা দিয়েছে— এই বইকে তিনি নিন্দা করেন নি। ছেলেমানুষির ভিতর থেকে আনন্দ পাবার এমন কিছু দেখেছিলেন, যাতে অপরিচিত বালককে হঠাৎ একটা চিঠি লিখতে তাঁকে প্রবৃত্ত করলে। দূরের যে পরিণতি অজানা ছিল সেইটি তাঁর কাছে কিছু আশার আশ্বাস এনেছিল। তাঁর কাছ থেকে এই উৎসাহবাণী আমার পক্ষে ছিল বহুমূল্য।

এই উপলক্ষে একটা কথা এখানে বলা আবশ্যক। স্বদেশী উদ্দীপনার আবেগে প্রতাপাদিত্যকে এক সময়ে বাংলাদেশের আদর্শ বীরচরিত্ররূপে খাড়া করবার চেষ্টা চলেছিল্। এখনও তার নিবৃত্তি হয় নি। আমি সে-সময়ে তাঁর সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে যা-কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলুম তার থেকে প্রমাণ পেয়েছি তিনি অন্যায়কারী অত্যাচারী নিষ্ঠুর লোক, দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করবার মতো অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্য তাঁর ছিল কিন্তু ক্ষমতা ছিল না। সে-সময়কার ইতিহাসলেখকদের উপরে পরবর্তী কালের দেশাভিমানের প্রভাব ছিল না। আমি যে-সময়ে এই বই অসংকোচে লিখেছিলুম তখনও তাঁর পূজা প্রচলিত হয় নি।

উপহার

শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী

শ্রীচরণেষু

দিদি,

তোমার স্নেহের কোলে আমার স্নেহের ধন
করিনু অর্পণ।
বিমল প্রশান্ত সুখে ফুটিবে স্নেহের হাস
দেখিবারে আশ।
সুদূর প্রবাস হতে আজি বহুদিন পরে
আসিতেছ ঘরে,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে আছি উপহার লয়ে করে
সমর্পণ তরে।
কাছে থাকি দূরে থাকি দেখ আর নাহি দেখ
শুধু স্নেহ দাও,
স্নেহ করে ভালো থাক স্নেহ দিতে ভালোবাস
কিছু নাহি চাও।
দূরে থেকে কাছে থাক আপনি হৃদয় তাহা
জানিবারে পায়,
সুদূর প্রবাস হতে স্নেহের বাতাস এসে
লাগে যেন গায়।
এত আছে এত দাও কথাটি নাহিক কও,
স্নেহপারাবার—
প্রভাতশিশিরসম নীরবে পরানে মম
ঝরে স্নেহধার।
তব স্নেহ চারি পাশে কেবল নীরবে ভাসে
সৌরভের প্রায়—
নীরবে বিমল হাসি উষার কিরণরাশি
প্রাণেরে জাগায়।

বউ-ঠাকুরানীর হাট

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাত্রি অনেক হইয়াছে। গ্রীষ্মকাল। বাতাস বন্ধ হইয়া গিয়াছে। গাছের পাতাটিও নড়িতেছে না। যশোহরের যুবরাজ, প্রতাপাদিত্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র, উদয়াদিত্য তাঁহার শয়নগৃহের বাতায়নে বসিয়া আছেন। তাঁহার পার্শ্বে তাঁহার স্ত্রী সুরমা।

সুরমা কহিলেন, "প্রিয়তম, সহ্য করিয়া থাকো, ধৈর্য ধরিয়া থাকো। একদিন সুখের দিন আসিবে!"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "আমি তো আর কোনো সুখ চাই না। আমি চাই, আমি রাজপ্রাসাদে না যদি জন্মাইতাম, যুবরাজ না যদি হইতাম, যশোহর-অধিপতির ক্ষুদ্রতম তুচ্ছতম প্রজার প্রজা হইতাম! তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র— তাঁহার সিংহাসনের, তাঁহার সমস্ত ধন মান যশ প্রভাব গৌরবের একমাত্র উত্তরাধিকারী না হইতাম! কী তপস্যা করিলে এ-সমস্ত অতীত উল্টাইয়া যাইতে পারে!"

সুরমা অতি কাতর হইয়া যুবরাজের দক্ষিণ হস্ত দুই হাতে লইয়া চাপিয়া ধরিলেন, ও তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। যুবরাজের ইচ্ছা পুরাইতে প্রাণ দিতে পারেন, কিন্তু প্রাণ দিলেও এই ইচ্ছা পুরাইতে পারিবেন না এই দুঃখ।

যুবরাজ কহিলেন, "সুরমা, রাজার ঘরে জন্মিয়াছি বলিয়াই সুখী হইতে পারিলাম না। রাজার ঘরে সকলে বুঝি কেবল উত্তরাধিকারী হইয়া জন্মায়, সন্তান হইয়া জন্মায় না। পিতা ছেলেবেলা হইতেই আমাকে প্রতি মুহূর্তে পরখ করিয়া দেখিতেছেন, আমি তাঁহার উপার্জিত যশোমান বজায় রাখিতে পারিব কি না, বংশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিব কি না, রাজ্যের গুরুভার বহন করিতে পারিব কি না। আমার প্রতি কার্য, প্রতি অঙ্গভঙ্গী তিনি পরীক্ষার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন, স্নেহের চক্ষে নহে। আত্মীয়বর্গ, মন্ত্রী, রাজসভাসদ্‌গণ, প্রজারা আমার প্রতি কথা প্রতি কাজ খুঁটিয়া খুঁটিয়া লইয়া আমার ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া আসিতেছে। সকলেই ঘাড় নাড়িয়া কহিল— না, আমার দ্বারা এ বিপদে রাজ্য রক্ষা হইবে না। আমি নির্বোধ, আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। সকলেই আমাকে অবহেলা করিতে লাগিল, পিতা আমাকে

ঘৃণা করিতে লাগিলেন। আমার আশা একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। একবার খোঁজও লইতেন না।"

সুরমার চক্ষে জল আসিল। সে কহিল, "আহা! কেমন করিয়া পারিত!"

তাহার দুঃখ হইল, তাহার রাগ হইল, সে কহিল, "তোমাকে যাহারা নির্বোধ মনে করিত তাহারাই নির্বোধ।"

উদয়াদিত্য ঈষৎ হাসিলেন, সুরমার চিবুক ধরিয়া তাহার রোষে আরক্তিম মুখখানি নাড়িয়া দিলেন। মুহূর্তের মধ্যে গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "না, সুরমা, সত্য সত্যই আমার রাজ্যশাসনের বুদ্ধি নাই। তাহার যথেষ্ট পরীক্ষা হইয়া গেছে। আমার যখন ষোল বৎসর বয়স তখন মহারাজ কাজ শিখাইবার জন্য হোসেনখালি পরগনার ভার আমার হাতে সমর্পণ করেন। ছয় মাসের মধ্যেই বিষম বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। খাজনা কমিয়া গেল, প্রজারা আশীর্বাদ করিতে লাগিল। কর্মচারীরা আমার বিরুদ্ধে রাজার নিকটে অভিযোগ করিতে লাগিল। রাজসভার সকলেরই মত হইল, যুবরাজ প্রজাদের যখন অত প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িয়াছেন তখনই বুঝা যাইতেছে উঁহার দ্বারা রাজ্যশাসন কখনো ঘটিতে পারিবে না। সেই অবধি মহারাজ আমার পানে আর বড়ো একটা তাকাইতেন না। বলিতেন— ও কুলাঙ্গার ঠিক রায়গড়ের খুড়া বসন্ত রায়ের মতো হইবে, সেতার বাজাইয়া নাচিয়া বেড়াইবে ও রাজ্য অধঃপাতে দিবে।"

সুরমা আবার কহিলেন, "প্রিয়তম, সহ্য করিয়া থাকো, ধৈর্য ধরিয়া থাকো। হাজার হউন, পিতা তো বটেন। আজকাল রাজ্য-উপার্জন রাজ্যবৃদ্ধির একমাত্র দুরাশায় তাঁহার সমস্ত হৃদয় পূর্ণ রহিয়াছে, সেখানে স্নেহের ঠাঁই নাই। যতই তাঁহার আশা পূর্ণ হইতে থাকিবে ততই তাঁহার স্নেহের রাজ্য বাড়িতে থাকিবে।"

যুবরাজ কহিলেন, "সুরমা, তোমার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, দূরদর্শী; কিন্তু এইবারে তুমি ভুল বুঝিয়াছ। এক তো আশার শেষ নাই; দ্বিতীয়ত পিতার রাজ্যের সীমা যতই বাড়িতে থাকিবে, রাজ্য যতই লাভ করিতে থাকিবেন, ততই তাহা হারাইবার ভয় তাঁহার মনে বাড়িতে থাকিবে— রাজকার্য যতই গুরুতর হইয়া উঠিবে ততই আমাকে তাহার অনুপযুক্ত মনে করিবেন।"

সুরমা ভুল বুঝে নাই, ভুল বিশ্বাস করিত মাত্র; বিশ্বাস বুদ্ধিকেও লঙ্ঘন করে। সে একমনে আশা করিত, এইরূপই যেন হয়।

"চারি দিকে কোথাও বা কৃপাদৃষ্টি কোথাও বা অবহেলা সহ্য করিতে না পারিয়া আমি মাঝে মাঝে পলাইয়া রায়গড়ে দাদামহাশয়ের কাছে যাইতাম। পিতা বড়ো একটা খোঁজ লইতেন না। আঃ, সে কী পরিবর্তন! সেখানে গাছপালা দেখিতে

পাইতাম, গ্রামবাসীদের কুটিরে যাইতে পারিতাম, দিবানিশি রাজবেশ পরিয়া থাকিতে হইত না। তাহা ছাড়া জান তো, যেখানে দাদামহাশয় থাকেন তাহার ত্রিসীমায় বিষাদ ভাবনা বা কঠোর গাম্ভীর্য তিষ্ঠিতে পারে না। গাহিয়া বাজাইয়া, আমোদ করিয়া চারি দিক পূর্ণ করিয়া রাখেন। চারি দিকে উল্লাস, সদ্ভাব, শান্তি। সেইখানে গেলেই আমি ভুলিয়া যাইতাম যে, আমি যশোহরের যুবরাজ। সে কী আরামের ভুল! অবশেষে আমার বয়স যখন আঠারো বৎসর, একদিন রায়গড়ে বসন্তের বাতাস বহিতেছিল, চারিদিকে সবুজ কুঞ্জবন, সেই বসন্তে আমি রুক্মিণীকে দেখিলাম।"

সুরমা বলিয়া উঠিল, "ও কথা অনেকবার শুনিয়াছি।"

উদয়াদিত্য। আর-একবার শুন। মাঝে মাঝে এক-একটা কথা প্রাণের মধ্যে দংশন করিতে থাকে, সে কথাগুলা যদি বা হর করিয়া না দিই তবে আর বাঁচিব কী করিয়া? সেই কথাটা তোমার কাছে এখনও বলিতে লজ্জা করে, কষ্ট হয়, তাই বারবার করিয়া বলি। যেদিন আর লজ্জা করিবে না, কষ্ট হইবে না, সেদিন বুঝিব আমার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইল, সেদিন আর বলিব না।

সুরমা। কিসের প্রায়শ্চিত্ত প্রিয়তম? তুমি যদি পাপ করিয়া থাক তো সে পাপের দোষ, তোমার দোষ নহে। আমি কি তোমাকে জানি না? অন্তর্যামী কি তোমার মন দেখিতে পান না?

উদয়াদিত্য বলিতে লাগিলেন, "রুক্মিণীর বয়স আমার অপেক্ষা তিন বৎসরের বড়ো। সে একাকিনী, বিধবা। দাদামহাশয়ের অনুগ্রহে সে রায়গড়ে বাস করিতে পাইত। মনে নাই, সে আমাকে কী কৌশলে প্রথমে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গেল। তখন আমার মনের মধ্যে মধ্যাহ্নের কিরণ জ্বলিতেছিল। এত প্রখর আলো যে, কিছুই ভালো করিয়া দেখিতে পাইতেছিলাম না, চারি দিকে জগৎ জ্যোতির্ময় বাষ্পে আবৃত। সমস্ত রক্ত যেন মাথায় উঠিতেছিল; কিছুই আশ্চর্য, কিছুই অসম্ভব মনে হইত না; পথ বিপথ, দিক বিদিক সমস্ত এক আকার ধারণ করিয়াছিল। ইহার পূর্বেও আমার এমন কখনো হয় নাই, ইহার পরেও আমার এমন কখনো হয় নাই। জগদীশ্বর জানেন, তাঁহার কী উদ্দেশ্য সাধন করিতে এই ক্ষুদ্র দুর্বল বুদ্ধিহীন হৃদয়ের বিরুদ্ধে এক দিনের জন্য সমস্ত জগৎকে যেন উত্তেজিত করিয়া দিয়াছিলেন, বিশ্ব-চরাচর যেন একতন্ত্র হইয়া আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়টিকে মুহূর্তে বিপথে লইয়া গেল। মুহূর্তমাত্র— আর অধিক নয়— সমস্ত বহির্জগতের মুহূর্তস্থায়ী এক নিদারুণ আঘাত, আর মুহূর্তের মধ্যে একটি ক্ষীণ হৃদয়ের মূল বিদীর্ণ হইয়া গেল, বিদ্যুদ্‌বেগে সে ধূলিকে আলিঙ্গন করিয়া পড়িল। তাহার পরে যখন উঠিল তখন ধূলিধূসরিত, ম্লান— সে ধূলি

আর মুছিল না, সে মলিনতার চিহ্ন আর উঠিল না। আমি কী করিয়াছিলাম বিধাতা, যে, পাপে এক মুহূর্তের মধ্যে আমার জীবনের সমস্ত শুভ্রকে কালী করিলে? দিনকে রাত্রি করিলে? আমার হৃদয়ের পুষ্পবনে মালতী ও জুঁই ফুলের মুখগুলিও যেন লজ্জায় কালো হইয়া গেল।"

বলিতে বলিতে উদয়াদিত্যের গৌরবর্ণ মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, আয়ত নেত্র অধিকতর বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, মাথা হইতে পা পর্যন্ত একটি বিদ্যুৎশিখা কাঁপিয়া উঠিল। সুরমা হর্ষে, গর্বে, কষ্টে কহিল, "আমার মাথা খাও, ও কথা থাক্।"

উদয়াদিত্য। ধীরে ধীরে যখন রক্ত শীতল হইয়া গেল সকলই তখন যথাযথ পরিমাণে দেখিতে পাইলাম। যখন জগৎকে উষ্ণ, ঘূর্ণিতমস্তিষ্ক, রক্তনয়ন মাতালের কুজ্ঝটিকাময় ঘূর্ণমান স্বপ্নদৃশ্য বলিয়া মনে না হইয়া প্রকৃত কার্যক্ষেত্র বলিয়া মনে হইল, তখন মনের কী অবস্থা! কোথা হইতে কোথায় পতন! শত সহস্র লক্ষ ক্রোশ পাতালের গহ্বরে, অন্ধ অন্ধতর অন্ধতম রজনীর মধ্যে একেবারে পলক না ফেলিতে পড়িয়া গেলাম। দাদামহাশয় স্নেহভরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন; তাঁহার কাছে মুখ দেখাইলাম কী বলিয়া? কিন্তু সেই অবধি আমাকে রায়গড় ছাড়িতে হইল। দাদা-মহাশয় আমাকে না দেখিলে থাকিতে পারেন না; আমাকে ডাকিয়া পাঠাইতেন। আমার এমনি ভয় করিত যে, আমি কোনোমতেই যাইতে পারিতাম না। তিনি স্বয়ং আমাকে ও ভগিনী বিভাকে দেখিতে আসিতেন। অভিমান নাই, কিছুই নাই। জিজ্ঞাসাও করিতেন না, কেন যাই নাই। আমাদের দেখিতেন, আমোদ-উল্লাস করিতেন ও চলিয়া যাইতেন।

উদয়াদিত্য ঈষৎ হাস্য করিয়া অতিশয় মৃদু কোমল প্রেমে তাঁহার বড়ো বড়ো চোখ দুটি প্লাবিত করিয়া সুরমার মুখের দিকে চাহিলেন। সুরমা বুঝিল, এইবার কী কথা আসিতেছে। মুখ নত হইয়া আসিল; ঈষৎ চঞ্চল হইয়া পড়িল। যুবরাজ দুই হস্তে তাহার দুই কপোল ধরিয়া নত মুখখানি তুলিয়া ধরিলেন। অধিকতর নিকটে গিয়া বসিলেন; মুখখানি নিজের স্কন্ধে ধীরে ধীরে রাখিলেন। কটিদেশ বামহস্তে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন ও গভীর প্রশান্ত প্রেমে তাহার কপোল চুম্বন করিয়া বলিলেন, "তার পর কী হইল, সুরমা বলো দেখি। এই বুদ্ধিতে দীপ্যমান, স্নেহপ্রেমে কোমল, হাস্যে উজ্জ্বল ও প্রশান্ত ভাবে বিমল, মুখখানি কোথা হইতে উদয় হইল? আমার সে গভীর অন্ধকার ভাঙিবে আশা ছিল কি? তুমি আমার উষা, আমার আলো, আমার আশা, কী মায়ামন্ত্রে সে আঁধার দূর করিলে।"

যুবরাজ বার বার সুরমার মুখচুম্বন করিলেন। সুরমা কিছুই কথা কহিল না,

আনন্দে তাহার চোখ জলে পুরিয়া আসিল। যুবরাজ কহিলেন, "এতদিনের পরে আমি যথার্থ আশ্রয় পাইলাম। তোমার কাছে প্রথম শুনিলাম যে আমি নির্বোধ নই, তাহাই বিশ্বাস করিলাম, তাহাই বুঝিতে পারিলাম। তোমারই কাছে শিখিলাম বুদ্ধি অন্ধকারময় ক্ষুদ্র গলির মতো বাঁকাচোরা উঁচুনিচু নহে, রাজপথের ন্যায় সরল সমতল প্রশস্ত। পূর্বে আমি আপনাকে ঘৃণা করিতাম, আপনাকে অবহেলা করিতাম। কোনো কাজ করিতে সাহস করিতাম না। মন যদি বলিত ইহাই ঠিক, আত্মসংশয়ী সংস্কার বলিত উহা ঠিক না হইতেও পারে। যে যেরূপ ব্যবহার করিত তাহাই সহিয়া থাকিতাম, নিজে কিছু ভাবিতে চেষ্টা করিতাম না। এতদিনের পরে আমার মনে হইল, আমি কিছু, আমি কেহ। এতদিন আমি অগোচর ছিলাম, তুমি আমাকে বাহির করিয়াছ, সুরমা তুমি আমাকে আবিষ্কার করিয়াছ, এখন আমার মন যাহা ভালো বলে তৎক্ষণাৎ তাহা আমি সাধন করিতে চাই। তোমার উপর আমার এমন বিশ্বাস আছে যে, তুমি যখন আমাকে বিশ্বাস কর তখন আমিও আমাকে নির্ভয়ে বিশ্বাস করিতে পারি। সুকুমার শরীরে এত বল কোথায় ছিল যাহাতে আমাকেও তুমি বলীয়ান করিয়া তুলিয়াছ!"

কী অপরিসীম নির্ভরের ভাবে সুরমা স্বামীর বক্ষ বেষ্টন করিয়া ধরিল। কী সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জী দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার চোখ কহিল, "আমার আর কিছুই নাই কেবল তুমি আছ, তাই আমার সব আছে!"

বাল্যকাল হইতে উদয়াদিত্য আত্মীয়-স্বজনের উপেক্ষা সহিয়া আসিতেছেন, মাঝে মাঝে এক-একদিন নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে সুরমার নিকট সেই শতবার-কথিত পুরানো জীবনকাহিনী খণ্ডে খণ্ডে সোপানে সোপানে আলোচনা করিতে তাঁহার বড়ো ভালো লাগে।

উদয়াদিত্য কহিলেন, "এমন করিয়া আর কতদিন চলিবে সুরমা? এ দিকে রাজসভায় সভাসদ্‌গণ কেমন একপ্রকার কৃপাদৃষ্টিতে আমার প্রতি চায়, ও দিকে অন্তঃপুরে মা তোমাকে লাঞ্ছনা করিতেছেন। দাসদাসীরা পর্যন্ত তোমাকে তেমন মানে না। আমি কাহাকেও ভালো করিয়া কিছু বলিতে পারি না, চুপ করিয়া থাকি, সহ্য করিয়া যাই। তোমার তেজস্বী স্বভাব, কিন্তু তুমিও নীরবে সহিয়া যাও। যখন তোমাকে সুখী করিতে পারিলাম না, আমা হইতে তোমাকে কেবল অপমান আর কষ্ট সহ্য করিতে হইল, তখন আমাদের এ বিবাহ না হইলেই ভালো ছিল।"

সুরমা। সে কী কথা নাথ! এই সময়েই তো সুরমাকে আবশ্যক। সুখের সময় আমি তোমার কী করিতে পারিতাম! সুখের সময় সুরমা বিলাসের দ্রব্য, খেলিবার

জিনিস। সকল দুঃখ অতিক্রম করিয়া আমার মনে এই সুখ জাগিতেছে যে, আমি তোমার কাজে লাগিতেছি, তোমার জন্য দুঃখ সহিতে যে অতুল আনন্দ আছে সেই আনন্দ উপভোগ করিতেছি। কেবল দুঃখ এই, তোমার সমুদয় কষ্ট কেন আমি বহন করিতে পারিলাম না।

যুবরাজ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "আমি নিজের জন্য তেমন ভাবি না। সকলই সহিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমার জন্য তুমি কেন অপমান সহ্য করিবে? তুমি যথার্থ স্ত্রীর মতো আমার দুঃখের সময় সান্ত্বনা দিয়াছ, শ্রান্তির সময় বিশ্রাম দিয়াছ, কিন্তু আমি স্বামীর মতো তোমাকে অপমান হইতে, লজ্জা হইতে রক্ষা করিতে পারিলাম না। তোমার পিতা শ্রীপুররাজ আমার পিতাকে প্রধান বলিয়া না মানাতে, আপনাকে যশোহরছত্রের অধীন বলিয়া স্বীকার না করাতে, পিতা তোমার প্রতি অবহেলা দেখাইয়া নিজের প্রধানত্ব বজায় রাখিতে চান। তোমাকে কেহ অপমান করিলে তিনি কানেই আনেন না। তিনি মনে করেন, তোমাকে যে পুত্রবধূ করিয়াছেন, ইহাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। এক-একবার মনে হয় আর পারিয়া উঠি না, সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে লইয়া চলিয়া যাই। এতদিনে হয়তো যাইতাম, তুমি কেবল আমাকে ধরিয়া রাখিয়াছ।"

রাত্রি গভীর হইল। অনেকগুলি সন্ধ্যার তারা অস্ত গেল, অনেকগুলি গভীর রাত্রের তারা উদিত হইল। প্রাকারতোরণস্থিত প্রহরীদের পদশব্দ দূর হইতে শুনা যাইতেছে। সমুদয় জগৎ সুষুপ্ত। নগরের সমুদয় প্রদীপ নিবিয়া গিয়াছে, গৃহদ্বার রুদ্ধ, দৈবাৎ দু-একটা শৃগাল ছাড়া একটি জনপ্রাণীও নাই। উদয়াদিত্যের শয়নকক্ষের দ্বার রুদ্ধ ছিল। সহসা বাহির হইতে কে দুয়ারে আঘাত করিতে লাগিল।

শশব্যস্ত যুবরাজ দুয়ার খুলিয়া দিলেন, "কেন বিভা? কী হইয়াছে? এত রাত্রে এখানে আসিয়াছ কেন?"

পাঠকেরা পূর্বেই অবগত হইয়াছেন বিভা উদয়াদিত্যের ভগিনী। বিভা কহিল, "এতক্ষণে বুঝি সর্বনাশ হইল!"

সুরমা ও উদয়াদিত্য একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, "কেন, কী হইয়াছে?" বিভা ভয়কম্পিত স্বরে চুপি চুপি কী কহিল। বলিতে বলিতে আর থাকিতে পারিল না, কাঁদিয়া উঠিল; কহিল, "দাদা কী হইবে?"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "আমি তবে চলিলাম।"

বিভা বলিয়া উঠিল, "না না, তুমি যাইয়ো না।"

উদয়াদিত্য। কেন বিভা?

বিভা। পিতা যদি জানিতে পারেন? তোমার উপরে যদি রাগ করেন?

সুরমা কহিল, "ছিঃ বিভা; এখন কি তাহা ভাবিবার সময়?"

উদয়াদিত্য বস্ত্রাদি পরিয়া কটিবন্ধে তরবারি বাঁধিয়া প্রস্থানের উদ্‌যোগ করিলেন। বিভা তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "দাদা তুমি যাইয়ো না, তুমি লোক পাঠাইয়া দাও, আমার বড়ো ভয় করিতেছে।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "বিভা এখন বাধা দিস নে; আর সময় নাই।" এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেলেন।

বিভা সুরমার হাত ধরিয়া কহিল, "কী হইবে ভাই? বাবা যদি টের পান?"

সুরমা কহিল, "আর কী হইবে? স্নেহের বোধ করি আর কিছু অবশিষ্ট নাই। যেটুকু আছে সেটুকু গেলেও বড়ো একটা ক্ষতি হইবে না।"

বিভা কহিল, "না ভাই, আমার বড়ো ভয় করিতেছে। পিতা যদি কোনোপ্রকার হানি করেন। যদি দণ্ড দেন?"

সুরমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "আমার বিশ্বাস, সংসারে যাহার কেহই সহায় নাই, নারায়ণ তাহার অধিক সহায়। হে প্রভু, তোমার নামে কলঙ্ক না হয় যেন। এ বিশ্বাস আমার ভাঙিয়ো না।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মন্ত্রী কহিলেন, "মহারাজ, কাজটা কি ভালো হইবে?"

প্রতাপাদিত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ কাজটা?"

মন্ত্রী কহিলেন, "কাল যাহা আদেশ করিয়াছিলেন।"

প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "কাল কী আদেশ করিয়াছিলাম?"

মন্ত্রী কহিলেন, "আপনার পিতৃব্য সম্বন্ধে।"

প্রতাপাদিত্য আরও বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "আমার পিতৃব্য সম্বন্ধে কী?"

মন্ত্রী কহিলেন, "মহারাজ আদেশ করিয়াছিলেন, যখন বসন্ত রায় যশোহরে আসিবার পথে শিমুলতলির চটিতে আশ্রয় লইবেন তখন—"

প্রতাপাদিত্য ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "তখন কী? কথাটা শেষ করিয়াই ফেলো।"

মন্ত্রী। তখন দুই জন পাঠান গিয়া—

প্রতাপ। হাঁ।

মন্ত্রী। তাঁহাকে নিহত করিবে।

প্রতাপাদিত্য রুষ্ট হইয়া কহিলেন, "মন্ত্রী, হঠাৎ তুমি শিশু হইয়াছ নাকি? একটা কথা শুনিতে দশটা প্রশ্ন করিতে হয় কেন? কথাটা মুখে আনিতে বুঝি সংকোচ হইতেছে! এখন বোধ করি তোমার রাজকার্যে মনোযোগ দিবার বয়স গিয়াছে, এখন পরকাল চিন্তার সময় আসিয়াছে। এতদিন অবসর প্রার্থনা কর নাই কেন?"

মন্ত্রী। মহারাজ আমার ভাবটা ভালো বুঝিতে পারেন নাই।

প্রতাপ। বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, আমি যে কাজটা করিতে পারি, তুমি তাহা মুখে আনিতেও পার না? তোমার বিবেচনা করা উচিত ছিল, আমি যখন এ কাজটা করিতে যাইতেছি, তখন অবশ্য তাহার গুরুতর কারণ আছে; আমি অবশ্য ধর্ম অধর্ম সমস্ত ভাবিয়াছিলাম।

মন্ত্রী। আজ্ঞা মহারাজ, আমি—

প্রতাপ। চুপ করো, আমার সমস্ত কথাটা শোনো আগে। আমি যখন এ কাজটা —আমি যখন নিজের পিতৃব্যকে খুন করিতে উদ্যত হইয়াছি, তখন অবশ্য তোমার চেয়ে ঢের বেশি ভাবিয়াছি। এ কাজে অধর্ম নাই। আমার ব্রত এই—এই যে ম্লেচ্ছেরা আমাদের দেশে আসিয়া অনাচার আরম্ভ করিয়াছে, যাহাদের অত্যাচারে আমাদের দেশ হইতে সনাতন আর্যধর্ম লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে, ক্ষত্রিয়েরা মোগলকে কন্যা দিতেছে, হিন্দুরা আচারভ্রষ্ট হইতেছে, এই ম্লেচ্ছদের আমি দূর করিয়া দিব, আমাদের আর্যধর্মকে রাহুর গ্রাস হইতে মুক্ত করিব। এই ব্রত সাধন করিতে অনেক বলের আবশ্যক। আমি চাই, সমস্ত বঙ্গদেশের রাজারা আমার অধীনে এক হয়; যাহারা যবনের মিত্র, তাহাদের বিনাশ না করিলে ইহা সিদ্ধ হইবে না। পিতৃব্য বসন্ত রায় আমার পূজ্যপাদ, কিন্তু যথার্থ কথা বলিতে পাপ নাই, তিনি আমাদের বংশের কলঙ্ক। তিনি আপনাকে ম্লেচ্ছের দাস বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, এমন লোকের সহিত প্রতাপাদিত্য রায়ের কোনো সম্পর্ক নাই। ক্ষত হইলে নিজের বাহুকে কাটিয়া ফেলা যায়; আমার ইচ্ছা যায় বংশের ক্ষত, বঙ্গদেশের ক্ষত ওই বসন্ত রায়কে কাটিয়া ফেলিয়া রায়-বংশকে বাঁচাই, বঙ্গদেশকে বাঁচাই।

মন্ত্রী কহিলেন, "এ-বিষয়ে মহারাজের সহিত আমার অন্য মত ছিল না।"

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "হাঁ ছিল। ঠিক কথা বলো। এখনও আছে। দেখো মন্ত্রী, যতক্ষণ আমার মতের সহিত তোমার মত না মিলিবে, ততক্ষণ তাহা প্রকাশ করিয়ো। সে সাহস যদি না থাকে তবে এ পদ তোমার নহে। সন্দেহ থাকে তো

বলিয়ো। আমাকে বুঝাইবার অবসর দিয়ো। তুমি মনে করিতেছ নিজের পিতৃব্যকে হনন করা সকল সময়েই পাপ; 'না' বলিয়ো না, ঠিক এই কথাই তোমার মনে জাগিতেছে। ইহার উত্তর আছে। পিতার অনুরোধে ভৃগু নিজের মাতাকে বধ করিয়াছিলেন, ধর্মের অনুরোধে আমি আমার পিতৃব্যকে বধ করিতে পারি না ?"

এ বিষয়ে— অর্থাৎ ধর্ম অধর্ম বিষয়ে যথার্থই মন্ত্রীর কোনো মতামত ছিল না। মন্ত্রী যতদুর তলাইয়াছিলেন, রাজা ততদুর তলাইতে পারেন নাই। মন্ত্রী বিলক্ষণ জানিতেন যে, উপস্থিত বিষয়ে তিনি যদি সংকোচ দেখান তাহা হইলে রাজা আপাতত কিছু রুষ্ট হইবেন বটে, কিন্তু পরিণামে তাহার জন্য মনে মনে সন্তুষ্ট হইবেন। এইরূপ না করিলে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে এককালে-না-এককালে রাজার সন্দেহ ও আশঙ্কা জন্মিতে পারে।

মন্ত্রী কহিলেন, "আমি বলিতেছিলাম কি, দিল্লীশ্বর এ সংবাদ শুনিয়া নিশ্চয়ই রুষ্ট হইবেন।"

প্রতাপাদিত্য জ্বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ হাঁ রুষ্ট হইবেন! রুষ্ট হইবার অধিকার তো সকলেরই আছে। দিল্লীশ্বর তো আমার ঈশ্বর নহেন। তিনি রুষ্ট হইলে থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকিবে এমন জীব যথেষ্ট আছে, মানসিংহ আছে, বীরবল আছে, আমাদের বসন্ত রায় আছেন, আর সম্প্রতি দেখিতেছি তুমিও আছ; কিন্তু আত্মবৎ সকলকে মনে করিয়ো না।"

মন্ত্রী হাসিয়া কহিলেন, "আজ্ঞা, মহারাজ, ফাঁকা রোষকে আমিও বড়ো একটা ডরাই না, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঢাল-তলোয়ার যদি থাকে তাহা হইলে ভাবিতে হয় বই কি। দিল্লীশ্বরের রোষের অর্থ পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য।"

প্রতাপাদিত্য ইহার একটা সদুত্তর না দিতে পারিয়া কহিলেন, "দেখো মন্ত্রী, দিল্লীশ্বরের ভয় দেখাইয়া আমাকে কোনো কাজ হইতে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিয়ো না, তাহাতে আমার নিতান্ত অপমান বোধ হয়।"

মন্ত্রী কহিলেন, "প্রজারা জানিতে পারিলে কী বলিবে ?"

প্রতাপ। জানিতে পারিলে তো ?

মন্ত্রী। এ কাজ অধিকদিন চাপা রহিবে না। এ সংবাদ রাষ্ট্র হইলে সমস্ত বঙ্গদেশ আপনার বিরোধী হইবে। যে উদ্দেশ্যে এই কাজ করিতে চান, তাহা সমূলে বিনাশ পাইবে। আপনাকে জাতিচ্যুত করিবে ও বিবিধ নিগ্রহ সহিতে হইবে।

প্রতাপ। দেখো মন্ত্রী, আবার তোমাকে বলিতেছি, আমি যাহা করি তাহা

বিশেষ ভাবিয়া করি। অতএব আমি কাজে প্রবৃত্ত হইলে মিছামিছি কতকগুলা ভয় দেখাইয়া আমাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিয়ো না, আমি শিশু নহি। প্রতি পদে আমাকে বাধা দিবার জন্য, তোমাকে আমার নিজের শৃঙ্খলস্বরূপে রাখি নাই।

মন্ত্রী চুপ করিয়া গেলেন। তাঁহার প্রতি রাজার দুইটি আদেশ ছিল। এক যতক্ষণ মতের অমিল হইবে ততক্ষণ প্রকাশ করিবে; দ্বিতীয়ত বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া রাজাকে কোনো কাজ হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিবে না। মন্ত্রী আজ পর্যন্ত এই দুই আদেশের ভালোরূপ সামঞ্জস্য করিতে পারেন নাই।

মন্ত্রী কিয়ৎক্ষণ পরে আবার কহিলেন, "মহারাজ, দিল্লীশ্বর—" প্রতাপাদিত্য জ্বলিয়া উঠিয়া কহিলেন, "আবার দিল্লীশ্বর? মন্ত্রী, দিনের মধ্যে তুমি যতবার দিল্লীশ্বরের নাম কর ততবার যদি জগদীশ্বরের নাম করিতে তাহা হইলে পরকালের কাজ গুছাইতে পারিতে। যতক্ষণে না আমার এই কাজটা শেষ হইবে, ততক্ষণ দিল্লীশ্বরের নাম মুখে আনিয়ো না। যখন আজ বিকালে এই কাজ সমাধার সংবাদ পাইব, তখন আসিয়া আমার কানের কাছে তুমি মনের সাধ মিটাইয়া দিল্লীশ্বরের নাম জপিয়ো। ততক্ষণ একটু আত্মসংযম করিয়া থাকো।"

মন্ত্রী আবার চুপ করিয়া গেলেন। দিল্লীশ্বরের কথা বন্ধ করিয়া কহিলেন, "মহারাজ, যুবরাজ উদয়াদিত্য—"

রাজা কহিলেন, "দিল্লীশ্বর গেল, প্রজারা গেল, এখন অবশেষে সেই স্ত্রৈণ বালকটার কথা বলিয়া ভয় দেখাইবে না কি?"

মন্ত্রী কহিলেন, "মহারাজ, আপনি অত্যন্ত ভুল বুঝিতেছেন। আপনার কাজে বাধা দিবার অভিপ্রায় আমার মূলেই নাই।"

প্রতাপাদিত্য ঠাণ্ডা হইয়া কহিলেন, "তবে কী বলিতেছিলে বলো।"

মন্ত্রী বলিলেন, "কাল রাত্রে যুবরাজ সহসা অশ্বারোহণ করিয়া একাকী চলিয়া গিয়াছেন, এখনও ফিরিয়া আসেন নাই।"

প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "কোন্ দিকে গেছেন?"

মন্ত্রী কহিলেন, "পূর্বাভিমুখে।"

প্রতাপাদিত্য দাঁতে দাঁত লাগাইয়া কহিলেন, "কখন গিয়াছিল?"

মন্ত্রী। কাল প্রায় অর্ধরাত্রের সময়।

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "শ্রীপুরের জমিদারের মেয়ে কি এখানেই আছে?"

মন্ত্রী। আজ্ঞা হাঁ।

প্রতাপাদিত্য। সে তাহার পিত্রালয়ে থাকিলেই তো ভালো হয়।

মন্ত্রী কোনো উত্তর দিলেন না।

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "উদয়াদিত্য কোনোকালেই রাজার মতো ছিল না। ছেলেবেলা হইতে প্রজাদের সঙ্গেই তাহার মেশামেশি। আমার সন্তান যে এমন হইবে তাহা কে জানিত? সিংহ-শাবককে কি, কী করিয়া সিংহ হইতে হয় তাহা শিখাইতে হয়? তবে কিনা— নরাণাং মাতুলক্রমঃ। বোধ করি সে তাহার মাতামহদের স্বভাব পাইয়াছে। তাহার উপরে আবার সম্প্রতি শ্রীপুরের ঘরে বিবাহ দিয়াছি; সেই অবধি বালকটা একেবারে অধঃপাতে গিয়াছে। ঈশ্বর করুন, আমার কনিষ্ঠ পুত্রটি যেন উপযুক্ত হয়, আমি যাহা আরম্ভ করিয়াছি তাহা শেষ যদি না করিতে পারি তাহা হইলে মরিবার সময়ে ভাবনা না থাকিয়া যায় যেন। সে কি তবে এখনও ফিরিয়া আসে নাই?"

মন্ত্রী। না মহারাজ।

ভূমিতে পদাঘাত করিয়া প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "একজন প্রহরী তাহার সঙ্গে কেন যায় নাই?"

মন্ত্রী। একজন যাইতে প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি বারণ করিয়াছিলেন।

প্রতাপ। অদৃশ্যভাবে দূরে দূরে থাকিয়া কেন যায় নাই?

মন্ত্রী। তাহারা কোনোপ্রকার অন্যায় সন্দেহ করে নাই।

প্রতাপ। সন্দেহ করে নাই! মন্ত্রী, তুমি কি আমাকে বুঝাইতে চাও, তাহারা বড়ো ভালো কাজ করিয়াছিল? মন্ত্রী, তুমি আমাকে অনর্থক যাহা-তাহা একটা বুঝাইতে চেষ্টা পাইয়ো না। প্রহরীরা কর্তব্য কাজে বিশেষ অবহেলা করিয়াছে। সে-সময়ে দ্বারে কাহারা ছিল ডাকিয়া পাঠাও। ঘটনাটির জন্য যদি আমার কোনো একটা ইচ্ছা বিফল হয়, তবে আমি সর্বনাশ করিব। মন্ত্রী, তোমারও তাহা হইলে ভয়ের সম্ভাবনা আছে। আমার কাছে তুমি প্রমাণ করিতে আসিয়াছ, এ কাজের জন্য কেহই দায়ী নহে। তবে এ দায় তোমার।

প্রতাপাদিত্য প্রহরীদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কিয়ৎক্ষণ গম্ভীর ভাবে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ। দিল্লীশ্বরের কথা কী বলিতেছিলে?"

মন্ত্রী। শুনিলাম আপনার নামে দিল্লীশ্বরের নিকটে অভিযোগ করিয়াছে।

প্রতাপ। কে? তোমাদের যুবরাজ উদয়াদিত্য নাকি?

মন্ত্রী। আজ্ঞা মহারাজ, এমন কথা বলিবেন না। কে করিয়াছে সন্ধান পাই নাই।

প্রতাপ। যেই করুক, তাহার জন্য অধিক ভাবিয়ো না, আমিই দিল্লীশ্বরের

বিচারকর্তা, আমিই তাহার দণ্ডের উদ্‌যোগ করিতেছি। সে পাঠানেরা এখনও ফিরিল না? উদয়াদিত্য এখনও আসিল না? শীঘ্র প্রহরীকে ডাকো।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিজন পথ দিয়া বিদ্যুদ্‌বেগে যুবরাজ অশ্ব ছুটাইয়া চলিয়াছেন। অন্ধকার রাত্রি, কিন্তু পথ দীর্ঘ সরল প্রশস্ত বলিয়া কোনো ভয়ের আশঙ্কা নাই। স্তব্ধ রাত্রে অশ্বের খুরের শব্দে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইতেছে, দুই-একটি কুকুর ঘেউ-ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিতেছে, দুই-একটা শৃগাল চকিত হইয়া পথ ছাড়িয়া বাঁশঝাড়ের মধ্যে লুকাইতেছে। আলোকের মধ্যে আকাশের তারা ও পথপ্রান্তস্থিত গাছে জোনাকি; শব্দের মধ্যে ঝিঁঝি পোকার অবিশ্রাম শব্দ, মনুষ্যের মধ্যে কঙ্কাল-অবশেষ একটি ভিখারি বৃদ্ধা গাছের তলায় ঘুমাইয়া আছে। পাঁচ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া যুবরাজ পথ ছাড়িয়া একটা মাঠে নামিলেন। অশ্বের বেগ অপেক্ষাকৃত সংযত করিতে হইল। দিনের বেলায় বৃষ্টি হইয়াছিল, মাটি ভিজা ছিল, পদে পদে অশ্বের পা বসিয়া যাইতেছে। যাইতে যাইতে সম্মুখের পায়ে ভর দিয়া অশ্ব তিন বার পড়িয়া গেল। শ্রান্ত অশ্বের নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত, মুখে ফেন, পশ্চাতের পদদ্বয়ের ঘর্ষণে ফেন জন্মিয়াছে, পঞ্জরের ভিতর হইতে একটা শব্দ বাহির হইতেছে, সর্বাঙ্গ ঘর্মে প্লাবিত। এদিকে দারুণ গ্রীষ্ম, বাতাসের লেশমাত্র নাই, এখনও অনেকটা পথ অবশিষ্ট রহিয়াছে। বহুতর জলা ও চষা মাঠ অতিক্রম করিয়া যুবরাজ অবশেষে একটা কাঁচা রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অশ্বকে আবার দ্রুতবেগে ছুটাইলেন। একবার তাহার স্কন্ধ চাপড়াইয়া উৎসাহ দিয়া ডাকিলেন, "সুগ্রীব।" সে চকিতে একবার কান খাড়া করিয়া বড়ো বড়ো চোখে বঙ্কিম দৃষ্টিতে প্রভুর দিকে চাহিল, একবার গ্রীবা বাঁকাইয়া হ্রেষাধ্বনি করিল ও সবলে মুখ নামাইয়া রাশ শিথিল করিয়া লইল ও গ্রীবা নত করিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। দুই পার্শ্বের গাছপালা চোখে ভালো দেখা যাইতেছে না, আকাশে চাহিলে মনে হইতেছে যেন দলে দলে নক্ষত্রেরা অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের মতো সবেগে উড়িয়া যাইতেছে এবং সেই স্তব্ধবায়ু আকাশে বায়ু তরঙ্গিত হইয়া কানের কাছে সাঁ সাঁ করিতে লাগিল। রাত্রি যখন তৃতীয় প্রহর, লোকালয়ের কাছে শৃগালেরা যখন প্রহর ডাকিয়া গেল, তখন যুবরাজ শিমুলতলির চটির দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার অশ্ব তৎক্ষণাৎ গতজীবন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। নামিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইলেন, তাহার মুখ তুলিয়া ধরিলেন, "সুগ্রীব" বলিয়া কতবার

ডাকিলেন, সে আর নড়িল না! দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া যুবরাজ দ্বারে গিয়া আঘাত করিলেন। বার বার আঘাতের পর চটির অধ্যক্ষ দ্বার না খুলিয়া জানালার মধ্য দিয়া কহিল, "এত রাত্রে তুমি কে গো?" দেখিল একজন সশস্ত্র যুবক দ্বারে দাঁড়াইয়া।

যুবরাজ কহিলেন, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব, দ্বার খোলো।"

সে কহিল, "দ্বার খুলিবার আবশ্যক কী, যাহা জিজ্ঞাসা করিবার আছে, জিজ্ঞাসা করো না।"

যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "রায়গড়ের রাজা বসন্ত রায় এখানে আছেন?"

সে কহিল, "আজ্ঞা, সন্ধ্যার পর তাঁহার আসিবার কথা ছিল বটে কিন্তু এখনও আসেন নাই। আজ বোধ করি তাঁহার আসা হইল না।"

যুবরাজ দুইটি মুদ্রা লইয়া শব্দ করিয়া কহিলেন, "এই লও।"

সে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া দ্বার খুলিয়া মুদ্রা দুইটি লইল। তখন যুবরাজ তাহাকে কহিলেন, "বাপু, আমি একবারটি তোমার চটি অনুসন্ধান করিয়া দেখিব, কে কে আছে?"

চটি-রক্ষক সন্দিগ্ধভাবে কহিল, "না মহাশয় তাহা হইবে না।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "আমাকে বাধা দিয়ো না। আমি রাজবাটীর কর্মচারী। দুই জন অপরাধীর অনুসন্ধানে আসিয়াছি।"

এই কথা বলিয়াই তিনি প্রবেশ করিলেন। চটি-রক্ষক তাঁহাকে আর বাধা দিল না। তিনি সমস্ত অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন। না বসন্ত রায়, না তাঁহার অনুচর, না কোনো পাঠানকে দেখিতে পাইলেন। কেবল দুই জন সুপ্তোত্থিতা প্রৌঢ়া চেঁচাইয়া উঠিল, "আ মরণ, মিনসে অমন করিয়া তাকাইতেছিস কেন?"

চটি হইতে বাহির হইয়া পথে দাঁড়াইয়া যুবরাজ ভাবিতে লাগিলেন। একবার মনে করিলেন যে, ভালোই হইয়াছে, হয়তো আজ দৈবক্রমে তিনি আসিতে পারেন নাই। আবার মনে করিলেন, যদি ইহার পূর্ববর্তী কোনো চটিতে থাকেন ও পাঠানেরা তাঁহার অনুসন্ধানে সেখানে গিয়া থাকে? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সেই পথ বাহিয়া চলিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া দেখিলেন, বিপরীত দিক হইতে একজন অশ্বারোহী আসিতেছে। নিকটে আসিলে কহিলেন, "কে ও, রতন নাকি?" সে অশ্ব হইতে তৎক্ষণাৎ নামিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, "আজ্ঞা হাঁ। যুবরাজ, আপনি এত রাত্রে এখানে যে?"

যুবরাজ কহিলেন, "তাহার কারণ পরে বলিব। এখন বলো তো দাদামহাশয় কোথায় আছেন।"

"আজ্ঞা, তাঁহার তো চটিতেই থাকিবার কথা।"

"সে কী! সেখানে তো তাঁহাকে দেখিলাম না।"

সে অবাক হইয়া কহিল, "ত্রিশ জন অনুচর সমেত মহারাজ যশোর উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছেন। আমি কার্যবশত পিছাইয়া পড়িয়াছিলাম। এই চটিতে আজ সন্ধ্যাবেলা তাঁহার সহিত মিলিবার কথা।"

"পথে যেরূপ কাদা তাহাতে পদচিহ্ন থাকিবার কথা, তাহাই অনুসরণ করিয়া আমি তাঁহার অনুসন্ধানে চলিলাম। তোমার ঘোটক লইলাম। তুমি পদব্রজে আইস।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিজন পথের ধারে অশথ গাছের তলায় বাহকশূন্য ভূতলস্থিত এক শিবিকার মধ্যে বৃদ্ধ বসন্ত রায় বসিয়া আছেন। কাছে আর কেহ নাই, কেবল একটি পাঠান শিবিকার বাহিরে। একটা জনকোলাহল দূরে মিলাইয়া গেল। রজনী স্তব্ধ হইয়া গেল। বসন্ত রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "খাঁ সাহেব, তুমি যে গেলে না?"

পাঠান কহিল, "হুজুর, কী করিয়া যাইব? আপনি আমাদের ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য আপনার সকল অনুচরগুলিকেই পাঠাইলেন। আপনাকে এই পথের ধারে রাত্রে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া যাইব, এতবড়ো অকৃতজ্ঞ আমাকে ঠাহরাইবেন না। আমাদের কবি বলেন, যে আমার অপকার করে সে আমার কাছে ঋণী; পরকালে সে ঋণ তাহাকে শোধ করিতে হইবে; যে আমার উপকার করে আমি তাহার কাছে ঋণী, কিন্তু কোনোকালে তাহার সে ঋণ শোধ করিতে পারিব না।"

বসন্ত রায় মনে মনে কহিলেন, বাহবা, লোকটা তো বড়ো ভালো। কিছুক্ষণ বিতর্ক করিয়া পালকি হইতে তাঁহার টাকবিশিষ্ট মাথাটি বাহির করিয়া কহিলেন, "খাঁ সাহেব, তুমি বড়ো ভালো লোক।"

খাঁ সাহেব তৎক্ষণাৎ এক সেলাম করিলেন। এ-বিষয়ে বসন্ত রায়ের সহিত খাঁ সাহেবের কিছুমাত্র মতের অনৈক্য ছিল না। বসন্ত রায় মশালের আলোকে তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "তোমাকে বড়োঘরের লোক বলিয়া মনে হইতেছে।"

পাঠান আবার সেলাম করিয়া কহিল, "কেয়া তাজ্জব, মহারাজ, ঠিক ঠাহরাইয়াছেন।"

বসন্ত রায় কহিলেন, "এখন তোমার কী করা হয়?"

পাঠান নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "হুজুর, দুরবস্থায় পড়িয়াছি, এখন চাষবাস করিয়া গুজরান চালাইতে হইতেছে। কবি বলিতেছেন, হে অদৃষ্ট, তুমি যে তৃণকে তৃণ করিয়া গড়িয়াছ, ইহাতে তোমার নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পায় না, কিন্তু তুমি যে অশথ গাছকে অশথ গাছ করিয়া গড়িয়া অবশেষে ঝড়ের হাতে তাহাকে তৃণের সহিত সমতল করিয়া শোয়াও ইহাতেই আন্দাজ করিতেছি, তোমার মনটা পাথরে গড়া।"

বসন্ত রায় নিতান্ত উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বাহবা, বাহবা, কবি কী কথাই বলিয়াছেন। সাহেব, যে দুইটি বয়েৎ আজ বলিলে, ওই দুইটি লিখিয়া দিতে হইবে।"

পাঠান ভাবিল, তাহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। বুড়া, লোক বড়ো সরেস; গরিবের বহুৎ কাজে লাগিতে পারিবে। বসন্ত রায় ভাবিলেন, আহা, এককালে যে ব্যক্তি বড়োলোক ছিল আজ তাহার এমন দুরবস্থা। চপলা লক্ষ্মীর এ বড়ো অত্যাচার। মনে মনে তিনি কিছু কাতর হইলেন, পাঠানকে কহিলেন, "তোমার যে-রকম সুন্দর শরীর আছে, তাহাতে তো তুমি অনায়াসে সৈন্যশ্রেণীতে নিযুক্ত হইতে পার।"

পাঠান তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "হুজুর, পারি বইকি। সেই তো আমাদের কাজ। আমার পিতা-পিতামহেরা সকলেই তলোয়ার হাতে করিয়া মরিয়াছেন, আমারও সেই একমাত্র সাধ আছে। কবি বলেন,—"

বসন্ত রায় হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "কবি যাহাই বলুন বাপু, আমার কাজ যদি গ্রহণ কর, তবে তলোয়ার হাতে করিয়া মরিবার সাধ মিটিতেও পারে, কিন্তু সে তলোয়ার খাপ হইতে খোলা তোমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে না। বুড়া হইয়া পড়িয়াছি, প্রজারা সুখে স্বচ্ছন্দে আছে, ভগবান করুন, আর যেন লড়াই করিবার দরকার না হয়। বয়স গিয়াছে; তলোয়ার ত্যাগ করিয়াছি। এখন তলোয়ারের পরিবর্তে আর-এক জন আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছে।" এই বলিয়াই পার্শ্বে শায়িত সহচরী সেতারটিকে দুই-একটি ঝংকার দিয়া একবার জাগাইয়া দিলেন।

পাঠান ঘাড় নাড়িয়া চোখ বুজিয়া কহিল, "আহা, যাহা বলিতেছেন, ঠিক বলিতেছেন। একটি বয়েৎ আছে যে, তলোয়ারে শত্রুকে জয় করা যায়, কিন্তু সংগীতে শত্রুকে মিত্র করা যায়।"

বসন্ত রায় বলিয়া উঠিলেন, "কী বলিলে খাঁ সাহেব? সংগীতে শত্রুকে মিত্র করা যায়! কী চমৎকার!" চুপ করিয়া কিয়ৎক্ষণ ভাবিতে লাগিলেন, যতই ভাবিতে লাগিলেন ততই যেন অধিকতর অবাক হইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বয়েৎটির ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তলোয়ার যে এতবড়ো ভয়ানক দ্রব্য তাহাতেও শত্রুর শত্রুত্ব নাশ করা যায় না— কেমন করিয়া বলিব নাশ করা যায়? রোগীকে

বধ করিয়া রোগ আরোগ্য করা সে কেমনতরো আরোগ্য? কিন্তু সংগীত যে এমন মধুর জিনিস, তাহাতে শত্রু নাশ না করিয়াও শত্রুত্ব নাশ করা যায়। এ কি সাধারণ কবিত্বের কথা? বাঃ, কী তারিফ!" বৃদ্ধ এতদূর উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন যে, শিবিকার বাহিরে পা রাখিয়া বসিলেন, পাঠানকে আরও কাছে আসিতে বলিলেন ও কহিলেন, "তলোয়ারে শত্রুকে জয় করা যায়, কিন্তু সংগীতে শত্রুকেও মিত্র করা যায়, কেমন খাঁ সাহেব?"

পাঠান। আজ্ঞা হাঁ হুজুর।

বসন্ত রায়। তুমি একবার রায়গড়ে যাইয়ো। আমি যশোর হইতে ফিরিয়া গিয়া তোমার যথাসাধ্য উপকার করিব।

পাঠান উৎফুল্ল হইয়া কহিল, "আপনি ইচ্ছা করিলে কী না করিতে পারেন।" পাঠান ভাবিল একরকম বেশ গুছাইয়া লইয়াছি। জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার সেতার বাজানো আসে?"

বসন্ত রায় কহিলেন, "হাঁ" ও তৎক্ষণাৎ সেতার তুলিয়া লইলেন। অঙ্গুলিতে মেজরাপ আঁটিয়া বেহাগ আলাপ করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে পাঠান মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "বাহবা! থাসী!" ক্রমে উত্তেজনার প্রভাবে শিবিকার মধ্যে বসিয়া থাকা বসন্ত রায়ের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বাজাইতে লাগিলেন। মর্যাদা গাম্ভীর্য আত্মপর সমস্ত বিস্মৃত হইলেন ও বাজাইতে বাজাইতে অবশেষে গান ধরিলেন, "কেয়সে কাটোঙ্গী রয়ন, সো পিয়া বিনা।"

গান থামিলে পাঠান কহিল, "বাঃ কী চমৎকার আওয়াজ।"

বসন্ত রায় কহিলেন, "তবে বোধ করি নিস্তব্ধ রাত্রে, খোলা মাঠে সকলের আওয়াজই মিঠা লাগে। কারণ, গলা অনেক সাধিয়াছি বটে কিন্তু লোকে আমার আওয়াজের তো বড়ো প্রশংসা করে না। তবে কী না, বিধাতা যতগুলি রোগ দিয়াছেন তাহার সকলগুলিরই একটি না একটি ঔষধ দিয়াছেন, তেমনি যতগুলি গলা দিয়াছেন তাহার একটি না একটি শ্রোতা আছেই। আমার গলাও ভালো লাগে এমন-দুটো অর্বাচীন আছে। নইলে এতদিনে সাহেব, এ গলার দোকানপাট বন্ধ করিতাম; সেই দুটো আনাড়ি খরিদ্দার আছে, মাল চিনে না, তাহাদেরই কাছ হইতে বাহবা মিলে। অনেকদিন দুটাকে দেখি নাই, গীতগানও বন্ধ আছে; তাই ছুটিয়া চলিয়াছি। মনের সাধে গান শুনাইয়া, প্রাণের বোঝা নামাইয়া বাড়ি ফিরিব।" বৃদ্ধের ক্ষীণজ্যোতি চোখদুটি স্নেহে ও আনন্দে দীপ্যমান হইয়া উঠিল।

পাঠান মনে মনে কহিল, তোমার একটা সাধ মিটিয়াছে, গান শুনানো হইয়াছে,

এখন প্রাণের বোঝাটা আমিই নামাইব কি? তোবা, তোবা, এমন কাজও করে! কাফেরকে মারিলে পুণ্য আছে বটে কিন্তু সে পুণ্য এত উপার্জন করিয়াছি যে পরকালের বিষয়ে আর বড়ো ভাবনা নাই, কিন্তু ইহকালের সমস্তই যে-প্রকার বেবন্দোবস্ত দেখিতেছি, তাহাতে এই কাফেরটাকে না মারিয়া যদি তাহার একটা বিলিবন্দেজ করিয়া লইতে পারি তাহাতে আপত্তি দেখিতেছি না।

বসন্ত রায় কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া আর থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার কল্পনা উত্তেজিত হইয়া উঠিল— পাঠানের নিকটবর্তী হইয়া অতি চুপি চুপি কহিলেন, "কাহাদের কথা বলিতেছিলাম, সাহেব, জান? তাহারা আমার নাতি ও নাতনী।" বলিতে বলিতে অধীর হইয়া উঠিলেন, ভাবিলেন— আমার অনুচরেরা কখন ফিরিয়া আসিবে? আবার সেতার লইয়া গান আরম্ভ করিলেন।

এক জন অশ্বারোহী পুরুষ নিকটে আসিয়া কহিল, "আঃ বাঁচিলাম। দাদামহাশয় পথের ধারে এত রাত্রে কাহাকে গান শুনাইতেছ?"

আনন্দে ও বিস্ময়ে বসন্ত রায় তৎক্ষণাৎ তাঁহার সেতার শিবিকা-উপরে রাখিয়া উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া নামাইলেন ও তাঁহাকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "খবর কী দাদা? দিদি ভালো আছে তো?"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "সমস্তই মঙ্গল।"

তখন বৃদ্ধ হাসিতে হাসিতে সেতার তুলিয়া লইলেন ও পা দিয়া তাল রাখিয়া মাথা নাড়িয়া গান আরম্ভ করিয়া দিলেন।—

"বঁধুয়া অসময়ে কেন হে প্রকাশ?
সকলি যে স্বপ্ন বলে হতেছে বিশ্বাস।
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে ছিলে, সেথায় তো আদর মিলে?
এরি মধ্যে মিটিল কি প্রণয়েরি আশ?
এখনো তো রয়েছে রাত, এখনো তো হয় নি প্রভাত,
এখনো এ রাধিকার ফুরায় নি তো অশ্রুপাত।
চন্দ্রাবলীর কুসুমসাজ এখনি কি শুকাল আজ?
চকোর হে, মিলাল কি সে চন্দ্রমুখের মধুর হাস?"

উদয়াদিত্য পাঠানের দিকে চাহিয়া বসন্ত রায়কে কানে কানে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদামহাশয়, এ কাবুলি কোথা হইতে জুটিল?"

বসন্ত রায় তাড়াতাড়ি কহিলেন, "খাঁ সাহেব বড়ো ভালো লোক। সমজদার ব্যক্তি। আজ রাত্রি বড়ো আনন্দে কাটানো গিয়াছে।"

উদয়াদিত্যকে দেখিয়া খাঁ সাহেব মনে মনে বিশেষ চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিল, কী করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না।

উদয়াদিত্য পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চটিতে না গিয়া এখানে যে?"

পাঠান সহসা বলিয়া উঠিল, "হুজুর, আশ্বাস পাই তো একটা কথা বলি। আমরা রাজা প্রতাপাদিত্যের প্রজা। মহারাজ আমাকে ও আমার ভাইকে আদেশ করেন যে আপনি যখন যশোহরের মুখে আসিবেন, তখন পথে আপনাকে খুন করা হয়।"

বসন্ত রায় চমকিয়া কহিয়া উঠিলেন, "রাম রাম রাম।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "বলিয়া যাও।"

পাঠান। আমরা কখনো এমন কাজ করি নাই, সুতরাং আপত্তি করাতে তিনি আমাদিগকে নানাপ্রকার ভয় দেখান। সুতরাং বাধ্য হইয়া এই কাজের উদ্দেশে যাত্রা করিতে হইল। পথের মধ্যে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমার ভাই গ্রামে ডাকাত পড়িয়াছে বলিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া আপনার অনুচরদের লইয়া গেলেন। আমার উপর এই কাজের ভার ছিল। কিন্তু মহারাজ, যদিও রাজার আদেশ, তথাপি এমন কাজে আমার কোনোমতেই প্রবৃত্তি হইল না। কারণ, আমাদের কবি বলেন, রাজার আদেশে প্রভুর আদেশে সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস করিতে পার। কিন্তু সাবধান, স্বর্গের এক কোণও ধ্বংস করিয়ো না। এখন গরিব, মহারাজের শরণাপন্ন হইল। দেশে ফিরিয়া গেলে আমার সর্বনাশ হইবে। আপনি রক্ষা না করিলে আমার আর উপায় নাই।" বলিয়া জোড়হাত করিয়া দাঁড়াইল।

বসন্ত রায় অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে পাঠানকে কহিলেন, "তোমাকে একটি পত্র দিতেছি তুমি রায়গড়ে চলিয়া যাও। আমি সেখানে ফিরিয়া গিয়া তোমার একটা সুবিধা করিয়া দিব।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "দাদামহাশয়, আবার যশোহরে যাইবে নাকি?"

বসন্ত রায় কহিলেন, "হাঁ ভাই।"

উদয়াদিত্য অবাক হইয়া কহিলেন, "সে কী কথা।"

বসন্ত রায়। প্রতাপ আমার তো আর কেহ নয়, সহস্র অপরাধ করুক, সে আমার নিতান্তই স্নেহভাজন। আমার নিজের কোনো হানি হইবে বলিয়া ভয় করি না। আমি তো ভাই, ভবসমুদ্রের কূলে দাঁড়াইয়া; একটা ঢেউ লাগিলেই আমার সমস্ত ফুরাইল। কিন্তু এই পাপকার্য করিলে প্রতাপের ইহকালের ও পরকালের যে হানি হইত, তাহা ভাবিয়া আমি কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি? তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া একবার সমস্ত বুঝাইয়া বলি।"

বলিতে বলিতে বসন্ত রায়ের চোখে জল আসিল। উদয়াদিত্য দুই হস্তে চক্ষু আচ্ছাদন করিলেন।

এমন সময় কোলাহল করিতে করিতে বসন্ত রায়ের অনুচরগণ ফিরিয়া আসিল।

"মহারাজ কোথায়? মহারাজ কোথায়?"

"এইখানেই আছি বাপু, আর কোথায় যাইব?"

সকলে সমস্বরে বলিল, "সে নেড়ে বেটা কোথায়।"

বসন্ত রায় বিব্রত হইয়া মাঝে পড়িয়া কহিলেন, "হাঁ হাঁ বাপু, তোমরা খাঁ সাহেবকে কিছু বলিয়ো না।"

প্রথম। আজ মহারাজ, বড়ো কষ্ট পাইয়াছি, আজ সে—

দ্বিতীয়। তুই থাম্ না রে; আমি সমস্ত ভালো করিয়া গুছাইয়া বলি। সে পাঠান বেটা আমাদের বরাবর সোজা লইয়া গিয়া অবশেষে বাঁ-হাতি একটা আম বাগানের মধ্যে—

তৃতীয়। না রে সেটা বাবলা বন।

চতুর্থ। সেটা বাঁ-হাতি নয় সেটা ডান-হাতি।

দ্বিতীয়। দূর খেপা, সেটা বাঁ হাতি।

চতুর্থ। তোর কথাতেই সেটা বাঁ-হাতি?

দ্বিতীয়। বাঁ-হাতি যদি না হইবে তবে সে পুকুরটা—

উদয়াদিত্য। হাঁ বাপু, সেটা বাঁ-হাতি বলিয়া বোধ হইতেছে, তার পরে বলিয়া যাও।

দ্বিতীয়। আজ্ঞা হাঁ। সেই বাঁ-হাতি আমবাগানের মধ্য দিয়া একটা মাঠে লইয়া গেল। কত চষা মাঠ জমি জলা বাঁশঝাড় পার হইয়া গেলাম, কিন্তু গাঁয়ের নামগন্ধও পাইলাম না। এমনি করিয়া তিন ঘণ্টা ঘুরিয়া গাঁয়ের কাছাকাছি হইতেই সে বেটা যে কোথায় পালাইল খোঁজ পাইলাম না।

প্রথম। সে বেটাকে দেখিয়াই আমার ভালো ঠেকে নাই।

দ্বিতীয়। আমিও মনে করিয়াছিলাম এইরকম একটা কিছু হইবেই।

তৃতীয়। যখনই দেখিয়াছি নেড়ে, তখনই আমার সন্দেহ হইয়াছে।

অবশেষে সকলেই ব্যক্ত করিল যে তাহারা পূর্ব হইতেই সমস্ত বুঝিতে পারিয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "দেখো দেখি মন্ত্রী, সে পাঠান দুটা এখনও আসিল না।"

মন্ত্রী ধীরে ধীরে কহিলেন, "সেটা তো আর আমার দোষ নয় মহারাজ।"

প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "দোষের কথা হইতেছে না। দেরি যে হইতেছে তাহার তো একটা কারণ আছে? তুমি কী অনুমান কর, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

মন্ত্রী। শিমুলতলি এখান হইতে বিস্তর দূর। যাইতে, কাজ সমাধা করিতে ও ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইবার কথা।

প্রতাপাদিত্য মন্ত্রীর কথায় অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি চান, তিনিও যাহা অনুমান করিতেছেন, মন্ত্রীও তাহাই অনুমান করেন। কিন্তু মন্ত্রী সেদিক দিয়া গেলেন না।

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "উদয়াদিত্য কাল রাত্রে বাহির হইয়া গেছে?"

মন্ত্রী। আজ্ঞা হাঁ, সে তো পূর্বেই জানাইয়াছি।

প্রতাপাদিত্য। পূর্বেই জানাইয়াছি! কী উপযুক্ত সময়েই জানাইয়াছ! যে সময়ে হউক জানাইলেই বুঝি তোমার কাজ শেষ হইল? উদয়াদিত্য তো পূর্বে এমনতরো ছিল না। শ্রীপুরের জমিদারের মেয়ে বোধ করি তাহাকে কুপরামর্শ দিয়া থাকিবে। কী বোধ হয়?

মন্ত্রী। কেমন করিয়া বলিব মহারাজ?

প্রতাপাদিত্য বলিয়া উঠিলেন, "তোমার কাছে কি আমি বেদবাক্য শুনিতে চাহিতেছি? তুমি কী আন্দাজ কর, তাই বলো না!"

মন্ত্রী। আপনি মহিষীর কাছে বধূমাতা ঠাকুরানীর কথা সমস্তই শুনিতে পান, এ-বিষয়ে আপনিই অনুমান করিতে পারেন, আমি কেমন করিয়া অনুমান করিব?

এক জন পাঠান গৃহে প্রবেশ করিল।

প্রতাপাদিত্য বলিয়া উঠিলেন, "কী হইল? কাজ নিকাশ করিয়াছ?"

পাঠান। হাঁ, মহারাজ, এতক্ষণে নিকাশ হইয়া গেছে।

প্রতাপাদিত্য। সে কী রকম কথা? তবে তুমি জান না?

পাঠান। আজ্ঞা হাঁ, জানি। কাজ নিকাশ হইয়াছে, তাহাতে আর ভুল নাই, তবে আমি সে সময়ে উপস্থিত ছিলাম না।

প্রতাপাদিত্য। তবে কী করিয়া কাজ নিকাশ হইল?

পাঠান। আপনার পরামর্শ মতে আমি তাঁহার লোকজনদের তফাত করিয়াই চলিয়া আসিতেছি, হোসেন খাঁ কাজ শেষ করিয়াছে।

প্রতাপাদিত্য। যদি না করিয়া থাকে?

পাঠান। মহারাজ, আমার শির জামিন রাখিলাম।

প্রতাপাদিত্য। আচ্ছা, ওইখানে হাজির থাকো। তোমার ভাই ফিরিয়া আসিলে পুরস্কার মিলিবে।

পাঠান দূরে দ্বারের নিকট প্রহরীদের জিম্মায় দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রতাপাদিত্য অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মন্ত্রীকে ধীরে ধীরে কহিলেন, "এটা যাহাতে প্রজারা কোনোমতে না জানিতে পায় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।"

মন্ত্রী কহিলেন, "মহারাজ, অসন্তুষ্ট না হন যদি তো বলি ইহা প্রকাশ হইবেই।"

প্রতাপাদিত্য। কিসে তুমি জানিতে পারিলে?

মন্ত্রী। ইতিপূর্বে আপনি প্রকাশ্যভাবে আপনার পিতৃব্যের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করিয়াছেন। আপনার কন্যার বিবাহের সময় আপনি বসন্ত রায়কে নিমন্ত্রণ করেন নাই, তিনি স্বয়ং অনিমন্ত্রিত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। আজ আপনি সহসা বিনা কারণে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন ও পথের মধ্যে কে তাঁহাকে হত্যা করিল। এমন অবস্থায় প্রজারা আপনাকেই এই ঘটনাটির মূল বলিয়া জানিবে।

প্রতাপাদিত্য রুষ্ট হইয়া কহিলেন, "তোমার ভাব আমি কিছুই বুঝিতে পারি না মন্ত্রী। এই কথাটা প্রকাশ হইলেই তুমি যেন খুশি হও, আমার নিন্দা রটিলেই তোমার যেন মনস্কামনা পূর্ণ হয়। নহিলে দিনরাত্রি তুমি কেন বলিতেছ যে, কথাটা প্রকাশ হইবেই। প্রকাশ হইবার আমি তো কোনো কারণ দেখিতেছি না। বোধ করি, আর কিছুতেই সংবাদটা রাষ্ট্র না হইলে তুমি নিজে গিয়া দ্বারে দ্বারে প্রকাশ করিয়া বেড়াইবে!"

মন্ত্রী কহিলেন, "মহারাজ, মার্জনা করিবেন। আপনি আমার অপেক্ষা সকল বিষয়েই অনেক ভালো বুঝেন। আপনাকে মন্ত্রণা দেওয়া আমাদের মতো ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোকের পক্ষে অত্যন্ত স্পর্ধার বিষয়। তবে আপনি না কি আমাকে বাছিয়া মন্ত্রী রাখিয়াছেন, এই সাহসেই ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা মনে হয় আপনাকে মাঝে মাঝে বলিয়া থাকি। মন্ত্রণায় রুষ্ট হন যদি তবে এ দাসকে এ কার্যভার হইতে অব্যাহতি দিন।"

প্রতাপাদিত্য সিধা হইলেন। মাঝে মাঝে মন্ত্রী যখন তাঁহাকে দুই একটা শক্ত কথা শুনাইয়া দেন, তখন প্রতাপাদিত্য মনে মনে সন্তুষ্ট হন।

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "আমি বিবেচনা করিতেছি, ওই পাঠান দুটাকে মারিয়া ফেলিলে এ-বিষয়ে আর কোনো ভয়ের কারণ থাকিবে না।"

মন্ত্রী কহিলেন, "একটা খুন চাপিয়া রাখাই দায়, তিনটা খুন সামলানো অসম্ভব। প্রজারা জানিতে পারিবেই।" মন্ত্রী বরাবর নিজের কথা বজায় রাখিলেন।

প্রতাপাদিত্য বলিয়া উঠিলেন, "তবে তো আমি ভয়ে সারা হইলাম! প্রজারা জানিতে পারিবে! যশোহর রায়গড় নহে; এখানে প্রজাদের রাজত্ব নাই। এখানে রাজা ছাড়া আর বাকি সকলেই রাজা নহে। অতএব আমাকে তুমি প্রজার ভয় দেখাইয়ো না। যদি কোনো প্রজা এ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে কোনো কথা কহে, তবে তাহার জিহ্বা তপ্ত লৌহ দিয়া পুড়াইব।"

মন্ত্রী মনে মনে হাসিলেন। মনে মনে কহিলেন— প্রজার জিহ্বাকে এত ভয়! তথাপি মনকে প্রবোধ দিয়া থাকেন যে, কোনো প্রজাকে ডরাই না!

প্রতাপাদিত্য। শ্রাদ্ধশান্তি শেষ করিয়া লোকজন লইয়া একবার রায়গড়ে যাইতে হইবে। আমি ছাড়া সেখানকার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী আর তো কাহাকেও দেখিতেছি না।

বৃদ্ধ বসন্ত রায় ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন— প্রতাপাদিত্য চমকিয়া পিছু হটিয়া গেলেন। সহসা তাঁহার মনে হইল, বুঝি উপদেবতা। অবাক হইয়া একটি কথাও বলিতে পারিলেন না। বসন্ত রায় নিকটে গিয়া তাঁহার গায়ে হাত বুলাইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "আমাকে কিসের ভয় প্রতাপ? আমি তোমার পিতৃব্য। তাহাতেও যদি বিশ্বাস না হয়, আমি বৃদ্ধ, তোমার অনিষ্ট করিতে পারি এমন শক্তি আমার নাই।"

প্রতাপাদিত্যের চৈতন্য হইয়াছে, কিন্তু কথা বানাইয়া বলিতে তিনি নিতান্ত অপটু। নিরুত্তর হইয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। পিতৃব্যকে প্রণাম করা পর্যন্ত হইল না।

বসন্ত রায় আবার ধীরে ধীরে কহিলেন, "প্রতাপ, একটা যাহা হয় কথা কও। যদি দৈবাৎ এমন একটা কাজ করিয়া থাক, যাহাতে আমাকে দেখিয়া তোমার লজ্জা ও সংকোচ উপস্থিত হয়, তবে তাহার জন্য ভাবিয়ো না। আমি কোনো কথা উত্থাপন করিব না। এসো বৎস, দুই জনে একবার কোলাকুলি করি। আজ অনেকদিনের পর দেখা হইয়াছে; আর তো অধিক দিন দেখা হইবে না।"

এতক্ষণের পর প্রতাপাদিত্য প্রণাম করিলেন ও উঠিয়া পিতৃব্যের সহিত কোলাকুলি করিলেন। ইতিমধ্যে মন্ত্রী আস্তে আস্তে গৃহ হইতে বাহির হইয়া

গেছেন। বসন্ত রায় ঈষৎ কোমল হাস্য হাসিয়া প্রতাপাদিত্যের গায়ে হাত দিয়া কহিলেন, "বসন্ত রায় অনেকদিন বাঁচিয়া আছে— না প্রতাপ? সময় হইয়া আসিয়াছে, এখনও যে কেন ডাক পড়িল না বিধাতা জানেন। কিন্তু আর অধিক বিলম্ব নাই।"

বসন্ত রায় কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, প্রতাপাদিত্য কোনো উত্তর করিলেন না। বসন্ত রায় আবার কহিলেন, "তবে স্পষ্ট করিয়া সমস্ত বলি। তুমি যে আমাকে ছুরি তুলিয়াছ, তাহাতে আমাকে ছুরির অপেক্ষা অধিক বাজিয়াছে। (বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষে জল আসিল।) কিন্তু আমি কিছুমাত্র রাগ করি নাই। আমি কেবল তোমাকে দুটি কথা বলিব। আমাকে বধ করিয়ো না প্রতাপ! তাহাতে তোমার ইহকাল পরকালের ভালো হইবে না। এতদিন পর্যন্ত যদি আমার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারিলে, তবে আর দুটা দিন পারিবে না? এইটুকুর জন্য পাপের ভাগী হইবে?"

বসন্ত রায় দেখিলেন, প্রতাপাদিত্য কোনো উত্তর দিলেন না। দোষ অস্বীকার করিলেন না, বা অনুতাপের কথা কহিলেন না। তৎক্ষণাৎ তিনি অন্য কথা পাড়িলেন, কহিলেন, "প্রতাপ, একবার রায়গড়ে চলো। অনেকদিন সেখানে যাও নাই। অনেক পরিবর্তন দেখিবে। সৈন্যেরা এখন তলোয়ার ছাড়িয়া লাঙল ধরিয়াছে; যেখানে সৈন্যদের বাসস্থান ছিল সেখানে অতিথিশালা—"

এমন সময়ে প্রতাপাদিত্য দূর হইতে দেখিলেন, পাঠানটা পালাইবার উদ্‌যোগ করিতেছে। আর থাকিতে পারিলেন না। মনের মধ্যে যে নিরুদ্ধ রোষ ফুটিতেছিল, তাহা অগ্নি-উৎসের ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বজ্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "খবরদার উহাকে ছাড়িস না। পাকড়া করিয়া রাখ্।" বলিয়া ঘর হইতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।

রাজা মন্ত্রীকে ডাকাইয়া কহিলেন, "রাজকার্যে তোমার অত্যন্ত অমনোযোগ লক্ষিত হইতেছে।"

মন্ত্রী আস্তে আস্তে কহিলেন, "মহারাজ, এ-বিষয়ে আমার কোনো দোষ নাই।"

প্রতাপাদিত্য তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আমি কি কোনো বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি? আমি বলিতেছি, রাজকার্যে তোমার অত্যন্ত অমনোযোগ লক্ষিত হইতেছে। সেদিন তোমার কাছে এক চিঠি রাখিতে দিলাম, তুমি হারাইয়া ফেলিলে।"

দেড় মাস পূর্বে এইরূপ একটা ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু তখন মহারাজ মন্ত্রীকে একটি কথাও বলেন নাই।

"আর-একদিন উমেশ রায়ের নিকট তোমাকে যাইতে আদেশ করিলাম, তুমি লোক পাঠাইয়া কাজ সারিলে। চুপ করো। দোষ কাটাইবার জন্য মিছামিছি চেষ্টা করিয়ো না। যাহা হউক তোমাকে জানাইয়া রাখিলাম, রাজকার্যে তুমি কিছুমাত্র মনোযোগ দিতেছ না।"

রাজা প্রহরীদের ডাকাইলেন। পূর্বে রাত্রের প্রহরীদের বেতন কাটিয়াছিলেন, এখন তাহাদের প্রতি কারাবাসের আদেশ হইল।

অন্তঃপুরে গিয়া মহিষীকে ডাকাইয়া কহিলেন, "মহিষী, রাজপরিবারের মধ্যে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা দেখিতেছি। উদয়াদিত্য পূর্বে তো এমন ছিল না। এখন সে যখন-তখন বাহির হইয়া যায়। প্রজাদের কাজে যোগ দেয়। আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করে। এ সকলের অর্থ কী?"

মহিষী ভীতা হইয়া কহিলেন, "মহারাজ, তাহার কোনো দোষ নাই। এ সমস্ত অনর্থের মূল ওই বড়োবউ। বাছা আমার তো আগে এমন ছিল না। যেদিন হইতে শ্রীপুরের ঘরে তাহার বিয়ে হইল, সেই দিন হইতে উদয় কেমন যে হইল কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।"

মহারাজ সুরমাকে শাসনে রাখিতে আদেশ করিয়া বাহিরে গেলেন। মহিষী উদয়াদিত্যকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। উদয়াদিত্য আসিলে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আহা, বাছা আমার রোগা কালো হইয়া গিয়াছে। বিয়ের আগে বাছার রং কেমন ছিল। যেন তপ্ত সোনার মতো। তোর এমন দশা কে করিল? বাবা, বড়োবউ তোকে যা বলে তা শুনিস না। তার কথা শুনিয়াই তোর এমন দশা হইয়াছে।" সুরমা ঘোমটা দিয়া চুপ করিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া ছিল। মহিষী বলিতে লাগিলেন, "ওর ছোটো বংশে জন্ম, ও কি তোর যোগ্য? ও কি তোকে পরামর্শ দিতে জানে? আমি যথার্থ কথা বলিতেছি ও কখনো তোকে ভালো পরামর্শ দেয় না, তোর মন্দ হইলেই ও যেন বাঁচে। এমন রাক্ষসীর সঙ্গেও মহারাজ তোর বিবাহ দিয়াছিলেন।" মহিষী অশ্রুবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

উদয়াদিত্যের প্রশান্ত ললাটে ঘর্মবিন্দু দেখা দিল। তাঁহার মনের অধীরতা পাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই নিমিত্ত তাঁহার আয়ত নেত্র অন্যদিকে ফিরাইলেন।

এক জন পুরানো বৃদ্ধা দাসী বসিয়া ছিল, সে হাত নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "শ্রীপুরের মেয়েরা জাদু জানে। নিশ্চয় বাছাকে ওষুধ করিয়াছে।" এই বলিয়া, উঠিয়া উদয়াদিত্যের কাছে গিয়া বলিল, "বাবা, ও তোমাকে ওষুধ করিয়াছে। ওই যে মেয়েটি দেখিতেছ, উনি বড়ো সামান্য মেয়ে নন। শ্রীপুরের ঘরের মেয়ে। ওরা ডাইনী। আহা

বাছার শরীরে আর কিছু রাখিল না।" এই বলিয়া সে সুরমার দিকে তীরের মতো এক কটাক্ষ বর্ষণ করিল ও আঁচল দিয়া দুই হস্তে দুই শুষ্ক চক্ষু রগড়াইয়া লাল করিয়া তুলিল। তাহা দেখিয়া আবার মহিষীর দুঃখ একেবারে উথলিয়া উঠিল। অন্তঃপুরে বৃদ্ধাদের মধ্যে ক্রন্দনের সংক্রামকতা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। কাঁদিবার অভিপ্রায়ে সকলে রানীর ঘরে আসিয়া সমবেত হইল। উদয়াদিত্য করুণনেত্রে একবার সুরমার মুখের দিকে চাহিলেন। ঘোমটার মধ্য হইতে সুরমা তাহা দেখিতে পাইল ও চোখ মুছিয়া একটি কথা না কহিয়া ধীরে ধীরে ঘরে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যাবেলা মহিষী প্রতাপাদিত্যকে কহিলেন, "আজ উদয়কে সমস্ত বুঝাইয়া বলিলাম। বাছা আমার তেমন নহে। বুঝাইয়া বলিলে বুঝে। আজ তাহার চোখ ফুটিয়াছে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিভার ম্লান মুখ দেখিয়া সুরমা আর থাকিতে পারিল না, তাহার গলা ধরিয়া কহিল, "বিভা, তুই চুপ করিয়া থাকিস কেন? তোর মনে যখন যাহা হয় বলিস না কেন?"

বিভা ধীরে ধীরে কহিল, "আমার আর কী বলিবার আছে?"

সুরমা কহিল, "অনেকদিন তাঁহাকে দেখিস নাই, তোর মন কেমন করিবেই তো! তুই তাঁহাকে আসিবার জন্য একখানা চিঠি লেখ না। আমি তোর দাদাকে দিয়া পাঠাইবার সুবিধা করিয়া দিব।"

বিভার স্বামী চন্দ্রদ্বীপপতি রামচন্দ্র রায়ের সম্বন্ধে কথা হইতেছে।

বিভা ঘাড় হেঁট করিয়া কহিতে লাগিল, "এখানে কেহ যদি তাঁহাকে গ্রাহ্য না করে, কেহ যদি তাঁহাকে ডাকিবার আবশ্যক বিবেচনা না করে, তবে এখানে তিনি না আসিলেই ভালো। তিনি যদি আপনি আসেন তবে আমি বারণ করিব। তিনি রাজা, যেখানে তাঁহার আদর নাই, সেখানে তিনি কেন আসিবেন? আমাদের চেয়ে তিনি কিসে ছোটো যে, পিতা তাঁহাকে অপমান করিবেন?" বলিতে বলিতে বিভা আর সামলাইতে পারিল না, তাহার মুখখানি লাল হইয়া উঠিল ও সে কাঁদিয়া ফেলিল।

সুরমা বিভার মুখ বুকে রাখিয়া তাহার চোখের জল মুছাইয়া কহিল, 'আচ্ছা বিভা, তুই যদি পুরুষ হইতিস তো কী করিতিস? নিমন্ত্রণপত্র পাস নাই বলিয়া কি শ্বশুরবাড়ি যাইতিস না?"

বিভা বলিয়া উঠিল, "না, তাহা পারিতাম না, আমি যদি পুরুষ হইতাম তো এখনই চলিয়া যাইতাম ; মান অপমান কিছুই ভাবিতাম না। কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহাকে আদর করিয়া না ডাকিয়া আনিলে তিনি কেন আসিবেন ?"

বিভা এত কথা কখনো কহে নাই। আজ আবেগের মাথায় অনেক কথা বলিয়াছে। এতক্ষণে একটু লজ্জা করিতে লাগিল। মনে হইল, বড়ো অধিক কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। আবার, যে রকম করিয়া বলিয়াছি, বড়ো লজ্জা করিতেছে। ক্রমে তাহার মনের উত্তেজনা হ্রাস হইয়া আসিল ও মনের মধ্যে একটা গুরুভার অবসাদ আস্তে আস্তে চাপিয়া পড়িতে লাগিল। বিভা বাহুতে মুখ ঢাকিয়া সুরমার কোলে মাথা দিয়া শুইয়া পড়িল, সুরমা মাথা নত করিয়া কোমল হস্তে তাহার ঘন কেশভার পৃথক করিয়া দিতে লাগিল। এমন কতক্ষণ গেল। উভয়ের মুখে একটি কথা নাই। বিভার চোখ দিয়া এক-এক বিন্দু করিয়া জল পড়িতেছে ও সুরমা আস্তে আস্তে মুছাইয়া দিতেছে।

অনেকক্ষণ বাদে যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিল তখন বিভা ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল ও চোখের জল মুছিয়া ঈষৎ হাসিল। সে হাসির অর্থ, "আজ কী ছেলেমানুষিই করিয়াছি।" ক্রমে মুখ ফিরাইয়া সরিয়া গিয়া পালাইয়া যাইবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিল।

সুরমা কিছু না বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া রহিল। পূর্বকার কথা আর কিছু উত্থাপন না করিয়া কহিল, "বিভা শুনিয়াছিস, দাদামহাশয় আসিয়াছেন ?"

বিভা। দাদামহাশয় আসিয়াছেন ?

সুরমা। হাঁ।

বিভা আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কখন আসিয়াছেন ?"

সুরমা। প্রায় চার প্রহর বেলার সময়।

বিভা। এখনও যে আমাদের দেখিতে আসিলেন না ?

বিভার মনে ঈষৎ অভিমানের উদয় হইল। দাদামহাশয়ের দখল লইয়া বিভা অতিশয় সতর্ক। এমন কি, একদিন বসন্ত রায় উদয়াদিত্যের সহিত অনেকক্ষণ কথোপকথন করিয়া বিভাকে অন্তঃপুরে তিন দণ্ড অপেক্ষা করাইয়াছিলেন, এক বারেই তাহার সহিত দেখা করিতে যান নাই, এই জন্য বিভার এমন কষ্ট হইয়াছিল যে, যদিও সে বিষয়ে সে কিছু বলে নাই বটে তবু প্রসন্নমুখে দাদামহাশয়ের সঙ্গে কথা কহিতে পারে নাই।

বসন্ত রায় ঘরে প্রবেশ করিয়াই হাসিতে হাসিতে গান ধরিলেন,

"আজ তোমারে দেখতে এলেম অনেক দিনের পরে।
ভয় নাইকো সুখে থাকো,
অধিক ক্ষণ থাকব নাকো
আসিয়াছি দু-দণ্ডেরি তরে।
দেখব শুধু মুখখানি
শুনব দুটি মধুর বাণী
আড়াল থেকে হাসি দেখে চলে যাব দেশান্তরে।"

গান শুনিয়া বিভা মুখ নত করিয়া হাসিল। তাহার বড়ো আহ্লাদ হইয়াছে। অতটা আহ্লাদ পাছে ধরা পড়ে বলিয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে।

সুরমা বিভার মুখ তুলিয়া ধরিয়া কহিল, "দাদামহাশয়, বিভার হাসি দেখিবার জন্য তো আড়ালে যাইতে হইল না।"

বসন্ত রায়। না, বিভা মনে করিল, নিতান্তই না হাসিলে যদি বুড়া বিদায় না হয়, তবে না হয় একটু হাসি। ও ডাকিনীর মতলব আমি বেশ বুঝি, আমাকে তাড়াইবার ফন্দি। কিন্তু শীঘ্র তাহা হইতেছে না। আসিলাম যদি তো ভালো করিয়া জ্বালাইয়া যাইব, আবার যতদিন না দেখা হয় মনে থাকিবে।"

সুরমা হাসিয়া কহিল, "দেখো দাদামহাশয়, বিভা আমার কানে কানে বলিল যে, মনে রাখানোই যদি অভিপ্রায় হয়, তবে যা জ্বালাইয়াছ তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে, আর নূতন করিয়া জ্বালাইতে হইবে না।"

কথাটা শুনিয়া বসন্ত রায়ের বড়োই আমোদ বোধ হইল। তিনি হাসিতে লাগিলেন।

বিভা অপ্রতিভ হইয়া উঠিল, "না, আমি কখনো ও-কথা বলি নাই। আমি কোনো কথাই কই নাই।"

সুরমা কহিল, "দাদামহাশয়, তোমার মনস্কামনা তো পূর্ণ হইল! তুমি হাসি দেখিতে চাহিলে তাহা দেখিলে, কথা শুনিতে চাহিয়াছিলে তাহাও শুনাইলাম, তবে এখন দেশান্তরে যাও।"

বসন্ত রায়। না ভাই, তাহা পারিলাম না। আমি গোটা-পনেরো গান ও একমাথা পাকা চুল আনিয়াছি, সেগুলি সমস্ত নিকাশ না করিয়া যাইতে পারিতেছি না।

বিভা আর থাকিতে পারিল না, হাসিয়া উঠিল, কহিল, "তোমার আধমাথা বই চুল নাই যে দাদামহাশয়।"

দাদামহাশয়ের অভিসন্ধি সিদ্ধ হইল। অনেকদিনের পর প্রথম আলাপে বিভার মুখ খুলিতে কিছু আয়োজনের আবশ্যক করে, কিন্তু দাদামহাশয়ের কাছে বিভার মুখ একবার খুলিলে তাহা বন্ধ করিতে আবার ততোধিক আয়োজনের আবশ্যক হয়। কিন্তু দাদামহাশয় ব্যতীত আর কাহারও কাছে কোনো অবস্থাতেই বিভার মুখ খুলে না।

বসন্ত রায় টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "সে একদিন গিয়াছে রে ভাই। যেদিন বসন্ত রায়ের মাথায় একমাথা চুল ছিল, সেদিন কি আর এত রাস্তা হাঁটিয়া তোমাদের খোশামোদ করিতে আসিতাম? একগাছি চুল পাকিলে তোমাদের মতো পাঁচটা রূপসী চুল তুলিবার জন্য উমেদার হইত ও মনের আগ্রহে দশটা কাঁচা চুল তুলিয়া ফেলিত।"

বিভা গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা দাদামহাশয়, তোমার যখন একমাথা চুল ছিল, তখন কি তোমাকে এখনকার চেয়ে ভালো দেখিতে ছিল?"

মনে মনে বিভার সে-বিষয়ে বিষম সন্দেহ ছিল। দাদামহাশয়ের টাকটি, তাঁহার গুম্ফসম্পর্কশূন্য অধরের প্রশস্ত হাসিটি, তাঁহার পাকা আম্রের ন্যায় ভাবটি, সে মনে মনে পরিবর্তন করিতে চেষ্টা করিল, কোনোমতেই ভালো ঠেকিল না। সে দেখিল, সে টাকটি না দিলে তাহার দাদামহাশয়কে কিছুতে মানায় না। আর গোঁফ জুড়িয়া দিলে দাদামহাশয়ের মুখখানি একেবারে খারাপ দেখিতে হইয়া যায়। এত খারাপ হইয়া যায় যে, সে তাহা কল্পনা করিলে হাসি রাখিতে পারে না। দাদামহাশয়ের আবার গোঁফ! দাদামহাশয়ের আবার টাক নাই!

বসন্ত রায় কহিলেন, "সে-বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। আমার নাতনীরা আমার টাক দেখিয়া মোহিত হয়, তাহারা আমার চুল দেখে নাই। আমার দিদিমায়া আমার চুল দেখিয়া মোহিত হইতেন, তাঁহারা আমার টাক দেখেন নাই। যাহারা উভয়ই দেখিয়াছে, তাহারা এখনও একটা মত স্থির করিতে পারে নাই।"

বিভা কহিল, "কিন্তু তা বলিয়া দাদামহাশয়, যতটা টাক পড়িয়াছে তাহার অধিক পড়িলে আর ভালো দেখাইবে না।"

সুরমা কহিল, "দাদামহাশয়, টাকের আলোচনা পরে হইবে। এখন বিভার একটা যাহা হয় উপায় করিয়া দাও।"

বিভা তাড়াতাড়ি বসন্ত রায়ের কাছে গিয়া বলিয়া উঠিল, "দাদামহাশয়, আমি তোমার পাকা চুল তুলিয়া দিই।"

সুরমা। আমি বলি কি—

বিভা। শোনো না দাদামহাশয়, তোমার—

সুরমা। বিভা চুপ কর্। আমি বলি কি, তুমি গিয়ে একবার—

বিভা। দাদামহাশয়, তোমার মাথায় পাকা চুল ছাড়া যে আর কিছুই নেই, তুলে দিলে সমস্ত মাথায় টাক পড়বে।

বসন্ত রায়। আমাকে যদি কথা শুনতে না দিস দিদি, আমাকে যদি বিরক্ত করিস তবে আমি রাগ হিন্দোল আলাপ করিব।

বলিয়া তাঁহার ক্ষুদ্রায়তন সেতারটির কান মোচড়াইতে আরম্ভ করিলেন। হিন্দোল রাগের উপর বিভার বিশেষ বিদ্বেষ ছিল।

বিভা বলিল, "কী সর্বনাশ। তবে আমি পালাই।" বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তখন সুরমা গম্ভীর হইয়া কহিল, "বিভা নীরব হইয়া দিনরাত্রি যে কষ্ট প্রাণের মধ্যে বহন করে তাহা জানিতে পারিলে বোধ করি মহারাজারও মনে দয়া হয়!"

"কেন। কেন। তাহার কি হয়েছে।" বলিয়া নিতান্ত আগ্রহের সহিত বসন্ত রায় সুরমার কাছে গিয়া বসিলেন।

সুরমা কহিল, "বৎসরের মধ্যে একটি দিন ঠাকুরজামাইকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইতেও কাহারও মনে পড়ে না।"

বসন্ত রায় চিন্তা করিয়া কহিলেন, "ঠিক কথাই তো।"

সুরমা কহিল, "স্বামীর প্রতি এ অনাদর কয়জন মেয়ে সহিতে পারে বলো তো? বিভা ভালোমানুষ, তাই কাহাকেও কিছু বলে না, আপনার মনে লুকাইয়া কাঁদে।"

বসন্ত রায় ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আপনার মনে লুকাইয়া কাঁদে?"

সুরমা। আজ বিকেলে আমার কাছে কত কাঁদিতেছিল।

বসন্ত রায়। বিভা আজ বিকালে কাঁদিতেছিল?

সুরমা। হাঁ।

বসন্ত রায়। আহা, তাহাকে একবার ডাকিয়া আনো, আমি দেখি।

সুরমা বিভাকে ধরিয়া আনিল। বসন্ত রায় তাহার চিবুক ধরিয়া কহিলেন, "তুই কাঁদিস কেন দিদি? যখন তোর যা কষ্ট হয় তোর দাদামহাশয়কে বলিস না কেন? তা হলে আমি আমার যথাসাধ্য করি। আমি এখনই যাই, প্রতাপকে বলিয়া আসি গে।"

বিভা বলিয়া উঠিল, "দাদামহাশয়, তোমার দুটি পায়ে পড়ি আমার বিষয়ে বাবাকে কিছু বলিয়ো না। দাদামহাশয়, তোমার পায়ে পড়ি যাইয়ো না।"

বলিতে বলিতে, বসন্ত রায় বাহির হইয়া গেলেন ; প্রতাপাদিত্যকে গিয়া বলিলেন, "তোমার জামাতাকে অনেকদিন নিমন্ত্রণ কর নাই ইহাতে তাহার প্রতি নিতান্ত অবহেলা প্রকাশ করা হইতেছে। যশোহরপতির জামাতাকে যতখানি সমাদর করা উচিত, ততখানি সমাদর যদি তাহাকে না করা হয়, তবে তাহাতে তোমারই অপমান। তাহাতে গৌরবের কথা কিছুই নাই।"

প্রতাপাদিত্য পিতৃব্যের কথায় কিছুমাত্র দ্বিরুক্তি করিলেন না। লোকসহ নিমন্ত্রণপত্র চন্দ্রদ্বীপে পাঠাইবার হুকুম হইল।

অন্তঃপুরে বিভা ও সুরমার কাছে আসিয়া বসন্ত রায়ের সেতার বাজাইবার ধূম পড়িয়া গেল।

"মলিন মুখে ফুটুক হাসি জুড়াক দু-নয়ন।"

বিভা লজ্জিত হইয়া কহিল, "দাদামহাশয়, বাবার কাছে আমার কথা সমস্ত বলিয়াছ?" বসন্ত রায় গান গাহিতে লাগিলেন,

"মলিন মুখে ফুটুক হাসি, জুড়াক দু-নয়ন।
মলিন বসন ছাড়ো সখী, পরো আভরণ।"

বিভা সেতারের তারে হাত দিয়া সেতার বন্ধ করিয়া আবার কহিল, "বাবার কাছে আমার কথা বলিয়াছ?"

এমন সময়ে উদয়াদিত্যের কনিষ্ঠ অষ্টমবর্ষীয় সমরাদিত্য ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া বলিয়া উঠিল, "অ্যাঁ! দিদি। দাদামহাশয়ের সহিত গল্প করিতেছ! আমি মাকে বলিয়া দিয়া আসিতেছি।"

"এস, এস, ভাই এস।" বলিয়া বসন্ত রায় তাহাকে পাকড়া করিলেন।

রাজপরিবারের বিশ্বাস এই যে, বসন্ত রায় ও সুরমায় মিলিয়া উদয়াদিত্যের সর্বনাশ করিয়াছে। এই নিমিত্ত বসন্ত রায় আসিলে সামাল সামাল পড়িয়া যায়। সমরাদিত্য বসন্ত রায়ের হাত ছাড়াইবার জন্য টানাহেঁচড়া আরম্ভ করিল। বসন্ত রায় তাহাকে সেতার দিয়া, তাহাকে কাঁধে চড়াইয়া, তাহাকে চশমা পরাইয়া, দুই দণ্ডের মধ্যে এমনি বশ করিয়া লইলেন যে, সে সমস্ত দিন দাদামহাশয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতে লাগিল ও অনবরত সেতার বাজাইয়া তাঁহার সেতারের পাঁচটা তার ছিঁড়িয়া দিল ও মেজরাপ কাড়িয়া লইয়া আর দিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র রায় তাঁহার রাজকক্ষে বসিয়া আছেন। ঘরটি অষ্টকোণ। কড়ি হইতে কাপড়ে মোড়া ঝাড় ঝুলিতেছে। দেয়ালের কুলঙ্গির মধ্যে একটাতে গণেশের ও বাকিগুলিতে শ্রীকৃষ্ণের নানা অবস্থার প্রতিমূর্তি স্থাপিত। সেগুলি বিখ্যাত কারিকর বটকৃষ্ণ কুম্ভকারের স্বহস্তে গঠিত। চারিদিকে চাদর পড়িয়াছে, মধ্যস্থলে জরিখচিত মছলন্দের গদি, তাহার উপর একটি রাজা ও একটা তাকিয়া। তাহার চারি কোণে জরির ঝালর। দেয়ালের চারিদিকে দেশী আয়না ঝুলানো, তাহাতে মুখ ঠিক দেখা যায় না। রাজার চারিদিকে যে-সকল মনুষ্য-আয়না আছে, তাহাতেও তিনি মুখ ঠিক দেখিতে পান না, শরীরের পরিমাণ অত্যন্ত বড়ো দেখায়। রাজার বাম পার্শ্বে এক প্রকাণ্ড আলবোলা ও মন্ত্রী হরিশংকর। রাজার দক্ষিণে রমাই ভাঁড় ও চশমাপরা সেনাপতি ফর্নাণ্ডিজ।

রাজা বলিলেন, "ওহে রমাই!"

রমাই বলিল, "আজ্ঞা, মহারাজ।"

রাজা হাসিয়া আকুল। মন্ত্রী রাজার অপেক্ষা অধিক হাসিলেন। ফর্নাণ্ডিজ হাততালি দিয়া হাসিয়া উঠিল। সন্তোষে রমাইয়ের চোখ মিটমিট করিতে লাগিল। রাজা ভাবেন, রমাইয়ের কথায় না হাসিলে অরসিকতা প্রকাশ পায়; মন্ত্রী ভাবেন, রাজা হাসিলে হাসা কর্তব্য; ফর্নাণ্ডিজ ভাবে, অবশ্য হাসিবার কিছু আছে। তাহা ছাড়া, যে দুর্ভাগ্য রমাই ঠোঁট খুলিলে দৈবাৎ না হাসে, রমাই তাহাকে কাঁদাইয়া ছাড়ে। নহিলে রমাইয়ের মান্ধাতার সমবয়স্ক ঠাট্টাগুলি শুনিয়া অল্প লোকই আমোদে হাসে। তবে ভয়ে ও কর্তব্যজ্ঞানে সকলেরই বিষম হাসি পায়, রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বারী পর্যন্ত।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "খবর কী হে?"

রমাই ভাবিল রসিকতা করা আবশ্যক।

"পরম্পরায় শুনা গেল সেনাপতি মহাশয়ের ঘরে চোর পড়িয়াছিল।"

সেনাপতি মহাশয় অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি বুঝিলেন একটা পুরাতন গল্প তাঁহার উপর দিয়া চালাইবার চেষ্টা হইতেছে। তিনি রমাইয়ের রসিকতার ভয়ে যেমন কাতর, রমাই প্রতিবারে তেমনি তাঁহাকেই চাপিয়া ধরে। রাজার বড়োই আমোদ। রমাই আসিলেই ফর্নাণ্ডিজকে ডাকিয়া পাঠান। রাজার জীবনে দুইটি

প্রধান আমোদ আছে; এক ভেড়ার লড়াই দেখা, আর রমাইয়ের মুখের সামনে ফর্নাণ্ডিজকে স্থাপন করা; রাজকার্যে প্রবেশ করিয়া অবধি সেনাপতির গায়ে একটা ছিটাগুলি বা তীরের আঁচড় লাগে নাই। অনবরত হাস্যের গোলাগুলি খাইয়া সে ব্যক্তি কাঁদো কাঁদো হইয়া আসিয়াছে। পাঠকেরা মার্জনা করিবেন, আমরা রমাইয়ের সকল রসিকতাগুলি লিপিবদ্ধ করিতে পারিব না, সুরুচির অনুরোধে অধিকাংশ স্থলই পরিত্যাগ করিতে হইবে।

রাজা চোখ টিপিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার পরে?"

"নিবেদন করি মহারাজ। (ফর্নাণ্ডিজ তাঁহার কোর্তার বোতাম খুলিতে লাগিলেন ও পরিতে লাগিলেন।) আজ দিন তিন-চার ধরিয়া সেনাপতি মহাশয়ের ঘরে রাত্রে চোর আনাগোনা করিতেছিল। সাহেবের ব্রাহ্মণী জানিতে পারিয়া কর্তাকে অনেক ঠেলাঠেলি করেন, কিন্তু কোনোমতেই কর্তার ঘুম ভাঙাইতে পারেন নাই।"

রাজা। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

মন্ত্রী। হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ।

সেনাপতি। হিঃ হিঃ।

"দিনের বেলা গৃহিণীর নিগ্রহ আর সহিতে না পারিয়া জোড়হস্তে কহিলেন, 'দোহাই তোমার, আজ রাত্রে চোর ধরিব।' রাত্রি দুই দণ্ডের সময় গৃহিণী বলিলেন, 'ওগো চোর আসিয়াছে।' কর্তা বলিলেন, 'ওই যাঃ ঘরে যে আলো জ্বলিতেছে। চোর যে আমাদের দেখিতে পাইবে ও দেখিতে পাইলেই পলাইবে।' চোরকে ডাকিয়া কহিলেন, 'আজ তুই বড়ো বাঁচিয়া গেলি। ঘরে আলো আছে, আজ নিরাপদে পালাইতে পারিবি, কাল আসিস দেখি, অন্ধকারে কেমন না ধরা পড়িস।"

রাজা। হা হা হা হা।

মন্ত্রী। হো হো হো হো হো।

সেনাপতি। হি।

রাজা বলিলেন, "তার পর?"

রমাই দেখিল, এখনও রাজার তৃপ্তি হয় নাই। "জানি না, কী কারণে চোরের যথেষ্ট ভয় হইল না। তাহার পররাত্রেও ঘরে আসিল। গিন্নি কহিলেন, 'সর্বনাশ হইল ওঠো।' কর্তা কহিলেন, 'তুমি ওঠো না।' গিন্নি কহিলেন, 'আমি উঠিয়া কী করিব।' কর্তা বলিলেন, 'কেন, ঘরে একটা আলো জ্বালাও না। কিছু যে দেখিতে পাই না।' গিন্নি বিষম ক্রুদ্ধ। কর্তা ততোধিক ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, 'দেখো দেখি, তোমার জন্যই তো যথাসর্বস্ব গেল। আলোটা জ্বালাও বন্দুকটা আনো।' ইতিমধ্যে

চোর কাজকর্ম সারিয়া কহিল, 'মহাশয়, এক ছিলিম তামাকু খাওয়াইতে পারেন ? বড়ো পরিশ্রম হইয়াছে।' কর্তা বিষম ধমক দিয়া কহিলেন, 'রোস্ বেটা! আমি তামাক সাজিয়া দিতেছি। কিন্তু আমার কাছে আসিবি তো এই বন্দুকে তোর মাথা উড়াইয়া দিব।' তামাক খাইয়া চোর কহিল, 'মহাশয়, আলোটা যদি জ্বালেন তো উপকার হয়। সিঁধকাঠিটা পড়িয়া গিয়াছে খুঁজিয়া পাইতেছি না।' সেনাপতি কহিলেন, 'বেটার ভয় হইয়াছে। তফাতে থাক, কাছে আসিস না।' বলিয়া তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়া দিলেন। ধীরে সুস্থে জিনিসপত্র বাঁধিয়া চোর চলিয়া গেল। কর্তা গিন্নিকে কহিলেন, 'বেটা বিষম ভয় পাইয়াছে।' "

রাজা ও মন্ত্রী হাসি সামলাইতে পারেন না। ফর্নাণ্ডিজ থাকিয়া থাকিয়া মাঝে মাঝে "হিঃ হিঃ" করিয়া টুকরা টুকরা হাসি টানিয়া টানিয়া বাহির করিতে লাগিলেন।

রাজা কহিলেন, "রমাই, শুনিয়াছ আমি শ্বশুরালয়ে যাইতেছি ?"

রমাই মুখভঙ্গী করিয়া কহিল, "অসারং খলু সংসারং সারং শ্বশুরমন্দিরং (হাস্য। প্রথমে রাজা, পরে মন্ত্রী, পরে সেনাপতি।) কথাটা মিথ্যা নহে। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) শ্বশুরমন্দিরের সকলই সার,— আহারটা, সমাদরটা ; দুধের সরটি পাওয়া যায়, মাছের মুড়োটি পাওয়া যায় ; সকলই সার পদার্থ ; কেবল সর্বাপেক্ষা অসার ওই স্ত্রীটা।"

রাজা হাসিয়া কহিলেন, "সে কী হে, তোমার অর্ধাঙ্গ—"

রমাই জোড়হস্তে ব্যাকুলভাবে কহিল, "মহারাজ, তাহাকে অর্ধাঙ্গ বলিবেন না। তিন জন্ম তপস্যা করিলে আমি বরঞ্চ একদিন তাহার অর্ধাঙ্গ হইতে পারিব, এমন ভরসা আছে। আমার মতো পাঁচটা অর্ধাঙ্গ জুড়িলেও তাহার আয়তনে কুলায় না!" (যথাক্রমে হাস্য।) কথাটার রস আর সকলেই বুঝিল, কেবল মন্ত্রী পারিলেন না, এই নিমিত্ত মন্ত্রীকে সর্বাপেক্ষা অধিক হাসিতে হইল।

রাজা কহিলেন, "আমি তো শুনিয়াছি, তোমার ব্রাহ্মণী বড়োই শান্তস্বভাবা ও ঘরকন্নায় বিশেষ পটু।"

রমাই। সে কথায় কাজ কী। ঘরে আর সকল রকম জঞ্জালই আছে, কেবল আমি তিষ্ঠিতে পারি না। প্রত্যুষে গৃহিণী এমনি ঝাঁটাইয়া দেন যে, একেবারে মহারাজের দুয়ারে আসিয়া পড়ি।

এইখানে কথাপ্রসঙ্গে রমাইয়ের ব্রাহ্মণীর পরিচয় দিই। তিনি অত্যন্ত কৃশাঙ্গী ও দিনে দিনে ক্রমেই আরও ক্ষীণ হইয়া যাইতেছেন। রমাই ঘরে আসিলে তিনি

কোথায় যে আশ্রয় লইবেন ভাবিয়া পান না। রাজসভায় রমাই একপ্রকার ভঙ্গীতে দাঁত দেখায় ও ঘরে আসিয়া গৃহিণীর কাছে আর-একপ্রকার ভঙ্গীতে দাঁত দেখায়। কিন্তু গৃহিণীর যথার্থ স্বরূপ বর্ণনা করিলে নাকি হাস্যরস না আসিয়া করুণ রস আসে, এই নিমিত্ত রাজসভায় রমাই তাহার গৃহিণীকে স্থূলকায়া ও উগ্রচণ্ডা করিয়া বর্ণনা করেন, রাজা ও মন্ত্রীরা হাসি রাখিতে পারেন না।

হাসি থামিলে পর রাজা কহিলেন, "ওহে রমাই, তোমাকে যাইতে হইবে, সেনাপতিকেও সঙ্গে লইব।"

সেনাপতি বুঝিলেন, এবার রমাই তাঁহার উপর দ্বিতীয় আক্রমণ করিবে। চশমাটা চোখে তুলিয়া পরিলেন এবং বোতাম খুলিতে ও পরিতে লাগিলেন।

রমাই কহিল, "উৎসবস্থলে যাইতে সেনাপতি মহাশয়ের কোনো আপত্তি থাকিতে পারে না, কারণ এ তো আর যুদ্ধস্থল নয়।"

রাজা ও মন্ত্রী ভাবিলেন, ভারি একটা মজার কথা আসিতেছে; আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

রমাই। সাহেবের চক্ষে দিনরাত্রি চশমা আঁটা। ঘুমাইবার সময়েও চশমা পরিয়া শোন, নহিলে ভালো করিয়া স্বপ্ন দেখিতে পারেন না। সেনাপতি মহাশয়ের যুদ্ধে যাইতে আর কোনো আপত্তি নাই, কেবল পাছে চশমার কাঁচে কামানের গোলা লাগে ও কাঁচ ভাঙিয়া চোখ কানা হইয়া যায়, এই যা ভয়। কেমন মহাশয়?

সেনাপতি চোখ টিপিয়া কহিলেন, "তাহা নয় তো কী।" তিনি আসন হইতে উঠিয়া কহিলেন, "মহারাজ, আদেশ করেন তো বিদায় হই।"

রাজা সেনাপতিকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে কহিলেন, "যাত্রার সমস্ত উদ্‌যোগ করো। আমার চৌষট্টি দাঁড়ের নৌকা যেন প্রস্তুত থাকে।" মন্ত্রী ও সেনাপতি প্রস্থান করিলেন।

রাজা কহিলেন, "রমাই, তুমি তো সমস্তই শুনিয়াছ। গতবারে শ্বশুরালয়ে আমাকে বড়োই মাটি করিয়াছিল।"

রমাই। আজ্ঞা হাঁ, মহারাজের লাঙ্গুল বানাইয়া দিয়াছিল।

রাজা হাসিলেন, মুখে দন্তের বিদ্যুৎছটা বিকাশ হইল বটে, কিন্তু মনের মধ্যে ঘোরতর মেঘ করিয়া উঠিল। এ সংবাদ রমাই জানিতে পারিয়াছে শুনিয়া তিনি বড়ো সন্তুষ্ট নহেন। আর কেহ জানিলে ততটা ক্ষতি ছিল না। অনবরত গুড়্‌গুড়ি টানিতে লাগিলেন।

রমাই কহিল, "আপনার এক শ্যালক আসিয়া আমাকে কহিলেন 'বাসর-ঘরে

তোমাদের রাজার লেজ প্রকাশ পাইয়াছে; তিনি রামচন্দ্র, না রামদাস? এমন তো পূর্বে জানিতাম না।' আমি তৎক্ষণাৎ কহিলাম, 'পূর্বে জানিবেন কিরূপে? পূর্বে তো ছিল না। আপনাদের ঘরে বিবাহ করিতে আসিয়াছেন তাই যস্মিন্ দেশে যদাচার অবলম্বন করিয়াছেন।'"

রাজা জবাব শুনিয়া বড়োই সুখী। ভাবিলেন, রমাই হইতে তাঁহার এবং তাঁহার পূর্বপুরুষদের মুখ উজ্জ্বল হইল ও প্রতাপাদিত্যের আদিত্য একেবারে চির-রাহুগ্রস্ত হইল। রাজা যুদ্ধবিগ্রহের বড়ো একটা ধার ধারেন না। এই সকল ছোটোখাটো ঘটনাগুলিকে তিনি যুদ্ধবিগ্রহের ন্যায় বিষম বড়ো করিয়া দেখেন। এতদিন তাঁহার ধারণা ছিল যে তাঁহার ঘোরতর অপমানসূচক পরাজয় হইয়াছে। এ কলঙ্কের কথা দিনরাত্রি তাঁহার মনে পড়িত ও তিনি লজ্জায় পৃথিবীকে দ্বিধা হইতে অনুরোধ করিতেন। আজ তাঁহার মন অনেকটা সান্ত্বনা লাভ করিল যে সেনাপতি রমাই রণে জিতিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তথাপি তাঁহার মন হইতে লজ্জার ভার একেবারে দূর হয় নাই।

রাজা রমাইকে কহিলেন, "রমাই, এবারে গিয়া জিতিয়া আসিতে হইবে। যদি জয় হয় তবে তোমাকে আমার অঙ্গুরী উপহার দিব।"

রমাই বলিল, "মহারাজ, জয়ের ভাবনা কী? রমাইকে যদি অন্তঃপুরে লইয়া যাইতে পারেন, তবে স্বয়ং শাশুড়ী ঠাকুরানীকে পর্যন্ত মনের সাধে ঘোল পান করাইয়া আসিতে পারি।"

রাজা কহিলেন, "তাহার ভাবনা? তোমাকে আমি অন্তঃপুরেই লইয়া যাইব।"

রমাই কহিল, "আপনার অসাধ্য কী আছে?"

রাজারও তাহাই বিশ্বাস। তিনি কী না করিতে পারেন? অনুগতবর্গের কেহ যদি বলে, "মহারাজের জয় হউক, সেবকের বাসনা পূর্ণ করুন।" মহামহিম রামচন্দ্র রায় তৎক্ষনাৎ বলেন, "হাঁ, তাহাই হইবে।" কেহ যেন মনে না করে এমন কিছু কাজ আছে, যাহা তাঁহা দ্বারা হইতে পারে না। তিনি স্থির করিলেন, রমাই ভাঁড়কে প্রতাপাদিত্যের অন্তঃপুরে লইয়া যাইবেন, স্বয়ং মহিষী-মাতার সঙ্গে বিদ্রূপ করাইবেন, তবে তাঁহার নাম রাজা রামচন্দ্র রায়। এতবড়ো মহৎ কাজটা যদি তিনি না করিতে পারিলেন তবে আর তিনি কিসের রাজা।

চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রামমোহন মালকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রামমোহন মাল পরাক্রমে ভীমের মতো ছিল। শরীর প্রায় সাড়ে চারি হাত লম্বা। সমস্ত শরীরে মাংসপেশী তরঙ্গিত। সে স্বর্গীয় রাজার আমলের লোক। রামচন্দ্রকে বাল্যকাল হইতে

পালন করিয়াছে। রমাইকে সকলেই ভয় করে, রমাই যদি কাহাকেও ভয় করে তা সে এই রামমোহন। রামমোহন রমাইকে অত্যন্ত ঘৃণা করিত। রমাই তাহার ঘৃণার দৃষ্টিতে কেমন আপনা-আপনি সংকুচিত হইয়া পড়িত। রামমোহনের দৃষ্টি এড়াইতে পারিলে সে ছাড়িত না। রামমোহন আসিয়া দাঁড়াইল। রাজা কহিলেন, তাঁহার সঙ্গে পঞ্চাশ জন অনুচর যাইবে। রামমোহন তাহাদিগের সর্দার হইয়া যাইবে।

রামমোহন কহিল, "যে আজ্ঞা। রমাই ঠাকুর যাইবেন কি ?" বিড়ালচক্ষু খর্বাকৃতি রমাই ঠাকুর সংকুচিত হইয়া পড়িল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

যশোহর রাজবাটীতে আজ কর্মচারীরা ভারি ব্যস্ত। জামাতা আসিবে, নানা-প্রকার উদ্‌যোগ করিতে হইতেছে। আহারাদির বিস্তৃত আয়োজন হইতেছে। চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ যশোহরের তুলনায় যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, সে-বিষয়ে প্রতাপাদিত্যের সহিত মহিষীর কোনো মতান্তর ছিল না, তথাপি জামাতা আসিবে বলিয়া আজ তাঁহার অত্যন্ত আহ্লাদ হইয়াছে। প্রাতঃকাল হইতে বিভাকে তিনি স্বহস্তে সাজাইতে আরম্ভ করিয়াছেন— বিভা বিষম গোলযোগে পড়িয়াছে। কারণ, সাজাইবার পদ্ধতি সম্বন্ধে বয়স্কা মাতার সহিত যুবতী দুহিতার নানা বিষয়ে রুচিভেদ আছে ; কিন্তু হইলে হয় কী, বিভার কিসে ভালো হয়, মহিষী তাহা অবশ্য ভালো বুঝেন। বিভার মনে মনে ধারণা ছিল তিনগাছি করিয়া পাতলা ফিরোজ রঙের চুড়ি পরিলে তাহার শুভ্র কচি হাত দুইখানি বড়ো মানাইবে ; মহিষী তাহাকে সোনার আটগাছা মোটা চুড়ি ও হীরার এক-একগাছা বৃহদাকার বালা পরাইয়া এত অধিক আনন্দিত হইয়া উঠিলেন যে, সকলকে দেখাইবার জন্য বাড়ির সমুদয় বৃদ্ধা দাসী ও বিধবা পিসীদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। বিভা জানিত যে তাহার ছোটো সুকুমার মুখখানিতে নথ কোনোমতেই মানায় না— কিন্তু মহিষী তাহাকে একটা বড়ো নথ পরাইয়া তাহার মুখখানি একবার দক্ষিণ পার্শ্বে একবার বাম পার্শ্বে ফিরাইয়া গর্বসহকারে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহাতেও বিভা চুপ করিয়া ছিল, কিন্তু মহিষী যে ছাঁদে তাহার চুল বাঁধিয়া দিলেন, তাহা তাহার একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল। সে গোপনে সুরমার কাছে মনের মতো চুল বাঁধিয়া আসিল। কিন্তু তাহা মহিষীর নজর এড়াইতে পারিল না। মহিষী দেখিলেন, কেবল চুল বাঁধার

দোষে বিভার সমস্ত সাজ মাটি হইয়া গিয়াছে। তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, সুরমা হিংসা করিয়া বিভার চুল বাঁধা খারাপ করিয়া দিয়াছে। সুরমার হীন উদ্দেশ্যের প্রতি বিভার চোখ ফুটাইতে চেষ্টা করিলেন। অনেকক্ষণ বকিয়া যখন স্থির করিলেন কৃতকার্য হইয়াছেন তখন তাহার চুল খুলিয়া পুনরায় বাঁধিয়া দিলেন। এইরূপে বিভা তাহার খোঁপা, তাহার নথ, তাহার দুই বাহুপূর্ণ চুড়ি, তাহার এক হৃদয়পূর্ণ আনন্দের ভার বহন করিয়া নিতান্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। সে বুঝিতে পারিয়াছে যে, দুরন্ত আহ্লাদকে কোনোমতেই সে কেবলই অন্তঃপুরে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেছে না, চোখে মুখে সে কেবলই বিদ্যুতের মতো উঁকি মারিয়া যাইতেছে। তাহার মনে হইতেছে, বাড়ির দেওয়ালগুলা পর্যন্ত তাহাকে উপহাস করিতে উদ্যত রহিয়াছে। যুবরাজ উদয়াদিত্য আসিয়া গভীর স্নেহপূর্ণ প্রশান্ত আনন্দের সহিত বিভার সলজ্জ হর্ষপূর্ণ মুখখানি দেখিলেন। বিভার হর্ষ দেখিয়া তাঁহার এমনি আনন্দ হইল যে, গৃহে গিয়া সস্নেহে মৃদু হাস্যে সুরমাকে চুম্বন করিলেন।

সুরমা জিজ্ঞাসা করিল, "কী?"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "কিছুই না।"

এমন সময়ে বসন্ত রায় জোর করিয়া বিভাকে টানিয়া ঘরের মধ্যে আনিয়া হাজির করিলেন। চিবুক ধরিয়া তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন, "দেখো দাদা, আজ একবার তোমাদের বিভার মুখখানি দেখো। সুরমা, ও সুরমা, একবার দেখে যাও।" আনন্দে গদগদ হইয়া বৃদ্ধ হাসিতে লাগিলেন। বিভার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আহ্লাদ হয় তো ভালো করেই হাস্ না ভাই, দেখি।

হাসিরে পায়ে ধরে রাখিবি কেমন করে,
হাসির সে প্রাণের সাধ ঐ অধরে খেলা করে।

বয়স যদি না যাইত তো আজ তোর ঐ মুখখানি দেখিয়া এইখানে পড়িতাম আর মরিতাম। হায় হায়, মরিবার বয়স গিয়াছে। যৌবনকালে ঘড়ি ঘড়ি মরিতাম। বুড়াবয়সে রোগ না হইলে আর মরণ হয় না।"

প্রতাপাদিত্যকে যখন তাঁহার শ্যালক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "জামাই বাবাজিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কে গিয়াছে?" তিনি কহিলেন, "আমি কী জানি।" "আজ পথে অবশ্য আলো দিতে হইবে?" নেত্র বিস্ফারিত করিয়া মহারাজ কহিলেন, "অবশ্যই দিতে হইবে, এমন কোনো কথা নাই।" তখন রাজশ্যালক সসংকোচে কহিলেন, "নহবত বসিবে না কি?" "সে সকল বিষয় ভাবিবার অবসর নাই।" আসল কথা, বাজনা বাজাইয়া একটা জামাই ঘরে আনা প্রতাপাদিত্যের কার্য নহে।

রামচন্দ্র রায়ের মহা অভিমান উপস্থিত হইয়াছে। তিনি স্থির করিয়াছেন তাঁহাকে ইচ্ছাপূর্বক অপমান করা হইয়াছে। পূর্বে দুই-এক বার তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাইবার জন্য রাজবাটী হইতে চকদিহিতে লোক প্রেরিত হইত, এবারে চকদিহি পার হইয়া দুই ক্রোশ আসিলে পর বামনহাটিতে দেওয়ানজি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছেন। যদি বা দেওয়ানজি আসিলেন, তাঁহার সহিত দুই শত পঞ্চাশ জন বই লোক আসে নাই। কেন, সমস্ত যশোহরে কি আর-পঞ্চাশ জন লোক মিলিল না। রাজাকে লইতে যে হাতিটি আসিয়াছে রমাই ভাঁড়ের মতে স্থূলকায় দেওয়ানজি তাহার অপেক্ষা বৃহত্তর। দেওয়ানকে রমাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মহাশয়, উটি বুঝি আপনার কনিষ্ঠ?" ভালোমানুষ দেওয়ানজি ঈষৎ বিস্মিত হইয়া উত্তর দিয়াছেন, "না, ওটা হাতি।"

রাজা ক্ষুব্ধ হইয়া দেওয়ানকে কহিলেন, "তোমাদের মন্ত্রী যে হাতিটাতে চড়িয়া থাকে সেটাও যে ইহা অপেক্ষা বড়ো।"

দেওয়ান কহিলেন, "বড়ো হাতিগুলি রাজকার্য উপলক্ষে দূরে পাঠানো হইয়াছে, শহরে একটিও নাই।"

রামচন্দ্র স্থির করিলেন, তাঁহাকে অপমান করিবার জন্যই তাহাদের দূরে পাঠানো হইয়াছে। নহিলে আর কী কারণ থাকিতে পারে!

রাজাধিরাজ রামচন্দ্র রায় আরক্তিম হইয়া শ্বশুরের নাম ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, "প্রতাপাদিত্য রায়ের চেয়ে আমি কিসে ছোটো?"

রমাই ভাঁড় কহিল, "বয়সে আর সম্পর্কে, নহিলে আর কিসে? তাঁহার মেয়েকে যে আপনি বিবাহ করিয়াছেন ইহাতেই—"

কাছে রামমোহন মাল দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার আর সহ্য হইল না, বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল, "দেখো ঠাকুর, তোমার বড়ো বাড় বাড়িয়াছে। আমার মা-ঠাকরুনের কথা অমন করিয়া বলিয়ো না। এই স্পষ্ট কথা বলিলাম।"

প্রতাপাদিত্যকে লক্ষ্য করিয়া রমাই কহিল, "অমন ঢের ঢের আদিত্য দেখিয়াছি। জানেন তো মহারাজ, আদিত্যকে যে-ব্যক্তি বগলে ধরিয়া রাখিতে পারে, সে-ব্যক্তি রামচন্দ্রের দাস।"

রাজা মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন। রামমোহন তখন ধীরপদক্ষেপে রাজার সম্মুখে আসিয়া জোড়হস্তে কহিল, "মহারাজ, ওই বামনা যে আপনার শ্বশুরের নামে যাহা ইচ্ছা তাই বলিবে, ইহা তো আমার সহ্য হয় না। বলেন তো উহার মুখ বন্ধ করি।"

রাজা কহিলেন, "রামমোহন, তুই থাম্।"

তখন রামমোহন সেখান হইতে দূরে চলিয়া গেল।

রামচন্দ্র সেদিন বহু সহস্র খুঁটিনাটি পর্যালোচনা করিয়া স্থির করিলেন, প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে অপমান করিবার জন্য বহুদিন ধরিয়া বিস্তৃত আয়োজন করিয়াছেন। অভিমানে তিনি নিতান্ত স্ফীত হইয়া উঠিয়াছেন। স্থির করিয়াছেন, প্রতাপাদিত্যের কাছে এমন মূর্তি ধারণ করিবেন, যাহাতে প্রতাপাদিত্য বুঝিতে পারেন তাঁহার জামাতা কতবড়ো লোক।

যখন প্রতাপাদিত্যের সহিত রামচন্দ্র রায়ের দেখা হইল, তখন প্রতাপাদিত্য রাজকক্ষে তাঁহার মন্ত্রীর সহিত উপবিষ্ট ছিলেন। প্রতাপাদিত্যকে দেখিবামাত্রই রামচন্দ্র নতমুখে ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

প্রতাপাদিত্য কিছুমাত্র উল্লাস বা ব্যস্তভাব প্রকাশ না করিয়া শান্তভাবে কহিলেন, "এস, ভালো আছ তো ?"

রামচন্দ্র মৃদুস্বরে কহিলেন, "আজ্ঞা হাঁ।"

মন্ত্রীর দিকে চাহিয়া প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "ভাঙ্গানাথি পরগনার তহশিলদারের নামে যে অভিযোগ আসিয়াছে, তাহার কোনো তদন্ত করিয়াছ ?"

মন্ত্রী দীর্ঘ এক কাগজ বাহির করিয়া রাজার হাতে দিলেন, রাজা পড়িতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর পড়িয়া একবার চোখ তুলিয়া জামাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গত বৎসরের মতো এবার তো তোমাদের ওখানে বন্যা হয় নাই ?"

রামচন্দ্র। আজ্ঞা না। আশ্বিন মাসে একবার জলবৃদ্ধি—

প্রতাপাদিত্য। মন্ত্রী এ চিঠিখানার অবশ্য একটা নকল রাখা হইয়াছে।

বলিয়া আবার পড়িতে লাগিলেন। পড়া শেষ করিয়া জামাতাকে কহিলেন, "যাও বাপু, অন্তঃপুরে যাও।"

রামচন্দ্র ধীরে ধীরে উঠিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহার অপেক্ষা প্রতাপাদিত্য কিসে বড়ো।

নবম পরিচ্ছেদ

রামমোহন মাল যখন অন্তঃপুরে আসিয়া বিভাকে প্রণাম করিয়া কহিল, "মা, তোমায় একবার দেখিতে আসিলাম" তখন বিভার মনে বড়ো আহ্লাদ হইল। রামমোহনকে সে বড়ো ভালোবাসিত। কুটুম্বিতার নানাবিধ কার্যভার বহন করিয়া রামমোহন প্রায় মাঝে মাঝে চন্দ্রদ্বীপ হইতে যশোহরে আসিত। কোনো আবশ্যক না

থাকিলেও অবসর পাইলে সে এক-একবার বিভাকে দেখিতে আসিত। রামমোহনকে বিভা কিছুমাত্র লজ্জা করিত না। বৃদ্ধ বলিষ্ঠ দীর্ঘ রামমোহন যখন "মা" বলিয়া আসিয়া দাঁড়াইত তখন তাহার মধ্যে এমন একটা বিশুদ্ধ সরল অলংকারশূন্য স্নেহের ভাব থাকিত যে, বিভা তাহার কাছে আপনাকে নিতান্ত বালিকা মনে করিত। বিভা তাহাকে কহিল, "মোহন, তুই এতদিন আসিস নাই কেন?"

রামমোহন কহিল, "তা মা, 'কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা কখনো নয়।' তুমি কোন্ আমাকে মনে করিলে? আমি মনে মনে কহিলাম, 'মা না ডাকিলে আমি যাব না, দেখি কতদিনে তাঁর মনে পড়ে।' তা কই, একবারও তো মনে পড়িল না!"

বিভা ভারি মুশকিলে পড়িল। সে কেন ডাকে নাই, তাহা ভালো করিয়া বলিতে পারিল না। তাহা ছাড়া, ডাকে নাই বলিয়া যে মনে করে নাই, এই কথাটার মধ্যে এক জায়গায় কোথায় যুক্তির দোষ আছে বলিয়া মনে হইতেছে, অথচ ভালো করিয়া বুঝাইয়া বলিতে পারিতেছে না।

বিভার মুশকিল দেখিয়া রামমোহন হাসিয়া কহিল, "না মা, অবসর পাই নাই বলিয়া আসিতে পারি নাই।"

বিভা কহিল, "মোহন, তুই বোস্; তোদের দেশের গল্প আমায় বল্।"

রামমোহন বসিল। চন্দ্রদ্বীপের বর্ণনা করিতে লাগিল। বিভা গালে হাত দিয়া একমনে শুনিতে লাগিল। চন্দ্রদ্বীপের বর্ণনা শুনিতে শুনিতে তাহার হৃদয়টুকুর মধ্যে কত কী কল্পনা জাগিয়া উঠিয়াছিল, সেদিন সে আসমানের উপর কত ঘরবাড়িই বাঁধিয়াছিল তাহার আর ঠিকানা নাই। যখন রামমোহন গল্প করিল গত বর্ষার বন্যায় তাহার ঘরবাড়ি সমস্ত ভাসিয়া গিয়াছিল, সন্ধ্যার প্রাক্কালে সে একাকী তাহার বৃদ্ধা মাতাকে পিঠে করিয়া সাঁতার দিয়া মন্দিরের চূড়ায় উঠিয়াছিল ও দুই জনে মিলিয়া সমস্ত রাত্রি সেখানে যাপন করিয়াছিল তখন বিভার ক্ষুদ্র বুকটির মধ্যে কী হৃৎকম্পই উপস্থিত হইয়াছিল।

গল্প ফুরাইলে পর রামমোহন কহিল, "মা, তোমার জন্য চারগাছি শাঁখা আনিয়াছি, তোমাকে ঐ হাতে পরিতে হইবে, আমি দেখিব।"

বিভা তাহার চারগাছি সোনার চুড়ি খুলিয়া শাঁখা পরিল ও হাসিতে হাসিতে মায়ের কাছে গিয়া কহিল, "মা, মোহন তোমার চুড়ি খুলিয়া আমাকে চারগাছি শাঁখা পরাইয়া দিয়াছে।"

মহিষী কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট না হইয়া হাসিয়া কহিলেন, "তা বেশ তো সাজিয়াছে, বেশ তো মানাইয়াছে।"

রামমোহন অত্যন্ত উৎসাহিত ও গর্বিত হইয়া উঠিল। মহিষী তাহাকে ডাকাইয়া লইয়া গেলেন, নিজে উপস্থিত থাকিয়া তাহাকে আহার করাইলেন। সে তৃপ্তিপূর্বক ভোজন করিলে পর তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "মোহন, এইবারে তোর সেই আগমনীর গানটি গা।" রামমোহন বিভার দিকে চাহিয়া গাহিল,

"সারা বরষ দেখি নে মা, মা তুই আমার কেমনধারা,
নয়নতারা হারিয়ে আমার অন্ধ হল নয়নতারা।
এলি কি পাষাণী ওরে,
দেখব তোরে আঁখি ভরে—
কিছুতেই থামে না যে মা, পোড়া এ নয়নের ধারা।"

রামমোহনের চোখে জল আসিল, মহিষীও বিভার মুখের দিকে চাহিয়া চোখের জল মুছিলেন। আগমনীর গানে তাঁহার বিজয়ার কথা মনে পড়িল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। পুরমহিলাদের জনতা বাড়িতে লাগিল। প্রতিবেশিনীরা জামাই দেখিবার জন্য ও সম্পর্ক অনুসারে জামাইকে উপহাস করিবার জন্য অন্তঃপুরে সমাগত হইল। আনন্দ, লজ্জা, আশঙ্কা, একটা অনিশ্চিত অনির্দেশ্য না-জানি-কী-হইবে ভাবে বিভার হৃদয় তোলপাড় করিতেছে, তাহার মুখ-কান লাল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার হাত-পা শীতল হইয়া গিয়াছে। ইহা কষ্ট কি সুখ কে জানে!

জামাই অন্তঃপুরে আসিয়াছেন। হুলবিশিষ্ট সৌন্দর্যের ঝাঁকের ন্যায় রমণীগণ চারিদিক হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে। চারিদিকে হাসির কোলাহল উঠিল। চারিদিক হইতে কোকিল-কণ্ঠের তীব্র উপহাস, মৃণাল-বাহুর কঠোর তাড়ন, চম্পক-অঙ্গুলির চন্দ্র-নখরের তীক্ষ্ণ পীড়ন চলিতে লাগিল। রামচন্দ্র রায় যখন নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, তখন একজন প্রৌঢ়া রমণী আসিয়া তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া বসিল। সে কঠোর কণ্ঠে এমনি কাটা কাটা কথা কহিতে লাগিল ও ক্রমেই তাহার মুখ দিয়া এমনি সকল রুচির বিকার বাহির হইতে লাগিল যে পুররমণীদের মুখ একপ্রকার বন্ধ হইয়া আসিল। তাহার মুখের কাছে থাকোদিদিও চুপ করিয়া গেলেন। বিমলাদিদি ঘর হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। কেবল ভুতোর মা তাহাকে খুব এক কথা শুনাইয়াছিল। যখন উল্লিখিত ভুতোর মার মুখ খুব চলিতেছিল, তখন সেই প্রৌঢ়া তাহাকে বলিয়াছিল, "মাগো, মা, তোমার মুখ নয় তো, একগাছা ঝাঁটা।" ভুতোর মা তৎক্ষণাৎ কহিল, "আর মাগি, তোর মুখটা আঁস্তাকুড়, এত ঝাঁটাইলাম তবুও সাফ হইল না।" বলিয়া গস গস করিয়া চলিয়া গেল। একে একে ঘর খালি হইল, রামচন্দ্র রায় বিরাম পাইলেন।

তখন সেই প্রৌঢ়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া মহিষীর কক্ষে উপস্থিত হইল। সেখানে মহিষী দাসদাসীদিগকে খাওয়াইতেছিলেন। রামমোহনও এক পার্শ্বে বসিয়া খাইতেছিল। সেই প্রৌঢ়া মহিষীর কাছে আসিয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, "এই যে নিকষা জননী।" শুনিবামাত্র রামমোহন চমকিয়া উঠিল, প্রৌঢ়ার মুখের দিকে চাহিল। তৎক্ষণাৎ আহার পরিত্যাগ করিয়া শার্দুলের ন্যায় লম্ফ দিয়া তাহার দুই হস্ত বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া বজ্রস্বরে বলিয়া উঠিল, "আমি যে ঠাকুর তোমায় চিনি।" বলিয়া তাহার মস্তকের বস্ত্র উন্মোচন করিয়া ফেলিল। আর কেহ নহে, রমাই ঠাকুর। রামমোহন ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল, গাত্র হইতে চাদর খুলিয়া ফেলিল; দুই হস্তে অবলীলাক্রমে রমাইকে আকাশে তুলিল, কহিল, "আজ আমার হাতে তোর মরণ আছে।" বলিয়া তাহাকে দুই এক পাক আকাশে ঘুরাইল। মহিষী ছুটিয়া আসিয়া কহিলেন, "রামমোহন তুই করিস কী?" রমাই কাতর স্বরে কহিল, "দোহাই বাবা, ব্রহ্মহত্যা করিস না।" চারিদিক হইতে বিষম একটা গোলযোগ উঠিল। তখন রামমোহন রমাইকে ভূমিতে নামাইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, "হতভাগা, তোর কি আর মরিবার জায়গা ছিল না?"

রমাই কহিল, "মহারাজ আমাকে আদেশ করিয়াছেন।" রামমোহন বলিয়া উঠিল, "কী বলিলি, নিমকহারাম? ফের অমন কথা বলিবি তো এই শানের পাথরে তোর মুখ ঘষিয়া দিব।" বলিয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিল।

রমাই আর্তনাদ করিয়া উঠিল। তখন রামমোহন খর্বকায় রমাইকে চাদর দিয়া বাঁধিয়া বস্তার মতন করিয়া ঝুলাইয়া অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে কথাটা অনেকটা রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। রাত্রি তখন দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। রাজার শ্যালক আসিয়া সেই রাত্রে প্রতাপাদিত্যকে সংবাদ দিলেন যে, জামাতা রমাই ভাঁড়কে রমণীবেশে অন্তঃপুরে লইয়া গেছেন। সেখানে সে পুররমণীদের সহিত, এমন কি, মহিষীর সহিত বিদ্রূপ করিয়াছে।

তখন প্রতাপাদিত্যের মূর্তি অতিশয় ভয়ংকর হইয়া উঠিল। রোষে তাঁহার সর্বাঙ্গ আলোড়িত হইয়া উঠিল। স্ফীতজটা সিংহের ন্যায় শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন। কহিলেন, "লছমন সর্দারকে ডাকো।" লছমন সর্দারকে কহিলেন, "আজ রাত্রে আমি রামচন্দ্র রায়ের ছিন্ন মুণ্ড দেখিতে চাই।" সে তৎক্ষণাৎ সেলাম করিয়া কহিল, "যো হুকুম মহারাজ।" তৎক্ষণাৎ তাঁহার শ্যালক তাঁহার পদতলে পড়িল, কহিল, "মহারাজ, মার্জনা করুন, বিভার কথা একবার মনে করুন। অমন কাজ করিবেন না।" প্রতাপাদিত্য পুনরায় দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "আজ রাত্রের

মধ্যেই আমি রামচন্দ্র রায়ের মুণ্ড চাই।" তাঁহার শ্যালক তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "মহারাজ, আজ তাঁহারা অন্তঃপুরে শয়ন করিয়াছেন, মার্জনা করুন, মহারাজ, মার্জনা করুন।" তখন প্রতাপাদিত্য কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া কহিলেন, "লছমন, শুন, কাল প্রভাতে যখন রামচন্দ্র রায় অন্তঃপুর হইতে বাহির হইবে তখন তাহাকে বধ করিবে, তোমার উপর আদেশ রহিল।" শ্যালক দেখিলেন, তিনি যত-দূর মনে করিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক হইয়া গিয়াছে! তিনি সেই রাত্রে চুপি চুপি আসিয়া বিভার শয়নকক্ষের দ্বারে আঘাত করিলেন।

তখন দূর হইতে দুই প্রহরের নহবত বাজিতেছে। নিস্তব্ধ রাত্রে সেই নহবতের শব্দ জ্যোৎস্নার সহিত দক্ষিণা বাতাসের সহিত মিশিয়া ঘুমন্ত প্রাণের মধ্যে স্বপ্ন সৃষ্টি করিতেছে। বিভার শয়নকক্ষের মুক্ত বাতায়ন ভেদ করিয়া জ্যোৎস্নার আলো বিছানায় আসিয়া পড়িয়াছে, রামচন্দ্র রায় নিদ্রায় মগ্ন। বিভা উঠিয়া বসিয়া চুপ করিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতেছে। জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া তাহার চোখ দিয়া দুই-এক বিন্দু অশ্রু ঝড়িয়া পড়িতেছিল। বুঝি যেমনটি কল্পনা করিয়াছিল ঠিক তেমনটি হয় নাই। তাহার প্রাণের মধ্যে কাঁদিতেছিল। এতদিন যাহার জন্য অপেক্ষা করিয়াছিল, সে দিন তো আজ আসিয়াছে।

রামচন্দ্র রায় শয্যায় শয়ন করিয়া অবধি বিভার সহিত একটি কথা কন নাই। প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে অপমান করিয়াছে— তিনি প্রতাপাদিত্যকে অপমান করিবেন কী করিয়া? না, বিভাকে অগ্রাহ্য করিয়া। তিনি জানাইতে চান, 'তুমি তো যশোহরের প্রতাপাদিত্যের মেয়ে, চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রাজা রামচন্দ্র রায়ের পাশে কি তোমাকে সাজে? এই স্থির করিয়া সেই যে পাশ ফিরিয়া শুইয়াছেন আর পার্শ্ব পরিবর্তন করেন নাই। যত মান-অভিমান সমস্তই বিভার প্রতি। বিভা জাগিয়া বসিয়া ভাবিতেছে। একবার জ্যোৎস্নার দিকে চাহিতেছে, একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিতেছে। তাহার বুক কাঁপিয়া কাঁপিয়া এক-একবার দীর্ঘনিশ্বাস উঠিতেছে— প্রাণের মধ্যে বড়ো ব্যথা বাজিয়াছে। সহসা একবার রামচন্দ্রের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সহসা দেখিলেন, বিভা চুপ করিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে। সেই নিদ্রোত্থিত অবস্থার প্রথম মুহূর্তে যখন অপমানের স্মৃতি জাগিয়া উঠে নাই, গভীর নিদ্রার পরে মনের সুস্থ ভাব ফিরিয়া আসিয়াছে, রোষের ভাব চলিয়া গিয়াছে, তখন সহসা বিভার সেই অশ্রুপ্লাবিত করুণ কচি মুখখানি দেখিয়া সহসা তাঁহার মনে করুণা জাগিয়া উঠিল। বিভার হাত ধরিয়া কহিলেন, "বিভা, কাঁদিতেছ?" বিভা আকুল হইয়া উঠিল। বিভা কথা কহিতে পারিল না, বিভা চোখে দেখিতে পাইল না, বিভা শুইয়া পড়িল। তখন

রামচন্দ্র রায় উঠিয়া বসিয়া ধীরে ধীরে বিভার মাথাটি লইয়া কোলের উপর রাখিলেন, তাহার অশ্রুজল মুছাইয়া দিলেন। এমন সময়ে দ্বারে কে আঘাত করিল। রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, "কে ও ?" বাহির হইতে উত্তর আসিল, "অবিলম্বে দ্বার খোলো।"

দশম পরিচ্ছেদ

রামচন্দ্র রায় শয়নকক্ষের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া বাহিরে আসিলেন। রাজশ্যালক রমাপতি কহিলেন, "বাবা, এখনই পালাও, মুহূর্ত বিলম্ব করিয়ো না।"

সেই রাত্রে সহসা এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র রায় একেবারে চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখ সাদা হইয়া গেল, রুদ্ধ নিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, কেন, কী হইয়াছে ?"

"কী হইয়াছে তাহা বলিব না, এখনই পালাও।"

বিভা শয্যা ত্যাগ করিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মামা, কী হইয়াছে ?"

রমাপতি কহিলেন, "সে-কথা তোমার শুনিয়া কাজ নাই, মা।"

বিভার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সে একবার বসন্ত রায়ের কথা ভাবিল, একবার উদয়াদিত্যের কথা ভাবিল। বলিয়া উঠিল, "মামা, কী হইয়াছে বলো।"

রমাপতি তাহার কথার কোনো উত্তর না দিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, "বাবা, অনর্থক কালবিলম্ব হইতেছে। এই বেলা গোপনে পলাইবার উপায় দেখো।"

হঠাৎ বিভার মনে একটা দারুণ অশুভ আশঙ্কা জাগিয়া উঠিল। গমনোদ্যত মাতুলের পথরোধ করিয়া কহিল, "ওগো তোমার দুটি পায়ে পড়ি, কী হইয়াছে বলিয়া যাও।"

রমাপতি সভয়ে চারিদিকে চাহিয়া কহিলেন, "গোল করিস নে বিভা, চুপ কর্, আমি সমস্তই বলিতেছি।"

যখন রমাপতি একে একে সমস্তটা বলিলেন, তখন বিভা একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিবার উপক্রম করিল। রমাপতি তাড়াতাড়ি তাহার মুখ চাপিয়া ধরিলেন— কহিলেন, "চুপ, চুপ, সর্বনাশ করিস নে।"

বিভা রুদ্ধশ্বাসে অর্ধরুদ্ধস্বরে সেইখানে বসিয়া পড়িল।

রামচন্দ্র রায় সকাতরে কহিলেন, "এখন আমি কী উপায় করিব ? পলাইবার কী পথ আছে, আমি তো কিছুই জানি না।"

রমাপতি কহিলেন, "আজ রাত্রে প্রহরীরা চারিদিকে সতর্ক আছে। আমি একবার চারিদিকে দেখিয়া আসি যদি কোথাও কোনো উপায় থাকে।"

এই বলিয়া তিনি প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। বিভা তাঁহাকে ধরিয়া কহিল, "মামা, তুমি কোথায় যাও। তুমি যাইয়ো না, তুমি আমাদের কাছে থাকো।"

রমাপতি কহিলেন, "বিভা, তুই পাগল হইয়াছিস। আমি কাছে থাকিলে কোনো উপকার দেখিবে না। ততক্ষণ আমি একবার চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া আসি।"

বিভা তখন বলপূর্বক উঠিয়া দাঁড়াইল। হাত-পা থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। কহিল, "মামা, তুমি আর-একটু এইখানে থাকো। আমি একবার দাদার কাছে যাই।" বলিয়া বিভা তাড়াতাড়ি উদায়াদিত্যের শয়নকক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল।

তখন ক্ষীণ চন্দ্র অস্ত যায় যায়। চারিদিকে অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। কোথাও সাড়াশব্দ নাই। রামচন্দ্র রায় তাঁহার শয়নকক্ষের দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিলেন দুই পার্শ্বে রাজ-অন্তঃপুরের শ্রেণীবদ্ধ কক্ষে দ্বার রুদ্ধ, সকলেই নিঃশঙ্কচিত্তে ঘুমাইতেছে। সম্মুখের প্রাঙ্গণে চারিদিকের ভিত্তির ছায়া পড়িয়াছে ও তাহার এক পার্শ্বে একটুখানি জ্যোৎস্না এখনো অবশিষ্ট রহিয়াছে। ক্রমে সেটুকুও মিলাইয়া গেল। অন্ধকার এক পা এক পা করিয়া সমস্ত জগৎ দখল করিয়া লইল। অন্ধকার দূরে বাগানের শ্রেণীবদ্ধ নারিকেল গাছগুলির মধ্যে আসিয়া জমিয়া বসিল। অন্ধকার কোল ঘেঁষিয়া অতি কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। রামচন্দ্র রায় কল্পনা করিতে লাগিলেন, এই চারিদিকের অন্ধকারের মধ্যে না জানি কোথায় একটা ছুরি তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। দক্ষিণে না বামে, সম্মুখে না পশ্চাতে? ওই যে ইতস্তত এক-একটা কোণ দেখা যাইতেছে, উহার মধ্যে একটা কোণে তো কেহ মুখ গুঁজিয়া সর্বাঙ্গ চাদরে ঢাকিয়া চুপ করিয়া বসিয়া নাই? কী জানি ঘরের মধ্যে যদি কেহ থাকে। খাটের নিচে, অথবা দেয়ালের এক পাশে। তাঁহার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, কপাল দিয়া ঘাম পড়িতে লাগিল। একবার মনে হইল যদি মামা কিছু করেন, যদি তাঁহার কোনো অভিসন্ধি থাকে? আস্তে আস্তে একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। একটা বাতাস আসিয়া ঘরের প্রদীপ নিবিয়া গেল। রামচন্দ্র ভাবিলেন, কে এক জন বুঝি প্রদীপ নিবাইয়া দিল— কে এক জন বুঝি ঘরে আছে। রমাপতির কাছে ঘেঁষিয়া গিয়া ডাকিলেন, "মামা।" মামা কহিলেন, "কী বাবা?" রামচন্দ্র রায় মনে মনে কহিলেন, বিভা কাছে থাকিলে ভালো হইত, মামাকে ভালো বিশ্বাস হইতেছে না।

বিভা উদয়াদিত্যের কাছে একেবারে কাঁদিয়া গিয়া পড়িল, তাহার মুখ দিয়া আর

কথা বাহির হইল না। সুরমা তাহাকে উঠাইয়া বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কী হইয়াছে, বিভা?" বিভা সুরমাকে দুই হস্তে জড়াইয়া ধরিয়া একটি কথাও বলিতে পারিল না। উদয়াদিত্য সস্নেহে বিভার মাথায় হাত দিয়া কহিলেন, "কেন বিভা, কী হইয়াছে?" বিভা তাহার ভ্রাতার দুই হাত ধরিয়া কহিল, "দাদা, আমার সঙ্গে এস, সমস্ত শুনিবে।"

তিন জনে মিলিয়া বিভার শয়নকক্ষের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে অন্ধকারে রামচন্দ্র বসিয়া ও রমাপতি দাঁড়াইয়া আছেন। উদয়াদিত্য তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মামা, হইয়াছে কী?" রমাপতি একে একে সমস্তটা কহিলেন, উদয়াদিত্য তাঁহার আয়ত নেত্র বিস্তারিত করিয়া সুরমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আমি এখনই পিতার কাছে যাই— তাঁহাকে কোনোমতেই আমি ও কাজ করিতে দিব না। কোনোমতেই না।"

সুরমা কহিল, "তাহাতে কি কোনো ফল হইবে? তাহার চেয়ে বরং একবার দাদামহাশয়কে তাঁহার কাছে পাঠাও, যদি কিছু উপকার দেখে।"

যুবরাজ কহিলেন, "আচ্ছা।"

বসন্ত রায় তখন অগাধ নিদ্রা দিতেছিলেন। ঘুম ভাঙিয়াই উদয়াদিত্যকে দেখিয়া ভাবিলেন, বুঝি ভোর হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ ললিতে একটা গান গাহিবার উপক্রম করিলেন,

"কবরীতে ফুল শুকাল, কাননের ফুল ফুটল বনে,
দিনের আলো প্রকাশিল, মনের সাধ রহিল মনে।"

উদয়াদিত্য বলিলেন, "দাদামহাশয়, বিপদ ঘটিয়াছে।"

তৎক্ষণাৎ বসন্ত রায়ের গান বন্ধ হইয়া গেল। ত্রস্তভাবে উঠিয়া উদয়াদিত্যের কাছে আসিয়া শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অ্যাঁ। সে কী দাদা। কী হইয়াছে। কিসের বিপদ।"

উদয়াদিত্য সমস্ত বলিলেন। বসন্ত রায় শয্যায় বসিয়া পড়িলেন। উদয়াদিত্যের মুখের দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "না দাদা, না, এ কি কখনো হয়? এ কি কখনো সম্ভব?"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "আর সময় নাই, একবার পিতার কাছে যাও।"

বসন্ত রায় উঠিলেন, চলিলেন, যাইতে যাইতে কতবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা, এ কি কখনো হয়? এ কি কখনো সম্ভব?"

প্রতাপাদিত্যের গৃহে প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা প্রতাপ, এ কি

কথনো সম্ভব?" প্রতাপাদিত্য এখনও শয়নকক্ষে যান নাই— তিনি তাঁহার মন্ত্রগৃহে বসিয়া আছেন। এক বার এক মুহূর্তের জন্য মনে হইয়াছিল লছমন সর্দারকে ফিরিয়া ডাকিবেন। কিন্তু সে সংকল্প তৎক্ষণাৎ মন হইতে দূর হইয়া গেল। প্রতাপাদিত্য কথনো দুইবার আদেশ করেন? যে মুখে আদেশ দেওয়া সেই মুখে আদেশ ফিরাইয়া লওয়া? আদেশ লইয়া ছেলেখেলা করা তাঁহার কার্য নহে। কিন্তু বিভা? বিভা বিধবা হইবে। রামচন্দ্র রায় যদি স্বেচ্ছাপূর্বক অগ্নিতে ঝাঁপ দিত, তাহা হইলেও তো বিভা বিধবা হইত। রামচন্দ্র রায় প্রতাপাদিত্য রায়ের রোষাগ্নিতে স্বেচ্ছাপূর্বক ঝাঁপ দিয়াছে, তাহার অনিবার্য ফলস্বরূপ বিভা বিধবা হইবে। ইহাতে প্রতাপাদিত্যের কী হাত আছে। কিন্তু এত কথাও তাঁহার মনে হয় নাই। মাঝে মাঝে যখনই সমস্ত ঘটনাটা উজ্জ্বলরূপে তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিতেছে তখনই তিনি একেবারে অধীর হইয়া উঠিতেছেন, ভাবিতেছেন, রাত কখন পোহাইবে? ঠিক এমন সময় বৃদ্ধ বসন্ত রায় ব্যস্তসমস্ত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন ও আকুল ভাবে প্রতাপাদিত্যের দুই হাত ধরিয়া কহিলেন, "বাবা প্রতাপ, ইহা কি কথনো সম্ভব?"

প্রতাপাদিত্য একেবারে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কেন সম্ভব নয়?"

বসন্ত রায় কহিলেন, "ছেলেমানুষ, অপরিণামদর্শী, সে কি তোমার ক্রোধের যোগ্য পাত্র?"

প্রতাপাদিত্য বলিয়া উঠিলেন, "ছেলেমানুষ! আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িয়া যায়, ইহা বুঝিবার বয়স তাহার হয় নাই! ছেলেমানুষ! কোথাকার একটা লক্ষ্মীছাড়া নির্বোধ মূর্খ ব্রাহ্মণ, নির্বোধদের কাছে দাঁত দেখাইয়া যে রোজগার করিয়া খায়, তাহাকে স্ত্রীলোক সাজাইয়া আমার মহিষীর সঙ্গে বিদ্রূপ করিবার জন্য আনিয়াছে,—এতটা বুদ্ধি যাহার জোগাইতে পারে, তাহার ফল কী হইতে পারে, সে বুদ্ধিটা আর তাহার মাথায় জোগাইল না। দুঃখ এই, বুদ্ধিটা যখন মাথায় জোগাইবে, তখন তাহার মাথাও তাহার শরীরে থাকিবে না।" যতই বলিতে লাগিলেন, তাঁহার শরীর আরো কাঁপিতে লাগিল, তাঁহার প্রতিজ্ঞা আরো দৃঢ় হইতে লাগিল, তাঁহার অধীরতা আরো বাড়িয়া উঠিল।

বসন্ত রায় মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "আহা সে ছেলেমানুষ। সে কিছুই বুঝে না।"

প্রতাপাদিত্যের অসহ্য হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, "দেখো পিতৃব্যঠাকুর, যশোহরের রায়-বংশের কিসে মান-অপমান হয় সে জ্ঞান যদি তোমার থাকিবে, তবে কি ওই পাকা চুলের উপর মোগল বাদশাহের শিরোপা জড়াইয়া বেড়াইতে পার। বাদশাহের প্রসাদগর্বে তুমি মাথা তুলিয়া বেড়াইতেছ বলিয়া প্রতাপাদিত্যের মাথা

একেবারে নত হইয়া পড়িয়াছে। যবন-চরণের মৃত্তিকা তুমি কপালে ফোঁটা করিয়া পরিয়া থাকো। তোমার ওই যবনের পদধূলিময় অকিঞ্চিৎকর মাথাটা ধূলিতে লুটাইবার সাধ ছিল, বিধাতার বিড়ম্বনায় তাহাতে বাধা পড়িল। এই তোমাকে স্পষ্টই বলিলাম। তুমি বলিয়াই বুঝিলে না, আজ রায়-বংশের কতবড়ো অপমান হইয়াছে, তুমি বলিয়াই আজ রায়-বংশের অপমানকারীর জন্য মার্জনা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছ।"

বসন্ত রায় তখন ধীরে ধীরে বলিলেন, "প্রতাপ, আমি বুঝিয়াছি, তুমি যখন একবার ছুরি তোল, তখন সে ছুরি এক জনের উপর পড়িতেই চায়। আমি তাহার লক্ষ হইতে সরিয়া পড়িলাম বলিয়া আর-এক জন তাহার লক্ষ্য হইয়াছে। ভালো প্রতাপ, তোমার মনে যদি দয়া না থাকে, তোমার ক্ষুধিত ক্রোধ এক জনকে যদি গ্রাস করিতেই চায়, তবে আমাকেই করুক। এই তোমার খুড়ার মাথা (বলিয়া বসন্ত রায় মাথা নিচু করিয়া দিলেন)। ইহা লইয়া যদি তোমার তৃপ্তি হয় তবে লও। ছুরি আনো। এ মাথায় চুল নাই, এ মুখে যৌবনের রূপ নাই। যম নিমন্ত্রণলিপি পাঠাইয়াছে, সে সভার উপযোগী সাজসজ্জাও শেষ হইয়াছে। (বসন্ত রায়ের মুখে অতি মৃদু হাস্যরেখা দেখা দিল)। কিন্তু ভাবিয়া দেখো প্রতাপ, বিভা আমাদের দুধের মেয়ে, তার যখন দুটি চক্ষু দিয়া অশ্রু পড়িবে তখন—" বলিতে বলিতে বসন্ত রায় অধীর উচ্ছ্বাসে একেবারে কাঁদিয়া উঠিলেন, "আমাকে শেষ করিয়া ফেলো প্রতাপ। আমার বাঁচিয়া সুখ নাই। তাহার চোখে জল দেখিবার আগে আমাকে শেষ করিয়া ফেলো।"

প্রতাপাদিত্য এত ক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন। যখন বসন্ত রায়ের কথা শেষ হইল তখন তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। বুঝিলেন কথাটা প্রকাশ হইয়াছে। নিচে গিয়া প্রহরীদের ডাকাইয়া আদেশ করিলেন, রাজপ্রাসাদসংলগ্ন খাল এখনই যেন বড়ো বড়ো শালকাঠ দিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। সেই খালে রামচন্দ্র রায়ের নৌকা আছে। প্রহরীদিগকে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিলেন, আজ রাত্রে অন্তঃপুর হইতে কেহ যেন বাহির হইতে না পারে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বসন্ত রায় যখন অন্তঃপুরে ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া বিভা একেবারে কাঁদিয়া উঠিল। বসন্ত রায় আর অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না, তিনি উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া কহিলেন, "দাদা, তুমি ইহার একটা উপায় করিয়া দাও।" রামচন্দ্র রায় একেবারে অধীর হইয়া উঠিলেন। তখন উদয়াদিত্য তাঁহার তরবারি হস্তে লইলেন, "এস আমার সঙ্গে সঙ্গে এস।" সকলে সঙ্গে সঙ্গে চলিল। উদয়াদিত্য কহিলেন, "বিভা, তুই এখানে থাক্, তুই আসিস নে।" বিভা শুনিল না। রামচন্দ্র রায়ও কহিলেন, "না, বিভা সঙ্গে সঙ্গেই আসুক।" সেই নিস্তব্ধ রাত্রে সকলে পা টিপিয়া চলিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, বিভীষিকা চারিদিক হইতে তাহার অদৃশ্য হস্ত প্রসারিত করিতেছে। রামচন্দ্র রায় সম্মুখে পশ্চাতে পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। মামার প্রতি মাঝে মাঝে সন্দেহ জন্মিতে লাগিল। অন্তঃপুর অতিক্রম করিয়া বহির্দেশে যাইবার দ্বারে আসিয়া উদয়াদিত্য দেখিলেন দ্বার রুদ্ধ। বিভা ভয়কম্পিত রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "দাদা, নিচে যাইবার দরজা হয়তো বন্ধ করে নাই সেইখানে চলো।" সকলে সেই দিকে চলিল। দীর্ঘ অন্ধকার সিঁড়ি বাহিয়া নিচে চলিতে লাগিল। রামচন্দ্র রায়ের মনে হইল, এ সিঁড়ি দিয়া নামিলে বুঝি আর কেহ উঠে না, বুঝি বাসুকি-সাপের গর্তটা এইখানে, পাতালে নামিবার সিঁড়ি এই। সিঁড়ি ফুরাইলে দ্বারের কাছে গিয়া দেখিলেন দ্বার বন্ধ। আবার সকলে ধীরে ধীরে উঠিল। অন্তঃপুর হইতে বাহির হইবার যতগুলি পথ আছে সমস্তই বন্ধ। সকলে মিলিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইল, প্রত্যেক দ্বারে ফিরিয়া ফিরিয়া দুই-তিন বার করিয়া গেল। সকলগুলিই বন্ধ।

যখন বিভা দেখিল, বাহির হইবার কোনো পথই নাই, তখন সে অশ্রু মুছিয়া ফেলিল। স্বামীর হাত ধরিয়া তাহার শয়নকক্ষে লইয়া গেল। দৃঢ়পদে দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া অকম্পিত স্বরে কহিল, "দেখিব, এ ঘর হইতে তোমাকে কে বাহির করিয়া লইতে পারে। তুমি যেখানে যাইবে, আমি তোমার আগে আগে যাইব, দেখিব আমাকে কে বাধা দেয়।" উদয়াদিত্য দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া কহিলেন, "আমাকে বধ না করিয়া কেহ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।" সুরমা কিছু না বলিয়া স্বামীর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ বসন্ত রায় সকলের আগে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মামা ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। কিন্তু রামচন্দ্র রায়ের এ বন্দোবস্ত কিছুতেই ভালো

লাগিল না। তিনি ভাবিতেছেন, "প্রতাপাদিত্য যে-রকম লোক দেখিতেছি তিনি কী না করিতে পারেন। বিভা ও উদয়াদিত্য যে মাঝে পড়িয়া কিছু করিতে পারিবেন, এমন ভরসা হয় না। এ বাড়ি হইতে কোনোমতে বাহির হইতে পারিলে বাঁচি।"

কিছুক্ষণ বাদে সুরমা উদয়াদিত্যকে মৃদুস্বরে কহিল, "আমাদের এখানে দাঁড়াইয়া থাকিলে যে কোনো ফল হইবে তাহা তো বোধ হয় না, বরং উল্টা। পিতা যতই বাধা পাইবেন, ততই তাঁহার সংকল্প আরো দৃঢ় হইবে। আজ রাত্রেই কোনোমতে প্রাসাদ হইতে পলাইবার উপায় করিয়া দাও।"

উদয়াদিত্য চিন্তিতভাবে কিয়ৎক্ষণ সুরমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তবে আমি যাই, বলপ্রয়োগ করিয়া দেখি গে।"

সুরমা দৃঢ়ভাবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "যাও।"

উদয়াদিত্য তাঁহার উত্তরীয় বসন ফেলিয়া দিলেন, চলিলেন। সুরমা সঙ্গে সঙ্গে কিছুদূর গেল। নিভৃত স্থানে গিয়া সে উদয়াদিত্যের বক্ষ আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। উদয়াদিত্য শির নত করিয়া তাহাকে একটি দীর্ঘ চুম্বন করিলেন ও মুহূর্তের মধ্যে চলিয়া গেলেন। তখন সুরমা তাহার শয়নকক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার দুই চোখ বহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। জোড়হস্তে কহিল, "মাগো যদি আমি পতিব্রতা সতী হই, তবে এবার আমার স্বামীকে তাঁহার পিতার হাত হইতে রক্ষা করো। আমি যে তাঁহাকে আজ এই বিপদের মধ্যে বিদায় দিলাম, সে কেবল তোর ভরসাতেই মা। তুই যদি আমাকে বিনাশ করিস, তবে পৃথিবীতে তোকে আর কেহ বিশ্বাস করিবে না।" বলিতে বলিতে কাঁদিয়া উঠিল। সুরমা সেই অন্ধকারে বসিয়া কতবার মনে মনে "মা" "মা" বলিয়া ডাকিল, কিন্তু মনে হইল যেন মা তাহার কথা শুনিতে পাইলেন না। মনে মনে তাঁহার পায়ে যে পুষ্পাঞ্জলি দিল মনে হইল যেন তিনি তাহা লইলেন না, তাঁহার পা হইতে পড়িয়া গেল। সুরমা কাঁদিয়া কহিল, "কেন মা, আমি কী করিয়াছি?" তাহার উত্তর শুনিতে পাইল না। সে সেই চারিদিকের অন্ধকারের মধ্যে দেখিতে পাইল, প্রলয়ের মূর্তি নাচিতেছে। সুরমা চারিদিক শূন্যময় দেখিতে লাগিল। সে একাকী সে-ঘরে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। বাহির হইয়া বিভার ঘরে আসিল।

বসন্ত রায় কাতর স্বরে কহিলেন, "দাদা এখনো ফিরিল না, কী হইবে?"

সুরমা দেয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "বিধাতা যাহা করেন।"

রামচন্দ্র রায় তখন মনে মনে তাঁহার পুরাতন ভৃত্য রামমোহনের সর্বনাশ করিতেছিলেন। কেন না, তাহা হইতেই এই সমস্ত বিপদ ঘটিল। তাহার যতপ্রকার

শাস্তি সম্ভব তাহার বিধান করিতেছিলেন। মাঝে মাঝে এক বার চৈতন্য হইতেছে যে, শাস্তি দিবার বুঝি আর অবসর থাকিবে না।

উদয়াদিত্য তরবারি হস্তে অন্তঃপুর অতিক্রম করিয়া রুদ্ধ দ্বারে গিয়া সবলে পদাঘাত করিলেন— কহিলেন, "কে আছিস ?"

বাহির হইতে উত্তর আসিল, "আজ্ঞা, আমি সীতারাম।"

যুবরাজ দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "শীঘ্র দ্বার খোলো।"

সে অবিলম্বে দ্বার খুলিয়া দিল। উদয়াদিত্য চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে সে জোড়হস্তে কহিল, "যুবরাজ মাপ করুন, আজ রাত্রে অন্তঃপুর হইতে কাহারও বাহির হইবার হুকুম নাই।"

যুবরাজ কহিল, "সীতারাম, তবে কি তুমিও আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে ? আচ্ছা তবে এস।" বলিয়া অসি নিষ্কাশিত করিলেন।

সীতারাম জোড়হস্তে কহিল, "না যুবরাজ, আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে পারিব না, আপনি দুইবার আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন।" বলিয়া তাঁহার পায়ের ধুলা মাথায় তুলিয়া লইল।

যুবরাজ কহিলেন, "তবে কী করিতে চাও শীঘ্র করো, আর সময় নাই।"

সীতারাম কহিল, "যে প্রাণ আপনি দুইবার রক্ষা করিয়াছেন, এবার তাহাকে বিনাশ করিবেন না। আমাকে নিরস্ত্র করুন। এই লউন আমার অস্ত্র। আমাকে আপাদমস্তক বন্ধন করুন। নহিলে মহারাজের নিকট কাল আমার রক্ষা নাই।"

যুবরাজ তাহার অস্ত্র লইলেন, তাহার কাপড় দিয়া তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিলেন। সে সেইখানে পড়িয়া রহিল, তিনি চলিয়া গেলেন। কিছুদূর গিয়া একটা অনতিউচ্চ প্রাচীরের মতো আছে। সে প্রাচীরের একটিমাত্র দ্বার, সে দ্বারও রুদ্ধ। সেই দ্বার অতিক্রম করিলেই একেবারে অন্তঃপুরের বাহিরে যাওয়া যায়। যুবরাজ দ্বারে আঘাত না করিয়া একেবারে প্রাচীরের উপর লাফ দিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, এক জন প্রহরী প্রাচীরে ঠেসান দিয়া দিব্য আরামে নিদ্রা যাইতেছে। অতি সাবধানে তিনি নামিয়া পড়িলেন। বিদ্যুদ্‌বেগে সেই নিদ্রিত প্রহরীর উপর গিয়া পড়িলেন। তাহার অস্ত্র কাড়িয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন ও সেই হতবুদ্ধি অভিভূত প্রহরীকে আপদমস্তক বাঁধিয়া ফেলিলেন। তাহার কাছে চাবি ছিল, সেই চাবি কাড়িয়া লইয়া দ্বার খুলিলেন। তখন প্রহরীর চৈতন্য হইল, বিস্মিত স্বরে কহিল, "যুবরাজ, করেন কী ?"

যুবরাজ কহিলেন, "অন্তঃপুরের দ্বার খুলিতেছি।"

প্রহরী কহিল, "কাল মহারাজের কাছে কী জবাব দিব ?"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "বলিস, যুবরাজ বলপূর্বক আমাদিগকে পরাভূত করিয়া অন্তঃপুরের দ্বার খুলিয়াছেন। তাহা হইলে খালাস পাইবি।"

উদয়াদিত্য অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া যে-ঘরে জামাতার লোকজন থাকে সেই-খানে উপস্থিত হইলেন। সে ঘরে কেবল রামমোহন ও রমাই ভাঁড় ঘুমাইতেছিল, আর বাকি সকলে আহারাদি করিয়া নৌকায় গিয়াছে। যুবরাজ ধীরে ধীরে রামমোহনকে স্পর্শ করিলেন। সে চমকিয়া লাফাইয়া উঠিল। বিস্মিত হইয়া কহিল, "এ কী ? যুবরাজ ?" যুবরাজ কহিলেন, "বাহিরে এস।" রামমোহন বাহিরে আসিল। রামমোহনকে যুবরাজ সমস্ত কহিলেন।

তখন রামমোহন মাথায় চাদর বাঁধিয়া লাঠি বাগাইয়া ধরিল, ক্রোধে স্ফীত হইয়া কহিল, "দেখিব লছমন সর্দার কতবড়ো লোক। যুবরাজ আমাদের মহারাজকে একবার কেবল আমার কাছে আনিয়া দিন। আমি একা এই লাঠি লইয়া এক-শ জন লোক ভাগাইতে পারি।"

যুবরাজ কহিলেন, "সে-কথা আমি মানি, কিন্তু যশোহরের রাজপ্রাসাদে এক শত অপেক্ষা অনেক অধিক লোক আছে। তুমি বলপূর্বক কিছু করিতে পারিবে না। অন্য কোনো উপায় দেখিতে হইবে।"

রামমোহন কহিল, "আচ্ছা, মহারাজকে একবার আমার কাছে আনুন, আমার পাশে তিনি দাঁড়াইলে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া উপায় ভাবিতে পারি।" তখন অন্তঃপুরে গিয়া উদয়াদিত্য রামচন্দ্রকে আহ্বান করিলেন। তিনি এবং তাঁহার সঙ্গে সকলেই আসিল।

রামচন্দ্র রামমোহনকে দেখিয়াই ক্রোধে অভিভূত হইয়া কহিলেন, "তোকে আমি এখনি ছাড়াইয়া দিলাম, তুই দূর হইয়া যা। তুই পুরানো লোক, তোকে আর অধিক কী শাস্তি দিব। যদি এ-যাত্রা বাঁচিয়া যাই তবে তোর মুখ আর আমি দেখিব না।" বলিতে বলিতে রামচন্দ্রের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। তিনি যথার্থই রামমোহনকে ভালোবাসিতেন, শিশুকাল হইতে রামমোহন তাঁহাকে পালন করিয়া আসিতেছে।

রামমোহন জোড়হাত করিয়া কহিল, "তুমি আমাকে ছাড়াইবার কে, মহারাজ ? আমার এ চাকরি ভগবান দিয়াছেন। যেদিন যমের তলব পড়িবে, সেদিন ভগবান আমার এ চাকরি ছাড়াইবেন। তুমি আমাকে রাখ না রাখ আমি তোমার চাকর।" বলিয়া সে রামচন্দ্রকে আগলাইয়া দাঁড়াইল।

উদয়াদিত্য কহিলেন, "রামমোহন, কী উপায় করিলে?" রামমোহন কহিল, "আপনার শ্রীচরণাশীর্বাদে এই লাঠিই উপায়। আর মা কালীর চরণ ভরসা।"

উদয়াদিত্য ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "ও উপায় কোনো কাজের নয়। আচ্ছা রামমোহন, তোমাদের নৌকা কোন্ দিকে আছে?"

রামমোহন কহিল, "রাজবাটীর দক্ষিণ পার্শ্বের খালে।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "চলো একবার ছাদে যাই।"

রামমোহনের মাথায় হঠাৎ একটা উপায় উপস্থিত হইল—সে কহিল, "হাঁ, ঠিক কথা, সেইখানে চলুন।"

সকলে প্রাসাদের ছাদে উঠিলেন। ছাদ হইতে প্রায় সত্তর হাত নিচে খাল। সেই খালে রামচন্দ্রের চৌষট্টি দাঁড়ের নৌকা ভাসিতেছে। রামমোহন কহিল, রামচন্দ্র রায়কে পিঠে বাঁধিয়া লইয়া সে সেইখানে ঝাঁপাইয়া পড়িবে।

বসন্ত রায় তাড়াতাড়ি শশব্যস্ত হইয়া রামমোহনকে ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, "না না না, সে কি হয়? রামমোহন, তুমি অমন অসম্ভব কাজ করিতে যাইয়ো না।"

বিভা চমকিয়া সত্রাসে বলিয়া উঠিল, "না মোহন, তুই ও কী বলিতেছিস।"

রামচন্দ্র বলিলেন, "না রামমোহন, তাহা হইবে না।"

তখন উদয়াদিত্য অন্তঃপুরে গিয়া কতকগুলা খুব মোটা বৃহৎ চাদর সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। রামমোহন সেগুলি পাকাইয়া বাঁধিয়া বাঁধিয়া একটা প্রকাণ্ড রজ্জুর মতো প্রস্তুত করিল। যেদিকে নৌকা ছিল, সেইদিককার ছাদের উপরের একটি ক্ষুদ্র স্তম্ভের সহিত রজ্জু বাঁধিল। রজ্জু নৌকার কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে গিয়া শেষ হইল। রামমোহন রামচন্দ্র রায়কে কহিল, "মহারাজ, আপনি আমার পিঠ জড়াইয়া ধরিবেন, আমি রজ্জু বাহিয়া নামিয়া পড়িব।" রামচন্দ্র তাহাতে অগত্যা সম্মত হইলেন। তখন রামমোহন সকলকে একে একে প্রণাম করিল ও সকলের পদধূলি লইল, কহিল, "জয় মা কালী।" রামচন্দ্রকে পিঠে তুলিয়া লইল, রামচন্দ্র চোখ বুজিয়া প্রাণপণে তাহার পিঠ আঁকড়িয়া ধরিলেন। বিভার দিকে চাহিয়া রামমোহন কহিল, "মা, তবে আমি চলিলাম। তোমার সন্তান থাকিতে কোনো ভয় করিয়ো না।"

রামমোহন রজ্জু আঁকড়াইয়া ধরিল। বিভা স্তম্ভে ভর দিয়া প্রাণপণে দাঁড়াইয়া রহিল। বৃদ্ধ বসন্ত রায় কম্পিত চরণে দাঁড়াইয়া চোখ বুজিয়া "দুর্গা" "দুর্গা" জপিতে লাগিলেন। রামমোহন রজ্জু বাহিয়া নামিয়া রজ্জুর শেষ প্রান্তে গেল। তখন সে হাত ছাড়িয়া দাঁত দিয়া রজ্জু কামড়াইয়া ধরিল ও রামচন্দ্রকে পৃষ্ঠ হইতে ছাড়াইয়া দুই

হস্তে ঝুলাইয়া অতি সাবধানে নৌকায় নামাইয়া দিল ও নিজেও লাফাইয়া পড়িল। রামচন্দ্র যেমন নৌকায় নামিলেন অমনি মূর্ছিত হইলেন। রামচন্দ্র যেমন নৌকায় নামিলেন, অমনি বিভা গভীর ও সুদীর্ঘ এক নিশ্বাস ফেলিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িল। বসন্ত রায় চোখ মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা, কী হইল ?" উদয়াদিত্য মূর্ছিত বিভাকে সস্নেহে কোলে করিয়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। সুরমা উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া কহিল, "এখন তোমার কী হইবে ?" উদয়াদিত্য কহিলেন, "আমার জন্য আমি ভাবি না।"

এদিকে নৌকা খানিক দূর গিয়া আটক পড়িল। বড়ো বড়ো শাল কাঠে খাল বদ্ধ ! এমন সময়ে সহসা প্রহরীরা দূর হইতে দেখিল, নৌকা পলাইয়া যায়। পাথর ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল, একটাও গিয়া পৌঁছিল না। প্রহরীদের হাতে তলোয়ার ছিল, বন্দুক ছিল না, এক জন বন্দুক আনিতে গেল। খোঁজ খোঁজ করিয়া বন্দুক জুটিল তো চকমকি জুটিল না। "ওরে বারুদ কোথায়— গুলি কোথায়" করিতে করিতে রামমোহন ও অনুচরগণ কাঠের উপর দিয়া নৌকা টানিয়া তুলিয়া লইয়া গেল। প্রহরীগণ অনুসরণ করিবার জন্য একটা নৌকা ডাকিতে গেল। যাহার উপরে নৌকা ডাকিবার ভার পড়িল পথের মধ্যে সে হরি মুদির দোকানে এক ছিলিম তামাক খাইয়া লইল ও রামশংকরকে তাহার বিছানা হইতে উঠাইয়া তাহার পাওনা টাকা শীঘ্র পাইবার জন্য তাগাদা করিয়া গেল। যখন নৌকার প্রয়োজন একেবারে ফুরাইল তখন হাঁকডাক করিতে করিতে নৌকা আসিল। বিলম্ব দেখিয়া সকলে নৌকা-আহ্বানকারীকে সুদীর্ঘ ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করিল। সে কহিল, "আমি তো আর ঘোড়া নই।" একে একে সকলের যখন ভর্ৎসনা করা ফুরাইল, তখন তাহাদের চৈতন্য হইল যে নৌকা ধরিবার আর কোনো সম্ভাবনা নাই। নৌকা আনিতে যে বিলম্ব হইয়াছিল, ভর্ৎসনা করিতে তাহার তিন গুণ বিলম্ব হইল। যখন রামচন্দ্রের নৌকা ভৈরব নদে গিয়া পৌঁছিল তখন ফর্নাণ্ডিজ এক তোপের আওয়াজ করিল। প্রত্যুষে প্রতাপাদিত্যের নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছিল। সেই তোপের শব্দে সহসা ঘুম ভাঙিয়া গেল। তিনি ডাকিয়া উঠিলেন, "প্রহরী।" কেহই আসিল না। দ্বারের প্রহরীগণ সেই রাত্রেই পলাইয়া গেছে। প্রতাপাদিত্য উচ্চতর স্বরে ডাকিলেন, "প্রহরী।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

প্রতাপাদিত্য ঘুম ভাঙিয়া উচ্চস্বরে ডাকিলেন, "প্রহরী।" যখন প্রহরী আসিল না, তখন অবিলম্বে শয্যা ত্যাগ করিয়া তিনি বিদ্যুদ্বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। ডাকিলেন, "মন্ত্রী।" একজন ভৃত্য ছুটিয়া গিয়া অবিলম্বে মন্ত্রীকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া আনিল।

"মন্ত্রী, প্রহরীরা কোথায় গেল?"

মন্ত্রী কহিলেন, "বহির্দ্বারের প্রহরীরা পলাইয়া গেছে।" মন্ত্রী দেখিলেন, মাথার উপরে বিপদ ঘনাইয়া আসিয়াছে। এই নিমিত্ত প্রতাপাদিত্যের কথার স্পষ্ট পরিষ্কার দ্রুত উত্তর দিলেন। যতই ঘুরাইয়া ও যতই বিলম্ব করিয়া তাঁহার কথার উত্তর দেওয়া হয়, ততই তিনি আগুন হইয়া উঠিতে থাকেন।

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "অন্তঃপুরের প্রহরীরা?"

মন্ত্রী কহিলেন, "আসিবার সময় দেখিলাম তাহারা হাতপা বাঁধা পড়িয়া আছে।" মন্ত্রী রাত্রির ব্যাপার কিছুই জানিতেন না। কী হইয়াছে কিছু অনুমান করিতে পারিতেছেন না। অথচ বুঝিয়াছেন, একটা কী ঘোরতর ব্যাপার ঘটিয়াছে; সে-সময়ে মহারাজকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করা অসম্ভব।

প্রতাপাদিত্য তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "রামচন্দ্র রায় কোথায়? উদয়াদিত্য কোথায়? বসন্ত রায় কোথায়?"

মন্ত্রী ধীরে ধীরে কহিলেন, "বোধ করি তাঁহারা অন্তঃপুরেই আছেন।"

প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "বোধ তো আমিও করিতে পারিতাম। তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম কী করিতে। যাহা বোধ করা যায় তাহা সকল সময়ে সত্য হয় না।"

মন্ত্রী কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। রমাপতির কাছে রাত্রের ঘটনা সমস্তই অবগত হইলেন। যখন শুনিলেন, রামচন্দ্র রায় পালাইয়া গেছেন, তখন তাঁহার বিশেষ ভাবনা উপস্থিত হইল। মন্ত্রী বাহিরে গিয়া দেখিলেন, খর্বকায় রমাই ভাঁড় গুড়ি মারিয়া বসিয়া আছে। মন্ত্রীকে দেখিয়া রমাই ভাঁড় কহিল, "এই যে মন্ত্রী জাম্বুবান।" বলিয়া দাঁত বাহির করিল। তাহার সেই দন্তপ্রধান হাস্যকে রামচন্দ্রের সভাসদেরা রসিকতা বলিত, বিভীষিকা বলিত না। মন্ত্রী তাহার সাদর সম্ভাষণ শুনিয়া কিছুই বলিলেন না, তাহার প্রতি দৃক্‌পাত করিলেন না। একজন ভৃত্যকে কহিলেন,

"ইহাকে লইয়া আয়।" মন্ত্রী ভাবিলেন, এই অপদার্থটাকে এই বেলা প্রতাপাদিত্যের ক্রোধের সামনে খাড়া করিয়া দিই। প্রতাপাদিত্যের বজ্র এক জন না এক জনের উপরে পড়িবেই— তা এই কলাগাছটার উপরেই পড়ুক, বাকি বড়ো বড়ো গাছ রক্ষা পাক্।

রমাইকে দেখিয়াই প্রতাপাদিত্য একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন। বিশেষত সে যখন প্রতাপাদিত্যকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য দাঁত বাহির করিয়া, অঙ্গভঙ্গী করিয়া একটা হাস্যরসের কথা কহিবার উপক্রম করিল, তখন প্রতাপাদিত্যের আর সহ্য হইল না। তিনি অবিলম্বে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দুই হাত নাড়িয়া দারুণ ঘৃণায় বলিয়া উঠিলেন, "দূর করো, দূর করো, উহাকে এখনই দূর করিয়া দাও। ওটাকে আমার সম্মুখে আনিতে কে কহিল?" প্রতাপাদিত্যের রাগের সহিত যদি ঘৃণার উদয় না হইত, তবে রমাই ভাঁড় এ-যাত্রা পরিত্রাণ পাইত না। কেন না ঘৃণ্য ব্যক্তিকে প্রহার করিতে গেলেও স্পর্শ করিতে হয়। রমাইকে তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া দেওয়া হইল।

মন্ত্রী কহিলেন, "মহারাজ, রাজজামাতা—"

প্রতাপাদিত্য অধীর ভাবে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "রামচন্দ্র রায়—"

মন্ত্রী কহিলেন, "হাঁ, তিনি কাল রাত্রে রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।"

প্রতাপাদিত্য দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন, "পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন! প্রহরীরা গেল কোথায়?"

মন্ত্রী পুনরায় কহিলেন, "বহির্দ্বারের প্রহরীরা পালাইয়া গেছে।"

প্রতাপাদিত্য মুষ্টিবদ্ধ করিয়া কহিলেন, "পালাইয়া গেছে? পালাইবে কোথায়? যেখানে থাকে তাহাদের খুঁজিয়া আনিতে হইবে। অন্তঃপুরের প্রহরীদের এখনই ডাকিয়া লইয়া এস।" মন্ত্রী বাহির হইয়া গেলেন।

রামচন্দ্র রায় যখন নৌকায় চড়িলেন তখনো অন্ধকার আছে। উদয়াদিত্য, বসন্ত রায়, সুরমা ও বিভা সে-রাত্রে আসিয়া আর বিছানায় শুইল না। বিভা একটি কথা না বলিয়া, একটি অশ্রু না ফেলিয়া অবসন্নভাবে শুইয়া রহিল, সুরমা তাহার কাছে বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। উদয়াদিত্য ও বসন্ত রায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অন্ধকার ঘরে পরস্পরের মুখ অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে। ঘরের মধ্যে যেন অদৃশ্য একজন কে— অন্ধকার বল, আশঙ্কা বল, অদৃষ্ট বল— বসিয়া আছে, তাহার নিশ্বাস-পতনের শব্দ শুনা যাইতেছে। সদানন্দ-হৃদয় বসন্ত রায় চারিদিকে নিরানন্দ দেখিয়া একেবারে আকুল হইয়া

পড়িয়াছেন। তিনি অনবরত টাকে হাত বুলাইতেছেন, চারিদিক দেখিতেছেন, ও ভাবিতেছেন— এ কী হইল। তাঁহার গোলমাল ঠেকিয়াছে, চারিদিককার ব্যাপার ভালোরূপ আয়ত্ত করিতে পারিতেছেন না। সমস্ত ঘটনা তাঁহার একটা জটিল দুঃস্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে। এক-একবার বসন্ত রায় উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া কাতর স্বরে কহিতেছেন, "দাদা।" উদয়াদিত্য কহিতেছেন, "কী দাদামহাশয়?" তাহার উত্তরে বসন্ত রায়ের আর কথা নাই। ওই এক "দাদা" সম্বোধনের মধ্যে একটি আকুল দিশাহারা হৃদয়ের বাক্যহীন সহস্র অব্যক্ত প্রশ্ন প্রকাশ পাইবার জন্য আঁকুবাঁকু করিতেছে। তাঁহার বিশেষ একটা কোনো প্রশ্ন নাই, তাঁহার সমস্ত কথার অর্থ এই— এ কী? চারিদিককার অন্ধকার এমনি গোলমাল করিয়া একটা কী ভাষায় তাঁহার কানের কাছে কথা কহিতেছে, তিনি কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। এমন সময়ে উদয়াদিত্যের সাড়া পাইলেও তাঁহার মনটা একটু স্থির হয়। থাকিয়া থাকিয়া তিনি সকাতরে উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া কহিলেন, "দাদা, আমার জন্যই কি এ-সমস্ত হইল?" তাঁহার বার বার মনে হইতেছে তাঁহাকে বিনাশ করিতে না পারাতেই এই সমস্ত ঘটিয়াছে। উদয়াদিত্যের তখন অধিক কথা কহিবার মতো ভাব নহে। তিনি কোমল স্বরে কহিলেন, "না দাদামহাশয়।" অনেকক্ষণ ঘর নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। থাকিয়া থাকিয়া বসন্ত রায় আবার বলিয়া উঠিলেন, "বিভা, দিদি আমার, তুই কথা কহিতেছিস না কেন?" বলিয়া বসন্ত রায় বিভার কাছে গিয়া বসিলেন। কিছু-ক্ষণ পরে বসন্ত রায় আবার বলিয়া উঠিলেন, "সুরমা, ও সুরমা।" সুরমা মুখ তুলিয়া চাহিল, আর কিছু বলিল না। বৃদ্ধ বসিয়া বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। একটা অনির্দেশ্য বিপদের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। সুরমা তখন স্থিরভাবে বসিয়া বিভার কপালে হাত বুলাইতেছিল, কিন্তু সুরমার হৃদয়ে যাহা হইতেছিল, তাহা অন্তর্যামীই দেখিতেছিলেন। সুরমা সেই অন্ধকারে একবার উদয়াদিত্যের মুখের দিকে চাহিল। তখন উদয়াদিত্য দেয়ালে মাথা রাখিয়া একমনে কী ভাবিতেছিলেন। সুরমার দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। আস্তে আস্তে মুছিয়া ফেলিল পাছে বিভা জানিতে পায়।

যখন চারিদিক আলো হইয়া আসিল তখন বসন্ত রায় নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। তখন তাঁহার মন হইতে একটা অনির্দেশ্য আশঙ্কার ভাব দূর হইল। তখন স্থিরচিত্তে সমস্ত ঘটনা একবার আলোচনা করিয়া দেখিলেন। তিনি বিভার ঘর হইতে উঠিয়া গেলেন। অন্তঃপুরের দ্বারে হাতপা-বাঁধা সীতারামের কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাকে কহিলেন, "দেখ সীতারাম, তোকে যখন প্রতাপ জিজ্ঞাসা করিবে, কে তোকে

বাঁধিয়াছে, তুই আমার নাম করিস। প্রতাপ জানে, এককালে বসন্ত রায় বলিষ্ঠ ছিল, সে তোর কথা বিশ্বাস করিবে।"

সীতারাম প্রতাপাদিত্যের কাছে কী জবাব দিবে, এতক্ষণ ধরিয়া তাহাই ভাবিতেছিল। এ সম্বন্ধে উদয়াদিত্যের নাম করিতে কোনোমতেই তাহার মন উঠিতেছিল না। সে একটা বাঁকা-পা তিন-চোখো তালবৃক্ষাকৃতি ভূতকে আসামী করিবে বলিয়া একবার স্থির করিয়াছিল, কিন্তু বসন্ত রায়কে পাইয়া নিরপরাধ ভূতটাকে খালাস দিল। বসন্ত রায়ের কথায় সে তৎক্ষণাৎ রাজি হইল। তখন তিনি দ্বিতীয় প্রহরীর নিকট গিয়া কহিলেন, "ভাগবত, প্রতাপ জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়ো বসন্ত রায় তোমাকে বাঁধিয়াছে।" সহসা ভাগবতের ধর্মজ্ঞান অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল, অসত্যের প্রতি নিতান্ত বিরাগ জন্মিল ; তাহার প্রধান কারণ, উদয়াদিত্যের প্রতি সে ভারি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

ভাগবত কহিল, "এমন কথা আমাকে আদেশ করিবেন না, ইহাতে আমার অধর্ম হইবে।"

বসন্ত রায় তাহার কাঁধে হাত দিয়া কহিলেন, 'ভাগবত, আমার কথা শুন ; ইহাতে কোনো অধর্ম নাই। সাধু লোকের প্রাণ বাঁচাইতে মিথ্যা কথা বলিতে যদি কোনো অধর্ম থাকিবে, তবে আমি কেন তোমাকে এমন অনুরোধ করিব ?" বসন্ত রায় তাহার কাঁধে হাত দিয়া পিঠে হাত দিয়া বার বার করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, ইহাতে কোনো অধর্ম নাই। কিন্তু লোকের যখন ধর্মজ্ঞান সহসা বিশেষ প্রবল হইয়া উঠে, তখন কোনো যুক্তিই তাহার কাছে খাটে না। সে কহিল, "না মহারাজ, মনিবের কাছে মিথ্যা কথা বলিব কী করিয়া।"

বসন্ত রায় বিষম অস্থির হইয়া উঠিলেন। ব্যাকুলভাবে কহিলেন, "ভাগবত, আমার কথা শুন, আমি তোমাকে বুঝাইয়া বলি, এ মিথ্যা কথায় কোনো পাপ নাই। দেখো বাপু, আমি তোমাকে পরে খুব খুশি করিব, তুমি আমার কথা রাখো। এই লও আমার কাছে যাহা আছে, এই দিলাম।"

ভাগবত তৎক্ষণাৎ হাত বাড়াইল ও সেই টাকাগুলা মুহূর্তের মধ্যে তাহার ট্যাঁকে আশ্রয় লাভ করিল। বসন্ত রায় কিয়ৎপরিমাণে নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

প্রতাপাদিত্যের নিকট প্রহরীদ্বয়ের ডাক পড়িয়াছে। মন্ত্রী তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। প্রতাপাদিত্য তখন তাঁহার উচ্ছ্বসিত ক্রোধ দমন করিয়া স্থির গম্ভীর ভাবে বসিয়া আছেন। প্রত্যেক কথা ধীরে ধীরে স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করিয়া কহিলেন, "কাল রাত্রে অন্তঃপুরের দ্বার খোলা হইল কী করিয়া ?"

সীতারামের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, সে জোড়হস্তে কহিল, "দোহাই মহারাজ, আমার কোনো দোষ নাই।"

মহারাজ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "সে-কথা তোকে কে জিজ্ঞাসা করিতেছে?"

সীতারাম তাড়াতাড়ি কহিল, "আজ্ঞা না, বলি মহারাজ, যুবরাজ— যুবরাজ আমাকে বলপূর্বক বাঁধিয়া অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়াছিলেন।" যুবরাজের নাম তাহার মুখ দিয়া কেমন হঠাৎ বাহির হইয়া গেল। ওই নামটা কোনোমতে করিবে না বলিয়া সে সর্বাপেক্ষা অধিক ভাবিয়াছিল, এই নিমিত্ত গোলমালে ওই নামটাই সর্বাগ্রে তাহার মুখাগ্রে উপস্থিত হইল। একবার যখন বাহির হইল তখন আর রক্ষা নাই।

এমন সময় বসন্ত রায় শুনিলেন, প্রহরীদের ডাক পড়িয়াছে। তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া প্রতাপাদিত্যের কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সীতারাম কহিতেছে, "যুবরাজকে আমি নিষেধ করিলাম, তিনি শুনিলেন না।"

বসন্ত রায় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ হাঁ সীতারাম, কী কহিলি? অধর্ম করিস নে, সীতারাম, ভগবান তোর 'পরে সন্তুষ্ট হইবেন। উদয়াদিত্যের ইহাতে কোনো দোষ নাই।"

সীতারাম তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল, "আজ্ঞা না, যুবরাজের কোনো দোষ নাই।"

প্রতাপাদিত্য দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "তবে তোর দোষ?"

সীতারাম কহিল, "আজ্ঞা না।"

"তবে কার দোষ?"

"আজ্ঞা মহারাজ—"

ভাগবতকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল, তখন সে সমস্ত কথা ঠিক করিয়া কহিল, কেবল সে যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল সেইটে গোপন করিল। বৃদ্ধ বসন্ত রায় চারিদিক ভাবিয়া কোনো উপায় দেখিলেন না। তিনি চোখ বুজিয়া মনে মনে "দুর্গা" "দুর্গা" কহিলেন। প্রহরীদ্বয়কে তৎক্ষণাৎ কর্মচ্যুত করা হইল। তাহাদের অপরাধ এই যে, তাহাদের যদি বলপূর্বক বাঁধিতে পারা যায় তবে তাহারা প্রহরী-বৃত্তি করিতে আসিয়াছে কী বলিয়া? এই অপরাধের জন্য তাহাদের প্রতি কশাঘাতের আদেশ হইল।

তখন প্রতাপাদিত্য বসন্ত রায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে কহিলেন, "উদয়াদিত্যের এ অপরাধের মার্জনা নাই!" এমনি ভাবে বলিলেন যেন উদয়াদিত্যের

সে অপরাধ বসন্ত রায়েরই। যেন তিনি উদয়াদিত্যকে সম্মুখে রাখিয়াই র্ভৎসনা করিতেছেন। বসন্ত রায়ের অপরাধ, তিনি উদয়াদিত্যকে প্রাণের অধিক ভালোবাসেন।

বসন্ত রায় তাড়াতাড়ি কহিয়া উঠিলেন, "বাবা প্রতাপ, উদয়ের ইহাতে কোনো দোষ নাই।"

প্রতাপাদিত্য আগুন হইয়া কহিলেন, "দোষ নাই? তুমি দোষ নাই বলিতেছ বলিয়াই তাহাকে বিশেষরূপে শাস্তি দিব। তুমি মাঝে পড়িয়া মীমাংসা করিতে আসিয়াছ কেন?"

বসন্ত রায় অত করিয়া উদয়াদিত্যের পক্ষ লইয়াছেন বলিয়াই প্রতাপাদিত্যের মন উদয়াদিত্যের বিশেষ বিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইল। বসন্ত রায় দেখিলেন, তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্যই পাছে উদয়াদিত্যকে শাস্তি দেওয়া হয়। চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে শান্ত হইয়া প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "যদি জানিতাম উদয়াদিত্যের কিছুমাত্র নিজের মনের জোর আছে, তাহার একটা মত আছে, একটা অভিপ্রায় আছে, যাহা করে, সব নিজে হইতেই করে, যদি না জানিতাম যে সে-নির্বোধটাকে যে খুশি ফুঁ দিয়া উড়াইয়া বেড়াইতে পারে, কটাক্ষের সংকেতে ঘুরাইয়া মারিতে পারে, তাহা হইলে তাহার আজ আর রক্ষা ছিল না। আমি যেখানে ওই পালকটাকে উড়িতে দেখিয়াছি, নিচের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছি ফুঁ দিতেছে কে। এইজন্য উদয়াদিত্যকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করে না। সে শাস্তিরও অযোগ্য। কিন্তু শোনো, পিতৃব্যঠাকুর, তুমি যদি দ্বিতীয়বার যশোহরে আসিয়া উদয়াদিত্যের সহিত দেখা কর তবে তাহার প্রাণ বাঁচানো দায় হইবে।"

বসন্ত রায় অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন; পরে ধীরে ধীরে উঠিয়া কহিলেন, "ভালো প্রতাপ, আজ সন্ধ্যাবেলায় তবে আমি চলিলাম।" আর একটি কথা না বলিয়া বসন্ত রায় ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন, বাহির হইয়া গিয়া গভীর এক নিশ্বাস ফেলিলেন।

প্রতাপাদিত্য স্থির করিয়াছেন, যে কেহ উদয়াদিত্যকে ভালোবাসে, উদয়াদিত্য যাহাদের বশীভূত, তাহাদিগকে উদয়াদিত্যের নিকট হইতে তফাত করিতে হইবে। মন্ত্রীকে কহিলেন, "বউমাকে আর রাজপুরীতে থাকিতে দেওয়া হইবে না, কোনো সূত্রে তাহাকে তাহার বাপের বাড়ি পাঠাইতে হইবে।" বিভার প্রতি প্রতাপাদিত্যের কোনো আশঙ্কা হয় নাই; হাজার হউক, সে বাড়ির মেয়ে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বসন্ত রায় উদয়াদিত্যের ঘরে আসিয়া কহিলেন, "দাদা, তোর সঙ্গে আর দেখা হইবে না।" বলিয়া উদয়াদিত্যকে বৃদ্ধ দুই হাতে জড়াইয়া ধরিলেন।

উদয়াদিত্য বসন্ত রায়ের হাত ধরিয়া কহিলেন, "কেন দাদামহাশয় ?"

বসন্ত রায় সমস্ত বলিলেন। কাঁদিয়া কহিলেন, "ভাই, তোকে আমি ভালোবাসি বলিয়াই তোর এত দুঃখ। তা তুই যদি সুখে থাকিস তো এ-কটা দিন আমি এক-রকম কাটাইয়া দিব।"

উদয়াদিত্য মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "না, তাহা কখনোই হইবে না। তোমাতে আমাতে দেখা হইবেই। তাহাতে কেহ বাধা দিতে পারিবে না। তুমি গেলে দাদামহাশয়, আমি আর বাঁচিব না।"

বসন্ত রায় ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, "প্রতাপ আমাকে বধ করিল না, তোকে আমার কাছ হইতে কাড়িয়া লইল। দাদা, আমি যখন চলিয়া যাইব, আমার পানে ফিরিয়া চাহিস নে, মনে করিস বসন্ত রায় মরিয়া গেল।"

উদয়াদিত্য শয়নকক্ষে সুরমার নিকটে গেলেন। বসন্ত রায় বিভার কাছে গিয়া বিভার চিবুক ধরিয়া কহিলেন, "বিভা, দিদি আমার, একবার ওঠ্। বুড়ার এই মাথাটায় একবার ওই হাত বুলাইয়া দে।" বিভা উঠিয়া বসিয়া দাদামহাশয়ের মাথা লইয়া পাকা চুল তুলিয়া দিতে লাগিল।

উদয়াদিত্য সুরমাকে সমস্ত কহিলেন ও বলিলেন, "সুরমা, পৃথিবীতে আমার যাহা-কিছু অবশিষ্ট আছে তাহাই কাড়িয়া লইবার জন্য যেন একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে।" সুরমার হাত ধরিয়া কহিলেন, "সুরমা, তোমাকে যদি কেহ আমার কাছ হইতে ছিনিয়া লইয়া যায় ?"

সুরমা দৃঢ়ভাবে উদয়াদিত্যকে আলিঙ্গন করিয়া দৃঢ়স্বরে কহিল, "সে যম পারে, আর কেহ পারে না।"

সুরমার মনেও অনেকক্ষণ ধরিয়া সেইরূপ একটা আশঙ্কা জন্মিতেছে। সে যেন দেখিতে পাইতেছে, একটা কঠোর হস্ত তাহার উদয়াদিত্যকে তাহার কাছ হইতে সরাইয়া দিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। সে মনে মনে উদয়াদিত্যকে প্রাণপণে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল, মনে মনে কহিল, 'আমি ছাড়িব না, আমাকে কেহ ছাড়াইতে পারিবে না।'

সুরমা আবার কহিল, "আমি অনেকক্ষণ হইতে ভাবিয়া রাখিয়াছি আমাকে তোমার কাছ হইতে কেহই লইতে পারিবে না।"

সুরমা ওই কথা বার বার করিয়া বলিল। সে মনের মধ্যে বল সঞ্চয় করিতে চায়, যে-বলে সে উদয়াদিত্যকে দুই বাহু দিয়া এমন জড়াইয়া থাকিবে যে, কোনো পার্থিব শক্তি তাহাদের বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। বার বার ওই কথা বলিয়া মনকে সে বজ্রের বলে বাঁধিতেছে।

উদয়াদিত্য সুরমার মুখের দিকে চাহিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "সুরমা, দাদামহাশয়কে আর দেখিতে পাইব না।"

সুরমা নিশ্বাস ফেলিল।

উদয়াদিত্য কহিলেন, "আমি নিজের কষ্টের জন্য ভাবি না সুরমা, কিন্তু দাদামহাশয়ের প্রাণে যে বড়ো বাজিবে। দেখি বিধাতা আরো কী করেন। তাঁর আরো কী ইচ্ছা আছে।"

উদয়াদিত্য বসন্ত রায়ের কত গল্প করিলেন।

বসন্ত রায় কোথায় কী কহিয়াছিলেন, কোথায় কী করিয়াছিলেন সমুদায় তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। বসন্ত রায়ের করুণ হৃদয়ের কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ, কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা, তাঁহার স্মৃতির ভাণ্ডারে ছোটো ছোটো রত্নের মতো জমা করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাই আজ একে একে সুরমার কাছে বাহির করিতে লাগিলেন।

সুরমা কহিল, "আহা, দাদামহাশয়ের মতো কি আর লোক আছে।"

সুরমা ও উদয়াদিত্য বিভার ঘরে গেলেন।

তখন বিভা তাহার দাদামহাশয়ের পাকা চুল তুলিতেছে, ও তিনি বসিয়া গান গাহিতেছেন,

"ওরে, যেতে হবে, আর দেরি নাই,
পিছিয়ে পড়ে রবি কত, সঙ্গীরা তোর গেল সবাই।
আয় রে ভবের খেলা সেরে, আঁধার করে এসেছে রে,
(ওরে) পিছন ফিরে বারে বারে কাহার পানে চাহিস রে ভাই।
খেলতে এল ভবের নাটে, নতুন লোকে নতুন খেলা,
হেথা হতে আয় রে সরে, নইলে তোরে মারবে ঢেলা,
নামিয়ে দে রে প্রাণের বোঝা, আর এক দেশে চল্ রে সোজা,
(সেথা) নতুন করে বাঁধবি বাসা, নতুন খেলা খেলবি সে ঠাঁই।"

উদয়াদিত্যকে দেখিয়া বসন্ত রায় হাসিয়া কহিলেন, "দেখো ভাই, বিভা আমাকে

ছাড়িতে চায় না। কী জানি আমাকে উহার কিসের আবশ্যক। এক কালে যে দুধ ছিল, বুড়া হইয়া সে ঘোল হইয়া উঠিয়াছে, তা বিভা দুধের সাধ ঘোলে মিটাইতে চায় কেন? আমি যাব শুনিয়া বিভা কাঁদে! এমন আর কখনো শুনিয়াছ? আমি ভাই বিভার কান্না দেখিতে পারি না।" বলিয়া গাহিতে লাগিলেন,

"আমার যাবার সময় হল,
আমায় কেন রাখিস ধরে,
চোখের জলের বাঁধন দিয়ে
বাঁধিস নে আর মায়াডোরে।
ফুরিয়েছে জীবনের ছুটি,
ফিরিয়ে নে তোর নয়ন দুটি,
নাম ধরে আর ডাকিস নে ভাই,
যেতে হবে ত্বরা করে।"

"ওই দেখো, ওই দেখো বিভার রকম দেখো। দেখ্ বিভা, তুই যদি অমন করিয়া কাঁদিবি তো—" বলিতে বলিতে বসন্ত রায়ের আর কথা বাহির হইল না। তিনি বিভাকে শাসন করিতে গিয়া নিজেকে আর সামলাইতে পারিলেন না, তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া হাসিয়া কহিলেন, "দাদা, ওই দেখো ভাই, সুরমা কাঁদিতেছে। এই বেলা ইহার প্রতিবিধান করো; নহিলে আমি সত্য সত্যই থাকিয়া যাইব, তোমার জায়গাটি দখল করিয়া বসিব। ওই দুই হাতে পাকা চুল তোলাইব, ওই কানের কাছে এই ভাঙা দাঁতের পাটির মধ্য হইতে ফিসফিস করিব, আর কানের অত কাছে গিয়া আর যদি কোনো প্রকার অঘটন সংঘটন হয় তবে তাহার দায়ী আমি হইব না।"

বসন্ত রায় দেখিলেন, কেহ কোনো কথা কহিল না, তখন তিনি কাতর হইয়া তাঁহার সেতারটা তুলিয়া লইয়া ঝন্ ঝন্ করিয়া বিষম বেগে বাজাইতে শুরু করিলেন। কিন্তু বিভার চোখের জল দেখিয়া তাঁহার সেতার বাজাইবার বড়োই ব্যাঘাত হইতে লাগিল, তাঁহার চোখ মাঝে মাঝে ঝাপসা হইয়া আসিতে লাগিল, মাঝে মাঝে বিভাকে এবং উপস্থিত সকলকে তিরস্কারচ্ছলে রাশ রাশ কথা বলিবার বাসনা হইতে লাগিল, কিন্তু আর কথা জোগাইল না, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, সেতার বন্ধ করিয়া নামাইয়া রাখিতে হইল। অবশেষে বিদায়ের সময় আসিল।

উদয়াদিত্যকে দীর্ঘকাল আলিঙ্গন করিয়া শেষ কথা এই বলিয়া গেলেন, "এই সেতার রাখিয়া গেলাম দাদা, আর সেতার বাজাইব না। সুরমা ভাই সুখে থাকো। বিভা—" কথা শেষ হইল না, অশ্রু মুছিয়া পালকিতে উঠিলেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

মঙ্গলার কুটির যশোহরের এক প্রান্তে ছিল। সেইখানে বসিয়া সে মালা জপ করিতেছিল। এমন সময়ে শাকসবজির চুবড়ি হাতে করিয়া রাজবাটীর দাসী মাতঙ্গিনী আসিয়া উপস্থিত হইল।

মাতঙ্গ কহিল, "আজ হাটে আসিয়াছিলাম, অমনি ভাবিলাম, অনেকদিন মঙ্গলা দিদিকে দেখি নাই, তা একবার দেখিয়া আসি গে। আজ ভাই অনেক কাজ আছে, অধিকক্ষণ থাকিতে পারিব না।" বলিয়া চুবড়ি রাখিয়া নিশ্চিন্তভাবে সেইখানে বসিল। "তা দিদি, তুমি তো সব জানই, সেই মিনসে আমাকে বড়ো ভালোবাসিত, ভালো এখনো বাসে তবে আর-একজন কার 'পরে তার মন গিয়াছে আমি টের পাইয়াছি— তা সেই মাগীটার ত্রিরাত্রির মধ্যে মরণ হয় এমন করিতে পার না?"

মঙ্গলার নিকট গোরু হারানো হইতে স্বামী হারানো পর্যন্ত সকল প্রকার দুর্ঘটনারই ঔষধ আছে, তা ছাড়া সে বশীকরণের এমন উপায় জানে যে, রাজবাটীর বড়ো বড়ো ভৃত্য মঙ্গলার কুটিরে কত গণ্ডা গণ্ডা গড়াগড়ি যায়! যে-মাগীটার ত্রিরাত্রির মধ্যে মরণ হইলে মাতঙ্গিনী বাঁচে সে আর কেহ নহে স্বয়ং মঙ্গলা।

মঙ্গলা মনে মনে হাসিয়া কহিল, "সে মাগীর মরিবার জন্য বড়ো তাড়াতাড়ি পড়ে নাই, যমের কাজ বাড়াইয়া তবে সে মরিবে।" মঙ্গলা হাসিয়া প্রকাশ্যে কহিল, "তোমার মতন রূপসীকে ফেলিয়া আর কোথাও মন যায় এমন অরসিক আছে নাকি? তা নাতিনী, তোমার ভাবনা নাই। তাহার মন তুমি ফিরিয়া পাইবে। তোমার চোখের মধ্যেই ঔষধ আছে, একটু বেশি করিয়া প্রয়োগ করিয়া দেখিয়ো, তাহাতেও যদি না হয় তবে এই শিকড়টি তাহাকে পানের সঙ্গে খাওয়াইয়ো।" বলিয়া এক শুকনো শিকড় আনিয়া দিল।

মঙ্গলা মাতঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "বলি রাজবাটীর খবর কী?"

মাতঙ্গিনী হাত উল্টাইয়া কহিল, "সে-সব কথায় আমাদের কাজ কী ভাই?"

মঙ্গলা কহিল, "ঠিক কথা। ঠিক কথা।"

মঙ্গলার যে এ বিষয়ে সহসা মতের এতটা ঐক্য হইয়া যাইবে, তাহা মাতঙ্গিনী আশা করে নাই। সে কিঞ্চিৎ ফাঁপরে পড়িয়া কহিল, "তা, তোমাকে বলিতে দোষ নাই। তবে আজ আমার বড়ো সময় নাই, আর-একদিন সমস্ত বলিব।" বলিয়া বসিয়া রহিল।

মঙ্গলা কহিল, "তা বেশ, আর-একদিন শুনা যাইবে।"

মাতঙ্গিনী অধীর হইয়া পড়িল, কহিল, "তবে আমি যাই ভাই। দেরি করিলাম বলিয়া আবার কত বকুনি খাইতে হইবে। দেখো ভাই, সেদিন আমাদের ওখানে রাজার জামাই আসিয়াছিলেন, তা তিনি যেদিন আসিয়াছিলেন সেই রাত্রেই কাহাকে না বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন।"

মঙ্গলা কহিল, "সত্যি নাকি? বটে। কেন বলো দেখি? তাই বলি, মাতঙ্গ না হইলে আমাকে ভিতরকার খবর কেহ দিতে পারে না।"

মাতঙ্গ প্রফুল্ল হইয়া কহিল, "আসল কথা কী জান? আমাদের যে বউ-ঠাকরুনটি আছেন, তিনি দুটি চক্ষে কাহারো ভালো দেখিতে পারেন না। তিনি কী মন্তর জানেন, সোয়ামিকে একেবারে ভেড়ার মতন করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি— না ভাই, কাজ নাই, কে কোথা দিয়া শুনিবে আর বলিবে মাতঙ্গ রাজবাড়ির কথা বাহিরে বলিয়া বেড়ায়।"

মঙ্গলা আর কৌতূহল সামলাইতে পারিল না; যদিও সে জানিত, আর খানিক ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলে মাতঙ্গ আপনি সমস্ত বলিবে, তবু তাহার বিলম্ব সহিল না, কহিল, "এখানে কোনো লোক নাই নাতনী। আর আপনা-আপনির মধ্যে কথা, ইহাতে আর দোষ কী? তা তোমাদের বউ-ঠাকরুন কী করিলেন?"

"তিনি আমাদের দিদি-ঠাকরুনের নামে জামাইয়ের কাছে কী সব লাগাইয়াছিলেন, তাই জামাই রাতারাতিই দিদি-ঠাকরুনকে ফেলিয়া চলিয়া গেছেন। দিদি-ঠাকরুন তো কাঁদিয়া কাটিয়া অনাত্ত করিতেছেন। মহারাজা খাপা হইয়া উঠিয়াছেন, তিনি বউ-ঠাকরুনকে শ্রীপুরে বাপের বাড়িতে পাঠাইতে চান। ওই দেখো ভাই, তোমার সকল কথাতেই হাসি। ইহাতে হাসিবার কী পাইলে? তোমার যে আর হাসি ধরে না।"

রামচন্দ্র রায়ের পলায়নবার্তার যথার্থ কারণ রাজবাটীর প্রত্যেক দাসদাসী সঠিক অবগত ছিল, কিন্তু কাহারও সহিত কাহারও কথার ঐক্য ছিল না।

মঙ্গলা কহিল, "তোমাদের মা-ঠাকরুনকে বলিয়ো যে, বউ-ঠাকরুনকে শীঘ্র বাপের বাড়ি পাঠাইয়া কাজ নাই। মঙ্গলা এমন ওষুধ দিতে পারে যাহাতে যুবরাজের মন তাঁহার উপর হইতে একেবারে চলিয়া যায়।" বলিয়া সে খল খল করিয়া হাসিতে লাগিল। মাতঙ্গ কহিল, "তা বেশ কথা।"

মঙ্গলা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের বউ-ঠাকরুনকে কি যুবরাজ বড়ো ভালোবাসেন?"

"সে কথায় কাজ কী। এক দণ্ড না দেখিলে থাকিতে পারেন না। যুবরাজকে 'তু' বলিয়া ডাকিলেই আসেন।"

"আচ্ছা আমি ওষুধ দিব। দিনের বেলাও কি যুবরাজ তাঁহার কাছেই থাকেন?"

"হাঁ।"

মঙ্গলা কহিল, "ও মা কী হইবে। তা সে যুবরাজকে কী বলে, কী করে, দেখিয়াছিস?"

"না ভাই, তাহা দেখি নাই।"

"আমাকে একবার রাজবাটীতে লইয়া যাইতে পারিস, আমি তাহা হইলে একবার দেখিয়া আসি।"

মাতঙ্গ কহিল, "কেন ভাই, তোমার এত মাথাব্যথা কেন?"

মঙ্গলা কহিল, "বলি তা নয়। একবার দেখিলেই বুঝিতে পারিব, কী মন্ত্রে সে বশ করিয়াছে, আমার মন্ত্র খাটিবে কি না।"

মাতঙ্গ কহিল, "তা বেশ, আজ তবে আসি।" বলিয়া চুবড়ি লইয়া চলিয়া গেল।

মাতঙ্গ চলিয়া গেলে মঙ্গলা যেন ফুলিতে লাগিল। দাঁতে দাঁত লাগাইয়া চক্ষুতারকা প্রসারিত করিয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া বকিতে লাগিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বসন্ত রায় চলিয়া গেলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। বিভা প্রাসাদের ছাদের উপর গেল। ছাদের উপর হইতে দেখিল, পালকি চলিয়া গেল। বসন্ত রায় পালকির মধ্য হইতে মাথাটি বাহির করিয়া একবার মুখ ফিরাইয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে চোখের জলের মধ্য হইতে পরিবর্তনহীন অবিচলিত পাষাণহৃদয় রাজবাটীর দীর্ঘ কঠোর দেয়ালগুলা ঝাপসা ঝাপসা দেখিতে পাইলেন। পালকি চলিয়া গেল, কিন্তু বিভা সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। পথের পানে চাহিয়া রহিল। তারাগুলি উঠিল, দীপগুলি জ্বলিল, পথে লোক রহিল না। বিভা দাঁড়াইয়া চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। সুরমা তাহাকে সারা দেশ খুঁজিয়া কোথাও না পাইয়া অবশেষে ছাদে গিয়া উপস্থিত হইল। বিভার গলা ধরিয়া স্নেহের স্বরে কহিল, "কী দেখিতেছিস্ বিভা?" বিভা নিশ্বাস ফেলিয়া

কহিল, "কে জানে ভাই।" বিভা সমস্তই শূন্যময় দেখিতেছে, তাহার প্রাণে সুখ নাই। সে কেন যে ঘরের মধ্যে যায়, কেন যে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসে, কেন শুইয়া পড়ে, কেন উঠিয়া যায়, কেন দুই প্রহর মধ্যাহ্নে বাড়ির এ-ঘরে ও-ঘরে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার কারণ খুঁজিয়া পায় না। রাজবাড়ি হইতে তাহার বাড়ি চলিয়া গেছে যেন, রাজবাড়িতে যেন তাহার ঘর নাই। অতি ছেলেবেলা হইতে নানা খেলাধুলা, নানা সুখদুঃখ হাসিকান্নায় মিলিয়া রাজবাটীর মধ্যে তাহার জন্য যে একটি সাধের ঘর বাঁধিয়া দিয়াছিল, সে ঘরটি একদিনে কে ভাঙিয়া দিল রে। এ ঘর তো আর তাহার ঘর নয়। সে এখন গৃহের মধ্যেই গৃহহীন। তাহার দাদামহাশয় ছিল, গেল; তাহার— চন্দ্রদ্বীপ হইতে বিভাকে লইতে কবে লোক আসিবে? হয়তো রামমোহন মাল রওনা হইয়াছে, এতক্ষণে তাহারা না জানি কোথায়। বিভার সুখের এখনো কিছু অবশিষ্ট আছে। তাহার অমন দাদা আছে, তাহার প্রাণের সুরমা আছে, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধেও যেন একটা কী বিপদ ছায়ার মতো পশ্চাতে ফিরিতেছে। যে-বাড়ির ভিটা ভেদ করিয়া একটা ঘন ঘোর গুপ্ত রহস্য অদৃশ্যভাবে ধূমায়িত হইতেছে সে বাড়িকে কি আর ঘর বলিয়া মনে হয়?

উদয়াদিত্য শুনিলেন, কর্মচ্যুত হইয়া সীতারামের দুর্দশা হইয়াছে। একে তাহার এক পয়সার সম্বল নাই, তাহার উপর তাহার অনেকগুলি গলগ্রহ জুটিয়াছে। কারণ যখন সে রাজবাড়ি হইতে মোটা মাহিয়ানা পাইত, তখন তাহার পিসা সহসা স্নেহের আধিক্যবশত কাজকর্ম সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া তাহার স্নেহাস্পদের বিরহে কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। মিলনের সুব্যবস্থা করিয়া লইয়া আনন্দে গদ্গদ হইয়া কহিল যে, সীতারামকে দেখিয়াই তাহার ক্ষুধাতৃষ্ণা সমস্ত দূর হইয়াছে। ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর হওয়ার বিষয়ে অনেক প্রমাণ আছে, কিন্তু কেবল সীতারামকে দেখিয়াই হইত কিনা, সে-বিষয়ে কোনো প্রমাণ নাই। সীতারামের এক দূরসম্পর্কের বিধবা ভগিনী তাহার এক পুত্রকে কাজকর্মে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময়ে সহসা তাহার চৈতন্য হইল যে, বাছাকে ছোটো কাজে নিযুক্ত করিলে বাছার মামাকে অপমান করা হয়। এই বুঝিয়া সে বাছার মামার মান রক্ষা করিবার জন্য কোনোমতে সে-কাজ করিতে পারিল না। এইরূপে সে মান রক্ষা করিয়া সীতারামকে ঋণী করিল ও তাহার বিনিময়ে আপনার প্রাণরক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া লইল। ইহার উপর সীতারামের বিধবা মাতা আছে ও এক অবিবাহিতা বালিকা কন্যা আছে। এদিকে আবার সীতারাম লোকটি অতিশয় শৌখিন, আমোদপ্রমোদটি নহিলে তাহার চলে না। সীতারামের অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে, অথচ তাহার সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক পরিবর্তন কিছুই হয় নাই।

তাহার পিসার ক্ষুধাতৃষ্ণা ঠিক সমান রহিয়াছে; তাহার ভাগিনেয়টির যতই বয়স বাড়িতেছে, ততই তাহার উদরের প্রসর ও মামার মান-অপমানের প্রতি দৃষ্টি অধিক করিয়া বাড়িতেছে। সীতারামের টাকার থলি ব্যতীত আর কাহারও উদর কমিবার কোনো লক্ষণ প্রকাশ করিতেছে না। সীতারামের অন্যান্য গলগ্রহের সঙ্গে শখটিও বজায় আছে, সেটি ধারের উপর বর্ধিত হইতেছে, সুদও যে-পরিমাণে পুষ্ট হইতেছে, সেও সেই পরিমাণে পুষ্ট হইয়া উঠিতেছে। উদয়াদিত্য সীতারামের দারিদ্র্যদশা শুনিয়া তাহার ও ভাগবতের মাসিক বৃত্তি নির্ধারণ করিয়া দিলেন। সীতারাম টাকাটা পাইয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িল। মহারাজার নিকট উদয়াদিত্যের নাম করিয়া অবধি সে নিজের কাছে ও উদয়াদিত্যের কাছে নিতান্ত অপরাধী হইয়া আছে। উদয়াদিত্যের টাকা পাইয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। একদিন যুবরাজের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহাকে ভগবান, জগদীশ্বর, দয়াময় সম্বোধন করিয়া বিস্তর ক্ষমা চাহিল। ভাগবত লোকটা অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির। সে শতরঞ্চ খেলে, তামাক খায় ও প্রতিবেশীদিগকে স্বর্গনরকের জমি বিলি করিয়া দেয়। সে যখন উদয়াদিত্যের টাকা পাইল, তখন মুখ বাঁকাইয়া নানা ভাবভঙ্গীতে জানাইল যে যুবরাজ তাহার যে সর্বনাশ করিয়াছেন এ টাকাতে তাহার কী প্রতিশোধ হইবে। টাকাটা লইতে সে কিছুমাত্র আপত্তি করিল না।

যুবরাজ কর্মচ্যুত প্রহরীদ্বয়কে মাসিক বৃত্তি দিতেছেন, এ-কথা প্রতাপাদিত্যের কানে গেল। আগে হইলে যাইত না। আগে তিনি উদয়াদিত্যকে এত অবহেলা করিতেন যে, উদয়াদিত্য সম্বন্ধে সকল কথা তাঁহার কানে যাইত না। মহারাজ জানিতেন যে, উদয়াদিত্য প্রজাদের সহিত মিশিতেন, এবং অনেক সময়ে প্রজাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, কিন্তু সেগুলি প্রায় এমন সামান্য ও এমন অল্পে অল্পে তাহা তাঁহার সহিয়া আসিয়াছিল যে, বিশেষ একটা কিছু না হইলে উদয়াদিত্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিত না। এইবার উদয়াদিত্যের প্রতি তাঁহার একটু বিশেষ মনোযোগ পড়িয়াছে, তাই উপরি-উক্ত ঘটনাটি অবিলম্বে তাঁহার কানে গেল। শুনিয়া প্রতাপাদিত্য অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন। উদয়াদিত্যকে ডাকাইয়া আনিলেন ও কহিলেন, "আমি যে সীতারামকে ও ভাগবতকে কর্মচ্যুত করিলাম, সে কি কেবল রাজকোষে তাহাদের বেতন দিবার উপযুক্ত অর্থ ছিল না বলিয়া? তবে যে তুমি নিজের হইতে তাহাদের মাসিক বৃত্তি নির্ধারণ করিয়া দিয়াছ?"

উদয়াদিত্য ধীরে ধীরে কহিলেন, "আমি দোষী। আপনি তাহাদের দণ্ড দিয়া

আমাকে দণ্ডিত করিয়াছেন। আমি আপনার সেই বিচার অনুসারে মাসে মাসে তাহাদের নিকট দণ্ড দিয়া থাকি।"

ইতিপূর্বে কখনোই প্রতাপাদিত্যকে উদয়াদিত্যের কথা মনোযোগ দিয়া শুনিতে হয় নাই। উদয়াদিত্যের ধীর গম্ভীর বিনীত স্বর ও তাঁহার সুসংযত কথাগুলি প্রতাপাদিত্যের নিতান্ত মন্দ লাগিল না। উদয়াদিত্যের কথার কোনো উত্তর না দিয়া প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "আমি আদেশ করিতেছি উদয়, ভবিষ্যতে তাহাদের যেন আর অর্থসাহায্য না করা হয়।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "আমার প্রতি আরো গুরুতর শাস্তির আদেশ হইল।" হাত জোড় করিয়া কহিলেন, "কিন্তু এমন কি অপরাধ করিয়াছি, যাহাতে এতবড়ো শাস্তি আমাকে বহন করিতে হইবে? আমি কী করিয়া দেখিব, আমার জন্য আট-নয়টি ক্ষুধিত মুখে অন্ন জুটিতেছে না, আট-নয়টি হতভাগা নিরাশ্রয় হইয়া পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতেছে, অথচ আমার পাতে অন্নের অভাব নাই? পিতা, আমার যাহা-কিছু সব আপনারই প্রসাদে। আপনি আমার পাতে আবশ্যকের অধিক অন্ন দিতেছেন, কিন্তু আপনি যদি আমার আহারের সময় আমার সম্মুখে আট-নয়টি ক্ষুধিত কাতরকে বসাইয়া রাখেন, অথচ তাহাদের মুখে অন্ন তুলিয়া দিতে বাধা দেন, তবে সে অন্ন যে আমার বিষ।"

উত্তেজিত উদয়াদিত্যকে প্রতাপাদিত্য কথা কহিবার সময় কিছুমাত্র বাধা দিলেন না, সমস্ত কথা শেষ হইলে পর আস্তে আস্তে কহিলেন, "তোমার যা বক্তব্য তাহা শুনিলাম, এক্ষণে আমার যা বক্তব্য তাহা বলি। ভাগবত ও সীতারামের বৃত্তি আমি বন্ধ করিয়া দিয়াছি, আর কেহ যদি তাহাদের বৃত্তি নির্ধারণ করিয়া দেয়, তবে সে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারী বলিয়া গণ্য হইবে।" প্রতাপাদিত্যের মনে মনে বিশেষ একটু রোষের উদয় হইয়াছিল। সম্ভবত তিনি নিজেও তাহার কারণ বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু তাহার কারণ এই 'আমি যেন ভারি একটা নিষ্ঠুরতা করিয়াছি, তাই দয়ার শরীর উদয়াদিত্য তাহার প্রতিবিধান করিতে আসিলেন। দেখি, তিনি দয়া করিয়া কী করিতে পারেন। আমি যেখানে নিষ্ঠুর সেখানে আর যে কেহ দয়ালু হইবে, এতবড়ো আস্পর্ধা কাহার প্রাণে সয়!"

উদয়াদিত্য সুরমার কাছে গিয়া সমস্ত কহিলেন। সুরমা কহিল, "সেদিন সমস্ত দিন কিছু খাইতে পায় নাই, সন্ধ্যাবেলায় সীতারামের মা সীতারামের ছোটো মেয়েটিকে লইয়া আমার কাছে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। আমি সেই সন্ধ্যাবেলায় কিছু দিই, তবে তাহারা সমস্ত পরিবার খাইতে পায়। সীতারামের মেয়েটি দুধের

মেয়ে, সমস্ত দিন কিছু খায় নাই, তাহার মুখপানে কি তাকানো যায়। ইহাদের কিছু কিছু না দিলে ইহারা যাইবে কোথায় ?"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "বিশেষত রাজবাটী হইতে যখন তাহারা তাড়িত হইয়াছে, তখন পিতার ভয়ে অন্য কেহ তাহাদের কর্ম দিতে বা সাহায্য করিতে সাহস করিবে না, এ-সময়ে আমরাও যদি বিমুখ হই তাহা হইলে তাহাদের আর সংসারে কেহই থাকিবে না। সাহায্য আমি করিবই, তাহার জন্য ভাবিয়ো না সুরমা, কিন্তু অনর্থক পিতাকে অসন্তুষ্ট করা ভালো হয় না, যাহাতে এ-কাজটা গোপনে সমাধা করা যায়, তাহার উপায় করিতে হইবে।"

সুরমা উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া কহিল, "তোমাকে আর কিছু করিতে হইবে না, আমি সমস্ত করিব। আমার উপরে ভার দাও।" সুরমা নিজেকে দিয়া উদয়াদিত্যকে ঢাকিয়া রাখিতে চায়। এই বৎসরটা উদয়াদিত্যের দুর্বৎসর পড়িয়াছে। অদৃষ্ট তাঁহাকে যে-কাজেই প্রবৃত্ত করাইতেছে, সবগুলিই তাঁহার পিতার বিরুদ্ধে; অথচ সেগুলি এমন কাজ যে, সুরমার মতো স্ত্রী প্রাণ ধরিয়া স্বামীকে সে-কাজ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে না। সুরমা তেমন স্ত্রী নহে। স্বামী যখন ধর্মযুদ্ধে যান, তখন সুরমা নিজের হাতে তাঁহার বর্ম বাঁধিয়া দেয়, তাহার পর ঘরে গিয়া সে কাঁদে। সুরমার প্রাণ প্রতি পদে ভয়ে আকুল হইয়াছে, অথচ উদয়াদিত্যকে সে প্রতি পদে ভরসা দিয়াছে। উদয়াদিত্য ঘোর বিপদের সময় সুরমার মুখের দিকে চাহিয়াছেন, দেখিয়াছেন সুরমার চোখে জল, কিন্তু সুরমার হাত কাঁপে নাই, সুরমার পদক্ষেপ অটল।

সুরমা তাঁহার এক বিশ্বস্তা দাসীর হাত দিয়া সীতারামের মায়ের কাছে ও ভাগবতের স্ত্রীর কাছে বৃত্তি পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। দাসী বিশ্বস্তা বটে, কিন্তু মঙ্গলার কাছে এ-কথা গোপন রাখিবার সে কোনো আবশ্যক বিবেচনা করে নাই। এই নিমিত্ত মঙ্গলা ব্যতীত বাহিরের আর কেহ অবগত ছিল না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

যখন গোপনে বৃত্তি পাঠানোর কথা প্রতাপাদিত্যের কানে গেল, তখন তিনি কথা না কহিয়া অন্তঃপুরে আদেশ পাঠাইয়া দিলেন, সুরমাকে পিত্রালয়ে যাইতে হইবে। উদয়াদিত্য বক্ষে দৃঢ় বল বাঁধিলেন। বিভা কাঁদিয়া সুরমার গলা জড়াইয়া কহিল, "তুমি যদি যাও, তবে এ শ্মশানপুরীতে আমি কী করিব ?" সুরমা বিভার

চিবুক ধরিয়া, বিভার মুখ চুম্বন করিয়া কহিল, "আমি কেন যাইব বিভা, আমার সর্বস্ব এখানে রহিয়াছে।" সুরমা যখন প্রতাপাদিত্যের আদেশ শুনিল, তখন কহিল, "আমি পিত্রালয়ে যাইবার কোনো কারণ দেখিতেছি না। সেখান হইতে আমাকে লইতে লোক আসে নাই, আমার স্বামীরও এ-বিষয়ে মত নাই। অতএব বিনা কারণে সহসা পিত্রালয়ে যাইবার আমি কোনো আবশ্যক দেখিতেছি না।" শুনিয়া প্রতাপাদিত্য জ্বলিয়া গেলেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলেন, কোনো উপায় নাই। সুরমাকে কিছু বলপূর্বক বাড়ি হইতে বাহির করা যায় না, অন্তঃপুরে শারীরিক বল খাটে না। প্রতাপাদিত্য মেয়েদের বিষয়ে নিতান্ত আনাড়ি ছিলেন, বলের প্রতি বল প্রয়োগ করিতে তিনি জানিতেন, কিন্তু এই অবলাদের সম্বন্ধে কিরূপ চাল চালিতে হয়, তাহা তাঁহার মাথায় আসিত না। তিনি বড়ো বড়ো কাছি টানিয়া ছিঁড়িতে পারেন কিন্তু তাঁহার মোটা মোটা অঙ্গুলি দিয়া ক্ষীণ সূত্রের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গ্রন্থি মোচন করিতে পারেন না। এই মেয়েগুলা তাঁহার মতে নিতান্ত দুর্জ্ঞেয় ও জানিবার অনুপযুক্ত সামগ্রী। ইহাদের সম্বন্ধে যখনই কোনো গোল বাধে, তিনি তাড়াতাড়ি মহিষীর প্রতি ভার দেন। ইহাদের বিষয়ে ভাবিতে বসিতে তাঁহার অবসরও নাই, ইচ্ছাও নাই এবং যোগ্যতাও নাই। ইহা তাঁহার নিতান্ত অনুপযুক্ত কাজ। এবারেও প্রতাপাদিত্য মহিষীকে ডাকিয়া কহিলেন, "সুরমাকে বাপের বাড়ি পাঠাও।" মহিষী কহিলেন, "তাহা হইলে বাবা উদয়ের কী হইবে?" প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "উদয় তো আর ছেলেমানুষ নয়, আমি রাজকার্যের অনুরোধে সুরমাকে রাজপুরী হইতে দূরে পাঠাইতে চাই, এই আমার আদেশ।"

মহিষী উদয়াদিত্যকে ডাকাইয়া কহিলেন, "বাবা উদয়, সুরমাকে বাপের বাড়ি পাঠানো যাক।" উদয়াদিত্য কহিলেন, "কেন মা, সুরমা কী অপরাধ করিয়াছে?"

মহিষী কহিলেন, "কী জানি বাছা, আমরা মেয়েমানুষ, কিছু বুঝি না, বউমাকে বাপের বাড়ি পাঠাইয়া মহারাজার রাজকার্যে যে কী সুযোগ হইবে, তা মহারাজই জানেন।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "মা, আমাকে কষ্ট দিয়া আমাকে দুঃখী করিয়া রাজকার্যের কী উন্নতি হইল? যতদূর কষ্ট সহিবার তাহা তো সহিয়াছি, কোন্ সুখ আমার অবশিষ্ট আছে? সুরমা যে বড়ো সুখে আছে তাহা নয়। দুই সন্ধ্যা সে ভর্ৎসনা সহিয়াছে, 'দূর ছাই' সে অঙ্গ-আভরণ করিয়াছে, অবশেষে কি রাজবাড়িতে তাহার জন্য একটুকু স্থানও কুলাইল না। তোমাদের সঙ্গে কি তাহার কোনো সম্পর্ক নাই মা? সে কি ভিখারি অতিথি যে, যখন খুশি রাখিবে, যখন খুশি তাড়াইবে?

তাহা হইলে মা, আমার জন্যও রাজবাড়িতে স্থান নাই, আমাকেও বিদায় করিয়া দাও।"

মহিষী কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন, কহিলেন, "কী জানি বাবা। মহারাজা কখন কী যে করেন, কিছু বুঝিতে পারি না। কিন্তু তাও বলি বাছা, আমাদের বউমাও বড়ো ভালো মেয়ে নয়। ও রাজবাড়িতে প্রবেশ করিয়া অবধি এখানে আর শান্তি নাই। হাড় জ্বালাতন হইয়া গেল। তা ও দিনকতক বাপের বাড়িতেই যাক না কেন, দেখা যাক। কী বল বাছা! ও দিনকতক এখান হইতে গেলেই দেখিতে পাইবে, বাড়ির শ্রী ফেরে কি না।"

উদয়াদিত্য এ কথার আর কোনো উত্তর করিলেন না, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, তাহার পরে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

মহিষী কাঁদিয়া প্রতাপাদিত্যের কাছে গিয়া পড়িলেন, কহিলেন, "মহারাজ, রক্ষা করো। সুরমাকে পাঠাইলে উদয় বাঁচিবে না। বাছার কোনো দোষ নাই, ওই সুরমা ওই ডাইনীটা তাহাকে কী মন্ত্র করিয়াছে।" বলিয়া মহিষী কাঁদিয়া আকুল হইলেন।

প্রতাপাদিত্য বিষম রুষ্ট হইয়া কহিলেন, "সুরমা যদি না যায় তো আমি উদয়াদিত্যকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিব।"

মহিষী মহারাজার কাছ হইতে আসিয়া সুরমার কাছে গিয়া কহিলেন, "পোড়ামুখী, আমার বাছাকে তুই কী করিলি? আমার বাছাকে আমাকে ফিরাইয়া দে। আসিয়া অবধি তুই আমার কী সর্বনাশ না করিলি? অবশেষে— সে রাজার ছেলে, তার হাতে বেড়ি না দিয়া কি তুই ক্ষান্ত হইবি না?"

সুরমা শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, "আমার জন্য তাঁর হাতে বেড়ি পড়িবে? সে কী কথা মা। আমি এখনই চলিলাম।"

সুরমা বিভার কাছে গিয়া সমস্ত কহিল। বিভার গলা ধরিয়া কহিল, "বিভা এই যে চলিলাম, আর বোধ করি আমাকে এখানে ফিরিয়া আসিতে দিবে না।" বিভা কাঁদিয়া সুরমাকে জড়াইয়া ধরিল। সুরমা সেইখানে বসিয়া পড়িল। অনন্ত ভবিষ্যতের অনন্ত প্রান্ত হইতে একটা কথা আসিয়া তাহার প্রাণে বাজিতে লাগিল, "আর হইবে না!" আর আসিতে পাইব না, আর হইবে না, আর কিছু রহিবে না! এমন একটা মহাশূন্য ভবিষ্যৎ তাহার সম্মুখে প্রসারিত হইল,— যে ভবিষ্যতে সে মুখ নাই, সে হাসি নাই, সে আদর নাই, চোখে চোখে বুকে বুকে প্রাণে প্রাণে মিলন নাই, সুখদুঃখের বিনিময় নাই, বুক ফাটিয়া গেলেও এক মুহূর্তের

জন্যও একবিন্দু প্রেম নাই, স্নেহ নাই, কিছু নাই, কী ভয়ানক ভবিষ্যৎ। সুরমার বুক ফাটিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল, চোখের জল শুকাইয়া গেল। উদয়াদিত্য আসিবামাত্র সুরমা তাঁহার পা দুটি জড়াইয়া বুকে চাপিয়া বুক ফাটিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সুরমা এমন করিয়া কখনো কাঁদে নাই। তাহার বলিষ্ঠ হৃদয় আজ শতধা হইয়া গিয়াছে। উদয়াদিত্য সুরমার মাথা কোলে তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী হইয়াছে সুরমা?" সুরমা উদয়াদিত্যের মুখের দিকে চাহিয়া আর কি কথা কহিতে পারে? মুখের দিকে চায় আর কাঁদিয়া ওঠে। বলিল, "ওই মুখ আমি দেখিতে পাইব না? সন্ধ্যা হইবে, তুমি বাতায়নে আসিয়া বসিবে, আমি পাশে নাই? ঘরে দীপ জ্বালাইয়া দিবে, তুমি ওই দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইবে, আর আমি হাসিতে হাসিতে তোমার হাত ধরিয়া আনিব না? তুমি যখন এখানে, আমি তখন কোথায়?" সুরমা যে বলিল "কোথায়", তাহাতে কতখানি নিরাশা, তাহাতে কত দূর দূরান্তরের বিচ্ছেদের ভাব! যখন কেবলমাত্র চোখে চোখেই মিলন হইতে পারে তখন মধ্যে কত দূর! যখন তাহাও হইতে পারে না, তখন আরও কত দূর! যখন বার্তা লইতে বিলম্ব হয় তখন আরও কতদূর! যখন প্রাণান্তিক ইচ্ছা হইলেও এক মুহূর্তের জন্যও দেখা হইবে না, তখন—তখন ওই পা দুখানি ধরিয়া এমনি করিয়া বুকে চাপিয়া এই মুহূর্তেই মরিয়া যাওয়াতেই সুখ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

উপাখ্যানের আরম্ভভাগে রুক্মিণীর উল্লেখ করা হইয়াছে, বোধ করি পাঠকেরা তাহাকে বিস্মৃত হন নাই। এই মঙ্গলাই সেই রুক্মিণী। সে রায়গড় পরিত্যাগ করিয়া নাম-পরিবর্তন-পূর্বক যশোহরের প্রান্তদেশে বাস করিতেছে। রুক্মিণীর মধ্যে অসাধারণ কিছুই নাই। সাধারণ নীচ প্রকৃতির স্ত্রীলোকের ন্যায় সে ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, ঈর্ষাপরায়ণ, মনোরাজ্য-অধিকার-লোলুপ। হাসিকান্না তাহার হাত-ধরা, আবশ্যক হইলে বাহির করে, আবশ্যক হইলে তুলিয়া রাখে। যখন সে রাগে তখন সে অতি প্রচণ্ডা, মনে হয় যেন রাগের পাত্রকে দাঁতে নখে ছিঁড়িয়া ফেলিবে। তখন অধিক কথা কয় না, চোখ দিয়া আগুন বাহির হইতে থাকে, থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপে। গলিত লৌহের মতো তাহার হৃদয়ের কটাহে রাগ টগ্‌বগ্‌ করিতে থাকে। তাহার মনের মধ্যে ঈর্ষা সাপের মতো ফোঁস ফোঁস করে ও ফুলিয়া ফুলিয়া লেজ

আছড়াইতে থাকে। এদিকে সে নানাবিধ ব্রত করে, নানাবিধ তান্ত্রিক অনুষ্ঠান করে। যে শ্রেণীর লোকদের সহিত সে মেশে, তাহাদের মন সে আশ্চর্যরূপে বুঝিতে পারে। যুবরাজ যখন সিংহাসনে বসিবেন তখন সে যুবরাজের হৃদয়ের উপর সিংহাসন পাতিয়া তাঁহার হৃদয়রাজ্য ও যশোহর-রাজ্য একত্রে শাসন করিবে, এ আশা শয়নে স্বপ্নে তাহার হৃদয়ে জাগিতেছে। ইহার জন্য সে কী না করিতে পারে। বহুদিন ধরিয়া অনবরত চেষ্টা করিয়া রাজবাটীর সমস্ত দাসদাসীর সহিত সে ভাব করিয়া লইয়াছে। রাজবাটীর প্রত্যেক ক্ষুদ্র খবরটি পর্যন্ত সে রাখে। সুরমার মুখ কবে মলিন হইল তাহাও সে শুনিতে পায়, প্রতাপাদিত্যের সামান্য পীড়া হইলেও তাহার কানে যায়, ভাবে এইবার বুঝি আপদটার মরণ হইবে। প্রতাপাদিত্য ও সুরমার মরণোদ্দেশে সে নানা অনুষ্ঠান করিয়াছে, কিন্তু এখনও তো কিছুই সফল হয় নাই। প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া সে মনে করে আজ হয়তো শুনিতে পাইব, প্রতাপাদিত্য অথবা সুরমা বিছানায় পড়িয়া মরিয়া আছে। প্রতিদিন তাহার অধীরতা বাড়িয়া উঠিতেছে। ভাবিতেছে মন্ত্রতন্ত্র চুলায় যাক, একবার হাতের কাছে পাই তো মনের সাধ মিটাই। ভাবিতে ভাবিতে এমন অধর দংশন করিতে থাকে যে, অধর কাটিয়া রক্ত পড়িবার উপক্রম হয়।

রুক্মিণী দেখিল যে, প্রতিদিন সুরমার প্রতি রাজার ও রাজমহিষীর বিরাগ বাড়িতেছে। অবশেষে এতদূর পর্যন্ত হইল যে, সুরমাকে রাজবাটী হইতে বিদায় করিয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। তাহার আর আনন্দের সীমা নাই। যখন সে দেখিল তবুও সুরমা গেল না, তখন সে বিদায় করিয়া দিবার সহজ উপায় অবলম্বন করিল।

রাজমহিষী যখন শুনিলেন, মঙ্গলা-নামক একজন বিধবা তন্ত্র মন্ত্র ঔষধ নানাপ্রকার জানে তখন তিনি ভাবিলেন, সুরমাকে রাজবাটী হইতে বিদায় করিবার আগে যুবরাজের মনটা তাহার কাছ হইতে আদায় করিয়া লওয়া ভালো। মাতঙ্গিনীকে মঙ্গলার নিকট হইতে গোপনে ঔষধ আনাইতে পাঠাইলেন।

মঙ্গলা নানাবিধ শিকড় লইয়া সমস্ত রাত ধরিয়া কাটিয়া ভিজাইয়া বাঁটিয়া মিশাইয়া মন্ত্র পড়িয়া বিষ প্রস্তুত করিতে লাগিল।

সেই নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে নির্জন নগরপ্রান্তে প্রচ্ছন্ন কুটির-মধ্যে হামানদিস্তার শব্দ উঠিতে লাগিল, সেই শব্দই তাহার একমাত্র সঙ্গী হইল, সেই অবিশ্রাম একঘেয়ে শব্দ তাহার নর্তনশীল উৎসাহের তালে তালে করতালি দিতে লাগিল, তাহার উৎসাহ দ্বিগুণ নাচিতে লাগিল, তাহার চোখে আর ঘুম রহিল না।

ঔষধ প্রস্তুত করিতে পাঁচ দিন লাগিল। বিষ প্রস্তুত করিতে পাঁচ দিন লাগিবার আবশ্যক করে না। কিন্তু সুরমা মরিবার সময় যাহাতে যুবরাজের মনে দয়া না হয়, এই উদ্দেশে মন্ত্র পড়িতে ও অনুষ্ঠান করিতে অনেক সময় লাগিল।

প্রতাপাদিত্যের মত লইয়া মহিষী সুরমাকে আরও কিছু দিন রাজবাটীতে থাকিতে দিলেন। সুরমা চলিয়া যাইবে, বিভা চারি দিকে অকূল পাথার দেখিতেছে। এ কয়দিন সে অনবরত সুরমার কাছে বসিয়া আছে। একটি মলিন ছায়ার মতো সে চুপ করিয়া সুরমার সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। এক-একটা দিন যায়, সন্ধ্যা আইসে, বিভা ততই যেন ঘনিষ্ঠতর ভাবে সুরমাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায়। দিনগুলিকে কে যেন তাহার প্রাণপণ আকর্ষণ হইতে টানিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া যাইতেছে। বিভার চারি দিকে অন্ধকার। সুরমার চক্ষেও সমস্তই শূন্য। তাহার আর উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম নাই, সংসারের দিগ্‌বিদিক সমস্ত মিশাইয়া গেছে। সে উদয়াদিত্যের পায়ের কাছে পড়িয়া থাকে, কোলের উপর শুইয়া থাকে, তাহার মুখের পানে চুপ করিয়া চাহিয়া থাকে, আর কিছু করে না। বিভাকে বলে, "বিভা, তোর কাছে আমার সমস্ত রাখিয়া গেলাম।" বলিয়া দুই হাতে মুখ আচ্ছাদন করিয়া কাঁদিয়া ফেলে।

অপরাহ্ণ হইয়া আসিয়াছে; কাল প্রত্যুষে সুরমার বিদায়ের দিন। তাহার গার্হস্থ্যের যাহা কিছু সমস্ত একে একে বিভার হাতে সমর্পণ করিল। উদয়াদিত্য প্রশান্ত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবে বসিয়া আছেন। তিনি স্থির করিয়াছেন, হয় সুরমাকে রাজপুরীতে রাখিবেন নয় তিনিও চলিয়া যাইবেন। যখন সন্ধ্যা হইল তখন সুরমা আর দাঁড়াইতে পারিল না, তাহার পা কাঁপিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল। সে শয়নগৃহে গিয়া শুইয়া পড়িল, কহিল, "বিভা, বিভা, শীঘ্র একবার তাঁহাকে ডাক্‌, আর বিলম্ব নাই!"

উদয়াদিত্য দ্বারের কাছে আসিতেই সুরমা বলিয়া উঠিল, "এস, এস, আমার প্রাণ কেমন করিতেছে।" বলিয়া দুই বাহু বাড়াইয়া দিল। উদয়াদিত্য কাছে আসিতেই তাঁহার পা দুটি জড়াইয়া, ধরিল। উদয়াদিত্য বসিলেন, তখন সুরমা বহু কষ্টে নিশ্বাস লইতেছে; তাহার হাত পা শীতল হইয়া আসিয়াছে। উদয়াদিত্য ভীত হইয়া ডাকিলেন, "সুরমা।" সুরমা অতি ধীরে মাথা তুলিয়া উদয়াদিত্যের মুখের পানে চাহিয়া কহিল, "কী নাথ।" উদয়াদিত্য ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, "কী হইয়াছে সুরমা?" সুরমা কহিল, "বোধ করি আমার সময় হইয়া আসিয়াছে।" বলিয়া উদয়াদিত্যের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিবার জন্য হাত উঠাইতে চাহিল, হাত উঠিল না। কেবল মুখের দিকে সে চাহিয়া রহিল। উদয়াদিত্য দুই হাতে সুরমার মুখ তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন, "সুরমা, সুরমা,

তুমি কোথায় যাইবে সুরমা। আমার আর কে রহিল?" সুরমার দুই চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে কেবল বিভার মুখের দিকে চাহিল। বিভা তখন হতচেতন হইয়া বোধশূন্য নয়নে সুরমার দিকে চাহিয়া আছে। যেখানে প্রতি সন্ধ্যায় সুরমা ও উদয়াদিত্য বসিয়া থাকিতেন, সম্মুখে সে বাতায়ন উন্মুক্ত। আকাশের তারা দেখা যাইতেছে, ধীরে ধীরে বাতাস বহিতেছে, চারিদিক স্তব্ধ। ঘরে প্রদীপ জ্বালাইয়া গেল। রাজবাটীতে পূজার শাঁখ-ঘণ্টা বাজিয়া ক্রমে থামিয়া গেল। সুরমা উদয়াদিত্যকে মৃদুস্বরে কহিল, "একটা কথা কও, আমি চোখে ভালো দেখিতে পাইতেছি না।"

ক্রমে রাজবাটীতে রাষ্ট্র হইল যে, সুরমা নিজ হস্তে বিষ খাইয়া মরিতেছে। রাজমহিষী ছুটিয়া আসিলেন, সকলে ছুটিয়া আসিল। সুরমার মুখ দেখিয়া মহিষী কাঁদিয়া উঠিয়া কহিলেন, "সুরমা মা আমার, তুই এইখানেই থাক্, তোকে কোথাও যাইতে হইবে না। তুই আমাদের ঘরের লক্ষ্মী, তোকে কে যাইতে বলে?" সুরমা শাশুড়ীর পায়ের ধুলা মাথায় তুলিয়া লইল। মহিষী দ্বিগুণ কাঁদিয়া উঠিয়া কহিলেন, "মা তুই কি রাগ করিয়া গেলি রে?" তখন সুরমার কণ্ঠরোধ হইয়াছে, কী কথা বলিতে গেল, বাহির হইল না। রাত্রি যখন চারি দণ্ড আছে, তখন চিকিৎসক কহিলেন, "শেষ হইয়া গেছে!" "দাদা, কী হইল গো" বলিয়া বিভা সুরমার বুকের উপরে পড়িয়া সুরমাকে জড়াইয়া ধরিল। প্রভাত হইয়া গেল, উদয়াদিত্য সুরমার মাথা কোলে রাখিয়া বসিয়া রহিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সুরমা কি আর নাই? বিভার কিছুতেই তাহা মনে হয় না কেন? যেন সুরমার দেখা পাইবে, যেন সুরমা ওইদিকে কোথায় আছে! বিভা ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার প্রাণ যেন সুরমাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। চুল বাঁধিবার সময় সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, যেন এখনই সুরমা আসিবে, তাহার চুল বাঁধিয়া দিবে, তাহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছে। না রে না, সন্ধ্যা হইয়া আসিল, রাত্রি হইয়া আসে, সুরমা বুঝি আর আসিল না। চুল বাঁধা আর হইল না। আজ বিভার মুখ এত মলিন হইয়া গিয়াছে, আজ বিভা এত কাঁদিতেছে, তবু কেন সুরমা আসিল না, সুরমা তো কখনো এমন করে না। বিভার মুখ একটু মলিন হইলেই অমনি সুরমা তাহার কাছে আসে, তাহার গলা ধরে, প্রাণ জুড়াইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকে। আর আজ— ওরে, আজ বুক ফাটিয়া গেলেও সে আসিবে না।

উদয়াদিত্যের অর্ধেক বল অর্ধেক প্রাণ চলিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক কাজে যে তাঁহার আশা ছিল, উৎসাহ ছিল, যাহার মন্ত্রণা তাঁহার একমাত্র সহায় ছিল, যাহার হাসি তাঁহার একমাত্র পুরস্কার ছিল— সেই চলিয়া গেল। তিনি তাঁহার শয়নগৃহে যাইতেন, যেন কী ভাবিতেন, একবার চারি দিকে দেখিতেন, দেখিতেন— কেহ নাই। ধীরে ধীরে সেই বাতায়নে আসিয়া বসিতেন; যেখানে সুরমা বসিত সেইখানটি শূন্য রাখিয়া দিতেন— আকাশে সেই জ্যোৎস্না, সম্মুখে সেই কানন, তেমনি করিয়া বাতাস বহিতেছে— মনে করিতেন, এমন সন্ধ্যায় সুরমা কি না আসিয়া থাকিতে পারিবে?

সহসা তাঁহার মনে হইত, যেন সুরমার মতো কার গলার স্বর শুনিতে পাইলাম, চমকিয়া উঠিতেন, যদিও অসম্ভব মনে হইত, তবু একবার চারি দিক দেখিতেন, একবার বিছানায় যাইতেন, দেখিতেন— কেহ আছে কি না। যে উদয়াদিত্য সমস্ত দিন শত শত ক্ষুদ্র কাজে ব্যস্ত থাকিতেন, দরিদ্র প্রজারা তাহাদের খেতের ও বাগানের ফলমূল শাকসবজি উপহার লইয়া তাঁহার কাছে আসিত, তিনি তাহাদের জিজ্ঞাসা-পড়া করিতেন, তাহাদের পরামর্শ দিতেন, আজকাল আর সে সব কিছুই করিতে পারেন না, তবুও সন্ধ্যাবেলায় শ্রান্ত হইয়া পড়েন। শ্রান্তপদে শয়নালয়ে আসেন, মনের মধ্যে যেন একটা আশা থাকে যে, সহসা শয়নকক্ষের দ্বার খুলিলেই দেখিতে পাইব— সুরমা সেই বাতায়নে বসিয়া আছে। উদয়াদিত্য যখন দেখিতে পান, বিভা একাকী ম্লানমুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তখন তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। বিভাকে কাছে ডাকেন, তাহাকে আদর করেন, তাহাকে কত কী স্নেহের কথা বলেন, অবশেষে দাদার হাত ধরিয়া বিভা কাঁদিয়া উঠে, উদয়াদিত্যেরও চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে। একদিন উদয়াদিত্য বিভাকে ডাকিয়া কহিলেন, "বিভা, এ-বাড়িতে আর তোর কে রহিল? তোকে এখন শ্বশুরবাড়ি পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিই। কী বলিস? আমার কাছে লজ্জা করিস না বিভা। তুই আর কার কাছে তোর মনের সাধ প্রকাশ করিবি বল্?" বিভা চুপ করিয়া রহিল। কিছু বলিল না। এ-কথা আর জিজ্ঞাসা করিতে হয়? পিতৃভবনে কি আর তাহার থাকিতে ইচ্ছা করে? পৃথিবীতে যে তাহার একমাত্র জুড়াইবার স্থল আছে, সেইখানে— সেই চন্দ্রদ্বীপে যাইবার জন্য তাহার প্রাণ অস্থির হইবে না তো কী? কিন্তু তাহাকে লইতে এ-পর্যন্ত একটিও তো লোক আসিল না! কেন আসিল না?

বিভাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাইবার প্রস্তাব উদয়াদিত্য একবার পিতার নিকট উত্থাপন করিলেন। প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "বিভাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাইতে আমার কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু তাহাদের নিকট যদি বিভার কোনো আদর থাকিত,

তবে তাহারা বিভাকে লইতে নিজে হইতে লোক পাঠাইত। আমাদের অত ব্যস্ত হইবার আবশ্যক দেখি না।"

রাজমহিষী বিভাকে দেখিয়া কান্নাকাটি করেন। বিভার সধবা অবস্থায় বৈধব্য কি চোখে দেখা যায়? বিভার করুণ মুখখানি দেখিলে তাঁহার প্রাণে শেল বাজে। তাহা ছাড়া মহিষী তাঁহার জামাতাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন, সে একটা কী ছেলেমানুষি করিয়াছে বলিয়া তাহার ফল যে এতদূর পর্যন্ত হইবে, ইহা তাঁহার কিছুতেই ভালো লাগে নাই। তিনি মহারাজের কাছে গিয়া মিনতি করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, বিভাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাও।" মহারাজ রাগ করিলেন, কহিলেন, "ওই এক কথা আমি অনেকবার শুনিয়াছি, আর আমাকে বিরক্ত করিও না। যখন তাহারা বিভাকে ভিক্ষা চাহিবে, তখন তাহারা বিভাকে পাইবে।" মহিষী কহিলেন, "মেয়ে অধিক দিন শ্বশুরবাড়ি না গেলে দশজনে কী বলিবে?" প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "আর প্রতাপাদিত্য নিজে সাধিয়া যদি মেয়েকে পাঠায় আর রামচন্দ্র রায় যদি তাহাকে দ্বার হইতে দূর করিয়া দেয়, তাহা হইলেই বা দশজনে কী বলিবে?"

মহিষী কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিলেন, মহারাজা এক-এক সময় কী যে করেন তাহার কোনো ঠিকানা থাকে না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

মান অপমানের প্রতি রাজা রামচন্দ্র রায়ের অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টি। রাজা একদিন চতুর্দোলায় করিয়া রাস্তায় বাহির হইয়াছিলেন, দুই জন অনভিজ্ঞ তাঁতি তাহাদের কুটিরের সম্মুখে বসিয়া তাঁত বুনিতেছিল, চতুর্দোল দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়ায় নাই, রাজা তাহা লইয়া হুলুস্থূল করিয়া তুলিয়াছিলেন। একবার যশোহরে তাঁহার শ্বশুরবাড়ির এক চাকরকে তিনি একটা কী কাজের জন্য আদেশ করিয়াছিলেন, সে বেচারা এক শুনিতে আর শুনিয়াছিল, কাজে ভুল করিয়াছিল, মহামানী রামচন্দ্র রায় তাহা হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, শ্বশুরবাড়ির ভৃত্যেরা তাঁহাকে মানে না। তাহারা অবশ্য তাহাদের মনিবদের কাছেই এইরূপ শিখিয়াছে নহিলে তাহারা সাহস করিত না। বিশেষত সেইদিন প্রাতঃকালেই তিনি দেখিয়াছিলেন যুবরাজ উদয়াদিত্য সেই চাকরকে চুপি চুপি কী একটা কথা বলিতেছিলেন—অবশ্য তাঁহাকে অপমান করিবার পরামর্শই চলিতেছিল, নহিলে আর কী হইতে পারে। একদিন কয়েক জন বালক

মাটির ঢিপির সিংহাসন গড়িয়া, রাজা, মন্ত্রী ও সভাসদ সাজিয়া রাজসভার অনুকরণে খেলা করিতেছিল। রাজার কানে যায়, তিনি তাহাদের পিতাদের ডাকিয়া বিলক্ষণ শাসন করিয়া দেন।

আজ মহারাজা গদির উপরে তাকিয়া ঠেসান দিয়া গুড়গুড়ি টানিতেছেন। সম্মুখে এক ভীরু দরিদ্র অপরাধী খাড়া রহিয়াছে, তাহার বিচার চলিতেছে। সে ব্যক্তি কোনো সূত্রে প্রতাপাদিত্য ও রামচন্দ্র রায় সংক্রান্ত ঘটনা শুনিতে পায় ও তাহা লইয়া আপনা-আপনির মধ্যে আলোচনা করে, তাহাই শুনিয়া তাহার শত্রুপক্ষের একজন সে-কথাটা রাজার কানে উত্থাপন করে। রাজা মহা খাপা হইয়া তাহাকে তলব করেন। তাহাকে ফাঁসিই দেন কি নির্বাসনই দেন, এমনি একটা কাণ্ড বাধিয়া গেছে।

রাজা বলিতেছেন, "বেটা, তোর এতবড়ো যোগ্যতা!"

সে কাঁদিয়া কহিতেছে, "দোহাই মহারাজ, আমি এমন কাজ করি নাই।"

মন্ত্রী কহিতেছেন, "বেটা, প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে আমাদের মহারাজের তুলনা।"

দেওয়ান কহিতেছেন, "বেটা, জানিস না, যখন প্রতাপাদিত্যের বাপ প্রথম রাজা হয়, তাহাকে রাজটিকা পরাইবার জন্য সে আমাদের মহারাজার স্বর্গীয় পিতামহের কাছে আবেদন করে। অনেক কাঁদাকাটা করাতে তিনি তাঁহার বাঁ পায়ের কড়ে আঙুল দিয়া তাঁহাকে টিকা পরাইয়া দেন।"

রমাই ভাঁড় কহিতেছে, "বিক্রমাদিত্যের ছেলে প্রতাপাদিত্য, উহারা তো দুই পুরুষে রাজা। প্রতাপাদিত্যের পিতামহ ছিল কেঁচো, কেঁচোর পুত্র হইল জোঁক, বেটা প্রজার রক্ত খাইয়া খাইয়া বিষম ফুলিয়া উঠিল, সেই জোঁকের পুত্র আজ মাথা খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া মাথাটা কুলোপানা করিয়া তুলিয়াছে ও সাপের মতো চক্র ধরিতে শিখিয়াছে। আমরা পুরুষানুক্রমে রাজসভায় ভাঁড়বৃত্তি করিয়া আসিতেছি, আমরা বেদে, আমরা জাত-সাপ চিনি না?" রাজা রামচন্দ্র রায় বিষম সন্তুষ্ট হইয়া সহাস্যবদনে গুড়গুড়ি টানিতে লাগিলেন। আজকাল প্রত্যহ সভায় প্রতাপাদিত্যের উপর একবার করিয়া আক্রমণ হয়। প্রতাপাদিত্যের পৃষ্ঠ লক্ষ্যপূর্বক শব্দভেদী বচনবাণ বর্ষণ করিয়া সেনানীদের তূণ নিঃশর হইলে সভা ভঙ্গ হয়। যাহা হউক আজিকার বিচারে অপরাধী অনেক কাঁদাকাটি করাতে দোর্দণ্ডপ্রতাপ রামচন্দ্র রায় কহিলেন, আচ্ছা যা, এ-যাত্রা বাঁচিয়া গেলি, ভবিষ্যতে সাবধান থাকিস।"

অন্যান্য সভাসদ চলিয়া গেল, কেবল মন্ত্রী ও রমাই ভাঁড় রাজার কাছে রহিল। প্রতাপাদিত্যের কথাই চলিতে লাগিল।

রমাই কহিল, "আপনি তো চলিয়া আসিলেন, এদিকে যুবরাজ বাবাজি বিষম গোলে পড়িলেন। রাজার অভিপ্রায় ছিল, কন্যাটি বিধবা হইলে হাতের লোহা ও বালা দুগাছি বিক্রয় করিয়া রাজকোষে কিঞ্চিৎ অর্থাগম হয়। যুবরাজ তাহাতে ব্যাঘাত করিলেন। তাহা লইয়া তম্বি কত!"

রাজা হাসিতে লাগিলেন, কহিলেন, "বটে!"

মন্ত্রী কহিলেন, "মহারাজ, শুনিতে পাই, প্রতাপাদিত্য আজকাল আপসোসে সারা হইতেছেন। এখন কী উপায়ে মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাইবেন, তাহাই ভাবিয়া তাঁহার আহারনিদ্রা নাই।"

রাজা কহিলেন, "সত্য নাকি!" বলিয়া হাসিতে লাগিলেন, তামাক টানিতে লাগিলেন, বড়োই আনন্দ বোধ হইল।

মন্ত্রী কহিল, "আমি বলিলাম, আর মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাইয়া কাজ নাই। তোমাদের ঘরে মহারাজ বিবাহ করিয়াছেন, ইহাতেই তোমাদের সাত পুরুষ উদ্ধার হইয়া গেছে। তাহার পরে আবার তোমাদের মেয়েকে ঘরে আনিয়া ঘর নিচু করা, এত পুণ্য এখনও তোমরা কর নাই। কেমন হে ঠাকুর!"

রমাই কহিল, "তাহার সন্দেহ আছে! মহারাজ, আপনি যে পাঁকে পা দিয়াছেন, সে তো পাঁকের বাবার ভাগ্য, কিন্তু তাই বলিয়া ঘরে ঢুকিবার সময় পা ধুইয়া আসিবেন না তো কী!"

এইরূপে হাস্যপরিহাস চলিতে লাগিল। প্রতাপাদিত্য ও উদয়াদিত্যের কাল্পনিক মূর্তি সম্মুখে রাখিয়া তাহাদিগকে ক্ষতবিক্ষত করা হইতে লাগিল। উদয়াদিত্যের যে কী অপরাধ তাহা বুঝিতে পারি না। তিনি যে নিজে বিপদকে অগ্রাহ্য করিয়া রামচন্দ্র রায়ের প্রাণরক্ষা করিলেন, সে-সকল কথা চুলায় গেল, আর তিনি প্রতাপাদিত্যের সন্তান হইয়াছেন এই অপরাধে রামচন্দ্র রায় তাঁহার কথা তুলিয়া অকাতরে হাস্যপরিহাস করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র রায় যে নিষ্ঠুর তাহা নহে, তিনি এক জন লঘুহৃদয় সংকীর্ণপ্রাণ লোক। উদয়াদিত্য যে তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি কৃতজ্ঞ নহেন। তিনি মনে করেন, ইহা তো হইবেই, ইহা না হওয়াই অন্যায়। রামচন্দ্র রায় বিপদে পড়িলে তাঁহাকে সকলে মিলিয়া বাঁচাইবে না তো কী! তাঁহার মনে হয়, রামচন্দ্র রায়ের পায়ে কাঁটা ফুটিলে সমস্ত জগৎ-সংসারের প্রাণে বেদনা লাগে। তিনি মনে করিতে পারেন না যে, পৃথিবীর একজন অতি ক্ষুদ্রতম লোকেরও নিজের বিপদের কাছে মহারাজাধিরাজ রামচন্দ্র রায় কিছুই নহে। দিবারাত্রি শত শত স্তুতিবাদকের দাঁড়িপাল্লায় এক দিকে জগৎকে ও আর-এক দিকে নিজেকে

চড়াইয়া তিনি নিজেকেই ওজনে ভারি বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, এইজন্য সহজে আর কাহারও উপরে তাঁর কৃতজ্ঞতার উদয় হয় না। তাহা ছাড়া উদয়াদিত্যের প্রতি কৃতজ্ঞতার উদয় না হইবার আর-এক কারণ এই যে, তিনি মনে করেন উদয়াদিত্য নিজের ভগিনীর জন্যই তাঁহাকে বাঁচাইয়াছেন, তাঁহার প্রাণরক্ষাই উদয়াদিত্যের উদ্দেশ্য ছিল না। তাহা ছাড়া, যদি বা রামচন্দ্রের হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার সঞ্চার হইত, তবুও তিনি উদয়াদিত্যকে লইয়া হাস্যপরিহাসের ত্রুটি করিতেন না। কারণ যেখানে দশ জনে মিলিয়া একজনকে লইয়া হাসিতামাশা করিতেছে, বিশেষত রমাই ভাঁড় যাহাকে লইয়া বিদ্রূপ করিতেছে, সেখানে তিনি তাহাদের মুখ বন্ধ করেন বা তাহাদের সহিত যোগ না দেন, এমন তাঁহার মনের জোর নাই। তাঁহার মনে হয়, তাহা হইলে সকলে কী মনে করিবে।

এখনও বিভার প্রতি রামচন্দ্র রায়ের আসক্তির মতো একটা ভাব আছে। বিভা সুন্দরী, বিভা সবে মাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। রামচন্দ্র রায়ের সহিত বিভার অতি অল্প দিনই সাক্ষাৎ হইয়াছে। প্রতাপাদিত্যের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছেন— কিন্তু যখন সেই রাত্রে প্রথম নিদ্রা ভাঙিয়া সহসা তিনি দেখিলেন, বিভা শয্যায় বসিয়া কাঁদিতেছে, তাহার মুখে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, তাহার অর্ধ-অনাবৃত বক্ষ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, তাহার মধুর করুণ দুটি চক্ষু বহিয়া জল পড়িতেছে, তাহার ক্ষুদ্র দুটি অধর কচি কিশলয়ের মতো কাঁপিতেছে, তখন তাঁহার মনে সহসা একটা কী উচ্ছ্বাস হইল, বিভার মাথা কোলে রাখিলেন, চোখের জল মুছাইয়া দিলেন, বিভার করুণ অধর চুম্বন করিবার জন্য হৃদয়ে একটা আবেগ উপস্থিত হইল, তখনই প্রথম তাঁহার শরীরে মুহূর্তের জন্য বিদ্যুৎ সঞ্চার হইল, তখনই প্রথম তিনি বিভার নববিকশিত যৌবনের লাবণ্যরাশি দেখিতে পাইলেন, সেই প্রথম তাঁহার নিশ্বাস বেগে বহিল, অর্ধনিমীলিত নেত্রপল্লবে জলের রেখা দেখা দিল, হৃদয় বেগে উঠিতে পড়িতে লাগিল। বিভাকে চুম্বন করিতে গেলেন। এমন সময়ে দ্বারে আঘাত পড়িল, এমন সময়ে বিপদের সংবাদ শুনিতে পাইলেন। সেই যে হৃদয়ের প্রথম বিকাশ, সেই যে বাসনার প্রথম উচ্ছ্বাস, সেই যে নয়নের মোহদৃষ্টি, তাহা পরিতৃপ্ত হইল না বলিয়া তাহারা তৃষাকাতর হইয়া রামচন্দ্র রায়ের স্মৃতি অধিকার করিয়া রহিল। ইহা স্থায়ী প্রেমের ভাব নহে, কারণ রামচন্দ্র রায়ের লঘু হৃদয়ের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। একটা বিলাসদ্রব্যের প্রতি শৌখিন হৃদয়ের যেমন সহসা একটা টান পড়ে, শৌখিন রামচন্দ্র রায়েরও বিভার প্রতি সেইরূপ একটা ভাব জন্মিয়াছিল। যাহা হউক, যে-কারণেই হউক রামচন্দ্র রায়ের

যৌবনস্বপ্নে বিভা জাগিতেছিল। বিভাকে পাইবার জন্য তাঁহার একটা অভিলাষ উদয় হইয়াছিল। কিন্তু যদি বিভাকে আনিতে পাঠান, তাহা হইলে সকলে কী মনে করিবে। সভাসদেরা যে তাঁহাকে স্ত্রৈণ মনে করিবে, মন্ত্রী যে মনে মনে অসন্তুষ্ট হইবে, রমাই ভাঁড় যে মনে মনে হাসিবে। তাহা ছাড়া, প্রতাপাদিত্যের তাহা হইলে কী শাস্তি হইল ? শ্বশুরের উপর প্রতিহিংসা তোলা হইল কই ? এইরূপ সাত-পাঁচ ভাবিয়া বিভাকে আনিতে পাঠাইতে তাঁহার ভরসা হয় না, প্রবৃত্তি হয় না। এমন কি, বিভাকে লইয়া হাস্যপরিহাস চলিতে থাকে, তাহাতে বাধা দিতেও তাঁহার সাহস হয় না, এবং প্রতাপাদিত্যের কথা মনে করিয়া তাহাতে বাধা দিতে তাঁহার ইচ্ছাও হয় না।

রমাই ভাঁড় ও মন্ত্রী চলিয়া গেলে রামমোহন মাল আসিয়া জোড়হাতে কহিল, "মহারাজ।"

রাজা কহিলেন, "কী রামমোহন।"

রামমোহন। মহারাজ, আজ্ঞা দিন, আমি ঠাকুরানীকে আনিতে যাই।

রাজা কহিলেন, "সে কী কথা!"

রামমোহন কহিল, "আজ্ঞা হাঁ। অন্তঃপুর শূন্য হইয়া আছে, আমি তাহা দেখিতে পারিব না। অন্তঃপুরে যাই, মহারাজের ঘরে কাহাকেও দেখিতে পাই না, আমার যেন প্রাণ কেমন করিতে থাকে। আমার মা-লক্ষ্মী গৃহে আসিয়া গৃহ উজ্জ্বল করুন আমরা দেখিয়া চক্ষু সার্থক করি।"

রাজা কহিলেন, "রামমোহন তুমি পাগল হইয়াছ ? সে-মেয়েকে আমি ঘরে আনি ?"

রামমোহন নেত্র বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "কেন মহারাজ, আমার মা-ঠাকুরানী কী অপরাধ করিয়াছেন ?"

রাজা কহিলেন, "বল কী রামমোহন! প্রতাপাদিত্যের মেয়েকে আমি ঘরে আনিব ?"

রামমোহন কহিল, "কেন আনিবেন না ? প্রতাপাদিত্যের সহিত তাঁহার সম্পর্ক কিসের ? যতদিন বিবাহ না হয় ততদিন মেয়ে বাপের ; বিবাহ হইলে পর আর তাহাতে বাপের অধিকার থাকে না। এখন আপনার মহিষী আপনার— আপনি যদি তাঁহাকে ঘরে না আনেন, আপনি যদি তাঁহাকে সমাদর না করেন, তবে আর কে করিবে ?"

রাজা কহিলেন, "প্রতাপাদিত্যের মেয়েকে যে আমি বিবাহ করিয়াছি,

ইহাই যথেষ্ট হইয়াছে, আবার তাহাকে ঘরে আনিব? তাহা হইলে মান রক্ষা হইবে কী করিয়া?"

রামমোহন কহিল, "মান রক্ষা? আপনার নিজের মহিষীকে আপনি পরের ঘরে ফেলিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার উপর আপনার কোনো অধিকার নাই, তাঁহার উপর অন্য লোক যাহা ইচ্ছা প্রভুত্ব করিতে পারে, ইহাতেই কি আপনার মান রক্ষা হইতেছে?"

রাজা কহিলেন, "যদি প্রতাপাদিত্য মেয়েকে না দেয়?"

রামমোহন বিশাল বক্ষ ফুলাইয়া কহিল, "কী বলিলেন মহারাজ? যদি না দেয়? এতবড়ো সাধ্য কাহার যে দিবে না? আমার মা-জননী, আমাদের ঘরের মা-লক্ষ্মী, কাহার সাধ্য তাঁহাকে আমাদের কাছ হইতে রাখিতে পারে? যতবড়ো প্রতাপাদিত্য হউন না কেন, তাঁহার হাত হইতে কাড়িয়া লইব। এই বলিয়া গেলাম। আমার মাকে আমি আনিব, তুমি বারণ করিবার কে?" বলিয়া রামমোহন প্রস্থানের উপক্রম করিল।

রাজা তাড়াতাড়ি কহিলেন, "রামমোহন, যেয়ো না, শোনো শোনো। আচ্ছা, তুমি মহিষীকে আনিতে যাও তাহাতে কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু— দেখো, এ-কথা যেন কেহ শুনিতে না পায়। রমাই কিংবা মন্ত্রীর কানে যেন এ-কথা না উঠে।"

রামমোহন কহিল, "যে আজ্ঞা মহারাজ।" বলিয়া চলিয়া গেল।

যদিও মহিষী রাজপুরে আসিলেই সকলে জানিতে পারিবে, তথাপি সে অনেক বিলম্ব আছে, তাহার জন্য প্রস্তুত হইবার সময় আছে। আপাতত উপস্থিত লজ্জার হাত এড়াইতে পারিলেই রামচন্দ্র রায় বাঁচেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

উদয়াদিত্য কিসে সুখে থাকেন, দিনরাত বিভার সেই একমাত্র চেষ্টা। নিজের হাতে সে তাঁহার সমস্ত কাজ করে। সে নিজে তাঁহার খাবার আনিয়া দেয়, আহারের সময় সম্মুখে বসিয়া থাকে, সামান্য বিষয়েও ত্রুটি হইতে দেয় না। যখন সন্ধ্যার সময় উদয়াদিত্য তাঁহার ঘরে আসিয়া বসেন, দুই হাতে চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, বুঝি চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে, তখন বিভা

আস্তে আস্তে তাঁহার পায়ের কাছে আসিয়া বসে— কথা উত্থাপন করিতে চেষ্টা করে, কিছুই কথা জোগায় না। দুইজনে স্তব্ধ, কাহারও মুখে কথা নাই। মলিন দীপের আলো মাঝে মাঝে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালের উপরে একটা আঁধারের ছায়া কাঁপিতেছে, বিভা অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া সেই ছায়ার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বুক ফাটিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কাঁদিয়া উঠে, "দাদা, সে কোথায় গেল ?" উদয়াদিত্য চমকিয়া উঠেন, চক্ষুর আচ্ছাদন অপসারণ করিয়া বিভার মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন, যেন বিভা কী বলিল ভালো বুঝিতে পারেন নাই, যেন তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন, সহসা চৈতন্য হয়, তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া বিভার কাছে আসিয়া বলেন, "আয় বিভা, একটা গল্প বলি শোন্।"

বর্ষার দিন খুব মেঘ করিয়াছে, সমস্ত দিন ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। দিনটা আঁধার করিয়া রহিয়াছে, বাগানের গাছপালাগুলা স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া ভিজিতেছে। এক-এক বার বাতাস দিতেছে ও ঘরের মধ্যে বৃষ্টির ছাঁট আসিতেছে। উদয়াদিত্য চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। আকাশে মেঘ ডাকিতেছে, দিগন্তে বিদ্যুৎ হানিতেছে। বৃষ্টির অবিশ্রাম শব্দ কেবল যেন বলিতেছে, "সুরমা নাই— সে নাই।" মাঝে মাঝে আর্দ্র বাতাস হুহু করিয়া আসিয়া যেন বলিয়া যায়, "সুরমা কোথায়!" বিভা ধীরে ধীরে উদয়াদিত্যের কাছে আসিয়া কহে, "দাদা!" দাদা আর উত্তর দিতে পারেন না, বিভাকে দেখিয়াই তিনি মুখ ঢাকিয়া বাতায়নের উপরে মাথা রাখিয়া পড়েন, মাথার উপরে বৃষ্টি পড়িতে থাকে। এমনি করিয়া দিন চলিয়া যায়, সন্ধ্যা হইয়া আসে, রাত্রি হইতে থাকে। বিভা উদয়াদিত্যের আহারের আয়োজন করিয়া আবার আসিয়া বলে, "দাদা, খাবার আসিয়াছে, খাও'সে।" উদয়াদিত্য কোনো উত্তর করেন না। রাত্রি অধিক হইতে লাগিল। বিভা কাঁদিয়া কহে, "দাদা, উঠ, রাত হইল।" উদয়াদিত্য মুখ তুলিয়া দেখেন, বিভা কাঁদিতেছে, তাড়াতাড়ি উঠিয়া বিভার চোখ মুছাইয়া খাইতে যান। ভালো করিয়া খান না। বিভা তাই দেখিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া শুইতে যায়, সে আর আহার স্পর্শ করে না।

বিভা কথা-কহিতে, গল্প করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু বিভা অধিক কথা কহিতে পারে না। উদয়াদিত্যকে কী করিয়া যে সুখে রাখিবে ভাবিয়া পায় না। সে কেবল ভাবে, আহা যদি দাদামহাশয় থাকিতেন!

আজকাল উদয়াদিত্যের মনে কেমন একটা ভয় উপস্থিত হইয়াছে। তিনি প্রতাপাদিত্যকে অত্যন্ত ভয় করেন। আর সে পূর্বেকার সাহস নাই। বিপদকে

তৃণজ্ঞান করিয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রাণপণ করিতে এখন আর পারেন না। সকল কাজেই ইতস্তত করেন, সকল বিষয়েই সংশয় উপস্থিত হয়।

একদিন উদয়াদিত্য শুনিলেন, ছাপরার জমিদারের কাছারিতে রাত্রিযোগে লাঠিয়াল পাঠাইয়া কাছারি লুট করিবার ও কাছারিতে আগুন লাগাইয়া দিবার আদেশ হইয়াছে। উদয়াদিত্য তৎক্ষণাৎ তাঁহার অশ্ব প্রস্তুত করিতে কহিয়া অন্তঃপুরে গেলেন। শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া একবার চারিদিক্ দেখিলেন। কী ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্ক হইয়া বেশ পরিবর্তন করিতে লাগিলেন। বাহিরে আসিলেন। ভৃত্য আসিয়া কহিল, "যুবরাজ, অশ্ব প্রস্তুত হইয়াছে। কোথায় যাইতে হইবে?" যুবরাজ কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হইয়া ভৃত্যের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন ও অবশেষে কহিলেন, "কোথাও না। তুমি অশ্ব লইয়া যাও।"

একদিন এক ক্রন্দনের শব্দ শুনিতে পাইয়া উদয়াদিত্য বাহির হইয়া আসিলেন, দেখিলেন রাজকর্মচারী এক প্রজাকে গাছে বাঁধিয়া মারিতেছে। প্রজা কাঁদিয়া যুবরাজের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "দোহাই যুবরাজ।" যুবরাজ তাহার যন্ত্রণা দেখিতে পারিলেন না, তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আগে হইলে ফলাফল বিচার না করিয়া কর্মচারীকে বাধা দিতেন, প্রজাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন।

ভাগবত ও সীতারামের বৃত্তি বন্ধ হইয়া গেছে। তাহাদিগকে প্রকাশ্যে অথবা গোপনে অর্থ সাহায্য করিতে যুবরাজের আর সাহস হয় না। যখনই তাহাদের কষ্টের কথা শুনেন, তখনই মনে করেন, "আজই আমি টাকা পাঠাইয়া দিব।" তাহার পরেই ইতস্তত করিতে থাকেন, পাঠানো আর হয় না।

কেহ যেন না মনে করেন, উদয়াদিত্য প্রাণের ভয়ে এরূপ করিতেছেন। সম্প্রতি জীবনের প্রতি তাঁহার যে পূর্বাপেক্ষা বিশেষ আসক্তি জন্মিয়াছে তাহা নহে। তাঁহার মনে একটা অন্ধ ভয় উপস্থিত হইয়াছে। প্রতাপাদিত্যকে তিনি যেন রহস্যময় কী একটা মনে করেন। যেন উদয়াদিত্যের অদৃষ্ট, উদয়াদিত্যের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত প্রতাপাদিত্যের মুষ্টির মধ্যে রহিয়াছে। উদয়াদিত্য যখন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছেন, জীবনের শেষ মুহূর্তে অবস্থান করিতেছেন, তখনও যদি প্রতাপাদিত্য ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বাঁচিতে আদেশ করেন, তাহা হইলে যেন তখনও তাঁহাকে মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরিয়া আসিতে হইবে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

বিধবা রুক্মিণীর (মঙ্গলার) কিঞ্চিৎ নগদ টাকা আছে। সেই টাকা খাটাইয়া সুদ লইয়া সে জীবিকা নির্বাহ করে। রূপ এবং রুপা এই দুয়ের জোরে সে অনেককে বশে রাখিয়াছে। সীতারাম শৌখিন লোক, অথচ ঘরে এক পয়সার সংস্থান নাই, এইজন্য রুক্মিণীর রূপ ও রুপা উভয়ের প্রতিই তাহার আন্তরিক টান আছে। যেদিন ঘরে হাঁড়ি কাঁদিতেছে, সেদিন সীতারামকে দেখো, দিব্য নিশ্চিন্ত মুখে হাতে লাঠি লইয়া পাৎলা চাদর উড়াইয়া বুক ফুলাইয়া রাস্তা দিয়া চলিতেছে, মঙ্গলার বাড়ি যাইবে। পথে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, "কেমন হে সীতারাম, সংসার কেমন চলিতেছে?" সীতারাম তৎক্ষণাৎ অম্লানবদনে বলে, "বেশ চলিতেছে। কাল আমাদের ওখানে তোমার নিমন্ত্রণ রহিল।" সীতারামের বড়ো বড়ো কথাগুলা কিছুমাত্র কমে নাই, বরঞ্চ অবস্থা যতই মন্দ হইতেছে কথার পরিমাণ লম্বা ও চওড়ার দিকে ততই বাড়িতেছে। সীতারামের অবস্থা বড়ো মন্দ হইতে চলিল। সম্প্রতি এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, পিসা তাঁহার অনরারি পিসা-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে মানস করিতেছেন।

আজ টাকার বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে, সীতারাম রুক্মিণীর বাড়িতে আসিয়াছে। হাসিয়া কাছে ঘেঁষিয়া কহিল—

"ভিক্ষা যদি দিবে রাই,
আমার সোনা রুপায় কাজ নাই,
আমি প্রাণের দায়ে এসেছি হে,
মানরতন ভিক্ষা চাই।

না ভাই, ছড়াটা ঠিক খাটিল না। মানরতনে আমার আপাতত তেমন আবশ্যক নাই, যদি আবশ্যক হয় পরে দেখা যাইবে, আপাতত কিঞ্চিৎ সোনা রুপা পাইলে কাজে লাগে।"

রুক্মিণী সহসা বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিয়া কহিল, "তা, তোমার যদি আবশ্যক হইয়া থাকে তো তোমাকে দিব না তো কাহাকে দিব?"

সীতারাম তাড়াতাড়ি কহিল, "নাঃ— আবশ্যক এমনই কী। তবে কী জান ভাই, আমার মার কাছে টাকা থাকে, আমি নিজের হাতে টাকা রাখি না। আজ সকালে মা জোড়াঘাটায় তাঁর জামাইয়ের বাড়ি গিয়াছেন। টাকা বাহির করিয়া দিতে ভুলিয়া গেছেন। তা আমি কালই শোধ করিয়া দিব।"

মঙ্গলা মনে মনে হাসিয়া কহিল, "তোমার অত তাড়াতাড়ি করিবার আবশ্যক কী? যখন স্থবিধা হয় শোধ দিলেই হইবে। তোমার হাতে দিতেছি, এ তো আর জলে ফেলিয়া দিতেছি না।" জলে ফেলিয়া দিলেও বরঞ্চ পাইবার সম্ভাবনা আছে, সীতারামের হাতে দিলে সে সম্ভাবনাটুকুও নাই, এই প্রভেদ।

মঙ্গলার এইরূপ অনুরাগের লক্ষণ দেখিয়া সীতারামের ভালোবাসা একেবারে উথলিয়া উঠিল। সীতারাম রসিকতা করিবার উদ্যোগ করিল। বিনা টাকায় নবাবি করা ও বিনা হাস্যরসে রসিকতা করা সীতারামের স্বভাবসিদ্ধ। সে যাহা মুখে আসে তাহাই বলে ও আর কাহারও অপেক্ষা না করিয়া নিজেই হাসিতে থাকে। তাহার হাসি দেখিয়া হাসি পায়। সে যখন রাজবাড়ির প্রহরী ছিল, তখন অন্যান্য প্রহরীদের সহিত সীতারামের প্রায় মাঝে মাঝে দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিবার উদ্যোগ হইত, তাহার প্রধান কারণ, সীতারাম যাহাকে মজা মনে করিত আর-সকলে তাহাকে মজা মনে করিত না। হনুমানপ্রসাদ তেওয়ারি পাহারা দিতে দিতে ঢুলিতেছিল, সীতারাম আস্তে আস্তে তাহার পশ্চাতে গিয়া হঠাৎ পিঠে এমন এক কিল মারিল যে, সেই হাড়ভাঙা রসিকতার জ্বালায় তাহার পিঠ ও পিত্ত একসঙ্গে জ্বলিয়া উঠিল। সীতারাম উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিল, কিন্তু হনুমানপ্রসাদ সে হাসিতে যোগ না দিয়া কিলের সহিত হাস্যরসের প্রভেদ ও করুণ রসের সম্বন্ধ উদাহরণ দ্বারা সীতারামকে অতিশয় স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিল। সীতারামের রসিকতার এমন আরো শত শত গল্প এইখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে সীতারামের অনুরাগ সহসা উথলিয়া উঠিল, সে রুক্মিণীর কাছে ঘেঁষিয়া প্রীতিভরে কহিল, "তুমি আমার সুভদ্রা, আমি তোমার জগন্নাথ!"

রুক্মিণী কহিল, "মর্ মিনসে। সুভদ্রা যে জগন্নাথের বোন!"

সীতারাম কহিল, "তাহা কেমন করিয়া হইবে? তাহা হইলে সুভদ্রাহরণ হইল কী করিয়া।"

রুক্মিণী হাসিতে লাগিল, সীতারাম বুক ফুলাইয়া কহিল, "না, তা হইবে না, হাসিলে হইবে না, জবাব দাও। সুভদ্রা যদি বোনই হইল তবে সুভদ্রাহরণ হইল কী করিয়া।"

সীতারামের বিশ্বাস যে, সে এমন প্রবল যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছে যে, ইহার উপরে আর কথা কহিবার জো নাই।

রুক্মিণী অতি মিষ্টস্বরে কহিল, "দূর মূর্খ।"

সীতারাম গলিয়া গিয়া কহিল, "মূর্খই তো বটে, তোমার কাছে আমি তো ভাই

হারিয়াই আছি, তোমার কাছে আমি চিরকাল মূর্খ।" সীতারাম মনে মনে ভাবিল খুব জবাব দিয়াছি, বেশ কথা জোগাইয়াছে।

আবার কহিল, "আচ্ছা ভাই, কথাটা যদি তোমার পছন্দ না হইল, কী বলিয়া ডাকিলে তুমি খুশি হইবে, আমাকে বলো।"

রুক্মিণী হাসিয়া কহিল, "বলো প্রাণ।"

সীতারাম কহিল, "প্রাণ।"

রুক্মিণী কহিল, "বলো প্রিয়ে।"

সীতারাম কহিল, "প্রিয়ে।"

রুক্মিণী কহিল, "বলো প্রিয়তমে।"

সীতারাম কহিল, "প্রিয়তমে।"

রুক্মিণী কহিল, "বলো প্রাণপ্রিয়ে।"

সীতারাম কহিল, "প্রাণপ্রিয়ে, আচ্ছা ভাই প্রাণপ্রিয়ে, তুমি যে টাকাটা দিলে, তাহার সুদ কত লইবে?"

রুক্মিণী রাগ করিল, মুখ বাঁকাইয়া কহিল, "যাও যাও, এই বুঝি তোমার ভালোবাসা। সুদের কথা কোন্ মুখে জিজ্ঞাসা করিলে?"

সীতারাম আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল, "না না, সে কি হয়? আমি কি ভাই সত্য বলিতেছিলাম? আমি যে ঠাট্টা করিতেছিলাম, এইটে আর বুঝিতে পারিলে না? ছি প্রিয়তমে।"

সীতারামের মায়ের কী রোগ হইল জানি না, আজকাল প্রায় মাঝে মাঝে সে জামাইবাড়ি যাইতে লাগিল ও টাকা বাহির করিয়া দিবার বিষয়ে তাহার স্মরণশক্তি একবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। কাজেই সীতারামকে প্রায় মাঝে মাঝে রুক্মিণীর কাছে আসিতে হইত। আজকাল দেখা যায় সীতারাম ও রুক্মিণীতে মিলিয়া অতি গোপনে কী একটা বিষয় লইয়া পরামর্শ চলিতেছে। অনেকদিন পরামর্শের পর সীতারাম কহিল, 'আমার ভাই অত ফন্দি আসে না, এ বিষয়ে ভাগবতের সাহায্য না লইলে চলিবে না।"

সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় অত্যন্ত ঝড় হইতেছে। রাজবাড়ির ইতস্তত দুম্‌দাম করিয়া দরজা পড়িতেছে। বাতাস এমন বেগে বহিতেছে যে, বাগানের বড়ো বড়ো গাছের শাখা হেলিয়া ভূমি স্পর্শ করিতেছে। বন্যার মুখে ভগ্ন চূর্ণ গ্রামপল্লীর মতো ঝড়ের মুখে ছিন্নভিন্ন মেঘ ছুটিয়া চলিয়াছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ, ঘন ঘন গর্জন। উদয়াদিত্য চারি দিকের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ছোটো একটি মেয়েকে কোলে

লইয়া বসিয়া আছেন। ঘরের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়াছেন। ঘর অন্ধকার। মেয়েটি কোলের উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সুরমা যখন বাঁচিয়া ছিল, এই মেয়েটিকে অত্যন্ত ভালোবাসিত। সুরমার মৃত্যুর পর ইহার মা ইহাকে আর রাজবাড়িতে পাঠান নাই। অনেক দিনের পর সে আজ একবার রাজবাড়িতে বেড়াইতে আসিয়াছিল। সহসা উদয়াদিত্যকে দেখিয়া "কাকা" "কাকা" বলিয়া সে তাঁহার কোলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। উদয়াদিত্য তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া তাঁহার শয়নগৃহে লইয়া আসিয়াছেন। উদয়াদিত্যের মনের ভাব এই যে, সুরমা এই মেয়েটিকে যদি একবার দেখিতে আসে। ইহাকে যে সে বড়ো ভালোবাসিত। এত স্নেহের ছিল, সে কি না আসিয়া থাকিতে পারিবে। মেয়েটি একবার জিজ্ঞাসা করিল, "কাকা, কাকীমা কোথায় ?"

উদয়াদিত্য রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "একবার তাঁহাকে ডাক্ না।" মেয়েটি "কাকীমা" "কাকীমা" করিয়া ডাকিতে লাগিল। উদয়াদিত্যের মনে হইল, ওই যেন কে সাড়া দিল। দূর হইতে ওই যেন কে বলিয়া উঠিল, "এই যাই রে।" যেন স্নেহের মেয়েটির করুণ আহ্বান শুনিয়া স্নেহময়ী আর থাকিতে পারিল না, তাহাকে বুকে তুলিয়া লইতে আসিতেছে। বালিকা কোলের উপর ঘুমাইয়া পড়িল। উদয়াদিত্য প্রদীপ নিবাইয়া দিলেন। একটি ঘুমন্ত মেয়েকে কোলে করিয়া অন্ধকার ঘরে একাকী বসিয়া রহিলেন। বাহিরে হু হু করিয়া বাতাস বহিতেছে। ইতস্তত খট্ খট্ করিয়া শব্দ হইতেছে। ওই না পদশব্দ শুনা গেল ? পদশব্দই বটে। বুক এমন দুড়্‌দুড়্ করিতেছে যে, শব্দ ভালো শুনা যাইতেছে না। দ্বার খুলিয়া গেল, ঘরের মধ্যে দীপালোক প্রবেশ করিল। ইহাও কি কখনো সম্ভব। দীপ হস্তে চুপি চুপি ঘরে একটি স্ত্রীলোক প্রবেশ করিল। উদয়াদিত্য চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কহিলেন, "সুরমা কি ?" পাছে সুরমাকে দেখিলে সুরমা চলিয়া যায়। পাছে সুরমা না হয়।

রমণী প্রদীপ রাখিয়া কহিল, "কেন গা, আমাকে কি আর মনে পড়ে না।"

বজ্রধ্বনি শুনিয়া যেন স্বপ্ন ভাঙিল। উদয়াদিত্য চমকিয়া উঠিয়া চক্ষু চাহিলেন। মেয়েটি জাগিয়া উঠিয়া "কাকা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহাকে বিছানার উপরে ফেলিয়া উদয়াদিত্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কী করিবেন কোথায় যাইবেন যেন ভাবিয়া পাইতেছেন না। রুক্মিণী কাছে আসিয়া মুখ নাড়িয়া কহিল, "বলি, এখন তো মনে পড়িবেই না। তবে এককালে কেন আশা দিয়া আকাশে তুলিয়াছিলে ?" উদয়াদিত্য চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিছুতেই কথা কহিতে পারিলেন না।

তখন রুক্মিণী তাহার ব্রহ্মাস্ত্র বাহির করিল। কাঁদিয়া কহিল, "আমি তোমার কী দোষ করিয়াছি, যাহাতে তোমার চক্ষুশূল হইলাম। তুমিই তো আমার সর্বনাশ করিয়াছ। যে রমণী যুবরাজকে একদিন দেহপ্রাণ বিকাইয়াছে সে আজ ভিখারিনীর মতো পথে পথে বেড়াইতেছে। এ পোড়া কপালে বিধাতা কি এই লিখিয়াছিল?"

এইবার উদয়াদিত্যের প্রাণে গিয়া আঘাত লাগিল। সহসা তাঁহার মনে হইল আমিই বুঝি ইহার সর্বনাশ করিয়াছি। অতীতের কথা ভুলিয়া গেলেন। ভুলিয়া গেলেন যৌবনের প্রমত্ত অবস্থায় রুক্মিণী কী করিয়া পদে পদে তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইয়াছে, প্রতিদিন তাঁহার পথের সম্মুখে জাল পাতিয়া বসিয়া ছিল, আবর্তের মতো তাঁহাকে তাহার দুই মোহময় বাহু দিয়া বেষ্টন করিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া মুহূর্তের মধ্যে পাতালের অন্ধকারে নিক্ষেপ করিয়াছিল— সে সমস্তই ভুলিয়া গেলেন। দেখিলেন রুক্মিণীর বসন মলিন, ছিন্ন। রুক্মিণী কাঁদিতেছে। করুণহৃদয় উদয়াদিত্য কহিলেন, "তোমার কী চাই?"

রুক্মিণী কহিল, "আমার আর কিছু চাই না, আমার ভালোবাসা চাই। আমি ওই বাতায়নে বসিয়া তোমার বুকে মুখ রাখিয়া তোমার সোহাগ পাইতে চাই। কেন গা, সুরমার চেয়ে কি এ মুখ কালো? যদি কালোই হইয়া থাকে তো সে তোমার জন্যই পথে পথে ভ্রমণ করিয়া। আগে তো কালো ছিল না।"

এই বলিয়া রুক্মিণী উদয়াদিত্যের শয্যার উপর বসিতে গেল। উদয়াদিত্য আর থাকিতে পারিলেন না। কাতর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ও বিছানায় বসিয়ো না, বসিয়ো না।"

রুক্মিণী আহত ফণিনীর মতো মাথা তুলিয়া বলিল, "কেন বসিব না?"

উদয়াদিত্য তাহার পথ রোধ করিয়া কহিলেন, "না, ও বিছানার কাছে তুমি যাইয়ো না। তুমি কী চাও আমি এখনই দিতেছি।"

রুক্মিণী কহিল, "আচ্ছা তোমার আঙুলের ওই আংটিটি দাও।"

উদয়াদিত্য তৎক্ষণাৎ তাঁহার হাত হইতে আংটি খুলিয়া ফেলিয়া দিলেন। রুক্মিণী কুড়াইয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল। মনে ভাবিল ডাকিনীর মন্ত্রমোহ এখনো দূর হয় নাই, আরো কিছুদিন যাক, তাহার পর আমার মন্ত্র খাটিবে। রুক্মিণী চলিয়া গেলে উদয়াদিত্য শয্যার উপরে আসিয়া পড়িলেন। দুই বাহুতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া কহিলেন, "কোথায়, সুরমা কোথায়। আজ আমার এ দগ্ধ বজ্রাহত হৃদয়ে শান্তি দিবে কে?"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

ভাগবতের অবস্থা বড়ো ভালো নহে। সে চুপচাপ বসিয়া কয়দিন ধরিয়া অনবরত তামাক ফুঁকিতেছে। ভাগবত যখন মনোযোগের সহিত তামাক ফুঁকিতে থাকে, তখন প্রতিবেশীদের আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হয়। কারণ, তাহার মুখ দিয়া কালো কালো ধোঁয়া পাকাইয়া পাকাইয়া উঠিতে থাকে, তাহার মনের মধ্যেও তেমনি একটা কৃষ্ণবর্ণ পাকচক্রের কারখানা চলিতে থাকে। কিন্তু ভাগবত লোকটা বড়ো ধর্মনিষ্ঠ। সে কাহারও সঙ্গে মেশে না এই যা তাহার দোষ, হরিনামের মালা লইয়া থাকে, অধিক কথা কয় না, পরচর্চায় থাকে না। কিন্তু কেহ যখন ঘোরতর বিপদে পড়ে, তখন ভাগবতের মতো পাকা পরামর্শ দিতে আর কেহ পারে না। ভাগবত কখনো ইচ্ছা করিয়া পরের অনিষ্ট করে না, কিন্তু আর কেহ যদি তাহার অনিষ্ট করে তবে ভাগবত ইহজন্মে তাহা কখনো ভোলে না, তাহার শোধ তুলিয়া তবে সে হুঁকা নামাইয়া রাখে। এক কথায়, সংসারে যাহাকে ভালো বলে ভাগবত তাহাই। পাড়ার লোকেরাও তাহাকে মান্য করে, দুরবস্থায় ভাগবত ধার করিয়াছিল, কিন্তু ঘটিবাটি বেচিয়া তাহা শোধ করিয়াছে।

একদিন সকালে সীতারাম আসিয়া ভাগবতকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, কেমন আছ হে?"

ভাগবত কহিল, "ভালো না।"

সীতারাম কহিল, "কেন বলো দেখি?"

ভাগবত কিয়ৎক্ষণ তামাক টানিয়া সীতারামের হাতে হুঁকা দিয়া কহিল, "বড়ো টানাটানি পড়িয়াছে।"

সীতারাম কহিল, "বটে? তা কেমন করিয়া হইল?"

ভাগবত মনে মনে কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া কহিল, "কেমন করিয়া হইল? তোমাকেও তাহা বলিতে হইবে নাকি? আমি তো জানিতাম আমারও যে দশা তোমারও সে দশা।"

সীতারাম কিছু অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, "না হে, আমি সে কথা কহিতেছি না, আমি বলিতেছি তুমি ধার কর না কেন?"

ভাগবত কহিল, "ধার করিলে তো শুধিতে হইবে। শুধিব কি দিয়া? বিক্রি করিবার ও বাঁধা দিবার জিনিস বড়ো অধিক নাই।"

সীতারাম সগর্বে কহিল, "তোমার কত টাকা ধার চাই, আমি দিব।"

ভাগবত কহিল, "বটে? তা এতই যদি তোমার টাকা হইয়া থাকে যে এক মুঠা জলে ফেলিয়া দিলেও কিছু না আসে যায়, তা হইলে আমাকে গোটা দশেক দিয়া ফেলো। কিন্তু আগে হইতে বলিয়া রাখিতেছি, আমার শুধিবার শক্তি নাই!"

সীতারাম কহিল, "সেজন্যে দাদা তোমাকে ভাবিতে হইবে না।"

সীতারামের কাছে এইরূপ সাহায্যপ্রাপ্তির আশা পাইয়া ভাগবত বন্ধুতার উচ্ছ্বাসে যে নিতান্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা নহে। আর-এক ছিলিম তামাক সাজিয়া চুপ করিয়া বসিয়া টানিতে লাগিল।

সীতারাম আস্তে আস্তে কথা পাড়িল, "দাদা, রাজার অন্যায় বিচারে আমাদের তো অন্ন মারা গেল।"

ভাগবত কহিল, "কই, তোমার ভাবে তো তাহা বোধ হইল না।" সীতারামের বদান্যতা ভাগবতের বড়ো সহ্য হয় নাই, মনে মনে কিছু চটিয়াছিল।

সীতারাম কহিল, "না ভাই, কথার কথা বলিতেছি। আজ না যায় তো দশ দিন পরে তো যাইবে।"

ভাগবত কহিল, "তা, রাজা যদি অন্যায় বিচার করেন তো আমরা কী করিতে পারি।"

সীতারাম কহিল, "আহা, যুবরাজ যখন রাজা হইবে তখন যশোরে রামরাজত্ব হইবে, ততদিন যেন আমরা বাঁচিয়া থাকি।"

ভাগবত চটিয়া গিয়া কহিল, "ও-সব কথায় আমাদের কাজ কী ভাই? তুমি বড়োমানুষ লোক, তুমি নিজের ঘরে বসিয়া রাজা-উজির মার, সে শোভা পায়। আমি গরিব মানুষ, আমার অতটা ভরসা হয় না।"

সীতারাম কহিল, "রাগ কর কেন দাদা? কথাটা মন দিয়া শোনোই না কেন?" বলিয়া চুপি চুপি কী বলিতে লাগিল।

ভাগবত মহাক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "দেখো সীতারাম, আমি তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, আমার কাছে অমন কথা তুমি মুখে উচ্চারণ করিয়ো না।"

সীতারাম সেদিন তো চলিয়া গেল। ভাগবত ভারি মনোযোগ দিয়া সমস্ত দিন কী একটা ভাবিতে লাগিল, তাহার পরদিন সকালবেলায় সে নিজে সীতারামের কাছে গেল। সীতারামকে কহিল, "কাল যে কথাটা বলিয়াছিলে বড়ো পাকা কথা বলিয়াছিলে।"

সীতারাম গর্বিত হইয়া উঠিয়া কহিল, "কেমন দাদা, বলি নাই!"

ভাগবত কহিল, "আজ সেই বিষয়ে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করিতে আসিয়াছি।"

সীতারাম আরো গর্বিত হইয়া উঠিল। কয়দিন ধরিয়া ক্রমিক পরামর্শ চলিতে লাগিল।

পরামর্শ করিয়া যাহা স্থির হইল তাহা এই, একটা জাল দরখাস্ত লিখিতে হইবে, যেন যুবরাজ প্রতাপাদিত্যের নামে সম্রাট-বিদ্রোহিতার অভিযোগ করিয়া নিজে রাজ্য পাইবার জন্য দরখাস্ত করিতেছেন। তাহাতে যুবরাজের সীলমোহর মুদ্রিত থাকিবে। রুক্মিণী যে আংটিটি লইয়া আসিয়াছে, তাহাতে যুবরাজের নাম-মুদ্রাঙ্কিত সীল আছে, অতএব কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়া আছে।

পরামর্শমত কাজ হইল। একখানা জাল দরখাস্ত লেখা হইল, তাহাতে যুবরাজের নাম মুদ্রিত রহিল। নির্বোধ সীতারামের উপর নির্ভর করা যায় না, অতএব স্থির হইল, ভাগবত নিজে দরখাস্ত লইয়া দিল্লীশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিবে।

ভাগবত সেই দরখাস্তখানি লইয়া দিল্লির দিকে না গিয়া প্রতাপাদিত্যের কাছে গেল। মহারাজকে কহিল, "উদয়াদিত্যের এক ভৃত্য এই দরখাস্তটি লইয়া দিল্লির দিকে যাইতেছিল, আমি কোনো সূত্রে জানিতে পারি। ভৃত্যটা দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া গেছে, দরখাস্তটি লইয়া আমি মহারাজের নিকট আসিতেছি।" ভাগবত সীতারামের নাম করে নাই! দরখাস্ত পাঠ করিয়া প্রতাপাদিত্যের কী অবস্থা হইল তাহা আর বলিবার আবশ্যক করে না। ভাগবতের পুনর্বার রাজবাড়িতে চাকরি হইল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

বিভার প্রাণের মধ্যে আঁধার করিয়া আসিয়াছে। ভবিষ্যতে কী যেন একটা মর্মভেদী দুঃখ, একটা মরুময়ী নিরাশা, জীবনের সমস্ত সুখের জলাঞ্জলি তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, প্রতিমুহূর্তে তাহার কাছে কাছে সরিয়া আসিতেছে। সেই যে জীবনশূন্যকারী চরাচরগ্রাসী শুষ্ক সীমাহীন ভবিষ্যৎ অদৃষ্টের আশঙ্কা, তাহারই একটা ছায়া আসিয়া যেন বিভার প্রাণের মধ্যে পড়িয়াছে। বিভার মনের ভিতরে কেমন করিতেছে। বিভা বিছানায় একেলা পড়িয়া আছে। এ-সময়ে বিভার কাছে কেহ নাই। বিভা নিশ্বাস ফেলিয়া, বিভা কাঁদিয়া, বিভা আকুল হইয়া কহিল, "আমাকে কি তবে পরিত্যাগ করিলে? আমি তোমার নিকট কী অপরাধ করিয়াছি?" কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিতে লাগিল, "আমি কী অপরাধ করিয়াছি?" দুটি হাতে মুখ ঢাকিয়া বালিশ বুকে লইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বার বার করিয়া কহিল, "আমি কী

করিয়াছি? একখানি পত্র না, একটি লোকও আসিল না, কাহারও মুখে সংবাদ শুনিতে পাই না। আমি কী করিব? বুক ফাটিয়া ছট্ ফট্ করিয়া সমস্ত দিন ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, কেহ তোমার সংবাদ বলে না, কাহারও মুখে তোমার নাম শুনিতে পাই না। মা গো মা, দিন কী করিয়া কাটিবে।" এমন কত দিন গেল। এমন কত মধ্যাহ্নে কত অপরাহ্নে কত রাত্রে সঙ্গিহীন বিভা রাজবাড়ির শূন্য ঘরে ঘরে একখানি শীর্ণ ছায়ার মতো ঘুরিয়া বেড়ায়।

এমন সময় একদিন প্রাতঃকালে রামমোহন আসিয়া "মা গো জয় হোক" বলিয়া প্রণাম করিল, বিভা এমনই চমকিয়া উঠিল যেন তাহার মাথায় একটা সুখের বজ্র ভাঙিয়া পড়িল। তাহার চোখ দিয়া জল বাহির হইল। সে সচকিত হইয়া কহিল, "মোহন, তুই এলি!"

"হাঁ মা, দেখিলাম মা আমাদের ভুলিয়া গেছেন, তাঁহাকে একবার স্মরণ করাইয়া আসি।"

বিভা কত কী জিজ্ঞাসা করিবে মনে করিল কিন্তু লজ্জায় পারিল না— বলে বলে করিয়া হইয়া উঠিল না, অথচ শুনিবার জন্য প্রাণটা আকুল হইয়া রহিল।

রামমোহন বিভার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "কেন মা, তোমার মুখখানি অমন মলিন কেন? তোমার চোখে কালী পড়িয়াছে। মুখে হাসি নাই। চুল রুক্ষ। এস মা, আমাদের ঘরে এস। এখানে বুঝি তোমাকে যত্ন করিবার কেহ নাই।"

বিভা ম্লান হাসি হাসিল, কিছু কহিল না। হাসিতে হাসিতে হাসি আর রহিল না। দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল— শীর্ণ বিবর্ণ দুটি কপোল প্লাবিত করিয়া জল পড়িতে লাগিল, অশ্রু আর থামে না। বহুদিন অনাদরের পর একটু আদর পাইলে যে অভিমান উথলিয়া উঠে, বিভা সেই অতিকোমল মৃদু অনন্তপ্রীতিপূর্ণ অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিল। মনে মনে কহিল, "এতদিন পরে কি আমাকে মনে পড়িল?"

রামমোহন আর থাকিতে পারিল না, তাহার চোখে জল আসিল, কহিল, "এ কী অলক্ষণ! মা লক্ষ্মী তুমি, হাসিমুখে আমাদের ঘরে এস। আজ শুভদিনে চোখের জল মোছো।"

মহিষীর মনে মনে ভয় ছিল, পাছে জামাই তাঁর মেয়েকে গ্রহণ না করে। রামমোহন বিভাকে লইতে আসিয়াছে শুনিয়া তাঁহার অত্যন্ত আনন্দ হইল। তিনি রামমোহনকে ডাকাইয়া জামাইবাড়ির কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, বিশেষ যত্নে রামমোহনকে আহার করাইলেন, রামমোহনের গল্প শুনিলেন, আনন্দে দিন কাটিল।

কাল যাত্রার দিন ভালো, কাল প্রভাতেই বিভাকে পাঠাইবেন স্থির হইল। প্রতাপাদিত্য এ-বিষয়ে আর কিছু আপত্তি করিলেন না।

যাত্রার যখন সমস্তই স্থির হইয়া গেছে, তখন বিভা একবার উদয়াদিত্যের কাছে গেল। উদয়াদিত্য একাকী বসিয়া কী একটা ভাবিতেছিল।

বিভাকে দেখিয়া সহসা ঈষৎ চমকিত হইয়া কহিলেন, "বিভা, তবে তুই চলিলি। তা ভালোই হইল। তুই সুখে থাকিতে পারিবি। আশীর্বাদ করি লক্ষ্মীস্বরূপা হইয়া স্বামীর ঘর উজ্জ্বল করিয়া থাক্।"

বিভা উদয়াদিত্যের পায়ের কাছে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। উদয়াদিত্যের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, বিভার মাথায় হাত দিয়া তিনি কহিলেন, "কেন কাঁদিতেছিস্? এখানে তোর কী সুখ ছিল বিভা, চারি দিকে কেবল দুঃখ কষ্ট শোক। এ কারাগার হইতে পালাইলি— তুই বাঁচিলি।"

বিভা যখন উঠিল, তখন উদয়াদিত্য কহিলেন, "যাইতেছিস? তবে আয়। স্বামীগৃহে গিয়া আমাদের একেবারে যেন ভুলিয়া যাস নে। এক-একবার মনে করিস, মাঝে মাঝে যেন সংবাদ পাই।"

বিভা রামমোহনের কাছে গিয়া কহিল, "এখন আমি যাইতে পারিব না।"

রামমোহন বিস্মিত হইয়া কহিল, "সে কী কথা মা।"

বিভা কহিল, "না, আমি যাইতে পারিব না। দাদাকে আমি এখন একলা ফেলিয়া যাইতে পারিব না। আমা হইতেই তাঁহার এত কষ্ট, এত দুঃখ, আর আমি আজ তাঁহাকে এখানে ফেলিয়া রাখিয়া সুখ ভোগ করিতে যাইব? যতদিন তাঁহার মনে তিলমাত্র কষ্ট থাকিবে, ততদিন আমিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব। এখানে আমার মতো তাঁহাকে কে যত্ন করিবে?" বলিয়া বিভা কাঁদিয়া চলিয়া গেল।

অন্তঃপুরে একটা গোলযোগ বাধিয়া উঠিল। মহিষী আসিয়া বিভাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন, তাহাকে অনেক ভয় দেখাইলেন, অনেক পরামর্শ দিলেন। বিভা কেবল কহিল, "না মা, আমি পারিব না।"

মহিষী রোষে বিরক্তিতে কাঁদিয়া কহিলেন, "এমন মেয়েও তো কোথাও দেখি নাই।" তিনি মহারাজের কাছে গিয়া সমস্ত কহিলেন। মহারাজ প্রশান্তভাবে কহিলেন, "তা বেশ তো, বিভার যদি ইচ্ছা না হয় তো কেন যাইবে?"

মহিষী অবাক হইয়া, হাত উল্টাইয়া, হাল ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, "তোমাদের যাহা ইচ্ছা তাহাই করো, আমি আর কোনো কথায় থাকিব না।"

উদয়াদিত্য সমস্ত শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি বিভাকে আসিয়া অনেক করিয়া বুঝাইলেন। বিভা চুপ করিয়া কাঁদিতে লাগিল, ভালো বুঝিল না।

হতাশ্বাস রামমোহন আসিয়া ম্লানমুখে কহিল, "মা, তবে চলিলাম। মহারাজকে গিয়া কী বলিব।"

বিভা কিছু বলিতে পারিল না, অনেকক্ষণ নিরুত্তর হইয়া রহিল।

রামমোহন কহিল, "তবে বিদায় হই মা।" বলিয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেল। বিভা একেবারে আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল, কাতর স্বরে ডাকিল, "মোহন।"

মোহন ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "কী মা ?"

বিভা কহিল, "মহারাজকে বলিয়ো, আমাকে যেন মার্জনা করেন। তিনি স্বয়ং ডাকিতেছেন, তবু আমি যাইতে পারিলাম না, সে কেবল নিতান্তই আমার দুরদৃষ্ট।"

রামমোহন শুষ্কভাবে কহিল, "যে আজ্ঞা।"

রামমোহন আবার প্রণাম করিয়া বিদায় হইয়া গেল। বিভা দেখিল, রামমোহন বিভার ভাব কিছুই বুঝিতে পারে নাই, তাহার ভারি গোলমাল ঠেকিয়াছে। একে তো বিভার প্রাণ যেখানে যাইতে চায়, বিভা সেখানে যাইতে পারিল না। তাহার উপর রামমোহন, যাহাকে সে যথার্থ স্নেহ করে, সে আজ রাগ করিয়া চলিয়া গেল। বিভার প্রাণে যাহা হইল তাহা বিভাই জানে।

বিভা রহিল। চোখের জল মুছিয়া প্রাণের মধ্যে পাষাণভার বহিয়া সে তাহার দাদার কাছে পড়িয়া রহিল। ম্লান শীর্ণ একখানি ছায়ার মতো সে নীরবে সমস্ত ঘরের কাজ করে। উদয়াদিত্য স্নেহ করিয়া আদর করিয়া কোনো কথা কহিলে চোখ নিচু করিয়া একটুখানি হাসে। সন্ধ্যাবেলায় উদয়াদিত্যের পায়ের কাছে বসিয়া একটু কথা কহিতে চেষ্টা করে ; যখন মহিষী তিরস্কার করিয়া কিছু বলেন, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া শোনে ও অবশেষে একখণ্ড মলিন মেঘের মতো ভাসিয়া চলিয়া যায় ; যখন কেহ বিভার চিবুক ধরিয়া বলে "বিভা, তুই এত রোগা হইতেছিস কেন" বিভা কিছু বলে না, কেবল একটু হাসে।

এই সময়ে ভাগবত পূর্বোক্ত জাল দরখাস্তটি লইয়া প্রতাপাদিত্যকে দেখায়। প্রতাপাদিত্য আগুন হইয়া উঠিলেন, পরে অনেক বিবেচনা করিয়া উদয়াদিত্যকে কারারুদ্ধ করিবার আদেশ দিলেন। মন্ত্রী কহিলেন, "মহারাজ, যুবরাজ যে এ কাজ করিয়াছেন, ইহা কোনোমতেই বিশ্বাস হয় না। যে শোনে সেই জিভ কাটিয়া বলে, ও-কথা কানে আনিতে নাই। যুবরাজ এ-কাজ করিবেন ইহা বিশ্বাসযোগ্য

নহে।" প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "আমারও তো বড়ো একটা বিশ্বাস হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া কারাগারে থাকিতে দোষ কী? সেখানে কোনোপ্রকার কষ্ট না দিলেই হইল। কেবল গোপনে কিছু না করিতে পারে, তাহার জন্য পাহারা নিযুক্ত থাকিবে।"

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

যখন রামমোহন চন্দ্রদ্বীপে ফিরিয়া গিয়া একাকী জোড়হস্তে অপরাধীর মতো রাজার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল তখন রামচন্দ্র রায়ের সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি স্থির করিয়াছিলেন বিভা আসিলে পর তাহাকে প্রতাপাদিত্য ও তাহার বংশ সম্বন্ধে খুব দু-চারিটা খরধার কথা শুনাইয়া তাঁহার শ্বশুরের উপর শোধ তুলিবেন। কী কী কথা বলিবেন, কেমন করিয়া বলিবেন, কখন বলিবেন, সমস্ত তিনি মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। রামচন্দ্র রায় গোঁয়ার নহেন, বিভাকে যে কোনোপ্রকারে পীড়ন করিবেন ইহা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না। কেবল বিভাকে তাহার পিতার সম্বন্ধে মাঝে মাঝে খুব লজ্জা দিবেন এই আনন্দেই তিনি অধীর ছিলেন। এমন-কি এই আনন্দের প্রভাবে তাঁহার মনেই হয় নাই যে, বিভার আসিবার পক্ষে কোনো বাধা থাকিতে পারে। এমন সময়ে রামমোহনকে একাকী আসিতে দেখিয়া রামচন্দ্র রায় নিতান্ত বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কী হইল রামমোহন?"

রামমোহন কহিল, "সকলই নিষ্ফল হইয়াছে।"

রাজা চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "আনিতে পারিলি না?"

রামমোহন। আজ্ঞা, না মহারাজ। কুলগ্নে যাত্রা করিয়াছিলাম।

রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বেটা তোকে যাত্রা করিতে কে বলিয়াছিল? তখন তোকে বার বার করিয়া বারণ করিলাম, তখন যে তুই বুক ফুলাইয়া গেলি, আর আজ—"

রামমোহন কপালে হাত দিয়া ম্লানমুখে কহিল, "মহারাজ, আমার অদৃষ্টের দোষ।"

রামচন্দ্র রায় আরো ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "রামচন্দ্র রায়ের অপমান! তুই বেটা আমার নাম করিয়া ভিক্ষা চাহিতে গেলি, আর প্রতাপাদিত্য দিল না। এত বড়ো অপমান আমাদের বংশে আর কখনো হয় নাই।"

তখন রামমোহন নতশির তুলিয়া ঈষৎ গর্বিতভাবে কহিল, "ও-কথা বলিবেন না। প্রতাপাদিত্য যদি না দিত, আমি কাড়িয়া আনিতাম। আপনার কাছে তাহা তো বলিয়াই গিয়াছিলাম। মহারাজ, যখন আপনার আদেশ পালন করিতে যাই, তখন কি আর প্রতাপাদিত্যকে ভয় করি? প্রতাপাদিত্য রাজা বটে, কিন্তু আমার রাজা তো সে নয়।"

রাজা কহিলেন, "তবে হইল না কেন?"

রামমোহন অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার চোখে জল দেখা দিল।

রাজা অধীর হইয়া কহিলেন, "রামমোহন, শীঘ্র বল্!"

রামমোহন জোড়হাতে কহিল, "মহারাজ— "

রাজা কহিলেন, "কী বল্।"

রামমোহন। মহারাজ, মা-ঠাকরুন আসিতে চাহিলেন না।

বলিয়া রামমোহনের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। বুঝি এ সন্তানের অভিমানের অশ্রু। বোধ করি এ অশ্রুজলের অর্থ— "মায়ের প্রতি আমার এত বিশ্বাস ছিল যে, সেই বিশ্বাসের জোরে আমি বুক ফুলাইয়া আনন্দ করিয়া মাকে আনিতে গেলাম, আর মা আসিলেন না, মা আমার সম্মান রাখিলেন না।" কী জানি কী মনে করিয়া বৃদ্ধ রামমোহন চোখের জল সামলাইতে পারিল না।

রাজা কথাটা শুনিয়াই একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিয়া চোখ পাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বটে।" অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্তি হইল না।

"আসিতে চাহিলেন না! বটে! বেটা, তুই বেরো, বেরো, আমার সম্মুখ হইতে এখনই বেরো।"

রামমোহন একটি কথা না কহিয়া বাহির হইয়া গেল। সে জানিত তাহারই সমস্ত দোষ, অতএব সমুচিত দণ্ড পাওয়া কিছু অন্যায় নহে।

রাজা কী করিয়া ইহার শোধ তুলিবেন কিছুতেই ভাবিয়া পাইলেন না। প্রতাপাদিত্যের কিছু করিতে পারিবেন না, বিভাকেও হাতের কাছে পাইতেছেন না। রামচন্দ্র রায় অধীর হইয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

দিন-দুয়েকের মধ্যে সংবাদটা নানা আকারে নানা দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। এমন অবস্থা হইয়া দাঁড়াইল যে, প্রতিশোধ না লইলে আর মুখ রক্ষা হয় না। এমন কি, প্রজারা পর্যন্ত প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্যস্ত হইল। তাহারা কহিল, "আমাদের মহারাজার অপমান!" অপমানটা যেন সকলের গায়ে লাগিয়াছে। একে তো প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি রামচন্দ্র রায়ের মনে স্বভাবতই বলবান আছে, তাহার উপরে

তাঁহার মনে হইতে লাগিল, প্রতিহিংসা না লইলে প্রজারা কী মনে করিবে, ভৃত্যেরা কী মনে করিবে, রমাই ভাঁড় কী মনে করিবে? তিনি যখন কল্পনায় মনে করেন, এই এই কথা লইয়া রমাই আর-একজন ব্যক্তির কাছে হাসি-টিটকারি করিতেছে তখন তিনি অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়েন।

একদিন সভায় মন্ত্রী প্রস্তাব করিলেন, "মহারাজ, আপনি আর-একটি বিবাহ করুন।"

রমাই ভাঁড় কহিল, "আর প্রতাপাদিত্যের মেয়ে তাহার ভাইকে লইয়া থাকুক।"

রাজা রমাইয়ের দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিলেন, "ঠিক বলিয়াছ রমাই।" রাজাকে হাসিতে দেখিয়া সকল সভাসদই হাসিতে লাগিল। কেবল ফর্নাণ্ডিজ বিরক্ত হইল, সে হাসিল না। রামচন্দ্র রায়ের মতো লোকেরা সম্ভ্রম রক্ষার জন্য সততই ব্যস্ত, কিন্তু সম্ভ্রম কাহাকে বলে ও কী করিয়া সম্ভ্রম রাখিতে হয় সে জ্ঞান তাহাদের নাই।

দেওয়ানজি কহিলেন, "মন্ত্রীমহাশয় ঠিক বলিয়াছেন। তাহ হইলে প্রতাপাদিত্যকে ও তাঁহার কন্যাকে বিলক্ষণ শিক্ষা দেওয়া হইবে।"

রমাই ভাঁড় কহিল, "এ শুভকার্যে আপনার বর্তমান শ্বশুরমহাশয়কে একখানা নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইতে ভুলিবেন না, নহিলে কী জানি তিনি মনে দুঃখ করিতে পারেন।" বলিয়া রমাই চোখ টিপিল। সভাস্থ সকলে হাসিতে লাগিল। যাহারা দূরে বসিয়াছিল, কথাটা শুনিতে পায় নাই, তাহারাও না হাসিয়া কিছুতেই থাকিতে পারিল না।

রমাই কহিল, "বরণ করিবার নিমিত্ত এয়োস্ত্রীদের মধ্যে যশোরে আপনার শাশুড়ীঠাকরুনকে ডাকিয়া পাঠাইবেন। আর মিষ্টান্নমিতরেজনাঃ, প্রতাপাদিত্যের মেয়েকে যখন একথাল মিষ্টান্ন পাঠাইবেন তখন তাহার সঙ্গে দুটো কাঁচা রম্ভা পাঠাইয়া দিবেন।"

রাজা হাসিয়া অস্থির হইলেন। সভাসদেরা মুখে চাদর দিয়া মুখ বাঁকাইয়া হাসিতে লাগিল। ফর্নাণ্ডিজ অলক্ষিতভাবে উঠিয়া চলিয়া গেল।

দেওয়ানজি একবার রসিকতা করিবার চেষ্টা করিলেন, কহিলেন, "মিষ্টান্নমিতরে-জনাঃ— যদি ইতর লোকের ভাগ্যেই মিষ্টান্ন থাকে, তাহা হইলে তো যশোহরেই সমস্ত মিষ্টান্ন খরচ হইয়া যায়, চন্দ্রদ্বীপে আর মিষ্টান্ন খাইবার উপযুক্ত লোক থাকে না।"

কথাটা শুনিয়া কাহারও হাসি পাইল না। রাজা চুপ করিয়া গুড়গুড়ি টানিতে লাগিলেন, সভাসদেরা গম্ভীর হইয়া রহিল, রমাই দেওয়ানের দিকে একবার অবাক

হইয়া চাহিল, এমন-কি, একজন অমাত্য বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "সে কী কথা দেওয়ানজি মহাশয়। রাজার বিবাহে মিষ্টান্নের বন্দোবস্ত কি এত কম হইবে?" দেওয়ানজি মহাশয় মাথা চুলকাইতে লাগিলেন।

বিবাহের কথা সমস্ত স্থির হইয়া গেল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

উদয়াদিত্যকে যেখানে রুদ্ধ করা হইয়াছে তাহা প্রকৃত কারাগার নহে; তাহা প্রাসাদসংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র অট্টালিকা। বাটীর ঠিক ডানপাশেই এক রাজপথ ও তাহার পূর্বদিকে প্রশস্ত এক প্রাচীর আছে, তাহার উপর প্রহরীরা পায়চারি করিয়া পাহারা দিতেছে। ঘরেতে একটি অতি ক্ষুদ্র জানালা কাটা। তাহার মধ্য দিয়া খানিকটা আকাশ, একটা বাঁশঝাড় ও একটি শিবমন্দির দেখা যায়। উদয়াদিত্য প্রথম যখন কারাগারে প্রবেশ করিলেন, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। জানালার কাছে মুখ রাখিয়া ভূমিতে গিয়া বসিলেন। বর্ষাকাল। আকাশে মেঘ জমিয়া আছে। রাস্তায় জল দাঁড়াইয়াছে। নিস্তব্ধ রাত্রে দৈবাৎ দুই-একজন পথিক চলিতেছে, ছপ্ ছপ্ করিয়া তাহাদের পায়ের শব্দ হইতেছে। পূর্বদিক হইতে কারাগারের হৃৎস্পন্দন-ধ্বনির মতো প্রহরীদের পদশব্দ অনবরত কানে আসিতেছে। এক-এক প্রহর অতীত হইতে লাগিল, দূর হইতে এক-একটা হাঁক শোনা যাইতেছে। আকাশে একটিমাত্র তারা নাই। যে বাঁশঝাড়ের দিকে উদয়াদিত্য চাহিয়া আছেন তাহা জোনাকিতে একেবারে ছাইয়া ফেলিয়াছে। সে-রাত্রে উদয়াদিত্য আর শয়ন করিলেন না, জানালার কাছে বসিয়া প্রহরীদের অবিরাম পদশব্দ শুনিতে লাগিলেন।

বিভা আজ সন্ধ্যাবেলায় একবার অন্তঃপুরের বাগানে গিয়াছে। প্রাসাদে বোধ করি অনেক লোক। চারি দিকে দাসদাসী, চারি দিকেই পিসি মাসি। কথায় কথায় কী হইয়াছে, কী বৃত্তান্ত, জিজ্ঞাসা করে; প্রতি অশ্রুবিন্দুর হিসাব দিতে হয়; প্রতি দীর্ঘনিশ্বাসের বিস্তৃত ভাষ্য ও সমালোচনা বাহির হইতে থাকে। বিভা বুঝি আর পারে নাই, ছুটিয়া বাগানে আসিয়াছে। সূর্য আজ মেঘের মধ্যেই উঠিয়াছে, মেঘের মধ্যেই অস্ত গেল। কখন যে দিনের অবসান হইল ও সন্ধ্যার আরম্ভ হইল বুঝা গেল না। বিকালের দিকে পশ্চিমের মুখে একটুখানি সোনার রেখা ফুটিয়াছিল, কিন্তু দিন শেষ হইতে না হইতেই মিলাইয়া গেল। আঁধারের উপর আঁধার ঘনাইতে লাগিল। দিগন্ত হইতে দিগন্ত আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ঘনশ্রেণী ঝাউগাছগুলির মাথার

উপর অন্ধকার এমনি করিয়া জমিয়া আসিল যে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা ব্যবধান আর দেখা গেল না, ঠিক মনে হইতে লাগিল যেন সহস্র দীর্ঘ পায়ের উপর ভর দিয়া একটা প্রকাণ্ড বিস্তৃত নিস্তব্ধ অন্ধকার দাঁড়াইয়া আছে। রাত হইতে লাগিল, রাজবাড়ির প্রদীপ একে একে নিবিয়া গেল। বিভা ঝাউগাছের তলায় বসিয়া আছে। বিভা স্বভাবতই ভীরু, কিন্তু আজ তাহার ভয় নাই। কেবল যতই আঁধার বাড়িতেছে ততই তাহার মনে হইতেছে যেন পৃথিবীকে কে তাহার কাছ হইতে কাড়িয়া লইতেছে, যেন সুখ হইতে শান্তি হইতে জগৎ-সংসারের উপকূল হইতে কে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়াছে, অতলস্পর্শ অন্ধকারের সমুদ্রের মধ্যে সে পড়িয়া গিয়াছে। ক্রমেই ডুবিতেছে, ক্রমেই নামিতেছে, মাথার উপরে অন্ধকার ক্রমেই বাড়িতেছে, পদতলে ভূমি নাই, চারি দিকে কিছুই নাই। আশ্রয় উপকূল জগৎ-সংসার ক্রমেই দূর হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছে। তাহার মনে হইতে লাগিল যেন একটু একটু করিয়া তাহার সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড ব্যবধান আকাশের দিকে উঠিতেছে। তাহার ওপারে কত কী পড়িয়া রহিল। প্রাণ যেন আকুল হইয়া উঠিল। যেন ওপারে সকলই দেখা যাইতেছে; সেখানকার সূর্যালোক, খেলাধুলা, উৎসব সকলই দেখা যাইতেছে; কে যেন নিষ্ঠুরভাবে, কঠোর হস্তে তাহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে, তাহার কাছে বুকের শিরা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেও সে যেন সেদিকে যাইতে দিবে না। বিভা যেন আজ দিব্যচক্ষু পাইয়াছে; এই চরাচরব্যাপী ঘনঘোর অন্ধকারের উপর বিধাতা যেন বিভার ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট লিখিয়া দিয়াছেন, অনন্ত জগৎ-সংসারে একাকী বসিয়া বিভা যেন তাহাই পাঠ করিতেছে; তাই তাহার চক্ষে জল নাই, দেহ নিস্পন্দ, নেত্র নির্নিমেষ। রাত্রি দুই প্রহরের পর একটা বাতাস উঠিল, অন্ধকারে গাছপালাগুলা হা হা করিয়া উঠিল। বাতাস অতি দূরে হু হু করিয়া শিশুর কণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল। বিভার মনে হইতে লাগিল যেন দূর দূর দূরান্তরে সমুদ্রের তীরে বসিয়া বিভার সাধের স্নেহের প্রেমের শিশুগুলি দুই হাত বাড়াইয়া কাঁদিতেছে, আকুল হইয়া তাহারা বিভাকে ডাকিতেছে, তাহারা কোলে আসিতে চায়, সম্মুখে তাহারা পথ দেখিতে পাইতেছে না, যেন তাহাদের ক্রন্দন এই শত যোজন লক্ষ যোজন গাঢ় স্তব্ধ অন্ধকার ভেদ করিয়া বিভার কানে আসিয়া পৌঁছিল। বিভার প্রাণ যেন কাতর হইয়া কহিল, "কে রে, তোরা কে, তোরা কে কাঁদিতেছিস, তোরা কোথায়।" বিভা মনে মনে যেন এই লক্ষ যোজন অন্ধকারের পথে একাকিনী যাত্রা করিল। সহস্র বৎসর ধরিয়া যেন অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করিল, পথ শেষ হইল না, কাহাকেও দেখিতে পাইল না। কেবল সেই বায়ুহীন শব্দহীন দিনরাত্রিহীন জনশূন্য তারাশূন্য

দিগ্‌দিগন্তশূন্য মহান্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া মাঝে মাঝে চারি দিক হইতে ক্রন্দন শুনিতে পাইল, কেবল বাতাস দূর হইতে করিতে লাগিল— হূ হূ।

সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটিয়া গেল। পরদিন বিভা কারাগারে উদয়াদিত্যের নিকট যাইবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিল, সেখানে তাহার যাওয়া নিষেধ। সমস্ত দিন ধরিয়া অনেক কাঁদাকাটি করিল। এমন-কি স্বয়ং প্রতাপাদিত্যের কাছে গেল। বিভা তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিল। অনেক কষ্টে সম্মতি পাইল। পরদিন প্রভাত হইতে না হইতেই বিভা শয্যা হইতে উঠিয়া কারাগৃহে প্রবেশ করিল। গিয়া দেখিল উদয়াদিত্য বিছানায় শোন নাই। ভূমিতলে বসিয়া বাতায়নের উপরে মাথা দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। দেখিয়া বিভার প্রাণ যেন বুক ফাটিয়া কাঁদিয়া উঠিতে চাহিল। অনেক কষ্টে রোদন সংবরণ করিল। অতি ধীরে নিঃশব্দে উদয়াদিত্যের কাছে গিয়া বসিল। ক্রমে প্রভাত পরিষ্কার হইয়া আসিল। নিকটের বন হইতে পাখিরা গাহিয়া উঠিল। পাশের রাজপথ হইতে পান্থেরা গান গাহিয়া উঠিল, দুই একটি রাত্রি-জাগরণে ক্লান্ত প্রহরী আলো দেখিয়া মৃদুস্বরে গান গাহিতে লাগিল। নিকটস্থ মন্দির হইতে শাঁখ-ঘণ্টার শব্দ উঠিল। উদয়াদিত্য সহসা চমকিয়া জাগিয়া উঠিলেন। বিভাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "এ কী বিভা, এত সকালে যে?" ঘরের চারি দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, "এ কী, আমি কোথায়?" মুহূর্তের মধ্যে মনে পড়িল, তিনি কোথায়। বিভার দিকে চাহিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "আঃ! বিভা, তুই আসিয়াছিস? কাল তোকে সমস্তদিন দেখি নাই, মনে হইয়াছিল বুঝি তোদের আর দেখিতে পাইব না।"

বিভা উদয়াদিত্যের কাছে আসিয়া চোখ মুছিয়া কহিল, "দাদা, মাটিতে বসিয়া কেন? খাটে বিছানা পাতা রহিয়াছে। দেখিয়া বোধ হইতেছে, একবারও তুমি খাটে বস নাই। এ দুদিন কি তবে ভূমিতেই আসন করিয়াছ?" বলিয়া বিভা কাঁদিতে লাগিল।

উদয়াদিত্য ধীরে ধীরে কহিলেন, "খাটে বসিলে আমি যে আকাশ দেখিতে পাই না বিভা। জানালার ভিতর দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া যখন পাখিদের উড়িতে দেখি, তখন মনে হয়, আমারও একদিন খাঁচা ভাঙিবে, আমিও একদিন ওই পাখিদের মতো ওই অনন্ত আকাশে প্রাণের সাধে সাঁতার দিয়া বেড়াইব। এ জানালা হইতে যখন সরিয়া যাই, তখন চারি দিকে অন্ধকার দেখি, তখন ভুলিয়া যাই যে আমার একদিন মুক্তি হইবে, একদিন নিষ্কৃতি হইবে— মনে হয় না জীবনের বেড়ি একদিন ভাঙিয়া যাইবে, এ কারাগার হইতে এক দিন খালাস পাইব। বিভা, এ কারাগারের

মধ্যে এই দুই হাত জমি আছে যেখানে আসিলেই আমি জানিতে পারি যে আমি স্বভাবতই স্বাধীন ; কোনো রাজা-মহারাজা আমাকে বন্দী করিতে পারে না। আর ওইখানে ওই ঘরের মধ্যে ওই কোমল শয্যা, ওইখানেই আমার কারাগার।"

আজ বিভাকে সহসা দেখিয়া উদয়াদিত্যের মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল। বিভা যখন তাঁহার চক্ষে পড়িল, তখন তাঁহার কারাগারের সমুদয় দ্বার যেন মুক্ত হইয়া গেল। সেদিন তিনি বিভাকে কাছে বসাইয়া আনন্দে এত কথা বলিয়াছিলেন যে কারা-প্রবেশের পূর্বে বোধ করি এত কথা কখনো বলেন নাই। বিভা উদয়াদিত্যের সে আনন্দ মনে মনে বুঝিতে পারিয়াছিল। জানি না, এক প্রাণ হইতে আর-এক প্রাণে কী করিয়া বার্তা যায়, এক প্রাণে তরঙ্গ উঠিলে আর-এক প্রাণে কী নিয়মে তরঙ্গ উঠে। বিভার হৃদয় পুলকে পুরিয়া উঠিল। তাহার অনেক দিনের উদ্দেশ্য আজ সফল হইল। বিভা সামান্য বালিকা, উদয়াদিত্যকে সে যে আনন্দ দিতে পারে অনেক দিনের পর ইহা সে সহসা আজ বুঝিতে পারিল। হৃদয়ে সে বল পাইল। এতদিন সে চারি দিকে অন্ধকার দেখিতেছিল, কোথাও কিনারা পাইতেছিল না, নিরাশার গুরুভারে একেবারে নত হইয়া পড়িয়াছিল। নিজের উপর তাহার বিশ্বাস ছিল না ; অনবরত সে উদয়াদিত্যের কাজ করিত, কিন্তু বিশ্বাস করিতে পারিত না যে, তাঁহাকে সুখী করিতে পারিবে। আজ সে সহসা একটা পথ দেখিতে পাইয়াছে, এতদিনকার সমস্ত শ্রান্তি একেবারে ভুলিয়া গেল। আজ তাহার চোখে প্রভাতের শিশিরের মতো অশ্রুজল দেখা দিল, আজ তাহার অধরে অরুণকিরণের নির্মল হাসি ফুটিয়া উঠিল।

বিভাও প্রায় কারাবাসিনী হইয়া উঠিল। গৃহের বাতায়নের মধ্য দিয়া যখনই প্রভাত প্রবেশ করিত, কারাদ্বার খুলিয়া গিয়া তখনই বিভার বিমল মূর্তি দেখা দিত। বিভা বেতনভোগী ভৃত্যদের কিছুই করিতে দিত না, নিজের হাতে সমুদয় কাজ করিত, নিজে আহার আনিয়া দিত, নিজে শয্যা রচনা করিয়া দিত। একটি টিয়াপাখি আনিয়া ঘরে টাঙাইয়া দিল ও প্রতিদিন সকালে অন্তঃপুরের বাগান হইতে ফুল তুলিয়া আনিয়া দিত। ঘরে একখানি মহাভারত ছিল, উদয়াদিত্য বিভাকে কাছে বসাইয়া তাহাই পড়িয়া শুনাইতেন।

কিন্তু উদয়াদিত্যের মনের ভিতরে একটি কষ্ট জাগিয়া আছে। তিনি তো ডুবিতেই বসিয়াছেন, তবে কেন এমন সময়ে এই অসম্পূর্ণ-সুখ অতৃপ্ত-আশা সুকুমার বিভাকে আশ্রয়স্বরূপে আলিঙ্গন করিয়া তাহাকে পর্যন্ত ডুবাইতেছেন? প্রতিদিন মনে করেন বিভাকে বলিবেন, "তুই যা বিভা।" কিন্তু বিভা যখন উষার বাতাস লইয়া

উষার আলোক লইয়া তরুণী উষার হাত ধরিয়া কারার মধ্যে প্রবেশ করে, যখন সেই স্নেহের ধন সুকুমার মুখখানি লইয়া কাছে আসিয়া বসে, কত যত্ন কত আদরের দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখে, কত মিষ্ট স্বরে কত কথা জিজ্ঞাসা করে, তখন তিনি আর কোনোমতেই প্রাণ ধরিয়া বলিতে পারেন না, "বিভা, তুই যা, তুই আর আসিস না, তোকে আর দেখিব না।" প্রত্যহ মনে করেন, কাল বলিব। কিন্তু সে কাল আর কিছুতেই আসিতে চায় না। অবশেষে একদিন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন। বিভা আসিল, বিভাকে বলিলেন, "বিভা, তুই আর এখানে থাকিস নে। তুই না গেলে আমি কিছুতেই শান্তি পাইতেছি না। প্রতিদিন সন্ধ্যা-বেলায় এই কারাগৃহের অন্ধকারে কে আসিয়া আমাকে যেন বলে, বিভার বিপদ কাছে আসিতেছে। বিভা, আমার কাছ হইতে তোরা শীঘ্র পালাইয়া যা। আমি শনিগ্রহ, আমার দেখা পাইলেই চারি দিক হইতে দেশের বিপদ ছুটিয়া আসে। তুই শ্বশুরবাড়ি যা। মাঝে মাঝে যদি সংবাদ পাই, তাহা হইলেই আমি সুখে থাকিব।"

বিভা চুপ করিয়া রহিল।

উদয়াদিত্য মুখ নত করিয়া বিভার সেই মুখখানি অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। উদয়াদিত্য বুঝিলেন, "আমি কারাগার হইতে না মুক্ত হইলে বিভা কিছুতেই আমাকে ছাড়িয়া যাইবে না, কী করিয়া মুক্ত হইতে পারিব।"

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

রামচন্দ্র রায় ভাবিলেন, বিভা যে চন্দ্রদ্বীপে আসিল না, সে কেবল প্রতাপাদিত্যের শাসনে ও উদয়াদিত্যের মন্ত্রণায়। বিভা যে নিজের ইচ্ছায় আসিল না, তাহা মনে করিলে তাঁহার আত্মগৌরবে অত্যন্ত আঘাত লাগে। তিনি ভাবিলেন প্রতাপাদিত্য আমাকে অপমান করিতে চাহে, অতএব সে কখনো বিভাকে আমার কাছে পাঠাইবে না। কিন্তু এ অপমান আমিই তাহাকে ফিরাইয়া দিই না কেন। আমিই তাহাকে এক পত্র লিখি না কেন যে তোমার মেয়েকে আমি পরিত্যাগ করিলাম, তাহাকে যেন আর চন্দ্রদ্বীপে পাঠানো না হয়। এইরূপ সাত-পাঁচ ভাবিয়া পাঁচজনের সহিত মন্ত্রণা করিয়া প্রতাপাদিত্যকে ওই মর্মে এক পত্র লেখা হইল। প্রতাপাদিত্যকে এরূপ চিঠি লেখা বড়ো সাধারণ সাহসের কর্ম নহে। রামচন্দ্র

রায়ের মনে মনে বিলক্ষণ ভয় হইতেছিল। কিন্তু ঢালু পর্বতে বেগে নামিতে নামিতে হাজার ভয় হইলেও যেমন মাঝে থামা যায় না, রামচন্দ্র রায়ের মনেও সেইরূপ একটা ভাবের উদয় হইয়াছিল। সহসা একটা দুঃসাহসিকতায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, শেষ পর্যন্ত না পৌঁছিয়া যেন দাঁড়াইতে পারিতেছেন না। রামমোহনকে ডাকিয়া কহিলেন, "এই পত্র যশোহরে লইয়া যা।" রামমোহন জোড়হস্তে কহিল, "আজ্ঞা না মহারাজ, আমি পারিব না। আমি স্থির করিয়াছি আর যশোহরে যাইব না। এক যদি পুনরায় মা-ঠাকুরানীকে আনিতে যাইতে বলেন তো আর-একবার যাইতে পারি, নতুবা এ চিঠি লইয়া যাইতে পারিব না।" রামমোহনকে আর কিছু না বলিয়া বৃদ্ধ নয়ানচাঁদের হাতে রাজা সেই পত্রখানি দিলেন। সে সেই পত্র লইয়া যশোহরে যাত্রা করিল।

পত্র লইয়া গেল বটে, কিন্তু নয়ানচাঁদের মনে বড়ো ভয় হইল। প্রতাপাদিত্যের হাতে এ পত্র পড়িলে না জানি তিনি কী করিয়া বসেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মহিষীর হাতে সে এই পত্র দিতে সংকল্প করিল। মহিষীর মনের অবস্থা বড়ো ভালো নয়। এক দিকে বিভার জন্য তাঁহার ভাবনা, আর-এক দিকে উদয়াদিত্যের জন্য তাঁহার কষ্ট। সংসারের গোলেমালে তিনি যেন একেবারে ঝালাপালা হইয়া গিয়াছেন। মাঝে মাঝে প্রায় তাঁহাকে কাঁদিতে দেখা যায়। তাঁহার যেন আর ঘরকন্নায় মন লাগে না। এইরূপ অবস্থায় তিনি এই পত্রখানি পাইলেন— কী যে করিবেন কিছু ভাবিয়া পাইলেন না। বিভাকে কিছু বলিতে পারেন না, তাহা হইলে সুকুমার বিভা আর বাঁচিবে না। মহারাজের কানে এ চিঠির কথা উঠিলে কী যে অনর্থপাত হইবে তাহার ঠিকানা নাই। অথচ এমন সংকটের অবস্থায় কাহাকে কিছু না বলিয়া কাহারও নিকট কোনো পরামর্শ না লইয়া মহিষী বাঁচিতে পারেন না, চারিদিক অকূল পাথার দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রতাপাদিত্যের কাছে গেলেন। কহিলেন, "মহারাজ, বিভার তো যাহা হয় একটা কিছু করিতে হইবে।"

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "কেন বলো দেখি?"

মহিষী কহিলেন, "নাঃ, কিছু যে হইয়াছে তাহা নহে, তবে বিভাকে তো এক সময়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠাইতেই হইবে।"

প্রতাপাদিত্য। সে তো বুঝিলাম, তবে এতদিন পরে আজ যে সহসা তাহা মনে পড়িল?

মহিষী ভীত হইয়া কহিলেন, "ওই তোমার এক কথা, আমি কি বলিতেছি যে কিছু হইয়াছে? যদি কিছু হয়—"

প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "হইবে আর কী ?"

মহিষী। এই মনে করো যদি জামাই বিভাকে একেবারে ত্যাগ করে।

বলিয়া মহিষী রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

প্রতাপাদিত্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার চোখ দিয়া অগ্নিকণা বাহির হইল।

মহারাজের সেই মূর্তি দেখিয়া মহিষী চোখের জল মুছিয়া তাড়াতাড়ি কহিলেন, "তাই বলিয়া জামাই কি আর সত্য সত্যই লিখিয়াছে যে, ওগো তোমাদের বিভাকে আমি ত্যাগ করিলাম, তাহাকে আর চন্দ্রদ্বীপে পাঠাইয়ো না, তাহা নহে— তবে কথা এই, যদি কোনোদিন তাই লিখিয়া বসে !"

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "তখন তাহার বিহিত বিধান করিব, এখন তাহার জন্য ভাবিবার অবসর নাই।"

মহিষী কাঁদিয়া কহিলেন, "মহারাজ, তোমার পায়ে পড়ি, আমার একটি কথা রাখো, একবার ভাবিয়া দেখো বিভার কী হইবে। আমার পাষাণ প্রাণ বলিয়া আজও রহিয়াছে, নহিলে আমাকে যত দূর যন্ত্রণা দিবার তা দিয়াছ। উদয়কে— আমার বাছাকে— রাজার ছেলেকে সামান্য অপরাধীর মতো রুদ্ধ করিয়াছ। সে আমার কাহারও কোনো অপকার করে না, কিছুতেই লিপ্ত থাকে না, দোষের মধ্যে সে কিছু বোঝে-সোঝে না, রাজকার্য শেখে নাই, প্রজা শাসন করিতে জানে না, তাহার বুদ্ধি নাই, তা ভগবান তাহাকে যা করিয়াছেন তাহার দোষ কী।"

বলিয়া মহিষী দ্বিগুণ কাঁদিতে লাগিলেন।

প্রতাপাদিত্য ঈষৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "ও কথা তো অনেকবার হইয়া গিয়াছে। যে কথা হইতেছিল তাহাই বলো না।"

মহিষী কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, "আমারই পোড়া কপাল। বলিব আর কী! বলিলে কি তুমি কিছু শোন! একবার বিভার মুখপানে চাও মহারাজ। সে যে কাহাকেও কিছু বলে না— সে কেবল দিনে দিনে শুকাইয়া যায়, ছায়ার মতো হইয়া আসে, কিন্তু সে কথা কহিতে জানে না। তাহার একটা উপায় করো।"

প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। মহিষী আর কিছু না বলিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

ইতিমধ্যে এক ঘটনা ঘটিয়াছে। যখন সীতারাম দেখিল, উদয়াদিত্যকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে, তখন সে আর হাত-পা আছড়াইয়া বাঁচে না। প্রথমেই তো সে রুক্মিণীর বাড়ি গেল। তাহাকে যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিল। তাহাকে মারিতে যায় আর-কি। কহিল, "সর্বনাশী, তোর ঘরে আগুন জ্বালাইয়া দিব, তোর ভিটায় ঘুঘু চরাইব, আর যুবরাজকে খালাস করিব, তবে আমার নাম সীতারাম। আজই আমি রায়গড়ে চলিলাম, রায়গড় হইতে আসি, তার পরে তোর ওই কালামুখ লইয়া এই শানের উপরে ঘষিব, তোর মুখে চুনকালি মাখাইয়া শহর হইতে বাহির করিয়া দিব, তবে জলগ্রহণ করিব।"

রুক্মিণী কিয়ৎক্ষণ অনিমেষনেত্রে সীতারামের মুখের দিকে চাহিয়া শুনিল, ক্রমে তাহার দাঁতে দাঁতে লাগিল, ঠোঁটে ঠোঁট চাপিল, তাহার হাতের মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ হইল, তাহার ঘনকৃষ্ণ ভ্রূযুগলের উপর মেঘ ঘনাইয়া আসিল, তাহার ঘনকৃষ্ণ চক্ষুতারকায় বিদ্যুৎ সঞ্চিত হইতে লাগিল, তাহার সমস্ত শরীর নিস্পন্দ হইয়া গেল। ক্রমে তাহার স্থূল অধরোষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল, ঘন ভ্রূ তরঙ্গিত হইল, অন্ধকার চক্ষে বিদ্যুৎ খেলাইতে লাগিল, কেশরাশি ফুলিয়া উঠিল, হাত-পা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিল। একটা পৈশাচিক অভিশাপ, একটা সর্বাঙ্গস্ফীত কম্পমান হিংসা সীতারামের মাথার উপরে যেন পড়ে পড়ে। সেই মুহূর্তে সীতারাম কুটির হইতে বাহির হইয়া গেল। ক্রমে যখন রুক্মিণীর মুষ্টি শিথিল হইয়া আসিল, দাঁত খুলিয়া গেল, অধরোষ্ঠ পৃথক হইল, কুঞ্চিত ভ্রূ প্রসারিত হইল, তখন সে বসিয়া পড়িল, কহিল, "বটে! যুবরাজ তোমারই বটে! যুবরাজের বিপদ হইয়াছে বলিয়া তোমার গায়ে বড়ো লাগিয়াছে— যেন যুবরাজ আমার কেহ নয়। পোড়ারমুখো, এটা জানিস না যে সে আমারই যুবরাজ, আমিই তাহার ভালো করিতে পারি আর আমিই তাহার মন্দ করিতে পারি। আমার যুবরাজকে তুই কারামুক্ত করিতে চাহিস। দেখিব কেমন তাহা পারিস।"

সীতারাম সেই দিনই রায়গড়ে চলিয়া গেল।

বিকালবেলা বসন্ত রায় রায়গড়ের প্রাসাদের বারান্দায় বসিয়া রহিয়াছেন। সম্মুখে এক প্রশস্ত মাঠ দেখা যাইতেছে। মাঠের প্রান্তে খালের পরপারে একটি আম্রবনের মধ্যে সূর্য অস্ত যাইতেছেন। বসন্ত রায়ের হাতে তাঁহার চিরসহচর সেতারটি আর নাই। বৃদ্ধ সেই অস্তমান সূর্যের দিকে চাহিয়া আপনার মনে গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতেছেন—

আমিই শুধু রইনু বাকি।
যা ছিল তা গেল চলে, রইল যা তা কেবল ফাঁকি
আমার ব'লে ছিল যারা
আর তো তারা দেয় না সাড়া—
কোথায় তারা ? কোথায় তারা ? কেঁদে কেঁদে কারে ডাকি।
বল্ দেখি মা, শুধাই তোরে,
আমার কিছু রাখলি নে রে ?
আমি কেবল আমায় নিয়ে কোন্ প্রাণেতে বেঁচে থাকি।

কে জানে কী ভাবিয়া বৃদ্ধ এই গান গাহিতেছিলেন। বুঝি তাঁহার মনে হইতেছিল, 'গান গাহিতেছি, কিন্তু যাহাদের গান শুনাইতাম তাহারা যে নাই। গান আপনি আসে, কিন্তু গান গাহিয়া যে আর সুখ নাই। এখনো আনন্দ ভুলি নাই, কিন্তু যখনই আনন্দ জন্মিত তখনই যাহাদের আলিঙ্গন করিতে সাধ যাইত তাহারা কোথায় ? যেদিন প্রভাতে রায়গড়ে ওই তালগাছটার উপরে মেঘ করিত, মনটা আনন্দে নাচিয়া উঠিত, সেই দিনই আমি যাহাদের দেখিতে যশোরে যাত্রা করিতাম, তাহাদের কি আর দেখিতে পাইব না ? এখনো এক-একবার মনটা তেমনি আনন্দে নাচিয়া উঠে, কিন্তু হায়—'

এই সব বুঝি ভাবিয়া আজ বিকালবেলায় অস্তমান সূর্যের দিকে চাহিয়া বৃদ্ধ বসন্ত রায়ের মুখে আপনা আপনি গান উঠিতেছে— আমিই শুধু রইনু বাকি।

এমন সময়ে খাঁ সাহেব আসিয়া এক মস্ত সেলাম করিল। খাঁ সাহেবকে দেখিয়া বসন্ত রায় উৎফুল্ল হইয়া কহিলেন, "খাঁ সাহেব, এসো এসো।" অধিকতর নিকটে গিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া কহিলেন, "সাহেব, তোমার মুখ অমন মলিন দেখিতেছি কেন ? মেজাজ ভালো আছে তো ?"

খাঁ সাহেব। মেজাজের কথা আর জিজ্ঞাসা করিবেন না, মহারাজ। আপনাকে মলিন দেখিয়া আমাদের মনে আর সুখ নাই। একটি বয়েত আছে— রাত্রি বলে আমি কেহই নই, যাহাকে মাথায় করিয়া রাখিয়াছি সেই চাঁদ, তাহারই সহিত আমি একত্রে হাসি, একত্রে ম্লান হইয়া যাই!— মহারাজ, আমরাই বা কে, আপনি না হাসিলে আমাদের হাসিবার ক্ষমতা কী ? আমাদের আর সুখ নাই, জনাব।

বসন্ত রায় ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, "সে কী কথা সাহেব ? আমার তো অসুখ কিছুই নাই, আমি নিজেকে দেখিয়া নিজে হাসি, নিজের আনন্দে নিজে থাকি, আমার অসুখ কী খাঁ সাহেব ?"

খাঁ সাহেব। মহারাজ এখন আপনার আর তেমন গান বাদ্য শুনা যায় না।

বসন্ত রায় সহসা ঈষৎ গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "আমার গান শুনিবে সাহেব ?—

আমিই শুধু রইনু বাকি।
যা ছিল তা গেল চলে,
রইল যা তা কেবল ফাঁকি।"

খাঁ সাহেব। আপনি আর সে সেতার বাজান কই ? আপনার সে সেতার কোথায় ?

বসন্ত রায় ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "সে সেতার যে নাই, তাহা নয়। সেতার আছে, শুধু তাহার তার ছিঁড়িয়া গেছে, তাহাতে আর স্বর মেলে না।"

বলিয়া আম্রবনের দিকে চাহিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে বসন্ত রায় বলিয়া উঠিলেন, "খাঁ সাহেব, একটা গান গাও না— একটা গান গাও ; গাও, তাজবে তাজ নওবে নও।"

খাঁ সাহেব গান ধরিলেন—

তাজবে তাজ নওবে নও।

দেখিতে দেখিতে বসন্ত রায় মাতিয়া উঠিলেন, আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। উঠিয়া দাঁড়াইলেন, একত্রে গাহিতে লাগিলেন— তাজবে তাজ নওবে নও। ঘন ঘন তাল দিতে লাগিলেন এবং বারবার করিয়া গাহিতে লাগিলেন। গাহিতে গাহিতে সূর্য অস্ত গেল, অন্ধকার হইয়া আসিল, রাখালেরা বাড়িমুখে আসিতে আসিতে গান ধরিল। এমন সময়ে আসিয়া সীতারাম "মহারাজের জয় হউক" বলিয়া প্রণাম করিল। বসন্ত রায় একেবারে চমকিত হইয়া তৎক্ষণাৎ গান বন্ধ করিয়া তাড়াতাড়ি তাহার কাছে আসিয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া কহিলেন, "আরে, সীতারাম যে! ভালো আছিস তো ? দাদা কেমন আছে ? দিদি কোথায় ? খবর ভালো তো ?"

খাঁ সাহেব চলিয়া গেল। সীতারাম কহিল, "একে একে নিবেদন করিতেছি মহারাজ।" বলিয়া একে একে যুবরাজের কারারোধের কথা কহিল। সীতারাম আগাগোড়া সত্য কথা বলে নাই। যে কারণে উদয়াদিত্যের কারারোধ ঘটিয়াছিল, সে কারণটা তেমন স্পষ্ট করিয়া বলে নাই।

বসন্ত রায়ের মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল, তিনি সীতারামের হাত দৃঢ় করিয়া ধরিলেন। তাঁহার ভ্রূ ঊর্ধ্বে উঠিল, তাঁহার চক্ষু প্রসারিত হইয়া গেল, তাঁহার অধরৌষ্ঠ বিভিন্ন হইয়া গেল— নির্নিমেষ নেত্রে সীতারামের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "অ্যাঁ ?"

সীতারাম কহিল, "আজ্ঞা হাঁ মহারাজ।"

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া বসন্ত রায় কহিলেন, "সীতারাম!"

সীতারাম। মহারাজ!

বসন্ত রায়। তাহা হইলে দাদা এখন কোথায়?

সীতারাম। আজ্ঞা, তিনি কারাগারে।

বসন্ত রায় মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। উদয়াদিত্য কারাগারে, এ কথাটা বুঝি তাঁহার মাথায় ভালো করিয়া বসিতেছে না, কিছুতেই কল্পনা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। আবার কিছুক্ষণ বাদে সীতারামের হাত ধরিয়া কহিলেন, "সীতারাম!"

সীতারাম। আজ্ঞা মহারাজ!

বসন্ত রায়। তাহা হইলে দাদা এখন কী করিতেছে?

সীতারাম। কী আর করিবেন। তিনি কারাগারেই আছেন।

বসন্ত রায়। তাহাকে কি সকলে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে?

সীতারাম। আজ্ঞা হাঁ মহারাজ।

বসন্ত রায়। তাহাকে কি কেহ একবার বাহির হইতে দেয় না?

সীতারাম। আজ্ঞা না।

বসন্ত রায়। সে একলা কারাগারে বসিয়া আছে?

বসন্ত রায় এ কথাগুলি বিশেষ কোনো ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন নাই— আপনা-আপনি বলিতেছিলেন। সীতারাম তাহা বুঝিতে পারে নাই— সে উত্তর করিল, "হাঁ মহারাজ।"

বসন্ত রায় বলিয়া উঠিলেন, "দাদা, তুই আমার কাছে আয় রে, তোকে কেহ চিনিল না।"

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

বসন্ত রায় তাহার পরদিনই যশোহরে যাত্রা করিলেন। কাহারও নিষেধ মানিলেন না। যশোহরে পৌঁছিয়াই একেবারে রাজবাটীর অন্তঃপুরে গেলেন। বিভা সহসা তাহার দাদামহাশয়কে দেখিয়া যেন কী হইয়া গেল। কিছুক্ষণ কী যে করিবে কিছু যেন ভাবিয়া পাইল না। কেবল চোখে বিস্ময়, অধরে আনন্দ, মুখে কথা নাই, শরীর নিস্পন্দ— খানিকটা দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর তাঁহার পায়ের কাছে

পড়িয়া প্রণাম করিল, পায়ের ধুলা মাথায় লইল। বিভা উঠিয়া দাঁড়াইলে পর বসন্ত রায় একবার নিতান্ত একাগ্রদৃষ্টে বিভার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিভা?" আর কিছু বলিলেন না, কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিভা?" যেন তাঁহার মনে একটি অতি ক্ষীণ আশা জাগিয়াছিল যে, সীতারাম যাহা বলিয়াছিল তাহা সত্য না হইতেও পারে। সমস্তটা স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিতে ভয় হইতেছে, পাছে বিভা তাহার উত্তর দিয়া ফেলে। তাঁহার ইচ্ছা নয় যে, বিভা তৎক্ষণাৎ তাঁহার এ প্রশ্নের উত্তর দেয়। তাই তিনি অতি ভয়ে ভয়ে বিভার মুখখানিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিভা?" তাই তিনি অতি একাগ্রদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে একবার চাহিলেন। বিভা বুঝিল এবং বিভা উত্তর দিতেও পারিল না; তাহার প্রথম আনন্দ-উচ্ছ্বাস ফুরাইয়া গেছে। আগে যখন দাদামহাশয় আসিতেন, সেই-সব দিন তাহার মনে পড়িয়াছে। সে এক কী উৎসবের দিনই গিয়াছে। তিনি আসিলে কী একটা আনন্দই পড়িত। সুরমা হাসিয়া তামাশা করিত, বিভা হাসিত কিন্তু তামাশা করিতে পারিত না, দাদা প্রশান্ত আনন্দমূর্তিতে দাদামহাশয়ের গান শুনিতেন। আজ দাদামহাশয় আসিলেন, কিন্তু আর কেহ তাঁহার কাছে আসিল না, কেবল এই আঁধার সংসারে একলা বিভা— সুখের সংসারের একমাত্র ভগ্নাবশেষের মতো একলা দাদামহাশয়ের কাছে দাঁড়াইয়া আছে। দাদামহাশয় আসিলে যে ঘরে আনন্দধ্বনি উঠিত— সেই সুরমার ঘর আজ এমন কেন? সে আজ স্তব্ধ, অন্ধকার, শূন্যময়— দাদামহাশয়কে দেখিলেই সে ঘরটা যেন এখনই কাঁদিয়া উঠিবে। বসন্ত রায় একবার কী যেন কিসের আশ্বাসে সেই ঘরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন— দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ঘরের মধ্যে মাথা লইয়া একবার চারি দিক দেখিলেন, তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া বুক-ফাটা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি, ঘরে কি কেহই নাই?"

বিভা কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "না দাদামহাশয়, কেহই নাই।"

স্তব্ধ ঘরটা যেন হা হা করিয়া বলিয়া উঠিল, "আগে যাহারা ছিল তাহারা কেহই নাই।"

বসন্ত রায় অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, অবশেষে বিভার হাত ধরিয়া আস্তে আস্তে গাহিয়া উঠিলেন—

আমিই শুধু রইনু বাকি।

বসন্ত রায় প্রতাপাদিত্যের কাছে গিয়া নিতান্ত মিনতি করিয়া কহিলেন, "বাবা প্রতাপ, উদয়কে আর কেন কষ্ট দাও— সে তোমার কী করিয়াছে? তাহাকে যদি তোমরা ভালো না বাস, পদে পদেই যদি সে তোমার কাছে অপরাধ করে তবে তাহাকে

এই বুড়ার কাছে দাও না। আমি তাহাকে লইয়া যাই— আমি তাহাকে রাখিয়া দিই। তাহাকে আর তোমাদের দেখিতে হইবে না— সে আমার কাছে থাকিবে!"

প্রতাপাদিত্য অনেকক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য ধরিয়া চুপ করিয়া বসন্ত রায়ের কথা শুনিলেন, অবশেষে বলিলেন, "খুড়ামহাশয়, আমি যাহা করিয়াছি তাহা অনেক বিবেচনা করিয়াই করিয়াছি, এ বিষয়ে আপনি অবশ্যই আমার অপেক্ষা অনেক অল্প জানেন— অথচ আপনি পরামর্শ দিতে আসিয়াছেন, আপনার এ-সকল কথা আমি গ্রাহ্য করিতে পারি না।"

তখন বসন্ত রায় উঠিয়া প্রতাপাদিত্যের কাছে আসিয়া প্রতাপাদিত্যের হাত ধরিয়া কহিলেন, "বাবা প্রতাপ, মনে কি নাই! তোকে যে আমি ছেলেবেলায় কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিলাম, সে কি আর মনে পড়ে না? স্বর্গীয় দাদা যেদিন তোকে আমার হাতে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, সেদিন হইতে আমি কি এক মুহূর্তের জন্য তোকে কষ্ট দিয়াছি? অসহায় অবস্থায় যখন তুই আমার হাতে ছিলি, একদিনও কি তুই আপনাকে পিতৃহীন বলিয়া মনে করিতে পারিয়াছিলি? প্রতাপ, বল্ দেখি, আমি তোর কী অপরাধ করিয়াছিলাম যাহাতে আমার এই বৃদ্ধ বয়সে তুই আমাকে এত কষ্ট দিতে পারিলি? এমন কথা আমি বলি না যে, তোকে পালন করিয়াছিলাম বলিয়া তুই আমার কাছে ঋণী— তোদের মানুষ করিয়া আমি আমার দাদার স্নেহ-ঋণ শোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। অতএব প্রতাপ, আমি প্রাপ্য বলিয়া তোর কাছে কিছুই চাহি না, কখনো চাহিও নাই, আমি কেবল তোর কাছে ভিক্ষা চাহিতেছি— তাও দিবি না?"

বসন্ত রায়ের চোখে জল পড়িতে লাগিল, প্রতাপাদিত্য পাষাণমূর্তির ন্যায় বসিয়া রহিলেন।

বসন্ত রায় আবার কহিলেন, "তবে আমার কথা শুনিবি না, আমার ভিক্ষা রাখিবি না? কথার উত্তর দিবি নে প্রতাপ?" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "ভালো, আমার আর-একটি ক্ষুদ্র প্রার্থনা আছে, একবার আমি উদয়কে দেখিতে চাই। আমাকে তাহার সেই কারাগৃহে প্রবেশ করিতে কেহ যেন নিষেধ না করে এই অনুমতি দাও।"

প্রতাপাদিত্য তাহাও দিলেন না। তাঁহার বিরুদ্ধে উদয়াদিত্যের প্রতি এতখানি স্নেহ প্রকাশ করাতে প্রতাপাদিত্য মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার যতই মনে হয় লোকে তাঁহাকেই অপরাধী করিয়া তুলিতেছে, ততই তিনি আরও বাঁকিয়া দাঁড়ান।

বসন্ত রায় নিতান্ত ম্লানমুখে অন্তঃপুরে ফিরিয়া গেলেন, তাঁহার মুখ দেখিয়া বিভার অত্যন্ত কষ্ট হইল। বিভা দাদামহাশয়ের হাত ধরিয়া কহিল, "দাদামহাশয়, আমার ঘরে এস।" বসন্ত রায় নীরবে বিভার সঙ্গে সঙ্গে বিভার ঘরে প্রবেশ করিলেন। তিনি ঘরে বসিলে পর বিভা তাহার কোমল অঙ্গুলি দিয়া তাঁহার পাকা চুলগুলি নাড়িয়া দিয়া কহিল, "দাদামহাশয়, এস, তোমার পাকা চুল তুলিয়া দিই।" বসন্ত রায় কহিলেন, "দিদি সে পাকাচুল কি আর আছে? যখন বয়স হয় নাই তখন সে-সব ছিল, তখন তোদের পাকা চুল তুলিতে বলিতাম। আজ আমি বুড়া হইয়া গিয়াছি, আজ আর আমার পাকা চুল নাই।"

বসন্ত রায় দেখিলেন বিভার মুখখানি মলিন হইয়া আসিল, তাহার চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসিল। অমনি তাড়াতাড়ি কহিলেন, "আয় বিভা আয়; গোটাকতক চুল তুলিয়া দে। তোদের পাকাচুল সরবরাহ করিয়া উঠিতে আর তো আমি পারি না ভাই। বয়স হইতে চলিল, ক্রমেই মাথায় টাক পড়িতে চলিল। এখন আর একটা মাথার অনুসন্ধান কর্‌, আমি জবাব দিলাম।" বলিয়া বসন্ত রায় হাসিতে লাগিলেন।

একজন দাসী আসিয়া বসন্ত রায়কে কহিল, "রানীমা আপনাকে একবার প্রণাম করিতে চান।"

বসন্ত রায় মহিষীর ঘরে গেলেন, বিভা কারাগারে গেল।

মহিষী বসন্ত রায়কে প্রণাম করিলেন। বসন্ত রায় আশীর্বাদ করিলেন, "মা, আয়ুষ্মতী হও।"

মহিষী কহিলেন, "কাকামহাশয়, ও আশীর্বাদ আর করিবেন না। এখন আমার মরণ হইলেই আমি বাঁচি।"

বসন্ত রায় ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "রাম রাম! ও কথা মুখে আনিতে নাই।"

মহিষী কহিলেন, "আর কী বলিব কাকামহাশয়, আমার ঘরকন্নায় যেন শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে।"

বসন্ত রায় অধিকতর ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

মহিষী কহিলেন, "বিভার মুখখানি দেখিয়া আমার মুখে আর অন্নজল রুচে না। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কিছু বলে না, কেবল দিনে দিনে তাহার শরীর ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। তাহাকে লইয়া যে আমি কী করিব কিছু ভাবিয়া পাই না।"

বসন্ত রায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

"এই দেখুন কাকামহাশয়, এক সর্বনেশে চিঠি আসিয়াছে।" বলিয়া এক চিঠি বসন্ত রায়ের হাতে দিলেন।

বসন্ত রায় সে চিঠি পড়িতে না পড়িতে মহিষী কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমার কিসের সুখ আছে? উদয়—বাছা আমার কিছু জানে না। তাহাকে তো মহারাজ—সে যেন রাজার মতোই হয় নাই, কিন্তু তাহাকে তো আমি গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম, সে তো আমার আপনার সন্তান বটে। জানি না, বাছা সেখানে কী করিয়া থাকে, একবার আমাকে দেখিতেও দেয় না।" মহিষী আজকাল যে কথাই পাড়েন, উদয়াদিত্যের কথা তাহার মধ্যে এক স্থলে আসিয়া পড়ে। ওই কষ্টটাই তাঁহার প্রাণের মধ্যে যেন দিনরাত জাগিয়া আছে।

চিঠি পড়িয়া বসন্ত রায় একেবারে অবাক হইয়া গেলেন, চুপ করিয়া বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বসন্ত রায় মহিষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ চিঠি তো কাহাকেও দেখাও নি মা!"

মহিষী কহিলেন, "মহারাজ এ চিঠির কথা শুনিলে কি আর রক্ষা রাখিবেন, বিভাও কি তাহা হইলে আর বাঁচিবে।"

বসন্ত রায় কহিলেন, "ভালো করিয়াছ। এ চিঠি আর কাহাকেও দেখাইয়ো না, বউমা। তুমি বিভাকে শীঘ্র তাহার শ্বশুরবাড়ি পাঠাইয়া দাও। মান-অপমানের কথা ভাবিয়ো না!"

মহিষী কহিলেন, "আমিও তাহাই মনে করিয়াছি। মান লইয়া আমার কাজ নাই, আমার বিভা সুখী হইলেই হইল। কেবল ভয় হয় পাছে বিভাকে তাহারা অযত্ন করে।"

বসন্ত রায় কহিলেন, "বিভাকে অযত্ন করিবে! বিভা কি অযত্নের ধন। বিভা যেখানে যাইবে সেইখানেই আদর পাইবে। অমন লক্ষ্মী অমন সোনার প্রতিমা আর কোথায় আছে। রামচন্দ্র কেবল তোমাদের উপর রাগ করিয়াই এই চিঠি লিখিয়াছে, আবার পাঠাইয়া দিলেই তাহার রাগ পড়িয়া যাইবে।" বসন্ত রায় তাঁহার সরল হৃদয়ে সরল বুদ্ধিতে এই বুঝিলেন। মহিষীও তাহাই বুঝিলেন।

বসন্ত রায় কহিলেন, "বাড়িতে রাষ্ট্র করিয়া দাও যে, বিভাকে চন্দ্রদ্বীপে পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া রামচন্দ্র এক চিঠি লিখিয়াছে। তাহা হইলে বিভা নিশ্চয়ই সেখানে যাইতে আর অমত করিবে না।"

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর বসন্ত রায় একাকী বহির্বাটীতে বসিয়া আছেন। এমন সময়ে সীতারাম তাঁহাকে আসিয়া প্রণাম করিল।

বসন্ত রায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী সীতারাম, কী খবর?"

সীতারাম কহিল, "সে পরে বলিব, আপনাকে আমার সঙ্গে আসিতে হইবে।"

বসন্ত রায় কহিলেন, "কেন, কোথায় সীতারাম?"

সীতারাম তখন কাছে আসিয়া বসিল। চুপি চুপি ফিস ফিস করিয়া কী বলিল! বসন্ত রায় চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, "সত্য নাকি?"

সীতারাম কহিল, "আজ্ঞা হাঁ মহারাজ।"

বসন্ত রায় মনে মনে অনেক ইতস্তত করিতে লাগিলেন। কহিলেন, "এখনই যাইতে হইবে নাকি।"

সীতারাম। আজ্ঞা হাঁ।

বসন্ত রায়। একবার বিভার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিব না?

সীতারাম। আজ্ঞা না, আর সময় নাই।

বসন্ত রায়। কোথায় যাইতে হইবে?

সীতারাম। আমার সঙ্গে আসুন, আমি লইয়া যাইতেছি।

বসন্ত রায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "একবার বিভার সঙ্গে দেখা করিয়া আসি না কেন?"

সীতারাম। আজ্ঞা না মহারাজ। দেরি হইলে সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইবে।

বসন্ত রায় তাড়াতাড়ি কহিলেন, "তবে কাজ নাই— কাজ নাই।" উভয়ে চলিলেন।

আবার কিছু দূর গিয়া কহিলেন, "একটু বিলম্ব করিলে কি চলে না?"

সীতারাম। না মহারাজ, তাহা হইলে বিপদ হইবে।

"দুর্গা বলো" বলিয়া বসন্ত রায় প্রাসাদের বাহির হইয়া গেলেন।

বসন্ত রায় যে আসিয়াছেন, তাহা উদয়াদিত্য জানেন না। বিভা তাঁহাকে বলে নাই। কেননা যখন উভয়ের দেখা হইবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না তখন এ সংবাদ তাঁহার কষ্টের কারণ হইত। সন্ধ্যার পর বিদায় লইয়া বিভা কারাগার হইতে চলিয়া গিয়াছে। উদয়াদিত্য একটি প্রদীপ লইয়া একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ পড়িতেছেন।

জানালার ভিতর দিয়া বাতাস আসিতেছে, দীপের ক্ষীণ শিখা কাঁপিতেছে, অক্ষর ভালো দেখা যাইতেছে না। কীটপতঙ্গ আসিয়া দীপের উপর পড়িতেছে। এক একবার দীপ নিভো-নিভো হইতেছে। একবার বাতাস বেগে আসিল— দীপ নিভিয়া গেল। উদয়াদিত্য পুঁথি ঝাঁপিয়া তাঁহার খাটে গিয়া বসিলেন। একে একে কত কী ভাবনা আসিয়া পড়িল। বিভার কথা মনে আসিল। আজ বিভা কিছু দেরি করিয়া আসিয়াছিল, কিছু সকাল সকাল চলিয়া গিয়াছিল। আজ বিভাকে কিছু বিশেষ ম্লান দেখিয়াছিলেন; তাহাই লইয়া মনে মনে আলোচনা করিতেছিলেন। পৃথিবীতে যেন তাঁহার আর কেহ নাই। সমস্ত দিন বিভাকে ছাড়া আর কাহাকেও দেখিতে পান না। বিভাই তাঁহার একমাত্র আলোচ্য। বিভার প্রত্যেক হাসিটি প্রত্যেক কথাটি তাঁহার মনে সঞ্চিত হইতে থাকে। তৃষিত ব্যক্তি তাহার পানীয়ের প্রত্যেক বিন্দুটি পর্যন্ত যেমন উপভোগ করে তেমনি বিভার প্রীতির অতি সামান্য চিহ্নটুকু পর্যন্ত তিনি প্রাণ-মনে উপভোগ করেন। আজ তাই এই বিজন ক্ষুদ্র অন্ধকার ঘরের মধ্যে একলা শুইয়া স্নেহের প্রতিমা বিভার ম্লান মুখখানি ভাবিতেছিলেন। সেই অন্ধকারে বসিয়া তাঁহার একবার মনে হইল, "বিভার কি ক্রমেই বিরক্তি ধরিতেছে? এই নিরানন্দ কারাগারের মধ্যে এক বিষণ্ণ অন্ধকার মূর্তির সেবা করিতে আর কি তাহার ভালো লাগিতেছে না? আমাকে কি ক্রমেই সে তাহার সুখের বাধা, তাহার সংসারপথের কণ্টক বলিয়া দেখিবে? আজ দেরি করিয়া আসিয়াছে, কাল হয়তো আরো দেরি করিয়া আসিবে, তাহার পরে একদিন হয়তো সমস্ত দিন বসিয়া আছি কখন্ বিভা আসিবে— বিকাল হইল, সন্ধ্যা হইল— রাত্রি হইল, বিভা আর আসিল না।— তাহার পর হইতে আর হয়তো বিভা আসিবে না।" উদয়াদিত্যের মনে যতই এই কথা উদয় হইতে লাগিল ততই তাঁহার মনটা হা হা করিতে লাগিল— তাঁহার কল্পনারাজ্যের চারি দিক কী ভয়ানক শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। একদিন আসিবে যেদিন বিভা তাঁহাকে স্নেহশূন্য নয়নে তাহার সুখের কণ্টক বলিয়া দেখিবে— সেই অতিদূর কল্পনার আভাসমাত্র লাগিয়া তাঁহার হৃদয় একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। একবার মনে করিতেছেন, "আমি কী ভয়ানক স্বার্থপর। আমি বিভাকে ভালোবাসি বলিয়া তাহার যে ঘোরতর শত্রুতা করিতেছি কোনো শত্রুও বোধ করি এমন পারে না।" বার বার করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছেন আর বিভার উপর নির্ভর করিবেন না। কিন্তু যখনই কল্পনা করিতেন তিনি বিভাকে হারাইয়াছেন তখনই তাঁহার মনে সে বল চলিয়া যাইতেছে, তখনই তিনি অকূল পাথারে পড়িয়া যাইতেছেন— মরণাপন্ন মজ্জমান ব্যক্তির মতো বিভার কাল্পনিক

মূর্তিকে আকুলভাবে আঁকড়িয়া ধরিতেছেন।

এমন সময়ে বহির্দেশে সহসা "আগুন আগুন" বলিয়া এক ঘোরতর কোলাহল উঠিল। উদয়াদিত্যের বুক কাঁপিয়া উঠিল। সহসা নানা কণ্ঠের নানাবিধ চীৎকার আকাশে উঠিল— বাহিরে শত শত লোকের দ্রুত পদশব্দ শুনা গেল। উদয়াদিত্য বুঝিলেন, প্রাসাদের কাছাকাছি কোথাও আগুন লাগিয়াছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া গোলমাল চলিতে লাগিল— তাঁহার মন অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিল। সহসা দ্রুতবেগে তাঁহার কারাগারের দ্বার খুলিয়া গেল। কে একজন তাঁহার অন্ধকার গৃহে প্রবেশ করিল— তিনি চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ও?"

সে উত্তর করিল, "আমি সীতারাম, আপনি বাহির হইয়া আসুন।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "কেন?"

সীতারাম কহিল, "যুবরাজ, কারাগৃহে আগুন লাগিয়াছে, শীঘ্র বাহির হইয়া আসুন।" বলিয়া তাঁহাকে ধরিয়া, প্রায় তাঁহাকে বহন করিয়া কারাগারের বাহিরে লইয়া গেল।

অনেক দিনের পর উদয়াদিত্য আজ মুক্ত স্থানে আসিলেন— মাথার উপরে সহসা অনেকটা আকাশ দেখিতে পাইলেন, বাতাস যেন তাহার বিস্তৃত বক্ষ প্রসারিত করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। চোখের বাধা চারি দিক হইতে খুলিয়া গেল। সেই অন্ধকার রাত্রে, আকাশের অসংখ্য তারকার দৃষ্টির নিম্নে, বিস্তৃত মাঠের মধ্যে কোমল তৃণজালের উপর দাঁড়াইয়া সহসা তাঁহার মনের মধ্যে এক অপরিসীম অনির্বচনীয় আনন্দের উদয় হইল। সেই আনন্দে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া তাহার পর সীতারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী করিব, কোথায় যাইব?" অনেকদিন সংকীর্ণ স্থানে বদ্ধ ছিলেন, চলেন ফেরেন নাই— আজ এই বিস্তৃত মাঠের মধ্যে আসিয়া অসহায়ভাবে সীতারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী করিব? কোথায় যাইব?"

সীতারাম কহিল, "আসুন, আমার সঙ্গে আসুন।"

এদিকে আগুন খুব জ্বলিতেছে। বৈকালে কতকগুলি প্রজা প্রধান কর্মচারীদের নিকট কী একটা নিবেদন করিবার জন্য আসিয়াছিল। তাহারা প্রাসাদের প্রাঙ্গণে একত্র বসিয়াছিল, তাহারাই প্রথমে আগুনের গোল তোলে। প্রহরীদের বাসের জন্য কারাগারের কাছে একটি দীর্ঘ কুটিরশ্রেণী ছিল, সেইখানেই তাহাদের চারপাই বাসন কাপড়চোপড় জিনিসপত্র সমস্তই থাকে। অগ্নির সংবাদ পাইয়াই যত প্রহরী পারিল সকলেই ছুটিয়া গেল, যাহারা নিতান্তই পারিল না তাহারা হাত-পা আছড়াইতে লাগিল। উদয়াদিত্যের গৃহদ্বারেও দুই-এক জন প্রহরী ছিল বটে,

কিন্তু সেখানে কড়াক্কড় পাহারা দিবার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। দস্তুর ছিল বলিয়া তাহারা পাহারা দিত মাত্র। কারণ, উদয়াদিত্য এমন শান্তভাবে তাঁহার গৃহে বসিয়া থাকিতেন যে, বোধ হইত না যে তিনি কখনো পলাইবার চেষ্টা করিবেন বা তাঁহার পলাইবার ইচ্ছা আছে। এইজন্য তাঁহার দ্বারের প্রহরীরা সর্বাগ্রে ছুটিয়া গিয়াছিল। রাত হইতে লাগিল, আগুন নেবে না—কেহ বা জিনিসপত্র সরাইতে লাগিল, কেহ বা জল ঢালিতে লাগিল। কেহ বা কিছুই না করিয়া কেবল গোলমাল করিয়া বেড়াইতে লাগিল—আগুন নিবিলে পর তাহারাই সকলের অপেক্ষা অধিক বাহবা পাইয়াছিল। এইরূপ সকলে ব্যস্ত আছে, এমন সময়ে একজন স্ত্রীলোক তাহাদের মধ্যে ছুটিয়া আসিল,—সে কী একটা বলিতে চায়। কিন্তু তাহার কথা শোনে কে? কেহ তাহাকে গালাগালি দিল, কেহ তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল, কেহই তাহার কথা শুনিল না। যে শুনিল সে কহিল, "যুবরাজ পলাইলেন তাতে আমার কী মাগী, তোরই বা কী? সে দয়াল সিং জানে। আমার ঘর ফেলিয়া এখন আমি কোথাও যাইতে পারি না।" বলিয়া সে ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল। এইরূপ বার বার প্রতিহত হইয়া সেই রমণী অতি প্রচণ্ডা হইয়া উঠিল। একজন যাহাকে সম্মুখে পাইল তাহাকেই সবলে ধরিয়া কহিল, "পোড়ারমুখো, তোমরা কি চোখের মাথা খাইয়াছ? রাজার চাকরি কর সে জ্ঞান কি নাই? কাল রাজাকে বলিয়া হেঁটোয় কাঁটা উপরে কাঁটা দিয়া তোমাদের মাটিতে পুঁতিব তবে ছাড়িব। যুবরাজ যে পলাইয়া গেল।"

"ভালোই হইয়াছে, তোর তাহাতে কী?" বলিয়া সে তাহাকে উত্তমরূপে প্রহার করিল। যাহারা ঘরে আগুন লাগাইয়াছিল, এ ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে একজন। প্রহার খাইয়া সেই রমণীর মূর্তি অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। ক্রুদ্ধ বাঘিনীর মতো তাহার চোখ দুটা জ্বলিতে লাগিল, তাহার চুলগুলা ফুলিয়া উঠিল; সে দাঁতে দাঁতে কিড়মিড় করিতে লাগিল, তাহার সেই মুখের উপর বহ্নিশিখার আভা পড়িয়া তাহার মুখ পিশাচীর মতো দেখিতে হইল। সম্মুখে একটি কাষ্ঠখণ্ড জ্বলিতেছিল, সেইটি তুলিয়া লইল—হাত পুড়িয়া গেল, কিন্তু তাহা ফেলিল না—সেই জ্বলন্ত কাষ্ঠ লইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। কিছুতে ধরিতে না পারিয়া সেই কাষ্ঠ তাহার প্রতি ছুঁড়িয়া মারিল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সীতারাম যুবরাজকে সঙ্গে করিয়া খালের ধারে লইয়া গেল। সেখানে একখানা বড়ো নৌকা বাঁধা ছিল, সেই নৌকার সম্মুখে উভয়ে গিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের দেখিয়া নৌকা হইতে এক ব্যক্তি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, "দাদা, আসিয়াছিস ?" উদয়াদিত্য একেবারে চমকিয়া উঠিলেন— সেই চিরপরিচিত স্বর, যে স্বর বাল্যের স্মৃতির সহিত, যৌবনের সুখদুঃখের সহিত জড়িত, পৃথিবীতে যতটুকু সুখ আছে, যতটুকু আনন্দ আছে, যে স্বর তাহারই সহিত অবিচ্ছিন্ন। এক-একদিন কারাগারে গভীর রাত্রে বিনিদ্রনয়নে বসিয়া সহসা স্বপ্নে বংশীধ্বনির ন্যায় যে স্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিতেন— সেই স্বর। বিস্ময় ভাঙিতে না ভাঙিতে বসন্ত রায় আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন। উভয়ের দুই চক্ষু বাষ্পে পুরিয়া গেল। উভয়ে সেইখানে তৃণের উপর বসিয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণের পর উদয়াদিত্য কহিলেন, "দাদামহাশয়।" বসন্ত রায় কহিলেন, "কী দাদা"। আর কিছু কথা হইল না। আবার অনেকক্ষণের পর উদয়াদিত্য চারিদিকে চাহিয়া, আকাশের দিকে চাহিয়া বসন্ত রায়ের মুখের দিকে চাহিয়া আকুলকণ্ঠে কহিলেন, "দাদামহাশয়, আজ আমি স্বাধীনতা পাইয়াছি, তোমাকে পাইয়াছি, আমার আর সুখের কী অবশিষ্ট আছে ? এ মুহূর্ত আর কতক্ষণ থাকিবে ?" কিয়ৎক্ষণ পরে সীতারাম জোড়হাত করিয়া কহিল, "যুবরাজ, নৌকায় উঠুন।"

যুবরাজ চমক ভাঙিয়া কহিলেন, "কেন, নৌকায় কেন ?"

সীতারাম কহিল, "নহিলে এখনই আবার প্রহরীরা আসিবে।"

উদয়াদিত্য বিস্মিত হইয়া বসন্ত রায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদামহাশয়, আমরা কি পলাইয়া যাইতেছি ?"

বসন্ত রায় উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া কহিলেন, "হাঁ ভাই, আমি তোকে চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছি। এ যে পাষাণ-হৃদয়ের দেশ— এরা যে তোকে ভালোবাসে না। তুই হরিণ-শিশু এ ব্যাধের রাজ্যে বাস করিস, আমি তোকে প্রাণের মধ্যে লুকাইয়া রাখিব, সেখানে নিরাপদে থাকিবি।" বলিয়া উদয়াদিত্যকে বুকের কাছে টানিয়া আনিলেন যেন তাঁহাকে কঠোর সংসার হইতে কাড়িয়া আনিয়া স্নেহের রাজ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চান।

উদয়াদিত্য অনেকক্ষণ ভাবিয়া কহিলেন, "না দাদামহাশয়, আমি পলাইতে পারিব না।"

বসন্ত রায় কহিলেন, "কেন দাদা, এ বুড়োকে কি ভুলিয়া গেছিস।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "আমি যাই— একবার পিতার পা ধরিয়া কাঁদিয়া ভিক্ষা চাই গে, তিনি হয়তো রায়গড়ে যাইতে সম্মতি দিবেন।"

বসন্ত রায় অস্থির হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "দাদা, আমার কথা শোন্— সেখানে যাস নে, সে-চেষ্টা করা নিষ্ফল।"

উদয়াদিত্য নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "তবে যাই। আমি কারাগারে ফিরিয়া যাই।"

বসন্ত রায় তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, "কেমন যাইবি যা দেখি। আমি যাইতে দিব না।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "দাদামশায়, এ-হতভাগ্যকে লইয়া কেন বিপদকে ডাকিতেছ। আমি যেখানে থাকি সেখানে কি তিলেক শান্তির সম্ভাবনা আছে?"

বসন্ত রায় কহিলেন, "দাদা, তোর জন্য যে বিভাও কারাবাসিনী হইয়া উঠিল। এই তাহার নবীন বয়সে সে কি তাহার সমস্ত জীবনের সুখ জলাঞ্জলি দিবে?" বসন্ত রায়ের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

তখন উদয়াদিত্য তাড়াতাড়ি কহিলেন, "তবে চলো চলো দাদামহাশয়।" সীতারামের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "সীতারাম, প্রাসাদে তিনখানি পত্র পাঠাইতে চাই।"

সীতারাম কহিল, "নৌকাতেই কাগজ-কলম আছে, আনিয়া দিতেছি। শীঘ্র করিয়া লিখিবেন, অধিক সময় নাই।"

উদয়াদিত্য পিতার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করিলেন। মাতাকে লিখিলেন, "মা, আমাকে গর্ভে ধরিয়া তুমি কখনো সুখী হইতে পার নাই। এইবার নিশ্চিন্ত হও মা— আমি দাদামহাশয়ের কাছে যাইতেছি, সেখানে আমি সুখে থাকিব, স্নেহে থাকিব, তোমার কোনো ভাবনার কারণ থাকিবে না।" বিভাকে লিখিলেন, "চিরায়ুষ্মতীষু— তোমাকে আর কী লিখিব— তুমি জন্ম জন্ম সুখে থাকো— স্বামিগৃহে গিয়া সুখের সংসার পাতিয়া সমস্ত দুঃখকষ্ট ভুলিয়া যাও।" লিখিতে লিখিতে উদয়াদিত্যের চোখ জলে পুরিয়া আসিল। সীতারাম সেই চিঠি তিনখানি একজন দাঁড়ির হাত দিয়া প্রাসাদে পাঠাইয়া দিল। সকলে নৌকাতে উঠিতেছেন— এমন সময়ে দেখিলেন, কে একজন ছুটিয়া তাহাদের দিকে আসিতেছে। সীতারাম চমকিয়া বলিয়া উঠিল, "ওই রে— সেই ডাকিনী আসিতেছে।" দেখিতে দেখিতে রুক্মিণী কাছে আসিয়া পৌঁছিল। তাহার চুল এলোথেলো, তাহার অঞ্চল খসিয়া পড়িয়াছে,

তাহার জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো চোখ দুটা অগ্নি উদ্গার করিতেছে— তাহার বার বার প্রতিহত বাসনা, অপরিতৃপ্ত প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সে যেন যাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া রোষ মিটাইতে চায়। যেখানে প্রহরীরা আগুন নিবাইতেছিল, সেখানে বার বার ধাক্কা খাইয়া ক্রোধে অধীর হইয়া পাগলের মতো প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করে— একেবারে প্রতাপাদিত্যের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য বার বার নিষ্ফল চেষ্টা করে, প্রহরীরা তাহাকে পাগল মনে করিয়া মারিয়া ধরিয়া তাড়াইয়া দেয়। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সে প্রাসাদ হইতে ছুটিয়া আসিতেছে। বাঘিনীর মতো সে উদয়াদিত্যের উপর লাফাইয়া পড়িবার চেষ্টা করিল। সীতারাম মাঝে আসিয়া পড়িল; চীৎকার করিয়া সে সীতারামের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, প্রাণপণে তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল— সহসা সীতারাম চীৎকার করিয়া উঠিল, দাঁড়ি মাঝিরা তাড়াতাড়ি আসিয়া বলপূর্বক রুক্মিণীকে ছাড়াইয়া লইল। আত্মঘাতী বৃশ্চিক যেমন নিজের সর্বাঙ্গে হুল ফুটাইতে থাকে, তেমনি সে অধীর হইয়া নিজের বক্ষ নখে আঁচড়াইয়া চুল ছিঁড়িয়া চীৎকার করিয়া কহিল, "কিছুই হইল না, কিছুই হইল না— এই আমি মরিলাম, এ স্ত্রীহত্যার পাপ তোদের হইবে।" সেই অন্ধকার রাত্রে এই অভিশাপ দিকে দিকে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। মুহূর্তমধ্যে বিদ্যুদ্‌বেগে রুক্মিণী জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। বর্ষায় খালের জল অত্যন্ত বাড়িয়াছিল— কোথায় সে তলাইয়া গেল ঠিকানা রহিল না। সীতারামের কাঁধ হইতে রক্ত পড়িতেছিল, চাদর জলে ভিজাইয়া কাঁধে বাঁধিল। নিকটে গিয়া দেখিল, উদয়াদিত্যের কপালে ঘর্মবিন্দু দেখা দিয়াছে, তাঁহার হাত পা শীতল হইয়া গিয়াছে, তিনি প্রায় অজ্ঞান হইয়া গিয়াছেন— বসন্ত রায়ও যেন দিশাহারা হইয়া অবাক হইয়া গিয়াছেন। দাঁড়িগণ উভয়কে ধরিয়া নৌকায় তুলিয়া তৎক্ষণাৎ নৌকা ছাড়িয়া দিল। সীতারাম ভীত হইয়া কহিল, "যাত্রার সময় কী অমঙ্গল।"

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

উদয়াদিত্যের নৌকা খাল অতিক্রম করিয়া নদীতে গিয়া পৌঁছিল, তখন সীতারাম নৌকা হইতে নামিয়া শহরে ফিরিয়া আসিল। আসিবার সময় যুবরাজের নিকট হইতে তাঁহার তলোয়ারটি চাহিয়া লইল।

উদয়াদিত্যের তিনখানি পত্র একটি লোকের হাত দিয়া সীতারাম প্রাসাদে প্রেরণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে চিঠি কয়খানি কাহারও হাতে দিতে তাহাকে

গোপনে বিশেষরূপে নিষেধ করিয়াছিল। নৌকা হইতে প্রাসাদে ফিরিয়া আসিয়া সীতারাম সেই চিঠি কয়খানি ফিরাইয়া লইল। কেবল মহিষী ও বিভার চিঠিখানি রাখিয়া বাকি পত্রখানি নষ্ট করিয়া ফেলিল।

তখন আগুন আরও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। রাত্রে শয্যা হইতে উঠিয়া কৌতুক দেখিবার জন্য অনেক লোক জড়ো হইয়াছে। তাহাতে নির্বাণের ব্যাঘাত হইতেছে বই সুবিধা হইতেছে না।

এই অগ্নিকাণ্ডে যে সীতারামের হাত ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। উদয়াদিত্যের প্রতি আসক্ত কয়েকজন প্রজা ও প্রাসাদের ভৃত্যের সাহায্যে সে-ই এই কীর্তি করিয়াছে। সন্ধ্যাবেলায় একেবারে পাঁচ-ছয়টা ঘরে যে বিনা কারণে আগুন ধরিয়া উঠিল, ইহা কখনো দৈবের কর্ম নহে, এতক্ষণ এত চেষ্টা করিয়া আগুন নিবিয়াও যে নিবিতেছে না, তাহারও কারণ আছে। যাহারা আগুন নিবাইতে যোগ দিয়াছে, তাহাদের মধ্যেই দুই-একজন করিয়া সীতারামের লোক আছে। যেখানে আগুন নাই তাহারা সেইখানে জল ঢালে, জল আনিতে গিয়া আনে না, কৌশলে কলসী ভাঙিয়া ফেলে, গোলমাল করিয়া এ ওর ঘাড়ের উপর গিয়া পড়ে। আগুন আর নেবে না।

এদিকে যখন এইরূপ গোলযোগ চলিতেছে, তখন সীতারামের দলস্থ লোকেরা উদয়াদিত্যের শূন্য কারাগারে আগুন লাগাইয়া দিল। একে একে জানালা দরজা কড়ি-বরগা চৌকাঠ কাঠের বেড়া প্রভৃতিতে আগুন ধরাইয়া দিল। সেই কারাগৃহে যে কোনো সূত্রে আগুন ধরিতে পারে, ইহা সকলের স্বপ্নেরও অগোচর, সুতরাং সেদিকে আর কাহারও মনোযোগ পড়ে নাই। সীতারাম ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, আগুন বেশ রীতিমত ধরিয়াছে। কতকগুলা হাড়, মড়ার মাথা ও উদয়াদিত্যের তলোয়ারটি সীতারাম কোনো প্রকারে উদয়াদিত্যের সেই ঘরের মধ্যে ফেলিয়া দিল।

এদিকে যাহারা প্রহরীশালার আগুন নিবাইতেছিল, কারাগারের দিক হইতে সহসা তাহারা এক চীৎকার শুনিতে পাইল। সকলে চমকিয়া একবাক্যে বলিয়া উঠিল, "ও কী রে।" একজন ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "ওরে, যুবরাজের ঘরে আগুন ধরিয়াছে।" প্রহরীদের রক্ত জল হইয়া গেল, দয়াল সিংহের মাথা ঘুরিয়া গেল। কলসী হাত হইতে পড়িয়া গেল, জিনিসপত্র ভূমিতে ফেলিয়া দিল। এমন সময়ে আর একজন সেই দিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "কারাগৃহের মধ্য হইতে যুবরাজ চীৎকার করিতেছেন শুনা গেল।" তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই সীতারাম ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "ওরে তোরা শীঘ্র আয়। যুবরাজের ঘরের ছাদ

ভাঙিয়া পড়িয়াছে, আর তো তাঁহার সাড়া পাওয়া যাইতেছে না।" যুবরাজের কারাগৃহের দিকে সকলে ছুটিল। গিয়া দেখিল গৃহ ভাঙিয়া পড়িয়াছে— চারিদিকে আগুন— ঘরে প্রবেশ করিবার উপায় নাই। তখন সেইখানে দাঁড়াইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিতে লাগিল। কাহার অসাবধানতায় এই ঘটনাটি ঘটিল, সকলেই তাহা স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঘোরতর বিবাদ বাধিয়া উঠিল, পরস্পর পরস্পরকে গালাগালি দিতে লাগিল। এমন কি, মারামারি হইবার উপক্রম হইল।

সীতারাম ভাবিল, গৃহদাহে যুবরাজের মৃত্যু হইয়াছে, এই সংবাদ রাষ্ট্র করিয়া আপাতত কিছুদিন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব। যখন সে দেখিল, ঘরে বেশ করিয়া আগুন লাগিয়াছে, তখন সে মাথায় চাদর বাঁধিয়া আনন্দমনে তাহার কুটিরাভিমুখে চলিল। প্রাসাদ হইতে অনেক দূরে আসিল। তখন রাত্রি অনেক, পথে লোক নাই, চারিদিক স্তব্ধ। বাঁশ গাছের পাতা ঝর ঝর করিয়া মাঝে মাঝে দক্ষিনা বাতাস বহিতেছে, সীতারামের শৌখিন প্রাণ উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে, সে একটি রসগর্ভ গান ধরিয়াছে। সেই জনশূন্য স্তব্ধ পথ দিয়া একাকী পান্থ মনের উল্লাসে গান গাহিতে গাহিতে চলিল। কিছুদূর গিয়া তাহার মনের মধ্যে এক ভাবনা উপস্থিত হইল। সে ভাবিল, যশোহর হইতে তো সপরিবারে পলাইতেই হইবে, অমনি বিনা মেহনতে কিঞ্চিৎ টাকার সংস্থান করিয়া লওয়া যাক না। মঙ্গলা পোড়ামুখী তো মরিয়াছে, বালাই গিয়াছে, একবার তাহার বাড়ি হইয়া যাওয়া যাক। বেটির টাকা আছে ঢের, তাহার ত্রিসংসারে কেহই নাই, সে-টাকা আমি না লই তো আর একজন লইবে— তায় কাজ কী, একবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাক। এইরূপ সাত-পাঁচ ভাবিয়া সীতারাম রুক্মিণীর বাড়ির মুখে চলিল, প্রফুল্লমনে আবার গান ধরিল। যাইতে যাইতে পথে একজন অভিসারিণীকে দেখিতে পাইল। সীতারামের নজরে এ সকল কিছুতেই এড়াইতে পায় না। দুইটা রসিকতা করিবার জন্য তাহার মনে অনিবার্য আবেগ উপস্থিত হইল— কিন্তু সময় নাই দেখিয়া সে আবেগ দমন করিয়া হন হন করিয়া চলিল।

সীতারাম রুক্মিণীর কুটিরের নিকট গিয়া দেখিল, দ্বার খোলাই আছে। হৃষ্টচিত্তে কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একবার চারিদিকে নিরীক্ষণ করিল। ঘোরতর অন্ধকার— কিছুই দেখা যাইতেছে না। একবার চারিদিক হাতড়াইয়া দেখিল। একটা সিন্দুকের উপর হুঁচট খাইয়া পড়িয়া গেল, দুই-একবার দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া গেল। সীতারামের গা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল। মনে হইল, কে যেন ঘরে আছে।

কাহার যেন নিশ্বাসপ্রশ্বাস শুনা যাইতেছে— আস্তে আস্তে পাশের ঘরে গেল। গিয়া দেখিল, রুক্মিণীর শয়নগৃহ হইতে আলো আসিতেছে। প্রদীপটা এখনো জ্বলিতেছে মনে করিয়া সীতারামের অত্যন্ত আনন্দ হইল। তাড়াতাড়ি সেই ঘরের দিকে গেল। ও কে ও! ঘরে বসিয়া কে! বিনিদ্রনয়নে চুপ করিয়া বসিয়া কে ও রমণী থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে! অর্ধাবৃত দেহে ভিজা কাপড় জড়ানো, এলোচুল দিয়া ফোঁটা ফোঁটা করিয়া জল পড়িতেছে। কাঁপিতে কাঁপিতে তাহার দাঁত ঠক্ ঠক্ করিতেছে। ঘরে একটিমাত্র প্রদীপ জ্বলিতেছে। সেই প্রদীপের ক্ষীণ আলো তাহার পাংশুবর্ণ মুখের উপর পড়িতেছে, পশ্চাতে সেই রমণীর অতি বৃহৎ এক ছায়া দেয়ালের উপর পড়িয়াছে— ঘরে আর কিছুই নাই— কেবল সেই পাংশু মুখশ্রী সেই দীর্ঘ ছায়া আর এক ভীষণ নিস্তব্ধতা। ঘরে প্রবেশ করিয়াই সীতারামের শরীর হিম হইয়া গেল। দেখিল ক্ষীণ আলোকে, এলোচুলে, ভিজা কাপড়ে সেই মঙ্গলা বসিয়া আছে। সহসা দেখিয়া তাহাকে প্রেতিনী বলিয়া বোধ হইল। অগ্রসর হইতেও সীতারামের সাহস হইল না— ভরসা বাঁধিয়া পিছন ফিরিতেও পাইল না। সীতারাম নিতান্ত ভীরু ছিল না, অল্পক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া অবশেষে একপ্রকার বাহিক সাহস ও মৌখিক উপহাসের স্বরে কহিল, "তুই কোথা হইতে মাগী। তোর মরণ নাই নাকি।" রুক্মিণী কট্‌মট্ করিয়া খানিকক্ষণ সীতারামের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল— তখন সীতারামের প্রাণটা তাহার কণ্ঠের কাছে আসিয়া ধুক্ ধুক্ করিতে লাগিল। অবশেষে রুক্মিণী সহসা বলিয়া উঠিল, "বটে। তোদের এখনও সর্বনাশ হইল না, আর আমি মরিব!" উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া কহিল, "যমের দুয়ার হইতে ফিরিয়া আসিলাম, আগে তোকে আর যুবরাজকে চুলায় শুয়াইব, তোদের চুলা হইতে দু-মুঠা ছাই লইয়া গায়ে মাখিয়া দেহ সার্থক করিব— তার পরে যমের সাধ মিটাইব। তাহার আগে যমালয়ে আমার ঠাঁই নাই।"

রুক্মিণীর গলা শুনিয়া সীতারামের অত্যন্ত সাহস হইল। সে সহসা অত্যন্ত অনুরাগ দেখাইয়া রুক্মিণীর সহিত ভাব করিয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। খুব যে কাছে ঘেঁষিয়া গেল তাহা নহে, অপেক্ষাকৃত কাছে আসিয়া কোমল স্বরে কহিল, "মাইরি ভাই, ওইজন্যই তো রাগ ধরে। তোমার কখন যে কী মতি হয়, ভালো বুঝতে পারি না। বল্ তো মঙ্গলা, আমি তোর কী করেছি। অধীনের প্রতি এত অপ্রসন্ন কেন? মান করেছিস বুঝি ভাই? সেই গানটা গাব?"

সীতারাম যতই অনুরাগের ভান করিতে লাগিল, রুক্মিণী ততই ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার আপাদমস্তক রাগে জ্বলিতে লাগিল— সীতারাম যদি তাহার নিজের

মাথার চুল হইত, তবে তাহা দুই হাতে পট্‌পট্‌ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারিত। সীতারাম যদি তাহার নিজের চোখ হইত, তবে তৎক্ষণাৎ তাহা নখ দিয়া উপড়াইয়া পা দিয়া দলিয়া ফেলিতে পারিত। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল কিছুই হাতের কাছে পাইল না। দাঁতে দাঁতে লাগাইয়া কহিল, "একটু রোসো, তোমার মুণ্ডপাত করিতেছি।" বলিয়া থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বঁটির অন্বেষণে পাশের ঘরে চলিয়া গেল। এই কিছুক্ষণ হইল— সীতারাম গলায় চাদর বাঁধিয়া রূপক অলংকারে মরিবার প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছিল, কিন্তু রুক্মিণীর চেহারা দেখিয়া তাহার রূপক ঘুরিয়া গেল এবং চৈতন্য হইল যে সত্যকার বঁটির আঘাতে মরিতে এখনো সে প্রস্তুত হইতে পারে নাই, এই নিমিত্ত অবসর বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ কুটিরের বাহিরে সরিয়া পড়িল। রুক্মিণী বঁটিহস্তে শূন্যগৃহে আসিয়া ঘরের মেজেতে সীতারামের উদ্দেশে বার বার আঘাত করিল।

রুক্মিণী এখন মরিয়া হইয়াছে। যুবরাজের আচরণে তাহার দুরাশা একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে— তাহার সমস্ত উপায় সমস্ত উদ্দেশ্য একেবারে ভূমিসাৎ হইয়াছে। এখন রুক্মিণীর আর সেই তীক্ষ্ণশানিত হাস্য নাই, বিদ্যুদ্‌বর্ষী কটাক্ষ নাই, তাহার সেই ভাদ্র মাসের জাহ্নবীর ঢলঢলে তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস নাই— রাজবাটীর যে-সকল ভৃত্যেরা তাহার কাছে আসিত, তাহাদের সহিত ঝগড়া করিয়া তাহাদিগকে গালাগালি দিয়া ভাগাইয়া দিয়াছে। দেওয়ানজির জ্যেষ্ঠ পুত্রটি সেদিন পান চিবাইতে চিবাইতে তাহার সহিত রসিকতা করিতে আসিয়াছিল, রুক্মিণী তাহাকে ঝাঁটাইয়া তাড়াইয়াছে। এখন আর কেহ তাহার কাছে ঘেঁষিতে পারে না। পাড়ার সকলেই তাহাকে ভয় করে।

সীতারাম কুটির হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ভাবিল, মঙ্গলা যুবরাজের পলায়ন-বৃত্তান্ত সমস্তই অবগত হইয়াছে; অতএব ইহার দ্বারাই সব ফাঁস হইবে। সর্বনাশীকে গলা টিপিয়া মারিয়া আসিলাম না কেন। যাহা হউক, আমার আর যশোহরে একমুহূর্ত থাকা শ্রেয় নয়। আমি এখনই পালাই। সেই রাত্রেই সীতারাম সপরিবারে যশোহর ছাড়িয়া রায়গড়ে পলাইল।

শেষরাত্রে মেঘ করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল, আগুনও ক্রমে নিবিয়া গেল। যুবরাজের মৃত্যুর জনরব প্রতাপাদিত্যের কানে গেল। শুনিয়া তৎক্ষণাৎ প্রতাপাদিত্য বহির্দেশে তাঁহার সভাভবনে আসিয়া বসিলেন। প্রহরীদের ডাকাইয়া আনিলেন, মন্ত্রী আসিল, আর দুই-একজন সভাসদ আসিল। একজন সাক্ষ্য দিল, যখন আগুন ধু ধু করিয়া জ্বলিতেছিলে, তখন সে যুবরাজকে জানালার মধ্য হইতে

দেখিয়াছে। আর-কয়েকজন কহিল, তাহারা যুবরাজের চীৎকার শুনিতে পাইয়াছিল। আর-একজন যুবরাজের গৃহ হইতে তাঁহার গলিত দগ্ধ তলোয়ারের অবশিষ্টাংশ আনিয়া উপস্থিত করিল। প্রতাপাদিত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "খুড়া কোথায়?" রাজবাটী অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইল না। কেহ কহিল, "যখন আগুন লাগিয়াছিল, তখন তিনিও কারাগারে ছিলেন।" কেহ কহিল, "না, রাত্রেই তিনি সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, গৃহদাহে যুবরাজের মৃত্যু হইয়াছে ও তাহা শুনিয়াই তিনি তৎক্ষণাৎ যশোর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।" প্রতাপাদিত্য এইরূপে যখন সভায় বসিয়া সকলের সাক্ষ্য শুনিতেছেন, এমন সময়ে গৃহদ্বারে এক কলরব উঠিল। একজন স্ত্রীলোক ঘরে প্রবেশ করিতে চায়, কিন্তু প্রহরীরা তাহাকে নিষেধ করিতেছে। শুনিয়া প্রতাপাদিত্য তাহাকে ঘরে লইয়া আসিতে আদেশ করিলেন। একজন প্রহরী রুক্মিণীকে সঙ্গে করিয়া আনিল। রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কী চাও?" সে হাত নাড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "আমি আর কিছু চাই না— তোমার ওই প্রহরীদিগকে, সকলকে একে একে ছয় মাস গারদে পচাইয়া ডালকুত্তা দিয়া খাওয়াও, এই আমি দেখিতে চাই। ওরা কি তোমাকে মানে, না তোমাকে ভয় করে!" এই কথা শুনিয়া প্রহরীরা চারিদিক হইতে গোল করিয়া উঠিল। রুক্মিণী পিছন ফিরিয়া চোখ পাকাইয়া তীব্র এক ধমক দিয়া কহিল, "চুপ কর মিন্‌সেরা। কাল যখন তোদের হাতে-পায়ে ধরিয়া, পই পই করিয়া বলিলাম, ওগো তোমাদের যুবরাজ তোমাদের রায়গড়ের বুড়া রাজার সঙ্গে পালায়, তখন যে তোরা পোড়ারমুখোরা আমার কথায় কান দিলি নে? রাজার বাড়ি চাকরি কর, তোমাদের বড়ো অহংকার হইয়াছে, তোমরা সাপের পাঁচ পা দেখিয়াছ! পিঁপড়ের পাখা উঠে মরিবার তরে।"

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "যাহা যাহা ঘটিয়াছে সমস্ত বলো।"

রুক্মিণী কহিল, "বলিব আর কী। তোমাদের যুবরাজ কাল রাত্রে বুড়া রাজার সঙ্গে পলাইয়াছে!"

প্রতাপাদিত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘরে কে আগুন দিয়াছে জান?"

রুক্মিণী কহিল, "আমি আর জানি না! সেই যে তোমাদের সীতারাম। তোমাদের যুবরাজের সঙ্গে যে তার বড়ো পিরিত, আর কেউ যেন তাঁর কেউ নয় সীতারামই যেন তাঁর সব। এ-সমস্ত সেই সীতারামের কাজ। বুড়া রাজা, সীতারাম আর তোমাদের যুবরাজ, এই তিনজনে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া ইহা করিয়াছে, এই তোমাকে স্পষ্ট বলিলাম।"

প্রতাপাদিত্য অনেকক্ষণ ধরিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এ-সব কী করিয়া জানিতে পারিলে?" রুক্মিণী কহিল, "সে-কথায় কাজ কী গা! আমার সঙ্গে লোক দাও, আমি স্বয়ং গিয়া তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া দিব। তোমার রাজবাড়ির চাকররা সব ভেড়া, উহারা এ-কাজ করিবে না।"

প্রতাপাদিত্য রুক্মিণীর সহিত লোক দিতে আদেশ করিলেন ও প্রহরীদিগের প্রতি যথাবিহিত শাস্তির বিধান করিলেন। একে একে সভাগৃহ শূন্য হইয়া গেল। কেবল মন্ত্রী ও মহারাজ অবশিষ্ট রহিলেন। মন্ত্রী মনে করিলেন, মহারাজ অবশ্য তাঁহাকে কিছু বলিবেন। কিন্তু প্রতাপাদিত্য কিছুই বলিলেন না, স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। মন্ত্রী একবার কী বলিবার অভিপ্রায়ে অতি ধীরস্বরে কহিলেন, "মহারাজ।" মহারাজ তাহার কোনো উত্তর করিলেন না। মন্ত্রী ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন।

সেইদিনই সন্ধ্যার পূর্বে প্রতাপাদিত্য একজন জেলের মুখে উদয়াদিত্যের পলায়ন-সংবাদ পাইলেন। নৌকা করিয়া নদী বাহিয়া উদয়াদিত্য চলিয়াছিলেন, সে তাঁহাকে দেখিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য নানা লোকের মুখ হইতে সংবাদ পাইতে লাগিলেন। রুক্মিণীর সহিত যে লোকেরা গিয়াছিল তাহারা এক সপ্তাহ পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, যুবরাজকে রায়গড়ে দেখিয়া আসিলাম। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই স্ত্রীলোকটি কোথায়?" তাহারা কহিল, "সে আর ফিরিয়া আসিল না, সে সেইখানেই রহিল।"

তখন প্রতাপাদিত্য মুক্তিয়ার খাঁ নামক তাঁহার এক পাঠান সেনাপতিকে ডাকিয়া তাহার প্রতি গোপনে কী একটা আদেশ করিলেন। সে সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রতাপাদিত্যের পূর্বেই মহিষী ও বিভা উদয়াদিত্যের পলায়ন-সংবাদ অবগত হইয়াছিলেন। উভয়েই ভয়ে অভিভূত হইয়া ভাবিতেছিলেন যে, মহারাজ যখন জানিতে পারিবেন, তখন না জানি কী করিবেন। প্রতিদিন মহারাজ যখন এক-একটি করিয়া সংবাদ পাইতেছিলেন, আশঙ্কায় উভয়ের প্রাণ ততই আকুল হইয়া উঠিতেছিল। এইরূপে সপ্তাহ গেল, অবশেষে মহারাজ বিশ্বাসযোগ্য যথার্থ সংবাদ পাইলেন। কিন্তু তিনি কিছুই করিলেন না। ক্রোধের আভাসমাত্র প্রকাশ করিলেন না। মহিষী আর সংশয়ে থাকিতে না পারিয়া একবার প্রতাপাদিত্যের কাছে

গেলেন। কিন্তু অনেকক্ষণ উদয়াদিত্য সম্বন্ধে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না। মহারাজও সে-বিষয়ে কোনো কথা উত্থাপিত করিলেন না। অবশেষে আর থাকিতে না পারিয়া মহিষী বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ, আমার এক ভিক্ষা রাখো, এবার উদয়কে মাপ করো। বাছাকে আরো যদি কষ্ট দাও তবে আমি বিষ খাইয়া মরিব।"

প্রতাপাদিত্য ঈষৎ বিরক্তিভাবে কহিলেন, "আগে হইতে যে তুমি কাঁদিতে বসিলে! আমি তো কিছুই করি নাই।"

পাছে প্রতাপাদিত্য আবার সহসা বাঁকিয়া দাঁড়ান এই নিমিত্ত মহিষী ও কথা আর দ্বিতীয় বার উত্থাপিত করিতে সাহস করিলেন না। ভীত মনে ধীরে ধীরে চলিয়া আসিলেন। এক দিন, দুই দিন, তিন দিন গেল, মহারাজের কোনো প্রকার ভাবান্তর লক্ষিত হইল না। তাহাই দেখিয়া মহিষী ও বিভা আশ্বস্তা হইলেন। মনে করিলেন, উদয়াদিত্য স্থানান্তরে যাওয়ায় মহারাজ মনে মনে বুঝি সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

এখন কিছুদিনের জন্য মহিষী একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন।

ইতিপূর্বেই মহিষী বিভাকে বলিয়াছেন ও বাড়িতে রাষ্ট্র করিয়া দিয়াছেন যে বিভাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া রামচন্দ্র রায় এক পত্র লিখিয়াছেন। বিভার মনে আর আহ্লাদ ধরে না। রামমোহনকে বিদায় করিয়া অবধি বিভার মনে আর এক মুহূর্তের জন্য শান্তি ছিল না। যখনই সে অবসর পাইত তখনই ভাবিত 'তিনি কী মনে করিতেছেন? তিনি কি আমার অবস্থা ঠিক বুঝিতে পারিয়াছেন? হয়তো তিনি রাগ করিয়াছেন। তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলে তিনি আমাকে কি মাপ করিবেন না? হা জগদীশ্বর, বুঝাইয়া বলিব কবে? কবে আবার দেখা হইবে?' উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া বিভা ক্রমাগত এই কথাই ভাবিত। দিবানিশি তাহার মনের মধ্যে একটা আশঙ্কা চাপিয়া ছিল। মহিষীর কথা শুনিয়া বিভার কী অপরিসীম আনন্দ হইল, তাহার মন হইতে কী ভয়ানক একটা গুরুভার তৎক্ষণাৎ দূর হইয়া গেল। লজ্জা-শরম দূর করিয়া হাসিয়া কাঁদিয়া সে তাহার মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া কতক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার মা কাঁদিতে লাগিলেন। বিভা যখন মনে করিল তাহার স্বামী তাহাকে ভুল বুঝেন নাই, তাহার মনের কথা ঠিক বুঝিয়াছেন— তখন তাহার চক্ষে সমস্ত জগৎ নন্দনকানন হইয়া উঠিল। তাহার স্বামীর হৃদয়কে কী প্রশস্ত বলিয়াই মনে হইল! তাহার স্বামীর ভালোবাসার উপর কতখানি বিশ্বাস, কতখানি আস্থা জন্মিল! সে মনে করিল, তাহার স্বামীর

ভালোবাসা এ জগতে তাহার অটল আশ্রয়। সে যে এক বলিষ্ঠ মহাপুরুষের বিশাল স্কন্ধে তাহার ক্ষুদ্র সুকুমার লতাটির মতো বাহু জড়াইয়া নির্ভয়ে অসীম বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া রহিয়াছে, সে নির্ভর হইতে কিছুতেই সে বিচ্ছিন্ন হইবে না। বিভা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার প্রাণ মেঘমুক্ত শরতের আকাশের মতো প্রসারিত, নির্মল হইয়া গেল। সে এখন তাহার ভাই সমরাদিত্যের সঙ্গে ছেলেমানুষের মতো কত কী খেলা করে। ছোটো স্নেহের মেয়েটির মতো তাহার মায়ের কাছে কত কী আবদার করে, তাহার মায়ের গৃহকার্যে সাহায্য করে। আগে যে তাহার একটি বাক্যহীন নিস্তব্ধ বিষণ্ণ ছায়ার মতো ভাব ছিল, তাহা ঘুচিয়া গেছে—এখন তাহার প্রফুল্ল হৃদয়খানি পরিস্ফুট প্রভাতের ন্যায় তাহার সর্বাঙ্গে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। আগেকার মতো সে সংকোচ, সে লজ্জা, সে বিষাদ, সে অভিমান, সেই নীরব ভাব আর নাই; সে এখন আনন্দভরে বিশ্বস্তভাবে মায়ের সহিত এত কথা বলে যে আগে হইলে বলিতে লজ্জা করিত, ইচ্ছাই হইত না। মেয়ের এই আনন্দ দেখিয়া মায়ের অসীম স্নেহ উথলিয়া উঠিল। মনের ভিতরে ভিতরে একটা ভাবনা জাগিতেছে বটে, কিন্তু বিভার নিকট আভাসেও সে ভাবনা কখনো প্রকাশ করেন নাই। মা হইয়া আবার কোন্ প্রাণে বিভার সেই বিমল প্রশান্ত হাসিটুকু এক তিল মলিন করিবেন। এইজন্য মেয়েটি প্রতিদিন চোখের সামনে হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়, মা হাস্যমুখে অপরিতৃপ্ত নয়নে তাহাই দেখেন।

মহিষীর মনের ভিতর নাকি একটা ভয়, একটা সন্দেহ বর্তমান ছিল, তারই জন্য আজ কাল করিয়া এ-পর্যন্ত বিভাকে আর প্রাণ ধরিয়া শ্বশুরালয়ে পাঠাইতে পারিতেছেন না। দুই-এক সপ্তাহ চলিয়া গেল, উদয়াদিত্যের বিষয়ে সকলেই একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। কেবল বিভার সম্বন্ধে যে কী করিবেন, মহিষী এখনো তাহার একটা স্থির করিতে পারিতেছেন না। এমন আরো কিছু দিন গেল। যতই বিলম্ব হইতেছে, ততই বিভার অধীরতা বাড়িতেছে। বিভা মনে করিতেছে, যতই বিলম্ব হইতেছে, ততই সে যেন তাহার স্বামীর নিকট অপরাধী হইতেছে। তিনি যখন ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, তখন আর কিসের জন্য বিলম্ব করা। একবার তিনি মার্জনা করিয়াছেন, আবার—। কয়েক দিন বিভা আর কিছু বলিল না, অবশেষে একদিন আর থাকিতে পারিল না; মায়ের কাছে গিয়া মায়ের গলা ধরিয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বিভা কহিল, "মা।" ওই কথাতেই তাহার মা সমস্ত বুঝিতে পারিলেন, বিভাকে বুকে টানিয়া লইয়া কহিলেন, "কী বাছা।" বিভা কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে কহিল, "মা, তুই আমাকে কবে পাঠাইবি মা।" বলিতে

বলিতে বিভার মুখ কান লাল হইয়া উঠিল। মা ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় পাঠাইব বিভু।" বিভা মিনতিস্বরে কহিল, "বলো না মা।" মহিষী কহিলেন, "আর কিছুদিন সবুর করো বাছা। শীঘ্রই পাঠাইব।" বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষে জল আসিল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বহুদিনের পর উদয়াদিত্য রায়গড়ে আসিলেন, কিন্তু আগেকার মতো তেমন আনন্দ আর পাইলেন না। মনের মধ্যে একটা ভাবনা চাপিয়া ছিল, তাই কিছুই তেমন ভালো লাগিল না। তিনি ভাবিতেছিলেন, দাদামহাশয় যে কাজ করিয়াছেন, তাঁহার যে কী হইবে তাহার ঠিকানা নাই, পিতা যে সহজে নিষ্কৃতি দিবেন এমন তো বোধ হয় না। আমার কী কুক্ষণেই জন্ম হইয়াছিল। তিনি বসন্ত রায়ের কাছে গিয়া কহিলেন, "দাদামহাশয়, আমি যাই, যশোহরে ফিরিয়া যাই। প্রথম প্রথম বসন্ত রায় গান গাহিয়া হাসিয়া এ-কথা উড়াইয়া দিলেন; তিনি গাহিলেন,

আর কি আমি ছাড়ব তোরে।
মন দিয়ে মন নাই বা পেলেম
জোর করে রাখিব ধরে।
শূন্য করে হৃদয়-পুরী প্রাণ যদি করিলে চুরি
তুমি তবে থাকো সেথায়
শূন্য হৃদয় পূর্ণ করে।

অবশেষে উদয়াদিত্য বারবার কহিলে পর বসন্ত রায়ের মনে আঘাত লাগিল, তিনি গান বন্ধ করিয়া বিষণ্ণমুখে কহিলেন, "কেন দাদা, আমি কাছে থাকিলে তোর কিসের অসুখ?" উদয়াদিত্য আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

উদয়াদিত্যকে উন্মনা দেখিয়া বসন্ত রায় তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য দিনরাত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। সেতার বাজাইতেন, গান গাহিতেন, সঙ্গে করিয়া লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন, উদয়াদিত্যের জন্য প্রায় তাঁহার রাজকার্য বন্ধ হইল। বসন্ত রায়ের ভয় পাছে উদয়াদিত্যকে না রাখিতে পারেন, পাছে উদয়াদিত্য আবার যশোহরে চলিয়া যান। দিনরাত তাঁহাকে চোখে চোখে রাখেন, তাঁহাকে বলেন, "দাদা, তোকে আর সে পাষাণহৃদয়ের দেশে যাইতে দিব না।"

দিনকতক থাকিতে থাকিতে উদয়াদিত্যের মনের ভাবনা অনেকটা শিথিল হইয়া

আসিল। অনেকদিনের পর স্বাধীনতা লাভ করিয়া, সংকীর্ণপ্রসর পাষাণময় চারিটি কারাভিত্তি হইতে মুক্ত হইয়া বসন্ত রায়ের কোমল হৃদয়ের মধ্যে তাঁহার অসীম স্নেহের মধ্যে বাস করিতেছেন। অনেক দিনের পর চারিদিকে গাছপালা দেখিতেছেন, আকাশ দেখিতেছেন, দিগ্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত উন্মুক্ত ঊষার আলো দেখিতেছেন, পাখির গান শুনিতেছেন, দূর দিগন্ত হইতে হু হু করিয়া সর্বাঙ্গে বাতাস লাগিতেছে, রাত্রি হইলে সমস্ত আকাশময় তারা দেখিতে পান, জ্যোৎস্নার প্রবাহের মধ্যে ডুবিয়া যান, ঘুমন্ত স্তব্ধতার প্রাণের মধ্যে বিরাজ করিতে থাকেন। যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারেন, যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, কিছুতেই আর বাধা নাই। ছেলেবেলা যে-সকল প্রজারা উদয়াদিত্যকে চিনিত, তাহারা দূর-দূরান্তর হইতে উদয়াদিত্যকে দেখিবার জন্য আসিল। গঙ্গাধর আসিল, ফটিক আসিল, হবিচাচা ও করিমউল্লা আসিল, মথুর তাহার তিনটি ছেলে সঙ্গে করিয়া আসিল, পরান ও হরি দুই ভাই আসিল, শীতল সর্দার খেলা দেখাইবার জন্য পাঁচজন লাঠিয়াল সঙ্গে লইয়া আসিল। প্রত্যহ যুবরাজের কাছে প্রজারা আসিতে লাগিল। যুবরাজ তাহাদের কত কী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। এখনো যে উদয়াদিত্য তাহাদিগকে ভোলেন নাই তাহা দেখিয়া প্রজারা অত্যন্ত আনন্দিত ও বিস্মিত হইল। মথুর কহিল, "মহারাজ, আপনি যে মাসে রায়গড়ে আসিয়াছিলেন সেই মাসে আমার এই ছেলেটি জন্মায়, আপনি দেখিয়া গিয়াছিলেন, তার পরে আপনার আশীর্বাদে আমার আরো দুটি সন্তান জন্মিয়াছে।" বলিয়া সে তাহার তিন ছেলেকে যুবরাজের কাছে আনিয়া কহিল, "প্রণাম করো?" তাহারা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। পরান আসিয়া কহিল, "এখান হইতে যশোর যাইবার সময় হুজুর যে নৌকায় গিয়াছিলেন, আমি সেই নৌকায় মাঝি ছিলাম, মহারাজ।" শীতল সর্দার আসিয়া কহিল, "মহারাজ, আপনি যখন রায়গড়ে ছিলেন, তখন আমার লাঠিখেলা দেখিয়া বকশিশ দিয়াছিলেন, আজ ইচ্ছা আছে একবার আমার ছেলেদের খেলা মহারাজকে দেখাইব। এস তো বাপধন, তোমরা এগোও তো।" বলিয়া ছেলেদের ডাকিল। এইরূপ প্রত্যহ সকাল হইলে উদয়াদিত্যের কাছে দলে দলে প্রজারা আসিত ও সকলে একত্রে মিলিয়া কথা কহিত।

এইরূপ স্নেহের মধ্যে, গাছপালার মধ্যে, আনন্দের মধ্যে, গীতোচ্ছ্বাসের মধ্যে থাকিয়া স্বভাবতই উদয়াদিত্যের মন হইতে ভাবনা অনেকটা শিথিল হইয়া আসিল। তিনি চোখ বুজিয়া মনে করিলেন, পিতা হয়তো রাগ করেন নাই, তিনি হয়তো সন্তুষ্ট হইয়াছেন, নহিলে এত দিন আর কি কিছু করিতেন না।

কিন্তু এরূপ চোখ-বাঁধা বিশ্বাসে বেশিদিন মনকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার দাদামহাশয়ের জন্য মনে কেমন একটা ভয় হইতে লাগিল। যশোহরে ফিরিয়া যাইবার কথা দাদামহাশয়কে বলা বৃথা; তিনি স্থির করিলেন— একদিন লুকাইয়া যশোহরে পলাইয়া যাইব। আবার সেই কারাগার মনে পড়িল। কোথায় এই আনন্দের স্বাধীনতা আর কোথায় সেই সংকীর্ণ ক্ষুদ্র কারাগারের একঘেয়ে জীবন। কারাগারের সেই প্রতিমুহূর্তকে এক-এক বৎসর রূপে মনে পড়িতে লাগিল। সেই নিরালোক, নির্জন, বায়ুহীন, বদ্ধ ঘরটি কল্পনায় স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, শরীর শিহরিয়া উঠিল। তবুও স্থির করিলেন, এখান হইতে একদিন সেই কারাগারের অভিমুখে পলাইতে হইবে। আজই পলাইব— এমন কথা মনে করিতে পারিলেন না। একদিন পলাইব— মনে করিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

আজ বৃহস্পতিবার, বারবেলা, আজ যাত্রা হইতে পারে না, কাল হইবে। আজ দিন বড়ো খারাপ। সকাল হইতে ক্রমাগত টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। সমস্ত আকাশ লেপিয়া মেঘ করিয়া আছে। আজ সন্ধ্যাবেলায় রায়গড় ছাড়িয়া যাইতেই হইবে বলিয়া উদয়াদিত্য স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। সকালে যখন বসন্ত রায়ের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল, তখন বসন্ত রায় উদয়াদিত্যকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, "দাদা, কাল রাত্রে আমি একটা বড়ো দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি। স্বপ্নটা ভালো মনে পড়িতেছে না, কেবল মনে আছে, তোতে আমাতে যেন— যেন জন্মের মতো ছাড়াছাড়ি হইতেছে।"

উদয়াদিত্য বসন্ত রায়ের হাত ধরিয়া কহিলেন, "না, দাদামহাশয়। ছাড়াছাড়ি যদি বা হয় তো জন্মের মতো কেন হইবে?"

বসন্ত রায় অন্যদিকে চাহিয়া ভাবনার ভাবে কহিলেন, "তা নয় তো আর কী। কতদিন আর বাঁচিব বল্, বুড়া হইয়াছি।"

গত রাত্রের দুঃস্বপ্নের শেষ তান এখনো বসন্ত রায়ের মনের গুহার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, তাই তিনি অন্যমনস্ক হইয়া কী ভাবিতেছিলেন।

উদয়াদিত্য কিছু ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "দাদামহাশয়, আবার যদি আমাদের ছাড়াছাড়ি হয় তো কী হইবে।"

বসন্ত রায় উদয়াদিত্যের গলা ধরিয়া কহিলেন, "কেন ভাই, কেন ছাড়াছাড়ি হইবে? তুই আমাকে ছাড়িয়া যাস নে। এ বুড়া বয়সে তুই আমাকে ফেলিয়া পালাস নে ভাই!"

উদয়াদিত্যের চোখে জল আসিল। তিনি বিস্মিত হইলেন, তাঁহার মনের

অভিসন্ধি যেন বসন্ত রায় কী করিয়া টের পাইয়াছেন। নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "আমি কাছে থাকিলেই যে তোমার বিপদ ঘটিবে দাদামহাশয়।"

বসন্ত রায় হাসিয়া কহিলেন, "কিসের বিপদ ভাই? এ বয়সে কি আর বিপদকে ভয় করি। মরণের বাড়া তো আর বিপদ নাই। তা মরণ যে আমার প্রতিবেশী। সে নিত্য আমার তত্ত্ব লইতে পাঠায়, তাহাকে আমি ভয় করি না। যে ব্যক্তি জীবনের সমস্ত বিপদ অতিক্রম করিয়া বুড়া বয়স পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তীরে আসিয়া তাহার নৌকাডুবি হইলই বা!"

উদয়াদিত্য আজ সমস্ত দিন বসন্ত রায়ের সঙ্গে রহিলেন। সমস্ত দিন টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল।

বিকালবেলায় বৃষ্টি ধরিয়া গেল, উদয়াদিত্য উঠিলেন। বসন্ত রায় কহিলেন, "দাদা, কোথায় যাস?"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "একটু বেড়াইয়া আসি।"

বসন্ত রায় কহিলেন, "আজ নাই-বা গেলি।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "কেন দাদামহাশয়?"

বসন্ত রায় উদয়াদিত্যকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, "আজ তুই বাড়ি হইতে বাহির হস নে, আজ তুই আমার কাছে থাক্ ভাই!"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "আমি অধিক দূর যাইব না দাদামশায়, এখনই ফিরিয়া আসিব।" বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

প্রাসাদের বহির্দ্বারে যাইতেই একজন প্রহরী কহিল, "মহারাজ, আপনার সঙ্গে যাইব?"

যুবরাজ কহিলেন, "না, আবশ্যক নাই।"

প্রহরী কহিল, "মহারাজের হাতে অস্ত্র নাই!"

যুবরাজ কহিলেন, "অস্ত্রের প্রয়োজন কী?"

উদয়াদিত্য প্রাসাদের বাহিরে গেলেন। একটি দীর্ঘ বিস্তৃত মাঠ আছে, সেই মাঠের মধ্যে গিয়া পড়িলেন। একলা বেড়াইতে লাগিলেন। ক্রমে দিনের আলো মিলাইয়া আসিতে লাগিল। মনে কত কী ভাবনা উঠিল। যুবরাজ তাঁহার এই লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্যহীন জীবনের কথা ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া দেখিলেন, তাঁহার কিছু স্থির নাই, কোথাও স্থিতি নাই—পরের মুহূর্তেই কী হইবে তাহার ঠিকানা নাই। বয়স অল্প, এখনো জীবনের অনেক অবশিষ্ট আছে। কোথাও ঘরবাড়ি না বাঁধিয়া কোথাও স্থায়ী আশ্রয় না পাইয়া এই সুদূরবিস্তৃত ভবিষ্যৎ এমন করিয়া

কিরূপে কাটিবে? তাহার পর মনে পড়িল— বিভা। বিভা এখন কোথায় আছে? এত কাল আমিই তাহার সুখের সূর্য আড়াল করিয়া বসিয়া ছিলাম, এখন কি সে সুখী হইয়াছে? বিভাকে মনে মনে কত আশীর্বাদ করিলেন।

মাঠের মধ্যে রৌদ্রে রাখালদের বসিবার নিমিত্ত অশথ বট খেজুর সুপারি প্রভৃতির এক বন আছে— যুবরাজ তাহার মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। অন্ধকার করিয়াছে। যুবরাজের আজ পলাইবার কথা ছিল— সেই সংকল্প লইয়া তিনি মনে মনে আন্দোলন করিতেছিলেন। বসন্ত রায় যখন শুনিবেন উদয়াদিত্য পলাইয়া গেছেন, তখন তাঁহার কিরূপ অবস্থা হইবে, তখন তিনি হৃদয়ে আঘাত পাইয়া করুণ মুখে কেমন করিয়া বলিবেন, 'অ্যাঁ, দাদা আমার কাছ হইতে পলাইয়া গেল!' সে ছবি তিনি যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন।

এমন সময়ে একজন রমণী কর্কশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "এই যে গা, এইখানে তোমাদের যুবরাজ— এইখানে!"

দুইজন সৈন্য মশাল হাতে করিয়া যুবরাজের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে আরো অনেকে আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তখন সেই রমণী তাঁহার কাছে আসিয়া কহিল, "আমাকে চিনিতে পার কি গা। একবার এইদিকে তাকাও! একবার এইদিকে তাকাও!" যুবরাজ মশালের আলোকে দেখিলেন, রুক্মিণী। সৈন্যগণ রুক্মিণীর ব্যবহার দেখিয়া তাহাকে ধমক দিয়া কহিল, "দূর হ মাগী।" সে তাহাতে কর্ণপাতও না করিয়া কহিতে লাগিল, "এ-সব কে করিয়াছে? আমি করিয়াছি। এ-সব কে করিয়াছে? আমি করিয়াছি। এ-সব সৈন্যদের এখানে কে আনিয়াছে? আমি আনিয়াছি। আমি তোমার লাগিয়া এত করিলাম, আর তুমি— ।" যুবরাজ ঘৃণায় রুক্মিণীর দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সৈন্যগণ রুক্মিণীকে বলপূর্বক ধরিয়া তফাত করিয়া দিল। তখন মুক্তিয়ার খাঁ সম্মুখে আসিয়া যুবরাজকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। যুবরাজ বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "মুক্তিয়ার খাঁ, কী খবর?"

মুক্তিয়ার খাঁ বিনীতভাবে কহিল, "জনাব, আমাদের মহারাজের নিকট হইতে আদেশ লইয়া আসিতেছি।"

যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী আদেশ।"

মুক্তিয়ার খাঁ প্রতাপাদিত্যের স্বাক্ষরিত আদেশপত্র বাহির করিয়া যুবরাজের হাতে দিল।

যুবরাজ পড়িয়া কহিলেন, "ইহার জন্য এত সৈন্যের প্রয়োজন কী? আমাকে একখানা পত্র লিখিয়া আদেশ করিলেই তো আমি যাইতাম। আমি তো আপনিই

যাইতেছিলাম, যাইব বলিয়াই স্থির করিয়াছি। তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন কী? এখনই চলো। এখনই যশোহরে ফিরিয়া যাই।" মুক্তিয়ার খাঁ হাত জোড় করিয়া কহিল, "এখনই ফিরিতে পারিব না।" যুবরাজ ভীত হইয়া কহিলেন, "কেন?" মুক্তিয়ার খাঁ কহিল, "আর-একটি আদেশ আছে, তাহা পালন না করিয়া যাইতে পারিব না।"

যুবরাজ ভীতস্বরে কহিলেন, "কী আদেশ!"

মুক্তিয়ার খাঁ কহিল, "রায়গড়ের রাজার প্রতি মহারাজা প্রাণদণ্ডের আদেশ করিয়াছেন।"

যুবরাজ চমকিয়া উচ্চস্বরে কহিয়া উঠিলেন, "না, করেন নাই, মিথ্যা কথা।"

মুক্তিয়ার খাঁ কহিল, "আজ্ঞা যুবরাজ, মিথ্যা নহে। আমার নিকট মহারাজের স্বাক্ষরিত পত্র আছে।"

যুবরাজ সেনাপতির হাত ধরিয়া ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, "মুক্তিয়ার খাঁ, তুমি ভুল বুঝিয়াছ। মহারাজ আদেশ করিয়াছেন যে, যদি উদয়াদিত্যকে না পাও, তাহা হইলে বসন্ত রায়ের— আমি যখন আপনি ধরা দিতেছি তখন আর কী! আমাকে এখনই লইয়া চলো, এখনই লইয়া চলো— আমাকে বন্দী করিয়া লইয়া চলো, আর বিলম্ব করিয়ো না।"

মুক্তিয়ার খাঁ কহিল, "যুবরাজ, আমি ভুল বুঝি নাই। মহারাজ স্পষ্ট আদেশ করিয়াছেন।"

যুবরাজ অধীর হইয়া কহিলেন, "তুমি নিশ্চয়ই ভুল বুঝিয়াছ। তাঁহার অভিপ্রায় এরূপ নহে। আচ্ছা চলো, যশোহরে চলো। আমি মহারাজের সম্মুখে তোমাদের বুঝাইয়া দিব, তিনি যদি দ্বিতীয় বার আদেশ করেন, তবে আদেশ সম্পন্ন করিয়ো।"

মুক্তিয়ার জোড়হস্তে কহিল, "যুবরাজ, মার্জনা করুন, তাহা পারিব না।"

যুবরাজ অধিকতর অধীর হইয়া কহিলেন, "মুক্তিয়ার, মনে আছে, আমি এক কালে সিংহাসন পাইব? আমার কথা রাখো, আমাকে সন্তুষ্ট করো।"

মুক্তিয়ার নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল।

যুবরাজের মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল, তাঁহার কপালে ঘর্মবিন্দু দেখা দিল। তিনি সেনাপতির হাত দৃঢ়ভাবে ধরিয়া কহিলেন, "মুক্তিয়ার খাঁ, বৃদ্ধ নিরপরাধ পুণ্যাত্মাকে বধ করিলে নরকেও তোমার স্থান হইবে না।"

মুক্তিয়ার খাঁ কহিল, "মনিবের আদেশ পালন করিতে পাপ নাই।"

উদয়াদিত্য উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিলেন, "মিথ্যা কথা। যে ধর্মশাস্ত্রে তাহা

বলে, সে ধর্মশাস্ত্র মিথ্যা। নিশ্চয়ই জানিয়ো মুক্তিয়ার, পাপ আদেশ পালন করিলে পাপ।"

মুক্তিয়ার নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল।

উদয়াদিত্য চারি দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তবে আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি গড়ে ফিরিয়া যাই। তোমার সৈন্যসামন্ত লইয়া সেখানে যাও, আমি তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি। সেখানে রণক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়া তার পরে তোমার আদেশ পালন করিয়ো।"

মুক্তিয়ার নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। সৈন্যগণ অধিকতর ঘেঁষিয়া আসিয়া যুবরাজকে ঘিরিল। যুবরাজ কোনো উপায় না দেখিয়া সেই অন্ধকারে প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "দাদামহাশয়, সাবধান।" বন কাঁপিয়া উঠিল, মাঠের প্রান্তে গিয়া সে স্বর মিলাইয়া গেল। সৈন্যরা আসিয়া উদয়াদিত্যকে ধরিল। উদয়াদিত্য আর-একবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "দাদামহাশয়, সাবধান।" এক জন পথিক মাঠ দিয়া যাইতেছিল—শব্দ শুনিয়া কাছে আসিয়া কহিল, "কে গা!" উদয়াদিত্য তাড়াতাড়ি কহিলেন, "যাও যাও, গড়ে ছুটিয়া যাও, মহারাজকে সাবধান করিয়া দাও।" দেখিতে দেখিতে সেই পথিককে সৈন্যেরা গ্রেপ্তার করিল। যে কেহ সেই মাঠ দিয়া চলিয়াছিল, সৈন্যেরা অবিলম্বে তাহাকে বন্দী করিল।

কয়েকজন সৈন্য উদয়াদিত্যকে বন্দী করিয়া রহিল, মুক্তিয়ার খাঁ এবং অবশিষ্ট সৈন্যগণ সৈনিকের বেশ পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্রশস্ত্র লুকাইয়া সহজ বেশে গড়ের অভিমুখে গেল। রায়গড়ের শতাধিক দ্বার ছিল, ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া তাহারা গড়ের মধ্যে প্রবেশ করিল।

তখন সন্ধ্যাকালে বসন্ত রায় বসিয়া আহ্নিক করিতেছিলেন। ওদিকে রাজবাড়ির ঠাকুরঘরে সন্ধ্যাপূজার শাঁখ ঘণ্টা বাজিতেছে। বৃহৎ রাজবাটীতে কোনো কোলাহল নাই, চারি দিক নিস্তব্ধ। বসন্ত রায়ের নিয়মানুসারে অধিকাংশ ভৃত্য সন্ধ্যাবেলায় কিছুক্ষণের জন্য ছুটি পাইয়াছে।

আহ্নিক করিতে করিতে বসন্ত রায় সহসা দেখিলেন, তাঁহার ঘরের মধ্যে মুক্তিয়ার খাঁ প্রবেশ করিল। ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "খাঁ সাহেব, এ ঘরে প্রবেশ করিয়ো না। আমি এখনই আহ্নিক সারিয়া আসিতেছি।"

মুক্তিয়ার খাঁ ঘরের বাহিরে গিয়া দুয়ারের নিকট দাঁড়াইয়া রহিল। বসন্ত রায় আহ্নিক সমাপন করিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া মুক্তিয়ার খাঁর গায়ে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "খাঁ সাহেব, ভালো আছ তো?"

মুক্তিয়ার সেলাম করিয়া সংক্ষেপে কহিল, "হাঁ মহারাজ।"

বসন্ত রায় কহিলেন, "আহারাদি হইয়াছে।"

মুক্তিয়ার। আজ্ঞা হাঁ।

বসন্ত রায়। আজ তবে তোমার এখানে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিই।

মুক্তিয়ার কহিল, "আজ্ঞা না, প্রয়োজন নাই। কাজ সারিয়া এখনই যাইতে হইবে।"

বসন্ত রায়। না, তা হইবে না খাঁ সাহেব, আজ তোমাদের ছাড়িব না, আজ এখানে থাকিতেই হইবে।

মুক্তিয়ার। না মহারাজ, শীঘ্রই যাইতে হইবে।

বসন্ত রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন বলো দেখি? বিশেষ কাজ আছে বুঝি? প্রতাপ ভালো আছে তো?"

মুক্তিয়ার। মহারাজ ভালো আছেন।

বসন্ত রায়। তবে কী তোমার কাজ, শীঘ্র বলো। বিশেষ জরুরি শুনিয়া উদ্বেগ হইতেছে। প্রতাপের তো কোনো বিপদ ঘটে নাই?

মুক্তিয়ার। আজ্ঞে না, তাঁহার কোনো বিপদ ঘটে নাই। মহারাজার একটি আদেশ পালন করিতে আসিয়াছি।

বসন্ত রায় তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী আদেশ? এখনই বলো।"

মুক্তিয়ার খাঁ এক আদেশপত্র বাহির করিয়া বসন্ত রায়ের হাতে দিল। বসন্ত রায় আলোর কাছে লইয়া পড়িতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে একে একে সমুদয় সৈন্য দরজার নিকট আসিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইল।

পড়া শেষ করিয়া বসন্ত রায় ধীরে ধীরে মুক্তিয়ার খাঁর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি প্রতাপের লেখা?"

মুক্তিয়ার কহিল, "হাঁ।"

বসন্ত রায় আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "খাঁ সাহেব, এ কি প্রতাপের স্বহস্তে লেখা?"

মুক্তিয়ার কহিল, "হাঁ মহারাজ।"

তখন বসন্ত রায় কাঁদিয়া বলিয়া উঠিলেন, "খাঁ সাহেব, আমি প্রতাপকে নিজের হাতে মানুষ করিয়াছি।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, অবশেষে আবার কহিলেন, "প্রতাপ যখন এতটুকু ছিল আমি তাহাকে দিনরাত কোলে করিয়া থাকিতাম, সে আমাকে একমুহূর্ত

ছাড়িয়া থাকিতে চাহিত না। সেই প্রতাপ বড়ো হইল, তাহার বিবাহ দিয়া দিলাম, তাহাকে সিংহাসনে বসাইলাম, তাহার সন্তানদের কোলে লইলাম— সেই প্রতাপ আজ স্বহস্তে এই লেখা লিখিয়াছে খাঁ সাহেব?"

মুক্তিয়ার খাঁর চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল, সে অধোবদনে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বসন্ত রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা কোথায়? উদয় কোথায়?"

মুক্তিয়ার খাঁ কহিল, "তিনি বন্দী হইয়াছেন। মহারাজের নিকট বিচারের নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছেন।"

বসন্ত রায় বলিয়া উঠিলেন, "উদয় বন্দী হইয়াছে? বন্দী হইয়াছে খাঁ সাহেব? আমি একবার তাহাকে কি দেখিতে পাইব না?"

মুক্তিয়ার খাঁ জোড়হাত করিয়া কহিল, "না জনাব, হুকুম নাই।"

বসন্ত রায় সাশ্রুনেত্রে মুক্তিয়ার খাঁর হাত ধরিয়া কহিলেন, "একবার আমাকে দেখিতে দিবে না খাঁ সাহেব!"

মুক্তিয়ার কহিল, "আমি আদেশপালক ভৃত্য মাত্র।"

বসন্ত রায় গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "এ সংসারে কাহারও দয়ামায়া নাই, এসো সাহেব, তোমার আদেশ পালন করো।"

মুক্তিয়ার তখন মাটি ছুঁইয়া সেলাম করিয়া জোড়হস্তে কহিল, "মহারাজ, আমাকে মার্জনা করিবেন— আমি প্রভুর আদেশ পালন করিতেছি মাত্র, আমার কোনো দোষ নাই।"

বসন্ত রায় কহিলেন, "না সাহেব, তোমার দোষ কী? তোমার কোনো দোষ নাই। তোমাকে আর মার্জনা করিব কী?" বলিয়া মুক্তিয়ার খাঁর কাছে গিয়া তাহার সহিত কোলাকুলি করিলেন; কহিলেন, "প্রতাপকে বলিয়ো, আমি তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া মরিলাম। আর দেখো খাঁ সাহেব, আমি মরিবার সময় তোমার উপরেই উদয়ের ভার দিয়া গেলাম। সে নিরপরাধ— দেখিয়ো অন্যায় বিচারে সে যেন আর কষ্ট না পায়।"

বলিয়া বসন্ত রায় চোখ বুঁজিয়া ইষ্টদেবতার নিকট ভূমিষ্ঠ হইয়া রহিলেন, দক্ষিণ হস্তে মালা জপিতে লাগিলেন ও কহিলেন, "সাহেব এইবার।"

মুক্তিয়ার খাঁ ডাকিল, "আবদুল।" আবদুল মুক্ত তলোয়ার হস্তে আসিল। মুক্তিয়ার মুখ ফিরাইয়া সরিয়া গেল। মুহূর্ত পরেই রক্তাক্ত অসি হস্তে আবদুল গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিল। গৃহে রক্তস্রোত বহিতে লাগিল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মুক্তিয়ার খাঁ ফিরিয়া আসিল। রায়গড়ে অধিকাংশ সৈন্য রাখিয়া উদয়াদিত্যকে লইয়া তৎক্ষণাৎ যশোহরে যাত্রা করিল। পথে যাইতে দুই দিন উদয়াদিত্য খাদ্য-দ্রব্য স্পর্শ করিলেন না, কাহারও সহিত একটি কথাও কহিলেন না, কেবল চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। পাষাণমূর্তির ন্যায় স্থির— তাঁহার নেত্রে নিদ্রা নাই, নিমেষ নাই, অশ্রু নাই, দৃষ্টি নাই— কেবলই ভাবিতেছেন। নৌকায় উঠিলেন, নৌকা হইতে মুখ বাড়াইয়া জলের দিকে চাহিয়া রহিলেন, নৌকা চলিতে লাগিল— দাঁড়ের শব্দ শুনিতে লাগিলেন, জলের কল্লোল কানে প্রবেশ করিল। তবুও কিছু শুনিলেন না, কিছুই দেখিলেন না, কেবলই ভাবিতে লাগিলেন। রাত্রি হইল, আকাশে তারা উঠিল, মাঝিরা নৌকা বাঁধিয়া রাখিল, নৌকায় সকলেই ঘুমাইল। কেবল জলের শব্দ শুনা যাইতেছে, নৌকার উপর ছোটো ছোটো তরঙ্গ আসিয়া আঘাত করিতেছে— যুবরাজ একদৃষ্টে সম্মুখে চাহিয়া সুদূরপ্রসারিত শুভ্র বালির চড়ার দিকে চাহিয়া কেবলই ভাবিতে লাগিলেন। প্রত্যুষে মাঝিরা জাগিয়া উঠিল, নৌকা খুলিয়া দিল, উষার বাতাস বহিল, পূর্বদিক রাঙা হইয়া উঠিল, যুবরাজ ভাবিতে লাগিলেন। তৃতীয় দিবসে যুবরাজের দুই চক্ষু ভাসিয়া হু হু করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল— হাতের উপর মাথা রাখিয়া জলের দিকে চাহিয়া রহিলেন, আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নৌকা চলিতে লাগিল— তীরে গাছপালাগুলি মেঘের মতো চোখের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল, চোখ দিয়া সহস্র ধারায় অশ্রু পড়িতে লাগিল। অনেকক্ষণের পর অবসর বুঝিয়া মুক্তিয়ার খাঁ ব্যথিত হৃদয়ে যুবরাজের নিকট আসিয়া বসিল, বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "যুবরাজ, কী ভাবিতেছেন।" যুবরাজ চমকিয়া উঠিলেন, অনেকক্ষণ স্তব্ধভাবে অবাক হইয়া মুক্তিয়ারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মুক্তিয়ারের মুখে মমতার ভাব দেখিয়া সহসা রুদ্ধ প্রাণ খুলিয়া যুবরাজ বলিয়া উঠিলেন, "ভাবিতেছি, পৃথিবীতে জন্মাইয়া আমি কী করিলাম। আমার জন্য কী সর্বনাশই হইল। হে বিধাতা, যাহারা দুর্বল এ পৃথিবীতে তাহারা কেন জন্মায়? যাহারা নিজের বলে সংসারে দাঁড়াইতে পারে না, যাহারা পদে পদে পরকে জড়াইয়া ধরে, তাহাদের দ্বারা পৃথিবীর কী উপকার হয়? তাহারা যাহাকে ধরে, তাহাকেই ডুবায়, পৃথিবীর সকল কাজে বাধা দেয়— নিজেও দাঁড়াইতে পারে না, আর-সকলকেও ভারাক্রান্ত করে। আমি একজন দুর্বল ভীরু, ঈশ্বর আমাকেই বাঁচাইলেন, আর যাহারা সংসারের আনন্দ ছিল, সংসারের

ভরসা ছিল— আমার জন্য তাহাদেরই বিনাশ করিলেন। আর না, এ সংসার হইতে আমি বিদায় লইলাম।"

উদয়াদিত্য বন্দিভাবে প্রতাপাদিত্যের সম্মুখে আনীত হইলেন। প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে অন্তঃপুরের কক্ষে লইয়া গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। প্রতাপাদিত্যের কাছে আসিতেই উদয়াদিত্যের শরীর যেন শিহরিয়া উঠিল, অনিবার্য ঘৃণায় তাঁহার সর্ব শরীরের মাংস যেন কুঞ্চিত হইয়া আসিল— তিনি পিতার মুখের দিকে আর চাহিতে পারিলেন না।

প্রতাপাদিত্য গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "কোন্ শাস্তি তোমার উপযুক্ত ?"

উদয়াদিত্য অবিচলিত ভাবে কহিলেন, "আপনি যাহা আদেশ করেন।"

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "তুমি আমার এ রাজ্যের যোগ্য নহ।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "না মহারাজ, আমি যোগ্য নহি। আমি আপনার রাজ্য চাহি না। আপনার সিংহাসন হইতে আমাকে অব্যাহতি দিন, এই ভিক্ষা।"

প্রতাপাদিত্যও তাহাই চান, তিনি কহিলেন, "তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা যে সত্যই তোমার হৃদয়ের ভাব তাহা কি করিয়া জানিব ?"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "দুর্বলতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু আজ পর্যন্ত নিজের স্বার্থের জন্য কখনো মিথ্যা কথা বলি নাই। বিশ্বাস না করেন যদি, আজ আমি মা কালীর চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিব— আপনার রাজ্যের এক সূচ্যগ্রভূমিও আমি কখনো শাসন করিব না। সমরাদিত্যই আপনার রাজ্যের উত্তরাধিকারী।"

প্রতাপাদিত্য সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "তুমি তবে কী চাও ?"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "মহারাজ, আমি আর কিছুই চাই না, কেবল আমাকে পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মতো গারদে পুরিয়া রাখিবেন না। আমাকে পরিত্যাগ করুন, আমি এখনই কাশী চলিয়া যাই। আর-একটি ভিক্ষা— আমাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিন। আমি সেখানে দাদামহাশয়ের নামে এক অতিথিশালা ও একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিব।"

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "আচ্ছা, তাহাই স্বীকার করিতেছি।"

সেইদিনই উদয়াদিত্য মন্দিরে গিয়া প্রতাপাদিত্যের সম্মুখে শপথ করিয়া কহিলেন, "মা কালী, তুমি সাক্ষী থাকো, তোমার পা ছুঁইয়া আমি শপথ করিতেছি— যতদিন আমি বাঁচিয়া থাকিব, যশোহরের মহারাজের রাজ্যের এত তিলও আমি আমার বলিয়া গ্রহণ করিব না। যশোহরের সিংহাসনে আমি বসিব না, যশোহরের রাজদণ্ড আমি স্পর্শও করিব না। যদি কখনো করি, তবে এই দাদামহাশয়ের হত্যার পাপ সমস্ত যেন আমারই হয়।" বলিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

মহারানী যখন শুনিলেন, উদয়াদিত্য কাশী চলিয়া যাইতেছেন, তখন উদয়াদিত্যের কাছে আসিয়া কহিলেন, "বাবা উদয়, আমাকেও তোর সঙ্গে লইয়া চল।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "সে কী কথা মা। তোমার সমরাদিত্য আছে, তোমার সমস্ত সংসার এখানে রহিল, তুমি যদি এখান হইতে যাও, তবে যশোহরে রাজলক্ষ্মী থাকিবে না।"

মহিষী কাঁদিয়া কহিলেন, "বাছা, এই বয়সে তুই যদি সংসার ছাড়িয়া গেলি, আমি কোন্ প্রাণে সংসার লইয়া থাকিব? রাজ্য সংসার পরিত্যাগ করিয়া তুই সন্ন্যাসী হইয়া থাকিবি, তোকে সেখানে কে দেখিবে? তোর পিতা পাষাণ বলিয়া আমি তোকে ছাড়িতে পারিব না।" মহিষী তাঁহার সকল সন্তানের মধ্যে উদয়াদিত্যকে অধিক ভালোবাসিতেন, উদয়াদিত্যের জন্য তিনি বুক ফাটিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

উদয়াদিত্য মায়ের হাত ধরিয়া অশ্রুনেত্রে কহিলেন, "মা, তুমি তো জানই রাজবাড়িতে থাকিলে আমার পদে পদে আশঙ্কার কারণ থাকিবে। তুমি নিশ্চিন্ত হও মা, আমি বিশ্বেশ্বরের চরণে গিয়া নিরাপদ হই।"

উদয়াদিত্য বিভার কাছে গিয়া কহিলেন, "বিভা, দিদি আমার, কাশী যাইবার আগে তোকে আমি সুখী করিয়া যাইব। আমি নিজে সঙ্গে করিয়া তোকে শ্বশুরবাড়ি লইয়া যাইব, এই আমার একমাত্র সাধ আছে।"

বিভা উদয়াদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদামহাশয় কেমন আছেন?"

"দাদামহাশয় ভালো আছেন।" বলিয়াই উদয়াদিত্য তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

উদয়াদিত্য ও বিভার যাত্রার উদ্‌যোগ হইতে লাগিল। বিভা মায়ের গলা ধরিয়া কাঁদিল। অন্তঃপুরে যে যেখানে ছিল, শ্বশুরালয়ে যাইবার আগে সকলেই বিভাকে নানাপ্রকার সদুপদেশ দিতে লাগিল।

মহিষী একবার উদয়াদিত্যকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, কহিলেন, "বাবা, বিভাকে তো লইয়া যাইতেছ, যদি তাহারা অযত্ন করে।"

উদয়াদিত্য চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "কেন মা, তাহারা অযত্ন করিবে কেন?"

মহিষী কহিলেন, "কী জানি তাহারা যদি বিভার উপর রাগ করিয়া থাকে?"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "না মা, বিভা ছেলেমানুষ, বিভার উপর কি তাহারা কখনো রাগ করিতে পারে ?"

মহিষী কাঁদিয়া কহিলেন, "বাছা, সাবধানে লইয়া যাইয়ো, যদি তাহারা অনাদর করে তবে আর বিভা বাঁচিবে না।"

উদয়াদিত্যের মনে একটা আশঙ্কা জাগিয়া উঠিল। বিভাকে যে শ্বশুরালয়ে অনাদর করিতে পারে, আগে তাহা তাঁহার মনেই হয় নাই। উদয়াদিত্য মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার কর্মফল সমস্তই বুঝি শেষ হইয়া গিয়াছে, দেখিলেন এখনও শেষ হয় নাই। বিভাকে তিনি আশ্রয় করিয়াছেন, তাহার পরিণামস্বরূপে বিভার অদৃষ্টে কী আছে তা কে জানে।

যাত্রার সময় উদয়াদিত্য ও বিভা মাকে আসিয়া প্রণাম করিলেন। পাছে যাত্রার বিঘ্ন হয়, মহিষী তখন কাঁদিলেন না, তাঁহারা চলিয়া যাইতেই তিনি ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। উদয়াদিত্য ও বিভা পিতাকে প্রণাম করিয়া আসিলেন, বাড়ির অন্যান্য গুরুজনদের প্রণাম করিলেন। উদয়াদিত্য সমরাদিত্যকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহাকে চুম্বন করিলেন ও আপনার মনে কহিলেন, "বৎস, যে সিংহাসনে তুমি বসিবে, সে সিংহাসনের অভিশাপ তোমাকে স্পর্শ যেন না করে।" রাজ-বাড়ির ভৃত্যেরা উদয়াদিত্যকে বড়ো ভালোবাসিত, তাহারা একে একে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, সকলে কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে মন্দিরে গিয়া উভয়ে দেবতাকে প্রণাম করিয়া যাত্রা করিলেন।

শোক বিপদ অত্যাচারের রঙ্গভূমি পশ্চাতে পড়িয়া রহিল— জীবনের কারাগার পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। উদয়াদিত্য মনে করিলেন এ বাড়িতে এ জীবনে আর প্রবেশ করিব না। একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন। দেখিলেন রক্তপিপাসু কঠোরহৃদয় রাজবাটী আকাশের মধ্যে মাথা তুলিয়া দৈত্যের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। পশ্চাতে ষড়যন্ত্র, যথেচ্ছাচারিতা, রক্তলালসা, দুর্বলের পীড়ন, অসহায়ের অশ্রুজল পড়িয়া রহিল, সম্মুখে অনন্ত স্বাধীনতা, প্রকৃতির অকলঙ্ক সৌন্দর্য, হৃদয়ের স্বাভাবিক স্নেহমমতা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য দুই হাত বাড়াইয়া দিল। তখন সবে প্রভাত হইয়াছে। নদীর পূর্ব পারে বনান্তের মধ্য হইতে কিরণের ছটা ঊর্ধ্বশিখা হইয়া উঠিয়াছে। গাছপালার মাথার উপরে সোনার আভা পড়িয়াছে। লোকজন জাগিয়া উঠিয়াছে। মাঝিরা আনন্দে গান গাহিতে গাহিতে পাল তুলিয়া নৌকা খুলিয়া দিয়াছে। প্রকৃতির এই বিমল প্রশান্ত পবিত্র প্রভাত-মুখশ্রী দেখিয়া উদয়াদিত্যের প্রাণ পাখিদের সহিত স্বাধীনতার গান গাহিয়া উঠিল। মনে মনে কহিলেন, "জন্ম

জন্ম যেন প্রকৃতির এই বিমল শ্যামল ভাবের মধ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারি, আর সরল প্রাণীদের সহিত একত্রে বাস করিতে পারি।"

নৌকা ছাড়িয়া দিল। মাঝিদের গান ও জলের কল্লোল শুনিতে শুনিতে উভয়ে অগ্রসর হইলেন। বিভার প্রশান্ত হৃদয়ে আনন্দের উষালোক বিরাজ করিতেছিল, তাহার মুখে চোখে অরুণের দীপ্তি। সে যেন এতদিনের পর একটা দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিয়া জগতের মুখ দেখিয়া আশ্বস্ত হইল। বিভা যাইতেছে। কাহার কাছে যাইতেছে? কে তাহাকে ডাকিতেছে? অনন্ত অচল প্রেম তাহাকে ডাকিয়াছে— বিভা ছোটো পাখিদের মতো ডানা ঢাকিয়া সেই কোমল প্রেমের স্তরের মধ্যে আরামে বিশ্বস্ত হৃদয়ে লুকাইয়া থাকিবে। জগতের চারিদিকে সে আজ স্নেহের সমুদ্র দেখিতে পাইতেছে। উদয়াদিত্য বিভাকে কাছে ডাকিয়া জলের কল্লোলের ন্যায় মৃদু স্বরে তাহাকে কত কী কাহিনী শুনাইতে লাগিলেন। যাহা শুনিল, বিভার তাহাই ভালো লাগিল।

রামচন্দ্র রায়ের রাজ্যের মধ্যে নৌকা প্রবেশ করিল। চারিদিক দেখিয়া বিভার মনে এক অভূতপূর্ব আনন্দের উদয় হইল। কী সুন্দর শোভা। কুটিরগুলি দেখিয়া, লোকজনদের দেখিয়া বিভার মনে হইল সকলে কী সুখেই আছে। বিভার ইচ্ছা হইতে লাগিল, প্রজাদিগকে কাছে ডাকিয়া তাহাদের রাজার কথা একবার জিজ্ঞাসা করে। প্রজাদিগকে দেখিয়া তাহার মনে মনে কেমন একপ্রকার অপূর্ব স্নেহের উদয় হইল। যাহাকে দেখিল সকলকেই তাহার ভালো লাগিল। মাঝে মাঝে দুই-একজন দরিদ্র দেখিতে পাইল; বিভা মনে মনে কহিল, "আহা, ইহার এমন দশা কেন? আমি অন্তঃপুরে গিয়া ইহাকে ডাকাইয়া পাঠাইব। যাহাতে ইহার দুঃখ মোচন হয়, তাহাই করিব।" সকলই তাহার আপনার বলিয়া মনে হইল। এ-রাজ্যে যে দুঃখ-দারিদ্র্য আছে, ইহা তাহার প্রাণে সহিল না। বিভার ইচ্ছা করিতে লাগিল, প্রজারা তাহার কাছে আসিয়া একবার তাহাকে মা বলিয়া ডাকে, তাহার কাছে নিজের নিজের দুঃখ নিবেদন করে ও সে সেই দুঃখ দূর করিয়া দেয়।

রাজধানীর নিকটবর্তী গ্রামে উদয়াদিত্য নৌকা লাগাইলেন। তিনি স্থির করিয়াছেন, রাজবাটীতে তাঁহাদের আগমন-বার্তা বলিয়া পাঠাইবেন ও তাহারা অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদের লইয়া যাইবে। যখন নৌকা লাগাইলেন, তখন বিকাল হইয়া গিয়াছে। উদয়াদিত্য মনে করিলেন, কাল প্রাতে লোক পাঠানো যাইবে। বিভার মনের ইচ্ছা আজই সংবাদ দেওয়া হয়।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আজ লোকজনেরা ভারি ব্যস্ত। চারিদিকে বাজনা বাজিতেছে। গ্রামে যেন একটি উৎসব পড়িয়াছে। একে বিভার প্রাণে অধীর আনন্দ জাগিতেছে, তাহার 'পরে চারিদিকে বাজনার শব্দ শুনিয়া তাহার হৃদয় যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। পাছে উদয়াদিত্যের কাছে তাহার এই অত্যধিক আনন্দ প্রকাশ হইয়া পড়ে, এইজন্য কত কষ্টে সে হাসি নিবারণ করিয়া রাখিয়াছে। উদয়াদিত্য নদীতীরে উৎসবের ভাব দেখিয়া কী হইতেছে জানিবার জন্য গ্রামে বেড়াইতে গেলেন।

এমন কিছুক্ষণ গেল। একজন তীর হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "কাহাদের নৌকা গা?" নৌকা হইতে রাজবাটীর ভৃত্যেরা বলিয়া উঠিল, "কে ও? রামমোহন যে? আরে, এস এস।" রামমোহন তাড়াতাড়ি নৌকায় প্রবেশ করিল। নৌকায় একলা বিভা বসিয়া আছে, রামমোহনকে দেখিয়া হর্ষে উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল, "মোহন।"

রামমোহন। মা।

রামমোহন বিভার সেই সরল আনন্দে পরিপূর্ণ হাসিহাসি মুখখানি অনেকক্ষণ দেখিয়া ম্লানমুখে কহিল, "মা তুমি আসিলে?"

বিভা তাড়াতাড়ি কহিল, "হাঁ, মোহন। মহারাজ কি ইহারই মধ্যে সংবাদ পাইয়াছেন? তুই কি আমাকে লইতে আসিয়াছিস?"

রামমোহন কহিল, "না মা, অত ব্যস্ত হইয়ো না। আজ থাক্, আর-একদিন লইয়া যাইব।"

রামমোহনের ভাব দেখিয়া বিভা একেবারে মলিন হইয়া গিয়া কহিল, "কেন মোহন, আজ কেন যাইব না।"

রামমোহন কহিল, "আজ সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে— আজ থাক্ মা।"

বিভা নিতান্ত ভীত হইয়া কহিল, "সত্য করিয়া বল্ মোহন, কী হইয়াছে?"

রামমোহন আর থাকিতে পারিল না। আত্মগোপন করা তাহার অভ্যাস নাই। সেইখানেই সে বসিয়া পড়িল, কাঁদিয়া কহিল, "মা জননী, আজ তোমার রাজ্যে তোমার স্থান নাই, তোমার রাজবাটীতে তোমার গৃহ নাই। আজ মহারাজ বিবাহ করিতেছেন।"

বিভার মুখ একেবারে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। তাহার হাত-পা হিম হইয়া গেল।

রামমোহন কহিতে লাগিল, "মা, যখন তোর এই অধম সন্তান তোকে ডাকিতে গিয়াছিল, তখন তুই কেন আসিলি না মা? তখন তুই নিষ্ঠুর পাষাণী হইয়া আমাকে কেন ফিরাইয়া দিলি মা? মহারাজের কাছে আমার যে আর মুখ রহিল না। বুক ফাটিয়া গেল, তবু যে তোর হইয়া একটি কথাও কহিতে পারিলাম না!"

বিভা আর চোখে কিছু দেখিতে পাইল না, মাথা ঘুরিয়া সেইখানে পড়িয়া গেল। রামমোহন তাড়াতাড়ি জল আনিয়া বিভার মুখে-চোখে ছিটা দিল। কিছুক্ষণ পরে বিভা উঠিয়া বসিল। এক আঘাতে বিভার সমস্ত জগৎ ভাঙিয়া গেছে। স্বামীর রাজ্যের মধ্যে আসিয়া, রাজধানীর কাছে পৌঁছিয়া, রাজপুরীর দুয়ারে আসিয়া তৃষার্ত-হৃদয় বিভার সমস্ত সুখের আশা মরীচিকার মতো মিলাইলা গেল।

বিভা আকুলভাবে কহিল, "মোহন, তিনি যে আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন— আমার আসিতে কি বড়ো বিলম্ব হইয়াছে?"

মোহন কহিল, "বিলম্ব হইয়াছে বই কি।"

বিভা অধীর হইয়া কহিল, "আর কি মার্জনা করিবেন না?"

মোহন করিল, "মার্জনা আর করিলেন কই।"

বিভা কহিল, "মোহন, আমি কেবল একবার তাঁহাকে দেখিতে যাইব।" বলিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে কাঁদিয়া উঠিল।

রামমোহন চোখ মুছিয়া কহিল, "আজ থাক্ না, মা।"

বিভা কহিল, "না মোহন, আমি আজই একবার তাঁহাকে দেখিয়া আসিব।"

রামমোহন কহিল, "যুবরাজ আগে গ্রাম হইতে ফিরিয়া আসুন।"

বিভা কহিল, "না মোহন, আমি এখনই একবার যাই।"

বিভা মনে করিয়াছিল, উদয়াদিত্য এ সংবাদ শুনিলে অপমানের ভয়ে পাছে না যাইতে দেন।

রামমোহন কহিল, "তবে একখানি শিবিকা আনাই।"

বিভা কহিল, "শিবিকা কেন? আমি কি রানী যে শিবিকা চাই। আমি একজন সামান্য প্রজার মতো, একজন ভিখারিনীর মতো যাইব, আমার শিবিকায় কাজ কী?"

রামমোহন কহিল, "আমার প্রাণ থাকিতে আমি তাহা দেখিতে পারিব না।"

বিভা কাতর স্বরে কহিল, "মোহন, তোর পায়ে পড়ি, আমাকে আর বাধা দিস্ নে, বিলম্ব হইয়া যাইতেছে।"

রামমোহন ব্যথিতহৃদয়ে কহিল, "আচ্ছা মা, তাহাই হউক।"

বিভা সামান্য রমণীর বেশে নৌকা হইতে বাহির হইল। নৌকার ভৃত্যেরা আসিয়া কহিল, "এ কী মা, এমন করিয়া এ বেশে কোথায় যাও!"

রামমোহন কহিল, "এ তো মায়েরই রাজ্য, যেখানে ইচ্ছা সেইখানেই যাইতে পারেন।"

ভৃত্যেরা আপত্তি করিতে লাগিল, রামমোহন তাহাদের ভাগাইয়া দিল।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

চারিদিকে লোকজন, চারিদিকেই ভিড়। আগে হইলে বিভা সংকোচে মরিয়া যাইত, আজ কিছুই যেন তাহার চোখে পড়িতেছে না। যাহা কিছু দেখিতেছে সমস্ত যেন বিভার মিথ্যা বলিয়া মনে হইতেছে। চারিদিকে যেন একটা কোলাহলময় স্বপ্নের ঘেঁষাঘেঁষি—কিছুই যেন কিছু নয়। চারিদিকে একটা ভিড় চোখে পড়িতেছে এই পর্যন্ত, চারিদিক হইতে একটা কোলাহল শোনা যাইতেছে এই পর্যন্ত, তাহার যেন একটা কোনো অর্থ নাই।

ভিড়ের মধ্য দিয়া রাজপুরীর দ্বারের নিকট আসিতেই একজন দ্বারী সহসা বিভার হাত ধরিয়া বিভাকে নিবারণ করিল, তখন সহসা বিভা একমুহূর্তে বাহ্য জগতের মধ্যে আসিয়া পড়িল, চারিদিক দেখিতে পাইল, লজ্জায় মরিয়া গেল। তাহার ঘোমটা খুলিয়া গিয়াছিল, তাড়াতাড়ি মাথার ঘোমটা তুলিয়া দিল। রামমোহন আগে আগে যাইতেছিল, সে পশ্চাৎ ফিরিয়া দ্বারীর প্রতি চোখ পাকাইয়া দাঁড়াইল। অদূরে ফর্নাণ্ডিজ ছিল, সে আসিয়া দ্বারীকে ধরিয়া বিলক্ষণ শাসন করিল। বিভা প্রাসাদে প্রবেশ করিল। অন্যান্য দাসদাসীর ন্যায় বিভা প্রাসাদে প্রবেশ করিল, কেহ তাহাকে সমাদর করিল না।

ঘরে কেবল রাজা ও রমাই ভাঁড় বসিয়াছিলেন। বিভা গৃহে প্রবেশ করিয়া রাজার মুখের দিকে চাহিয়াই রাজার পায়ের কাছে ভূমিতে পড়িয়া গেল। রাজা শশব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুই? ভিখারিনী? ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছিস?"

বিভা নত মুখ তুলিয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে রাজার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "না মহারাজ, আমার সর্বস্ব দান করিতে আসিয়াছি। আমি তোমাকে পরের হাতে সমর্পণ করিয়া বিদায় লইতে আসিয়াছি।"

রামমোহন থাকিতে পারিল না, কাছে আসিয়া কহিল, "মহারাজ, আপনার মহিষী— যশোহরের রাজকুমারী।"

সহসা রামচন্দ্র রায়ের প্রাণ যেন কেমন চমকিয়া উঠিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ রমাই ভাঁড় হাসিয়া রাজার দিকে কটাক্ষ করিয়া কঠোর কণ্ঠে কহিল, "কেন, এখন কি আর দাদাকে মনে ধরে না নাকি?"

রামচন্দ্র রায়ের হৃদয়ে করুণার আভাস জাগিয়া উঠিয়াছিল, তথাপি রমাইয়ের কথায় তিনি নিষ্ঠুর হাস্য করিয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন, বিভাকে এখন মমতা দেখাইলে পাছে উপহাসাস্পদ হইতে হয়।

বিভার মাথায় একেবারে সহস্র বজ্রাঘাত হইল, সে লজ্জায় একেবারে মরিয়া গেল। চোখ বুজিয়া মনে মনে কহিল, মা গো, বসুন্ধরা, তুমি দ্বিধা হও। কাতর হইয়া চারিদিকে চাহিল, রামমোহনের মুখের দিকে একবার অসহায় দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল।

রামমোহন ছুটিয়া আসিয়া সবলে রমাই ভাঁড়ের ঘাড় টিপিয়া ধরিয়া তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিল।

রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "রামমোহন, তুই আমার সম্মুখে বেয়াদবি করিস!"

রামমোহন কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, "মহারাজ, আমি বেয়াদবি করিলাম! তোমার মহিষীকে— আমার মা-ঠাকরুনকে বেটা অপমান করিল— উহার হইয়াছে কী, আমি উহার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া শহর হইতে বাহির করিয়া দিব, তবে আমার নাম রামমোহন।"

রাজা রামমোহনকে ধমক দিয়া কহিলেন, "কে আমার মহিষী? আমি উহাকে চিনি না।"

বিভার মুখ নীল হইয়া গেল, সে মুখে আঁচল চাপিয়া ধরিল, থর থর করিয়া তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, অবশেষে কাঁপিতে কাঁপিতে বিভা মূর্ছিতা হইয়া ভূমিতে পড়িল। তখন রামমোহন জোড়হস্তে রাজাকে কহিল, "মহারাজ, আজ চারপুরুষে তোমার বংশে আমরা চাকরি করিয়া আসিতেছি। বাল্যকাল হইতে তোমাকে পালন করিয়াছি। আজ তুমি আমার মা-ঠাকরুনকে অপমান করিলে, তোমার রাজ্যলক্ষ্মীকে দূর করিয়া দিলে, আজ আমিও তোমার চাকরি ছাড়িয়া দিয়া চলিলাম। আমার মা-ঠাকরুনের সেবা করিয়া জীবন কাটাইব। ভিক্ষা করিয়া খাইব, তবুও এ রাজবাটীর ছায়া মাড়াইব না।" বলিয়া রামমোহন রাজাকে প্রণাম করিল ও বিভাকে কহিল, "আয় মা, আয়। এখান হইতে শীঘ্র চলিয়া আয়। আর একমুহূর্তও

এখানে থাকা নয়।" বলিয়া বিভাকে ধরিয়া তুলিয়া আনিল। দ্বারের নিকট অনেকগুলি শিবিকা ছিল, তাহার মধ্যে একটিতে হতজ্ঞান অবসন্ন বিভাকে তুলিয়া নৌকায় ফিরিয়া আসিল।

বিভা উদয়াদিত্যের সহিত কাশী চলিয়া গেল। সেইখানে দানধ্যান, দেবসেবা ও তাহার ভ্রাতার সেবায় জীবন কাটাইতে লাগিল। রামমোহন যতদিন বাঁচিয়া ছিল, তাহাদের সঙ্গে ছিল। সীতারামও সপরিবারে কাশীতে আসিয়া উদয়াদিত্যের আশ্রয় লইল।

চন্দ্রদ্বীপের যে হাটের সম্মুখে বিভার নৌকা লাগিয়াছিল, অদ্যাপি তাহার নাম রহিয়াছে—

"বউ-ঠাকুরানীর হাট।"

প্রবন্ধ

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র

য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত বন্ধুবরেষু

আমার বয়স ছিল সতেরো। পড়াশুনোয় ফাঁকি দিয়ে গুরুজনের উদ্বেগভাজন হয়েছি। মেজদাদা তখন আমেদাবাদে জজিয়তি করছেন। ভদ্রঘরের ছেলের মানরক্ষার উপযুক্ত ইংরেজি যে-করে-হোক জানা চাই; সেজন্যে আমার বিলেত-নির্বাসন ধার্য হয়েছে। মেজদাদার ওখানে কিছু দিন থেকে পত্তন করতে হবে তার প্রথম ভিত, হিতৈষীরা এই স্থির করেছেন। সিভিল সার্ভিসের রঙ্গভূমিতে আমার বিলিতি কায়দার নেপথ্যবিধান হল।

বালক-বয়সে আত্মপ্রকাশটা থাকে চাপা। জীবনে তখন উপর-ওআলাদেরই আধিপত্য; চলৎশক্তির স্বাতন্ত্র্যটা দখল করে আদেশ উপদেশ অনুশাসন। স্বভাবত মেনে-চলবার মন আমার নয়, কিন্তু আমি ছিলুম ভোলা মনের মানুষ, আপন খেয়াল নিয়ে থাকতুম, আমাকে দেখতে হত নেহাত ভালোমানুষের মতো। ভাবীকালে বিস্তর কথাই কইতে হয়েছে, তার অঙ্কুরোদ্গম ছিল নিঃশব্দে। একদিন যখন বারান্দার রেলিং ধরে একলা চুপ করে বসে ছিলুম, পাশ দিয়ে যেতে যেতে বড়দাদা আমার মাথা নাড়া দিয়ে বললেন, রবি হবে ফিলজফর। চুপ করে থাকার খেতে ফিলজফি ছাড়াও অন্য ফসল ফলে।

খেতে প্রথম দেখা দিল কাঁটাগাছ, চাষ-না-করা জমিতে। বিশ্বকে খোঁচা মেরে আপন অস্তিত্ব প্রমাণ করবার সেই ঔদ্ধত্য। হরিণ-বালকের প্রথম শিং উঠলে তার যে চাল হয় সেই উগ্র চাল প্রথম কৈশোরের। বালক আপন বাল্যসীমা পেরোবার সময় সীমা লঙ্ঘন করতে চায় লাফ দিয়ে। তার পরিচয় শুরু হয়েছিল মেঘনাদবধকাব্যের সমালোচনা যখন লিখেছিলেম পনেরো বছর বয়সে। এই সময়েই যাত্রা করেছি বিলেতে। চিঠি যেগুলো লিখেছিলুম তাতে খাঁটি সত্য বলার চেয়ে খাঁটি স্পর্ধা প্রকাশ পেয়েছে প্রবল বেগে। বাঙালির ছেলে প্রথম বিলেতে গেলে তার ভালো লাগবার অনেক কারণ ঘটে। সেটা স্বাভাবিক, সেটা ভালোই। কিন্তু কোমর বেঁধে বাহাদুরি করবার প্রবৃত্তিতে পেয়ে বসলে উল্‌টো মূর্তি ধরতে হয়। বলতে হয়, আমি অন্য পাঁচজনের মতো নই, আমার ভালো লাগবার যোগ্য কোথাও কিছুই নেই। সেটা যে

চিত্তদৈন্যের লজ্জাকর লক্ষণ এবং অর্বাচীন মূঢ়তার শোচনীয় প্রমাণ, সেটা বোঝবার বয়স তখনো হয় নি।

সাহিত্যে সাবালক হওয়ার পর থেকেই ওই বইটার 'পরে আমার ধিক্কার জন্মেছিল। বুঝেছি, যে-দেশে গিয়েছিলুম সেখানকারই যে সম্মানহানি করা হয়েছে তা নয়, ওটাতে নিজেরই সম্মানহানি। বিস্তর লোকের বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও বইটা প্রকাশ করি নি। কিন্তু আমি প্রকাশে বাধা দিলেই ওটা যে অপ্রকাশিত থাকবে এই কৌতূহলমুখর যুগে তা আশা করা যায় না। সেইজন্যে এ লেখার কোন্ কোন্ অংশকে লেখক স্বয়ং গ্রাহ্য ও ত্যাজ্য বলে স্বীকার করেছে সেটা জানিয়ে রেখে দিলুম। যথাসময়ে ময়লার ঝুলি হাতে আবর্জনা কুড়োবার লোক আসবে, বাজারে সেগুলো বিক্রি হবার আশঙ্কাও যথেষ্ট আছে। অনেক অপরাধের অনেক প্রায়শ্চিত্ত বাকি থাকে ইহলোকে, প্রেতলোকে সেগুলো সম্পূর্ণ হতে থাকে।

এই বইটাকে সাহিত্যের পংক্তিতে আমি বসাতে চাই, ইতিহাসের পংক্তিতে নয়। পাঠ্য জিনিসেরই মূল্য সাহিত্যে, অপাঠ্য জিনিসেরও মূল্য ইতিহাসে। ঐতিহাসিককে যদি সম্পূর্ণ বঞ্চিত করতে পারতুম তবে আমার পক্ষে সেটা পুণ্যকর্ম, সুতরাং মুক্তির পথ হত। নিজের কাব্য সম্বন্ধে এই ত্যাগের সাধনায় প্রবৃত্ত হতে বার বার সংকল্প করেছি। কিন্তু দুর্বল মন, সংঘবদ্ধ আপত্তির বিরুদ্ধে ব্রতপালন করতে পারি নি। বাছাই করবার ভার দিতে হল পরশুপাণি মহাকালের হাতে। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের যুগে মহাকালেরও কর্তব্যে ত্রুটি ঘটছে। বইগুলির বৈষয়িক স্বত্ব হারিয়েছি বলে আরো দুর্বল হতে হল আমাকে।

য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রশ্রেণী আগাগোড়া অরক্ষণীয়া নয়। এর সপক্ষে একটা কথা আছে সে হচ্ছে এর ভাষা। নিশ্চিত বলতে পারি নে কিন্তু আমার বিশ্বাস, বাংলা সাহিত্যে চলতি ভাষায় লেখা বই এই প্রথম। আজ এর বয়স হল প্রায় ষাট। সে-ক্ষেত্রেও আমি ইতিহাসের দোহাই দিয়ে কৈফিয়ত দাখিল করব না। আমার বিশ্বাস বাংলা চলতি ভাষার সহজ প্রকাশপটুতার প্রমাণ এই চিঠিগুলির মধ্যে আছে।

তার পরে লেখার জঙ্গলগুলো সাফ করবামাত্র দেখা গেল, এর মধ্যে

শ্রদ্ধা বস্তুটাই ছিল গোপনে, অশ্রদ্ধাটা উঠেছিল বাহিরে আগাছার মতো নিবিড় হয়ে। আসল জিনিসটাকে তারা আচ্ছন্ন করেছিল, কিন্তু নষ্ট করে নি। এইটে আবিষ্কার করে আমার মন অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছে। কেন না, নিন্দানৈপুণ্যের প্রাখর্য ও চাতুর্যকে আমি সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি। ভালো লাগবার শক্তিই বিধাতার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার মানবজীবনে। সাহিত্যে কুৎসাবিলাসীদের ভোজের দাদন আমি নিই নি, আর কিছু না হোক, এই পরিচয়টুকু আমি রেখে যেতে চাই।

একটা কথা আপনাকে বলা বাহুল্য। ইংরেজের চেহারা সেদিন আমার চোখে যেমনটা ধরা পড়েছিল সেটা যে নেহাত আমার বাল্যবুদ্ধি ও অনভিজ্ঞতার সৃষ্টি সে-কথা বললে সম্পূর্ণ সত্য কথা বলা হবে না। এই প্রায় ষাট বছরের মধ্যে সেখানকার মানুষের যে পরিবর্তন হয়েছে তাকে ক্রমশ অভিব্যক্তির আখ্যা দেওয়া যায় না। এক-এক সময়ে ইতিহাস-শতরঞ্চের বোড়ে তার এক পা চাল ছেড়ে দিয়ে লম্বা চালে চলতে শুরু করে। পাশ্চাত্যে তাই ঘটেছে। সেদিনকার পাসপোর্টে তার যে ছবিটা ছিল সে ছবি আজ একেবারেই চলবে না।

সেই প্রথম-বয়সে যখন ইংলণ্ডে গিয়েছিলুম ঠিক মুসাফেরের মতো যাই নি। অর্থাৎ রাস্তা থেকে চলতে চলতে বাহির থেকে চোখ বুলিয়ে যাওয়া বরাদ্দ ছিল না। ছিলেম অতিথির মতো, ঘরের মধ্যে প্রবেশ পেয়েছিলুম। সেবা পেয়েছি, স্নেহ পেয়েছি, কোথাও কোথাও ঠকেছি, দুঃখ পেয়েছি। কিন্তু তার পরে আবার যখন সেখানে গিয়েছি, তখন সভায় থেকেছি, ঘরে নয়। আমার তৎপূর্বকালে অভিজ্ঞতা সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ যদি না হয় তবু সত্য। যে ডাক্তারের বাড়িতে ছিলুম তিনি ভদ্রশ্রেণীর এবং শ্রদ্ধেয়, কিন্তু সমুদয় ভদ্রশ্রেণীর প্রতীক তিনি না হতে পারেন। ইংলণ্ডে আজও বর্ণসাম্য যতই থাক্ শ্রেণীভেদ যথেষ্ট। সেখানে এক শ্রেণীর সঙ্গে আর-এক শ্রেণীর মনোবৃত্তি ও ব্যবহারের মিল না থাকাই স্বাভাবিক। সেদিনও নিঃসন্দেহ ছিল না। আমি সেদিনকার সাধারণ গৃহস্থ-ঘরের এবং একটি বিলাসিনী-ঘরের পরিচয় কাছে থেকেই পেয়েছি। তার কিছু কিছু বর্ণনা চিঠিগুলির মধ্যে আছে।

কয়েকটি চিঠিতে তখনকার দিনের ইঙ্গবঙ্গের বিবরণ কিছু বিস্তারিত

করেই দিয়েছি। আজ এরা লুপ্ত জীব। কোথাও কোথাও তার বর্তমান অভিব্যক্তির কিছু কিছু চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়, এমন কি যাঁরা বিলেতে যান নি তাঁদেরও কারো কারো চালচলনে ইঙ্গবঙ্গী লক্ষণ অকস্মাৎ ফুটে ওঠে। সেকালের ইঙ্গবঙ্গদের অনেককে আমি প্রত্যক্ষ জানতুম। তাঁদের অনেকখানি পরিচয় পেয়েছি তাঁদের নিজেরই মুখ থেকে। যদি এর মধ্যে কোনো অত্যুক্তি থাকে সে তাঁদেরই স্বকৃত। আমার সামনে বর্ণনায় নিজেদেরও বে-আবরু করতে ভয় পান নি, যেহেতু মুখচোরা ভালোমানুষ বালকটিকে তাঁরা বিপদ্‌জনক বলে সন্দেহ করেন নি। আজ তাঁদের কাছে ক্ষমা চাইতে গেলে আরো কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে। তাঁরা আছেন বৈতরণীর পরপারে।

আমার বিলাতের চিঠিতে 'এবার মলে সাহেব হব' গানটি উদ্ধৃত করেছিলেম। আমার স্নেহভাজন বন্ধু শ্রীযুক্ত চারু বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গ-সাহিত্যে হাস্যরসের দৃষ্টান্তস্বরূপ ওই গানটি আমার রচনা বলে প্রচার করেছেন। তাতে অনামা রচয়িতার মান বেঁচে গেছে, কিন্তু আমার বাঁচে নি। আমার বিশ্বাস যথোচিত গবেষণা করলে আমার লেখা থেকে ওর চেয়ে ভালো দৃষ্টান্ত পাওয়া যেতেও পারে।

এই পত্রগুলি যখন লেখা হয়েছিল তার বারো বছর পরে আর এক বার বিলেতে গিয়েছিলেম। তখনো দেশের বদল খুব বেশি হয় নি। সেদিন যে ডায়ারি লিখেছি তাতে আছে আঁচড়কাটা ছবি— একাগাড়িতে চলতে চলতে আশেপাশে এক-নজরে দেখার দৃশ্য।

বইগুলির পুনঃসংস্করণের মুখবন্ধে এই চিঠিখানি আপনাকে সম্বোধন করে লিখছি। তার কারণ, বিলেত সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতা অনেক প্রশস্ত ও গভীর— সেই ভূমিকার উপর রেখে এই চিঠিগুলি ও ডায়ারির যথাযোগ্য স্থান নির্ণয় করতে পারবেন এবং ভুলত্রুটি ও অতিভাষণের অপরিহার্যতা অনুমান করে ক্ষমা করাও আপনার পক্ষে কঠিন হবে না।
ইতি ২৯ আগস্ট, ১৯৩৬।

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উপহার

ভাই জ্যোতিদাদা,

ইংলণ্ডে যাঁহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক মনে পড়িত
তাঁহারই হস্তে এই পুস্তকটি
সমর্পণ করিলাম।

স্নেহভাজন
রবি

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র

প্রথম পত্র

বিশে সেপ্টেম্বরে আমরা 'পুনা' স্টীমারে উঠলেম। পাঁচটার সময় জাহাজ ছেড়ে দিলে। আমরা তখন জাহাজের ছাতে দাঁড়িয়ে। আস্তে আস্তে আমাদের চোখের সামনে ভারতবর্ষের শেষ তটরেখা মিলিয়ে গেল। চারদিকের লোকের কোলাহল সইতে না পেরে আমি আমার নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেম। গোপন করবার বিশেষ প্রয়োজন দেখছি নে, আমার মনটা বড়োই কেমন নির্জীব, অবসন্ন, ম্রিয়মান হয়ে পড়েছিল, কিন্তু দূর হোক গে— ও-সব করুণরসাত্মক কথা লেখবার অবসরও নেই ইচ্ছেও নেই; আর লিখলেও হয় তোমার চোখের জল থাকবে না, নয় তোমার ধৈর্য থাকবে না।

সমুদ্রের পায়ে দণ্ডবৎ। ২০শে থেকে ২৬শে পর্যন্ত যে করে কাটিয়েছি তা আমিই জানি। সমুদ্রপীড়া কাকে বলে অবিশ্যি জান কিন্তু কী রকম তা জান না। আমি সেই ব্যামোয় পড়েছিলেম, সে-কথা বিস্তারিত করে লিখলে পাষাণেরও চোখে জল আসবে। ছটা দিন, মশায়, শয্যা থেকে উঠি নি। যে ঘরে থাকতেম, সেটা অতি অন্ধকার, ছোটো, পাছে সমুদ্রের জল ভিতরে আসে তাই চারদিকের জানলা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ। অসূর্যম্পশ্যরূপ ও অবায়ুস্পর্শ্যদেহ হয়ে ছয়টা দিন কেবল বেঁচে ছিলেম মাত্র। প্রথম দিন সন্ধ্যেবেলায় আমাদের একজন সহযাত্রী আমাকে জোর করে বিছানা থেকে উঠিয়ে খাবার টেবিলে নিয়ে গেলেন। যখন উঠে দাঁড়ালেম তখন আমার মাথার ভিতর যা-কিছু আছে সবাই মিলে যেন মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ করে দিলে, চোখে দেখতে পাই নে, পা চলে না, সর্বাঙ্গ টলমল করে! দু-পা গিয়েই একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসে পড়লেম। আমার সহযাত্রীটি আমাকে ধরাধরি করে জাহাজের ডেক-এ নিয়ে গেলেন। একটা রেলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেম। তখন অন্ধকার রাত। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন। আমাদের প্রতিকূলে বাতাস বইছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে সেই নিরাশ্রয় অকূল সমুদ্রে দুই দিকে অগ্নি উৎক্ষিপ্ত করতে করতে আমাদের জাহাজ একলা চলেছে; যেখানে চাই সেইদিকেই অন্ধকার, সমুদ্র ফুলে ফুলে উঠছে— সে এক মহা গম্ভীর দৃশ্য।

সেখানে বেশিক্ষণ থাকতে পারলেম না। মাথা ঘুরতে লাগল। ধরাধরি করে আবার আমার ক্যাবিনে এলেম। সেই যে বিছানায় পড়লেম, ছ-দিন আর এক মুহূর্তের জন্যও মাথা তুলি নি। আমাদের যে স্টুঅর্ড ছিল (যাত্রীদের সেবক)— কারণ জানি নে— আমার উপর তার বিশেষ কৃপাদৃষ্টি ছিল। দিনের মধ্যে যখন-তখন সে আমার জন্যে খাবার নিয়ে উপস্থিত করত; না খেলে কোনোমতেই ছাড়ত না। সে বলত, না খেলে আমি ইঁদুরের মতো দুর্বল হয়ে পড়ব (weak as a rat)। সে বলত, সে আমার জন্যে সব কাজ করতে পারে। আমি তাকে যথেষ্ট সাধুবাদ দিতেম, এবং জাহাজ ছেড়ে আসবার সময় সাধুবাদের চেয়ে আরো কিঞ্চিৎ সারবান পদার্থ দিয়েছিলেম।

ছ-দিনের পর আমরা যখন এডেনের কাছাকাছি পৌঁছলেম, তখন সমুদ্র কিছু শান্ত হল। সেদিন আমার স্টুঅর্ড এসে নড়ে চড়ে বেড়াবার জন্যে আমাকে বার বার অনুরোধ করতে লাগল। আমি তার পরামর্শ শুনে বিছানা থেকে তো উঠলেম, উঠে দেখি যে সত্যিই ইঁদুরের মতো দুর্বল হয়ে পড়েছি। মাথা যেন ধার-করা, কাঁধের সঙ্গে তার ভালো রকম বনে না; চুরি-করা কাপড়ের মতো শরীরটা যেন আমার ঠিক গায়ে লাগছে না। ঘর থেকে বেরিয়ে ছাতের উপর গিয়ে একটা কেদারায় হেলান দিয়ে পড়লেম। অনেক দিনের পর বাতাস পেয়ে বাঁচলেম। দুপুরবেলা দেখি একটা ছোটো নৌকা সেই সমুদ্র দিয়ে চলেছে। চারদিকে অনেক দূর পর্যন্ত আর ডাঙা নেই, জাহাজসুদ্ধ লোক অবাক। তারা আমাদের স্টীমারকে ডাকতে আরম্ভ করলে, জাহাজ থামল। তারা একটি ছোটো নৌকায় করে কতকগুলি লোক জাহাজে পাঠিয়ে দিলে। এরা সকলে আরবদেশীয়, এডেন থেকে মস্কটে যাচ্ছে। পথের মধ্যে দিক্‌ভ্রম হয়ে গেছে, তাদের সঙ্গে যা জলের পিপে ছিল, তা ভেঙে গিয়ে জল সমস্ত নষ্ট হয়ে গেছে, অথচ যাত্রী অনেক। আমাদের জাহাজের লোকেরা তাদের জল দিলে। একটি ম্যাপ খুলে কোন্ দিকে ও কত দূরে মস্কট, তাদের দেখিয়ে দিলে, তারা আবার চলতে লাগল। সে নৌকো যে মস্কট পর্যন্ত পৌঁছবে তাতে সকলেই সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগল।

২৮শে সেপ্টেম্বর শনিবার সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখি, আমাদের সম্মুখে সব পাহাড়-পর্বত উঠেছে। অতি সুন্দর পরিষ্কার প্রভাত, সূর্য সবেমাত্র উঠেছে, সমুদ্র অতিশয় শান্ত। দূর থেকে সেই পর্বতময় ভূভাগের প্রভাতদৃশ্য এমন সুন্দর দেখাচ্ছে যে কী বলব। পর্বতের উপরে রঙিন মেঘগুলি এমন নত হয়ে পড়েছে যে, মনে হয় যেন অপরিমিত সূর্যকিরণ পান করে তাদের আর দাঁড়াবার শক্তি নেই, পর্বতের

উপরে যেন অবসন্ন হয়ে পড়েছে। আয়নার মতো পরিষ্কার শান্ত সমুদ্রের উপর ছোটো ছোটো পাল তোলা নৌকাগুলি আবার কেমন ছবির মতো দেখাচ্ছে।

এডেনে পৌঁছে বাড়িতে চিঠি লিখতে আরম্ভ করলেম কিন্তু লিখতে গিয়ে দেখি যে এই ক-দিন নাড়াচাড়া খেয়ে মাথার ভিতরে যেন সব উল্‌টোপাল্‌টা হয়ে গেছে, বুদ্ধির রাজ্যে একটা অরাজকতা ঘটেছে। কী করে লিখব, ভালো মনে আসছে না। ভাবগুলো যেন মাকড়সার জালের মতো, ছুঁতে গেলেই অমনি ছিঁড়েখুঁড়ে যাচ্ছে। কিসের পর কী লিখব, তার একটা ভালোরকম বন্দোবস্ত করতে পারছি নে। এই অবস্থায় লিখতে আরম্ভ করলেম, এমন বিপদে পড়ে তোমাকে যে লিখতে পারি নি তাতে তোমার ক্ষোভের কারণ কিছুই নেই।

দেখো, সমুদ্রের উপর আমার কতকটা অশ্রদ্ধা হয়েছে। কল্পনায় সমুদ্রকে যা মনে করতেম, সমুদ্রে এসে দেখি তার সঙ্গে অনেক বিষয় মেলে না। তীর থেকে সমুদ্রকে খুব মহান বলে মনে হয়, কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে এলে আর ততটা হয় না। তার কারণ আছে ; আমি যখন বম্বের উপকূলে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখতেম, তখন দেখতেম দূরদিগন্তে গিয়ে নীল জল নীল আকাশে মিশিয়ে গিয়েছে, কল্পনায় মনে করতেম যে, এক বার যদি ওই দিগন্তের আবরণ ভেদ করতে পারি, ওই দিগন্তের যবনিকা ওঠাতে পারি, অমনি আমার সুমুখে এক অকূল অনন্ত সমুদ্র একেবারে উথলে উঠবে। ওই দিগন্তের পরে যে কী আছে তা আমার কল্পনাতেই থাকত ; তখন মনে হত না, ওই দিগন্তের পরে আর-এক দিগন্ত আসবে। কিন্তু যখন সমুদ্রের মধ্যে এসে পড়ি, তখন মনে হয় যে, জাহাজ যেন চলছে না, কেবল একটি দিগন্তের গণ্ডির মধ্যে বাঁধা আছে। আমাদের কল্পনার পক্ষে সে দিগন্তের সীমা এত সংকীর্ণ যে কেমন তৃপ্তি হয় না। কিন্তু দেখো, এ-কথা বড়ো গোপনে রাখা উচিত ; বাল্মীকি থেকে বায়রন পর্যন্ত সকলেরই যদি এই সমুদ্র দেখে ভাব লেগে থাকে, তবে আমার না লাগলে দশজনে যে হেসে উঠবে ; গ্যালিলিওর সময়ে এ-কথা বললে হয়তো আমাকে কয়েদ যেতে হত! এত কবি সমুদ্রের স্তুতিবাদ করেছেন যে আজ আমার এই নিন্দায় তাঁর বোধ হয় বড়ো একটা গায়ে লাগবে না। যখন তরঙ্গ ওঠে, তখন বোধ করি সমুদ্র বেশ দেখায়, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে সমুদ্রের তরঙ্গ উঠলেই আমার এমন মাথা ঘুরতে থাকে যে আমার দেখাশুনো সব ঘুরে যায়।

আমি যখন ঘর থেকে বেরোতে আরম্ভ করলেম, তখন জাহাজের যাত্রীদের উপর আমার নজর পড়ল ও আমার উপর জাহাজের যাত্রীদের নজর পড়ল। আমি স্বভাবতই 'লেডি' জাতিকে বড়ো ডরাই। তাঁদের কাছে ঘেঁষতে গেলে এত প্রকার

বিপদের সম্ভাবনা যে, চাণক্য পণ্ডিত থাকলে লেডিদের কাছ থেকে দশ সহস্র হস্ত দূরে থাকতে পরামর্শ দিতেন। এক তো মনোরাজ্যে নানাপ্রকার শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা— তা ছাড়া সর্বদাই ভয় হয় পাছে কী কথা বলতে কী কথা বলে ফেলি, আর আমাদের অসহিষ্ণু লেডি তাঁদের আদবকায়দার তিলমাত্র ব্যতিক্রম সইতে না পেরে দারুণ ঘৃণায় ও লজ্জায় একেবারে অভিভূত হন। পাছে তাঁদের গাউনের অরণ্যের মধ্যে ভেবাচেকা খেয়ে যাই, পাছে আহারের সময় তাঁদের মাংস কেটে দিতে হয়, পাছে মুরগির মাংস কাটতে গিয়ে নিজের আঙুল কেটে বসি— এইরকম সাত-পাঁচ ভেবে আমি জাহাজের লেডিদের কাছ থেকে অতি দূরে থাকতেম। আমাদের জাহাজে লেডির অভাব ছিল না, কিন্তু জেণ্টলম্যানেরা সর্বদা খুঁত খুঁত করতেন যে, তার মধ্যে অল্পবয়স্কা বা সুশ্রী এক জনও ছিল না।

পুরুষ যাত্রীদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হল। ব— মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তাঁর কথা অনর্গল, হাসি অজস্র, আহার অপরিমিত। সকলের সঙ্গেই তাঁর আলাপ, সকলের সঙ্গেই তিনি হাসিতামাশা করে বেড়ান। তাঁর একটা গুণ আছে, তিনি কখনো বিবেচনা করে, মেজে ঘষে কথা কন না; ঠাট্টা করেন, সকল সময়ে তার মানে না থাকুক, তিনি নিজে হেসে আকুল হন। তিনি তাঁর বয়সের ও পদমানের গাম্ভীর্য বুঝে হিসাব করে কথা কন না, মেপে জুকে হাসেন না ও দু-দিক বজায় রেখে মত প্রকাশ করেন না, এই সকল কারণে তাঁকে আমার ভালো লাগত। কত প্রকার যে ছেলেমানুষি করেন তার ঠিক নেই। বৃদ্ধত্বের বুদ্ধি ও বালকত্বের সাদাসিদা নিশ্চিন্ত ভাব একত্রে দেখলে আমার বড়ো ভালো লাগে। আমাকে তিনি 'অবতার' বলতেন, গ্রেগরি সাহেবকে 'গড়গড়ি' বলতেন, আর-এক যাত্রীকে 'রুহি মৎস্য' বলে ডাকতেন; সে-বেচারির অপরাধ কী তা জান? সাধারণ মানুষদের চেয়ে তার ঘাড়ের দিকটা কিছু খাটো ছিল, তার মাথা ও শরীরের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র যোজক পদার্থ ছিল না বললেও হয়। এই জন্যে ব— মহাশয় তাকে মৎস্যশ্রেণীভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু আমি যে কেন অবতারশ্রেণীর মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেম, তার কারণ সহজে নির্দেশ করা যায় না।

আমাদের জাহাজের T— মহাশয় কিছু নূতন রকমের লোক। তিনি ঘোরতর ফিলজফর মানুষ। তাঁকে কখনো চলিত ভাষায় কথা কইতে শুনি নি। তিনি কথা কইতেন না, বক্তৃতা দিতেন। একদিন আমরা দু-চার জনে মিলে জাহাজের ছাতে দু-দণ্ড আমোদপ্রমোদ করছিলেম, এমন সময়ে দুর্ভাগ্যক্রমে ব— মহাশয় তাঁকে বললেন, 'কেমন সুন্দর তারা উঠেছে'। এই আমাদের ফিলজফর তারার সঙ্গে মনুষ্য-

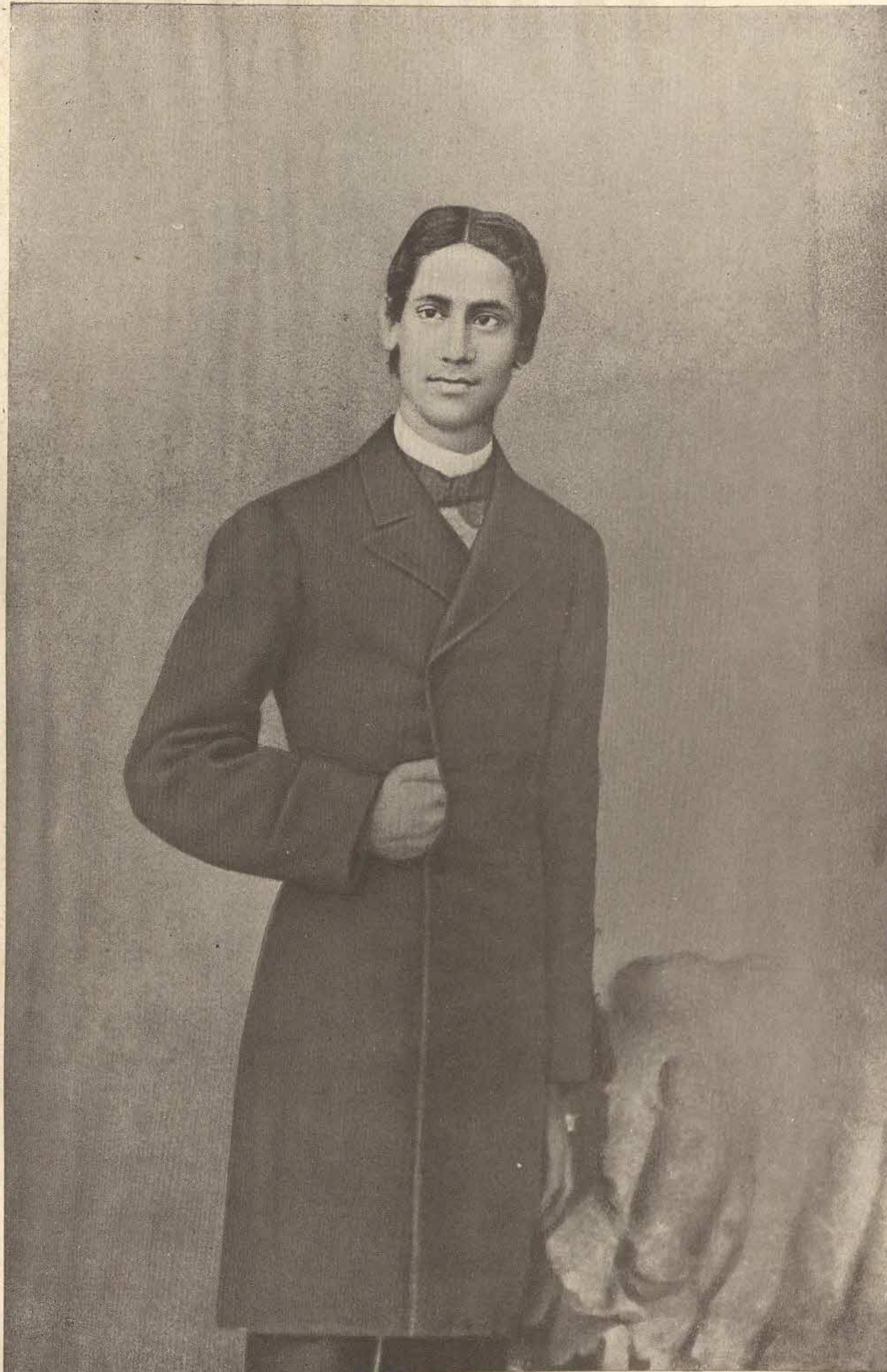
জীবনের সঙ্গে একটা গভীর সম্বন্ধ বাধিয়ে দিয়ে বক্তৃতা শুরু করলেন— আমরা "মূর্খেতে চাহিয়া থাকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া" রইলেম।

আমাদের জাহাজে একটি আস্ত জনবুল ছিলেন। তাঁর তালবৃক্ষের মতো শরীর, ঝাঁটার মতো গোঁফ, শজারুর কাঁটার মতো চুল, হাঁড়ির মতো মুখ, মাছের চোখের মতো ম্যাড়মেড়ে চোখ, তাঁকে দেখলেই আমার গা কেমন করত, আমি পাঁচ হাত তফাতে সরে যেতেম। এক-এক জন কোনো অপরাধ না করলেও তার মুখশ্রী যেন সর্বদা অপরাধ করতে থাকে। প্রত্যহ সকালে উঠেই শুনতে পেতেম তিনি ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, হিন্দুস্থানি প্রভৃতি যত ভাষা জানেন সমস্ত ভাষায় জাহাজের সমস্ত চাকরবাকরদের অজস্র গাল দিতে আরম্ভ করেছেন, ও দশ দিকে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছেন। তাঁকে কখনো হাসতে দেখি নি; কারো সঙ্গে কথা নেই বার্তা নেই, আপনার ক্যাবিনে গোঁ হয়ে বসে আছেন। কোনো কোনো দিন ডেক-এ বেড়াতে আসতেন, বেড়াতে বেড়াতে যার দিকে একবার কৃপাকটাক্ষে নেত্রপাত করতেন, তাকে যেন পিঁপড়াটির মতো মনে করতেন।

প্রত্যহ খাবার সময় ঠিক আমার পাশেই B— বসতেন। তিনি একটি ইয়ুরাশীয়। কিন্তু তিনি ইংরেজের মতো শিস দিতে, পকেটে হাত দিয়ে পা ফাঁক করে দাঁড়াতে সম্পূর্ণরূপে শিখেছেন। তিনি আমাকে বড়োই অনুগ্রহের চোখে দেখতেন। একদিন এসে মহাগম্ভীর স্বরে বললেন, "ইয়ং ম্যান্‌, তুমি অক্সফোর্ড যাচ্ছ? অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি বড়ো ভালো বিদ্যালয়।" আমি একদিন ট্রেঞ্চ সাহেবের "Proverbs and their lessons" বইখানি পড়ছিলেম, তিনি এসে বইটি নিয়ে শিস দিতে দিতে দু-চার পাত উলটিয়ে পালটিয়ে বললেন, "হাঁ, ভালো বই বটে।"

এডেন থেকে সুয়েজ যেতে দিন পাঁচেক লেগেছিল। যারা ব্রিন্দিসি-পথ দিয়ে ইংলণ্ডে যায় তাদের জাহাজ থেকে নেবে সুয়েজে রেলওয়ের গাড়িতে উঠে আলেকজান্দ্রিয়াতে যেতে হয়; আলেকজান্দ্রিয়ার বন্দরে তাদের জন্যে একটা স্টীমার অপেক্ষা করে— সেই স্টীমারে চড়ে ভূমধ্যসাগর পার হয়ে ইটালিতে পৌছতে হয়। আমরা overland ডাঙা-পেরোনো যাত্রী, সুতরাং আমাদের সুয়েজে নাবতে হল। আমরা তিনজন বাঙালি ও একজন ইংরেজ একখানি আরব নৌকা ভাড়া করলেম। মানুষের "divine" মুখশ্রী কতদূর পশুত্বের দিকে নাবতে পারে, তা সেই নৌকোর মাঝিটার মুখ দেখলে জানতে পারতে। তার চোখ দুটো যেন বাঘের মতো, কাল কুচকুচে রং, কপাল নিচু, ঠোঁট পুরু, সবসুদ্ধ মুখের ভাব অতি ভয়ানক। অন্যান্য নৌকোর সঙ্গে দরে বনল না, সে একটু কম দামে নিয়ে যেতে রাজি হল। ব— মহাশয় তো

সে নৌকোয় বড়ো সহজে যেতে রাজি নন ; তিনি বললেন আরবদের বিশ্বাস করতে নেই— ওরা অনায়াসে গলায় ছুরি দিতে পারে। তিনি সুয়েজের দুই-একটা ভয়ানক ভয়ানক অরাজকতার গল্প করলেন। কিন্তু যা হোক, আমরা সেই নৌকোয় তো উঠলেম। মাঝিরা ভাঙা ভাঙা ইংরেজি কয়, ও অল্পস্বল্প ইংরেজি বুঝতে পারে। আমরা তো কতক দূর নির্বিবাদে গেলেম। আমাদের ইংরেজ যাত্রীটির সুয়েজের পোস্ট আপিসে নাববার দরকার ছিল। পোস্ট আপিস অনেক দূর এবং যেতে অনেক বিলম্ব হবে, তাই মাঝি একটু আপত্তি করলে ; কিন্তু শীঘ্রই সে আপত্তি ভঞ্জন হল। তার পরে আবার কিছু দূরে গিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে "পোস্ট আপিসে যেতে হবে কি? সে দুই-এক ঘণ্টার মধ্যে যাওয়া অসম্ভব।"— আমাদের রুক্ষস্বভাব সাহেবটি মহাক্ষাপা হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "Your grandmother"। এই তো আমাদের মাঝি রুখে উঠলেন, "What? mother? mother? what mother, don't say mother"। আমরা মনে করলুম সাহেবটাকে ধরে বুঝি জলে ফেলে দিলে, আবার জিজ্ঞাসা করলে, "What did say? (কী বললি?)" সাহেব তাঁর রোখ ছাড়লেন না। আবার বললেন "Your grandmother"। এই তো আর রক্ষা নেই, মাঝিটা মহা তেড়ে উঠল। সাহেব গতিক ভালো নয় দেখে নরম হয়ে বললেন, "You don't seem to understand what I say!" অর্থাৎ তিনি তখন grandmother বলাটা যে গালি নয় তাই প্রমাণ করতে ব্যস্ত। তখন সে মাঝিটা ইংরেজি ভাষা ছেড়ে ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল "বস—চুপ।" সাহেব থতমত খেয়ে চুপ করে গেলেন, আর তাঁর বাক্যস্ফূর্তি হল না। আবার খানিক দূর গিয়ে সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন "কতদূর বাকি আছে?" মাঝি অগ্নিশর্মা হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "Two shilling give, ask what distance!" আমরা এই রকম বুঝে গেলেম যে, দু-শিলিং ভাড়া দিলে সুয়েজ-রাজ্যে এই রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা আইনে নেই! মাঝিটা যখন আমাদের এইরকম ধমক দিচ্ছে তখন অন্য অন্য দাঁড়িদের ভারি আমোদ বোধ হচ্ছে, তারা তো পরস্পর মুখচাওয়াচাওয়ি করে মুচকি মুচকি হাসি আরম্ভ করলে। মাঝিমহাশয়ের বিষম বদমেজাজ দেখে তাদের হাসি সামলানো দায় হয়ে উঠেছিল। একদিকে মাঝি ধমকাচ্ছে, একদিকে দাঁড়িগুলো হাসি জুড়ে দিয়েছে, মাঝিটির উপর প্রতিহিংসা তোলবার আর কোনো উপায় না দেখে আমরাও তিনজনে মিলে হাসি জুড়ে দিলেম —এ রকম সুবুদ্ধি অনেক স্থলে দায়ে পড়ে খাটাতে হয়। মানে মানে সুয়েজ শহরে গিয়ে তো পৌঁছলেম। সুয়েজ শহর সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার অধিকার নেই,



বিলাতে রবীন্দ্রনাথ

কারণ আমি সুয়েজের আধ মাইল জায়গার বেশি আর দেখি নি। শহরের চারদিকে একবার প্রদক্ষিণ করবার বাসনা ছিল, কিন্তু আমার সহযাত্রীদের মধ্যে যাঁরা পূর্বে সুয়েজ দেখেছিলেন, তাঁরা বললেন, "এ পরিশ্রমে শ্রান্তি ও বিরক্তি ছাড়া অন্য কোনো ফললাভের সম্ভাবনা নেই।" তাতেও আমি নিরুৎসাহ হই নি কিন্তু শুনলেম গাধায় চড়ে বেড়ানো ছাড়া শহরে বেড়াবার আর কোনো উপায় নেই। শুনে শহরে বেড়াবার দিকে টান আমার অনেকটা কমে গেল, তার পরে শোনা গেল, এ-দেশের গাধাদের সঙ্গে চালকদের সকল সময়ে মতের ঐক্য হয় না, তারও একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন ইচ্ছে আছে; এইজন্যে সময়ে সময়ে দুই ইচ্ছের বিরোধ উপস্থিত হয়, কিন্তু প্রায় দেখা যায়, গাধার ইচ্ছে পরিণামে জয়ী হয়। সুয়েজে একপ্রকার জঘন্য চোখের ব্যামোর অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব— রাস্তায় অমন শত শত লোকের চোখ ওই রকম রোগগ্রস্ত দেখতে পাবে। এখানকার মাছিরা ওই রোগ চারদিকে বিতরণ করে বেড়ায়। রোগগ্রস্ত চোখ থেকে ওই রোগের বীজ আহরণ করে তারা অরুগ্‌ণ চোখে গিয়ে বসে, চারদিকে রোগ ছড়িয়ে পড়ে। সুয়েজে আমরা রেলগাড়িতে উঠলেম। এ রেলগাড়ির অনেকপ্রকার রোগ আছে, প্রথমত শোবার কোনো বন্দোবস্ত নেই, কেন না বসবার জায়গাগুলি অংশে অংশে বিভক্ত, দ্বিতীয়ত এমন গজগামিনী রেলগাড়ি সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায় না। সমস্ত রাত্রিই গাড়ি চলেছে, দিনের বেলা যখন জেগে উঠলেম তখন দেখলেম ধুলোয় আমাদের কেবল গোর হয় নি, আর সব হয়েছে। চুলে হাত দিতে গিয়ে দেখি, চুলে এমন এক স্তর মাটি জমেছে যে, মাথায় অনায়াসে ধান চাষ করা যায়। এইরকম ধুলোমাখা সন্ন্যাসীর বেশে আমরা আলেক-জান্দ্রিয়াতে গিয়ে পৌঁছলেম। রেলের লাইনের দু-পারে সবুজ শস্যক্ষেত্র। জায়গায় জায়গায় খেজুরের গাছে থোলো থোলো খেজুর ফলে রয়েছে। মাঠের মাঝে মাঝে কুয়ো। মাঝে মাঝে দুই-একটা কোঠাবাড়ি— বাড়িগুলো চৌকোনা, থাম নেই, বারান্দা নেই— সমস্তটাই দেয়ালের মতো, সেই দেয়ালের মধ্যে মধ্যে দুই-একটা জানলা। এই সকল কারণে বাড়িগুলোর যেন শ্রী নেই। যা হ'ক আমি আগে আফ্রিকার মাথা থেকে পা পর্যন্ত যে রকম অনুর্বর মরুভূমি মনে করে রেখেছিলুম, চারদিক দেখে তা কিছুই মনে হল না। বরং চারদিককার সেই হরিৎ ক্ষেত্রের উপর খেজুরকুঞ্জের মধ্যে প্রভাতটি আমার অতি চমৎকার লেগেছিল।

আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে আমাদের জন্য 'মঙ্গোলিয়া' স্টীমার অপেক্ষা করছিল। এইবার আমরা ভূমধ্যসাগরের বক্ষে আরোহণ করলেম। আমার একটু শীত-শীত করতে লাগল। জাহাজে গিয়ে খুব ভাল করে স্নান করলেম, আমার তো হাড়ে

হাড়ে ধুলো প্রবেশ করেছিল। স্নান করার পর আলেকজান্দ্রিয়া শহর দেখতে গেলেম। জাহাজ থেকে ডাঙা পর্যন্ত যাবার জন্যে একটা নৌকো ভাড়া হল। এখানকার এক-একটা মাঝি সার উইলিয়ম জোন্‌সের দ্বিতীয় সংস্করণ বললেই হয়। তারা গ্রীক ইটালিয়ান ফ্রেঞ্চ ইংরেজি প্রভৃতি অনেক ভাষায় চলনসই রকম কথা কইতে পারে। শুনলেম ফ্রেঞ্চ ভাষাই এখানকার সাধারণ ভাষা। রাস্তাঘাটের নাম, সাইনবোর্ডে দোকানগুলির আত্মপরিচয়, অধিকাংশই ফরাসি ভাষায় লেখা। আলেকজান্দ্রিয়া শহরটি সমৃদ্ধিশালী মনে হল। এখানে যে কত জাতের লোক ও কত জাতের দোকানবাজার আছে তার ঠিকানা নেই। রাস্তাগুলি পাথর দিয়ে বাঁধানো, তাতে বেশ পরিষ্কার থাকে, কিন্তু গাড়ির শব্দ বড়ো বেশি রকম হয়। খুব বড়ো বড়ো বাড়ি, বড়ো বড়ো দোকান, শহরটি খুব জমকালো বটে। আলেকজান্দ্রিয়ার বন্দর খুব প্রকাণ্ড। বিস্তর জাহাজ এখানে আশ্রয় পায়। য়ুরোপীয় মুসলমান সকল প্রকার জাতিরই জাহাজ এ বন্দরে আছে, কেবল হিন্দুদের জাহাজ নেই।

চার-পাঁচ দিনে আমরা ইটালিতে গিয়ে পৌঁছলেম। তখন রাত্রি একটা-দুটো হবে। গরম বিছানা ত্যাগ করে জিনিসপত্র নিয়ে আমরা জাহাজের ছাতে গিয়ে উঠলেম। জ্যোৎস্নারাত্রি, খুব শীত; আমার গায়ে বড়ো একটা গরম কাপড় ছিল না, তাই ভারি শীত করছিল। আমাদের সুমুখে নিস্তব্ধ শহর, বাড়িগুলির জানলা দরজা সমস্ত বন্ধ— সমস্ত নিদ্রামগ্ন। আমাদের যাত্রীদের মধ্যে ভারি গোল পড়ে গেল, কখনো শুনি ট্রেন পাওয়া যাবে, কখনো শুনি পাওয়া যাবে না। জিনিসপত্রগুলো নিয়ে কী করা যাবে ভেবে পাওয়া যায় না, জাহাজে থাকবো কি বেরোব কিছুই স্থির নেই। একজন ইটালিয়ান অফিসার এসে আমাদের গুনতে আরম্ভ করলে— কিন্তু কেন গুনতে আরম্ভ করলে তা ভেবে পাওয়া গেল না। জাহাজের মধ্যে এইরকম একটা অস্ফুট জনশ্রুতি প্রচারিত হল যে, এই গণনার সঙ্গে আমাদের ট্রেনে চড়ার একটা বিশেষ যোগ আছে। কিন্তু সে-রাত্রে মূলেই ট্রেন পাওয়া গেল না। শোনা গেল, তার পরদিন বেলা তিনটের আগে ট্রেন পাওয়া যাবে না। যাত্রীরা মহা বিরক্ত হয়ে উঠল। অবশেষে সে-রাত্রে ব্রিন্দিসির হোটেলে আশ্রয় নিতে হল।

এই তো প্রথম য়ুরোপের মাটিতে আমার পা পড়ল। কোনো নূতন দেশে আসবার আগে আমি তাকে এমন নূতনতর মনে করে রাখি যে, এসে আর তা নূতন বলে মনেই হয় না। য়ুরোপ আমার তেমন নূতন মনে হয় নি শুনে সকলেই অবাক।

আমরা রাত্রি তিনটের সময় ব্রিন্দিসির হোটেলে গিয়ে শুয়ে পড়লেম। সকালে একটা আধমরা ঘোড়া ও আধভাঙা গাড়ি চড়ে শহর দেখতে বের হলেম। সারথির

সঙ্গে গাড়িঘোড়ার এমন অসামঞ্জস্য যে কী বলব! সারথির বয়স চোদ্দো হবে, কিন্তু ঘোড়াটির বয়স পঞ্চাশ হবে— আর গাড়িটি পৌরাণিক যুগের মনে হল। ছোটোখাটো শহর যেমন হয়ে থাকে ব্রিন্দিসিও তাই। কতকগুলি কোঠাবাড়ি, দোকানবাজার, রাস্তাঘাট আছে। ভিক্ষুকেরা ভিক্ষা করে ফিরছে, দু-চার জন লোক মদের দোকানে বসে গল্পগুজব করছে, দু-চার জন রাস্তার কোণে দাঁড়িয়ে হাসি-তামাশা করছে; লোকজনেরা অতি নিশ্চিন্তমুখে গজেন্দ্রগমনে গমন করছে; যেন কারও কোনো কাজ নেই, কারও কোনো ভাবনা নেই— যেন শহরসুদ্ধ ছুটি। রাস্তায় গাড়িঘোড়ার সমারোহ নেই, লোকজনের সমাগম নেই। আমরা খানিক দূর যেতেই একজন ছোকরা আমাদের গাড়ি থামিয়ে হাতে একটা তরমুজ নিয়ে গাড়োয়ানের পাশে গিয়ে বসল। ব—মহাশয় বললেন, "বিনা আয়াসে এঁর কিছু রোজগার করবার বাসনা আছে।" লোকটা এসে হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে মাঝে মাঝে আমাদের দেখিয়ে দিতে লাগল, "ওইটে চার্চ, ওইটে বাগান, ওইটে মাঠ" ইত্যাদি। তার টীকাতে আমাদের কিছুমাত্র জ্ঞানবৃদ্ধি হয় নি, আর তার টীকা না হলেও আমাদের কিছুমাত্র জ্ঞানের ব্যাঘাত হত না। তাকে কেউ আমাদের গাড়িতে উঠতে বলে নি, কেউ তাকে কোনো বিষয় জিজ্ঞাসাও করে নি, কিন্তু তবু এই অযাচিত অনুগ্রহের জন্য তার যাজ্ঞা পূর্ণ করতে হল। তারা আমাদের একটা ফলের বাগানে নিয়ে গেল। সেখানে যে কত প্রকার ফলের গাছ, তার সংখ্যা নেই। চারদিকে থোলো থোলো আঙুর ফলে রয়েছে। দু-রকম আঙুর আছে, কালো আর সাদা। তার মধ্যে কালোগুলিই আমার বেশি মিষ্টি লাগল। বড়ো বড়ো গাছে আপেল পিচ প্রভৃতি অনেক প্রকার ফল ধরে আছে। একজন বুড়ি (বোধ হয় উদ্যানপালিকা) কতকগুলি ফলমূল নিয়ে উপস্থিত করলে। আমরা সেদিকে নজর করলেম না; কিন্তু ফল বিক্রয় করবার উপায় সে বিলক্ষণ জানে। আমরা ইতস্তত বেড়াচ্ছি, এমন সময়ে দেখি একটি সুন্দরী মেয়ে কতকগুলি ফল আর ফুলের তোড়া নিয়ে আমাদের সম্মুখে হাজির হল, তখন আর অগ্রাহ্য করবার সাধ্য রইল না।

ইটালির মেয়েদের বড়ো সুন্দর দেখতে। অনেকটা আমাদের দেশের মেয়ের ভাব আছে। সুন্দর রং, কালো কালো চুল, কালো ভুরু, কালো চোখ, আর মুখের গড়ন চমৎকার।

তিনটের ট্রেনে ব্রিন্দিসি ছাড়লেম। রেলোয়ে পথের দু-ধারে আঙুরের খেত, চমৎকার দেখতে। পর্বত, নদী, হ্রদ, কুটির, শস্যক্ষেত্র, ছোটো ছোটো গ্রাম প্রভৃতি যত কিছু কবির স্বপ্নের ধন সমস্ত চারদিকে শোভা পাচ্ছে। গাছপালার মধ্যে থেকে

যখন কোনো একটি দূরস্থ নগর, তার প্রাসাদচূড়া, তার চার্চের শিখর, তার ছবির মতো বাড়িগুলি আস্তে আস্তে চোখে পড়ে তখন বড়ো ভালো লাগে। সন্ধেবেলায় একটি পাহাড়ের নিচে অতি সুন্দর একটি হ্রদ দেখেছিলেম, তা আর আমি ভুলতে পারব না। তার চার দিকে গাছপালা, জলে সন্ধ্যার ছায়া— সে অতি সুন্দর, তা আমি বর্ণনা করতে চাই নে।

রেলোয়ে করে যেতে যেতে আমরা Mont Cenis-এর বিখ্যাত সুরঙ্গ দেখলেম। এই পর্বতের এ-পাশ থেকে ফরাসিরা ও-পাশ থেকে ইটালিয়ানরা, এক সঙ্গে খুদতে আরম্ভ করে, কয়েক বৎসর খুদতে খুদতে দুই যন্ত্রিদল ঠিক মাঝামাঝি এসে পরস্পরের সমুখাসমুখি হয়। এই গুহা অতিক্রম করতে রেলগাড়ির ঠিক আধ ঘণ্টা লাগল। সে অন্ধকারে আমরা যেন হাঁপিয়ে উঠছিলেম। এখানকার রেলগাড়ির মধ্যে দিনরাত আলো জ্বালাই আছে, কেন না এক-এক স্থানে প্রায় পাঁচ মিনিট অন্তর এক-একটা পর্বতগুহা ভেদ করতে হয়— সুতরাং দিনের আলো খুব অল্পক্ষণ পাওয়া যায়। ইটালি থেকে ফ্রান্স পর্যন্ত সমস্ত রাস্তা— নির্ঝর নদী পর্বত গ্রাম হ্রদ দেখতে দেখতে আমরা পথের কষ্ট ভুলে গিয়েছিলেম।

সকালবেলায় প্যারিসে গিয়ে পৌঁছলেম। কী জমকালো শহর। অভ্রভেদী প্রাসাদের অরণ্যে অভিভূত হয়ে যেতে হয়। মনে হয় প্যারিসে বুঝি গরিব লোক নেই। মনে হল, এই সাড়ে তিন হাত মানুষের জন্যে এমন প্রকাণ্ড জমকালো বাড়িগুলোর কী আবশ্যক। হোটেলে গেলেম, এমন প্রকাণ্ড কাণ্ড যে, ঢিলে কাপড় পরে যেমন সোয়াস্তি হয় না, সে হোটেলেও বোধ করি তেমনি অসোয়াস্তি হয়। স্মরণস্তম্ভ, উৎস, বাগান, প্রাসাদ, পাথরে বাঁধানো রাস্তা, গাড়ি, ঘোড়া, জনকোলাহল প্রভৃতিতে অবাক হয়ে যেতে হয়। প্যারিসে পৌঁছিয়েই আমরা একটা 'টার্কিশ-বাথে' গেলেম। প্রথমত একটা খুব গরম ঘরে গিয়ে বসলেম, সে-ঘরে অনেকক্ষণ থাকতে থাকতে কারও কারও ঘাম বেরতে লাগল, কিন্তু আমার তো বেরল না, আমাকে তার চেয়ে আর একটা গরম ঘরে নিয়ে গেল, সে ঘরটা আগুনের মতো, চোখ মেলে থাকলে চোখ জ্বালা করতে থাকে, মিনিট কতক থেকে সেখানে আর থাকতে পারলেম না, সেখান থেকে বেরিয়ে খুব ঘাম হতে লাগল। তার পরে এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে আমাকে শুইয়ে দিলে। ভীমকায় এক ব্যক্তি এসে আমার সর্বাঙ্গ ডলতে লাগল। তার সর্বাঙ্গ খোলা, এমন মাংসপেশল চমৎকার শরীর কখনো দেখি নি। "ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ।" মনে মনে ভাবলেম ক্ষীণকায় এই মশকটিকে দলন করার জন্যে এমন প্রকাণ্ড কামানের কোনো আবশ্যক ছিল না। সে আমাকে দেখে

বললে, আমার শরীর বেশ লম্বা আছে, এখন পাশের দিকে বাড়লে আমি একজন সুপুরুষের মধ্যে গণ্য হব; আধ ঘণ্টা ধরে সে আমার সর্বাঙ্গ অবিশ্রান্ত দলন করলে, ভূমিষ্ঠকাল থেকে যত ধুলো মেখেছি, শরীর থেকে সব যেন উঠে গেল। যথেষ্টরূপে দলিত করে আমাকে আর-একটি ঘরে নিয়ে গেল, সেখানে গরম জল দিয়ে, সাবান দিয়ে, স্পঞ্জ দিয়ে শরীরটা বিলক্ষণ করে পরিষ্কার করলে। পরিষ্করণ-পর্ব শেষ হলে আর-একটা ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে একটা বড়ো পিচকিরি করে গায়ে গরম জল ঢালতে লাগল, হঠাৎ গরম জল দেওয়া বন্ধ করে বরফের মতো ঠাণ্ডা জল বর্ষণ করতে লাগল; এইরকম কখনো গরম কখনো ঠাণ্ডা জলে স্নান করে একটা জলযন্ত্রের মধ্যে গেলেম, তার উপর থেকে নিচে থেকে চার পাশ থেকে বাণের মতো জল গায়ে বিঁধতে থাকে। সেই বরফের মতো ঠাণ্ডা বরুণ-বাণ-বর্ষণের মধ্যে খানিকক্ষণ থেকে আমার বুকের রক্ত পর্যন্ত যেন জমাট হয়ে গেল— রণে ভঙ্গ দিতে হল, হাঁপাতে হাঁপাতে বেরিয়ে এলেম। তার পরে এক জায়গায় পুকুরের মতো আছে, আমি সাঁতার দিতে রাজি আছি কি না জিজ্ঞাসা করলে। আমি সাঁতার দিলেম না, আমার সঙ্গী সাঁতার দিলেন। তাঁর সাঁতার দেওয়া দেখে তারা বলাবলি করতে লাগল "দেখো, দেখো, এরা কী অদ্ভুত রকম করে সাঁতার দেয়, ঠিক কুকুরের মতো।" এতক্ষণে স্নান শেষ হল। আমি দেখলেম টার্কিশ-বাথে স্নান করা আর শরীরটাকে ধোপার বাড়ি দেওয়া এক কথা। তার পরে সমস্ত দিনের জন্যে এক পাউণ্ড দিয়ে এক গাড়ি ভাড়া করা গেল। প্যারিস এক্‌সিবিশন দেখতে গেলেম। তুমি এইবার হয়তো খুব আগ্রহের সঙ্গে কান খাড়া করেছ, ভাবছ আমি প্যারিস এক্‌সিবিশনের বিষয় কী না জানি বর্ণনা করব। কিন্তু দুঃখের বিষয় কী বলব, কলকাতার য়ুনিভার্সিটিতে বিদ্যা শেখার মতো প্যারিস এক্‌সিবিশনের সমস্ত দেখেছি কিন্তু কিছুই ভালো করে দেখি নি। একদিনের বেশি আমাদের প্যারিসে থাকা হল না— সে বৃহৎ কাণ্ড একদিনে দেখা কারও সাধ্য নয়। সমস্ত দিন আমরা দেখলেম— কিন্তু সে-রকম দেখায়, দেখবার একটা তৃষ্ণা জন্মাল কিন্তু দেখা হল না। সে একটা নগরবিশেষ। এক মাস থাকলে তবে তা বর্ণনা করবার দুরাশা করতেম। প্যারিস এক্‌সিবিশনের একটা স্তূপাকার ভাব মনে আছে, কিন্তু শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাব কিছুই মনে নেই। সাধারণত মনে আছে যে চিত্রশালায় গিয়ে অসংখ্য অসংখ্য চমৎকার ছবি দেখেছি, স্থাপত্যশালায় গিয়ে অসংখ্য অসংখ্য প্রস্তরমূর্তি দেখেছি, নানা দেশবিদেশের নানা জিনিস দেখেছি; কিন্তু বিশেষ কিছু মনে নেই। তার পর প্যারিস থেকে লণ্ডনে এলেম— এমন বিষণ্ণ অন্ধকার পুরী আর কখনো দেখি নি— ধোঁয়া, মেঘ, বৃষ্টি, কুয়াশা, কাদা আর লোকজনের

ব্যস্তসমস্ত ভাব। আমি দুই-এক ঘণ্টামাত্র লণ্ডনে ছিলেম, যখন লণ্ডন পরিত্যাগ করলেম তখন নিশ্বাস পরিত্যাগ করে বাঁচলেম। আমার বন্ধুরা আমাকে বললেন, লণ্ডনের সঙ্গে প্রথম-দৃষ্টিতেই ভালোবাসা হয় না, কিছু দিন থেকে তাকে ভালো করে চিনলে তবে লণ্ডনের মাধুর্য বোঝা যায়।

দ্বিতীয় পত্র

ইংলণ্ডে আসবার আগে আমি নির্বোধের মতো আশা করেছিলেম যে, এই ক্ষুদ্র দ্বীপের দুই হস্ত-পরিমিত ভূমির সর্বত্রই গ্ল্যাডস্টোনের বাগ্মিতা, ম্যাক্স্মূলরের বেদব্যাখ্যা, টিণ্ডালের বিজ্ঞানতত্ত্ব, কার্লাইলের গভীর চিন্তা, বেনের দর্শনশাস্ত্রে মুখরিত। সৌভাগ্যক্রমে তাতে আমি নিরাশ হয়েছি। মেয়েরা বেশভূষায় লিপ্ত, পুরুষেরা কাজকর্ম করছে, সংসার যেমন চলে থাকে তেমনি চলছে, কেবল রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে বিশেষভাবে কোলাহল শোনা যায়। মেয়েরা জিজ্ঞাসা করে থাকে, তুমি নাচে গিয়েছিলে কি না, কনসর্ট কেমন লাগল, থিয়েটারে একজন নূতন অ্যাক্টর এসেছে, কাল অমুক জায়গায় ব্যাণ্ড হবে ইত্যাদি। পুরুষেরা বলবে, আফগান যুদ্ধের বিষয় তুমি কী বিবেচনা কর, Marquis of Lorneকে লণ্ডনীয়েরা খুব সমাদর করেছিল, আজ দিন বেশ ভালো, কালকের দিন বড়ো মিজরেব্‌ল্ ছিল। এ-দেশের মেয়েরা পিয়ানো বাজায়, গান গায়, আগুনের ধারে আগুন পোয়ায়, সোফায় ঠেসান দিয়ে নভেল পড়ে, ভিজিটরদের সঙ্গে আলাপচারি করে ও আবশ্যক বা অনাবশ্যক মতে যুবকদের সঙ্গে ফ্লার্ট করে। এদেশের চির-আইবুড়ো মেয়েরা কাজের লোক। টেম্‌পারেন্স মীটিং, ওয়ার্কিং মেন্‌স্ সোসাইটি প্রভৃতি যতপ্রকার অনুষ্ঠানের কোলাহল আছে, সমুদয়ের মধ্যে তাদের কণ্ঠ আছে। পুরুষদের মতো তাঁদের আপিসে যেতে হয় না, মেয়েদের মতো ছেলেপিলে মানুষ করতে হয় না, এদিকে হয়তো এত বয়স হয়েছে যে 'বলে' গিয়ে নাচা বা ফ্লার্ট করে সময় কাটানো সংগত হয় না, তাই তাঁরা অনেক কাজ করতে পারেন, তাতে উপকারও হয়তো আছে।

এখানে দ্বারে দ্বারে মদের দোকান। আমি রাস্তায় বেরোলে জুতোর দোকান, দরজির দোকান, মাংসের দোকান, খেলনার দোকান পদে পদে দেখতে পাই কিন্তু বইয়ের দোকান প্রায় দেখতে পাই নে। আমাদের একটি কবিতার বই কেনবার আবশ্যক হয়েছিল, কিন্তু কাছাকাছির মধ্যে বইয়ের দোকান না দেখে একজন

খেলনাওয়ালাকে সেই বই আনিয়ে দিতে হুকুম করতে হয়েছিল— আমি আগে জানতেম, এ দেশে একটা কসাইয়ের দোকান যেমন প্রচুররূপে দরকারি, বইয়ের দোকানও তেমনি।

ইংলণ্ডে এলে সকলের চেয়ে চোখে পড়ে লোকের ব্যস্ততা। রাস্তা দিয়ে যারা চলে তাদের মুখ দেখতে মজা আছে— বগলে ছাতি নিয়ে হুস হুস করে চলেছে, পাশের লোকদের উপর ভ্রূক্ষেপ নেই, মুখে যেন মহা উদ্‌বেগ, সময় তাদের ফাঁকি দিয়ে না পালায় এই তাদের প্রাণপণ চেষ্টা। সমস্ত লণ্ডনময় রেলোয়ে। প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর এক-একটা ট্রেন যাচ্ছে। লণ্ডন থেকে ব্রাইটনে আসবার সময় দেখি প্রতি মুহূর্তে উপর দিয়ে একটা, নিচে দিয়ে একটা, পাশ দিয়ে একটা, এমন চারি দিক থেকে হুস হাস করে ট্রেন ছুটেছে। সে ট্রেনগুলোর চেহারা লণ্ডনের লোকদেরই মতো, এদিক থেকে ওদিক থেকে মহা ব্যস্তভাবে হাঁসফাঁস করতে করতে চলেছে। দেশ তো এই এক রত্তি, দু-পা চললেই ভয় হয় পাছে সমুদ্রে গিয়ে পড়ি, এখানে এত ট্রেন যে কেন ভেবে পাই নে। আমরা একবার লণ্ডনে যাবার সময় দৈবাৎ ট্রেন মিস করেছিলেম, কিন্তু তার জন্যে বাড়ি ফিরে আসতে হয় নি, তার আধ ঘণ্টা পরেই আর-এক ট্রেন এসে হাজির।

এ-দেশের লোক প্রকৃতির আদুরে ছেলে নয়, কারুর নাকে তেল দিয়ে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে থাকবার জো নেই। একে তো আমাদের দেশের মতো এ-দেশের জমিতে আঁচড় কাটলেই শস্য হয় না, তাতে শীতের সঙ্গে মারামারি করতে হয়— প্রথমত শীতের উপদ্রবে এদের কত কাপড় দরকার হয় তার ঠিক নেই, তার পরে কম খেলে এ-দেশে বাঁচবার জো নেই, শরীরে তাপ জন্মাবার জন্যে অনেক খাওয়া চাই। এ-দেশের লোকের কাপড়, কয়লা, খাওয়া অপর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকলে চলে না, তার উপরে আবার মদ আছে। আমাদের বাংলার খাওয়া নামমাত্র, কাপড় পরাও তাই। এ-দেশে যার ক্ষমতা আছে সেই মাথা তুলতে পারে, দুর্বল লোকদের এখানে রক্ষা নেই— একে প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ, তাতে কার্যক্ষেত্রে সহস্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা রোখারুখি করছে।

ক্রমে ক্রমে এখানকার দুই-এক জন লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হতে চলল। একটা মজা দেখছি, এখানকার লোকেরা আমাকে নিতান্ত অবুঝের মতো মনে করে। একদিন Dr.— এর ভাইয়ের সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়েছিলেম। একটা দোকানের সম্মুখে কতকগুলো ফোটোগ্রাফ ছিল, সে আমাকে সেইখানে নিয়ে গিয়ে ফোটোগ্রাফের ব্যাখ্যান আরম্ভ করে দিলে— আমাকে বুঝিয়ে দিলে যে, একরকম যন্ত্র দিয়ে ওই

ছবিগুলো তৈরি হয়, মানুষে হাতে করে আঁকে না। আমার চার দিকে লোক দাঁড়িয়ে গেল। একটা ঘড়ির দোকানের সামনে নিয়ে, ঘড়িটা যে খুব আশ্চর্য যন্ত্র তাই আমার মনে সংস্কার জন্মাবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগল। একটা ঈভনিং পার্টিতে মিস— আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি এর পূর্বে পিয়ানোর শব্দ শুনেছি কি না। এ-দেশের অনেক লোক হয়তো পরলোকের একটা ম্যাপ এঁকে দিতে পারে কিন্তু ভারতবর্ষের সম্বন্ধে যদি একবিন্দুও খবর জানে। ইংলণ্ড থেকে কোনো দেশের যে কিছু তফাত আছে তা তারা কল্পনাও করতে পারে না। ভারতবর্ষের কথা দূরে থাক্— সাধারণ লোকেরা কত বিষয় জানে না তার ঠিক নেই।

তৃতীয় পত্র

আমরা সেদিন ফ্যান্সি-বলে অর্থাৎ ছদ্মবেশী নাচে গিয়েছিলেম— কত মেয়ে পুরুষ নানারকম সেজেগুজে সেখানে নাচতে গিয়েছিল। প্রকাণ্ড ঘর, গ্যাসের আলোয় আলোকাকীর্ণ, চার দিকে ব্যাণ্ড বাজছে— ছ-সাত-শ সুন্দরী, সুপুরুষ। ঘরে ন স্থানং তিল ধারয়েৎ— চাঁদের হাট তো তাকেই বলে। এক-একটা ঘরে দলে দলে স্ত্রী পুরুষে হাত ধরাধরি করে ঘুরে ঘুরে নাচ আরম্ভ করেছে, যেন জোড়া জোড়া পাগলের মতো। এক-একটা ঘরে এমন সত্তর আশি জন যুগলমূর্তি; এমন ঘেঁষাঘেষি যে, কে কার ঘাড়ে পড়ে তার ঠিক নেই। একটা ঘরে শ্যাম্পেনের কুরুক্ষেত্র পড়ে গিয়েছে, মদ্যমাংসের ছড়াছড়ি, সেখানে লোকারণ্য; এক-একটা মেয়ের নাচের বিরাম নেই, দু-তিন ঘণ্টা ধরে ক্রমাগত তার পা চলছে। এক জন মেম তুষার-কুমারী সেজে গিয়েছিলেন, তাঁর সমস্তই শুভ্র, সর্বাঙ্গে পুঁতির সজ্জা, আলোতে ঝকমক করছে। এক জন মুসলমানিনী সেজেছিলেন; একটা লাল ফুলো ইজের, উপরে একটা রেশমের পেশোয়াজ, মাথায় টুপির মতো— এ কাপড়ে তাঁকে বেশ মানিয়ে গিয়েছিল। এক জন সেজেছিলেন আমাদের দিশি মেয়ে, একটা শাড়ি আর একটা কাঁচুলি তাঁর প্রধান সজ্জা, তার উপরে একটা চাদর, তাতে ইংরেজি কাপড়ের চেয়ে তাঁকে ঢের ভালো দেখাচ্ছিল। একজন সেজেছিলেন বিলিতি দাসী। আমি বাংলার জমিদার সেজেছিলেম, জরি দেওয়া মখমলের কাপড়, জরি দেওয়া মখমলের পাগড়ি প্রভৃতি পরেছিলেম। আমাদের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষ অযোধ্যার তালুকদার সেজে গিয়েছিলেন, সাদা রেশমের ইজের জরিতে খচিত, সাদা রেশমের চাপকান, সাদা রেশমের জোব্বা, জরিতে ঝকমকায়মান পাগড়ি, জরির কোমরবন্ধ— তাঁর সজ্জা। অযোধ্যার তালুকদারেরা

যে এই রকম কাপড় পরে তা হয়তো নয়, কিন্তু ধরা পড়বার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি আফগান সেনাপতি সেজেছিলেন।

গত মঙ্গলবারে আমরা এক ভদ্রলোকের বাড়িতে নাচের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলেম। সন্ধেবেলায় কোথাও নিমন্ত্রণে যেতে হলে শীতের জন্য সচরাচর মোটা কাপড় পরতে হয়, কিন্তু ঈভ্‌নিং পার্টি প্রভৃতিতে পাতলা কালো বনাতের কাপড় পরাই রীতি। সান্ধ্য পরিচ্ছদের কামিজটি একেবারে নিষ্কলঙ্ক ধবধবে সাদা হওয়া চাই, তার উপরে প্রায় সমস্ত-বুক খোলা এক বনাতের ওয়েস্টকোট, কালো ওয়েস্টকোটের মধ্যে সাদা কামিজের স্মুখ দিকটা বেরিয়ে থাকে, গলায় সাদা ফিতে (নেকটাই) বাঁধা, সকলের উপর একটি টেল-কোট (লাঙুল-কোট) ; টেলকোটের স্মুখ দিকটা কোমর পর্যন্ত কাটা, আমাদের চাপকান প্রভৃতি পোষাকগুলি যেমন হাঁটু পর্যন্ত পড়ে, এ তা নয়। এর স্মুখ দিকটার সীমা কোমর পর্যন্ত, কিন্তু পিছন দিকটা কাটা নয়, সুতরাং কতকটা লেজের মতো ঝুলতে থাকে। ইংরেজদের অনুকরণে এই লেজকোট পরতে হল। নাচ-পার্টিতে যেতে হলে হাতে একজোড়া সাদা দস্তানা পরা চাই, কারণ যে মহিলাদের হাতে হাত দিয়ে নাচতে হবে, খালি হাত লেগে তাঁদের হাত ময়লা হয়ে যেতে পারে কিংবা তাঁদের হাতে যদি দস্তানা থাকে সেটা ময়লা হবার ভয় আছে। অন্য কোনো জায়গায় লেডিদের সঙ্গে শেক্‌হাণ্ড করতে গেলে হাতের দস্তানা খুলে ফেলতে হয়, কিন্তু নাচের ঘরে তার উল্‌টো।

যা হ'ক, আমরা তো সাড়ে নটার সময় তাঁদের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেম। তখনো নাচ আরম্ভ হয় নি। ঘরের দুয়ারের কাছে গৃহকর্ত্রী দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি বিশেষ পরিচিতদের সঙ্গে শেক্‌হাণ্ড করছেন, অপরিচিতদের প্রতি শিরঃকম্পন ও সকলকে অভ্যর্থনা করছেন। এ গোরাদের দেশে নিমন্ত্রণসভায় গৃহকর্তার বড়ো উঁচু পদ নেই, তিনি সভায় উপস্থিত থাকুন বা শয়নগৃহে নিদ্রা দিন, তাতে কারও বড়ো কিছু এসে যায় না। আমরা ঘরে প্রবেশ করলেম, গ্যাসের আলোয় ঘর উজ্জ্বল, শত শত রমণীর রূপের আলোকে গ্যাসের আলো ম্রিয়মাণ ; রূপের উৎসব পড়ে গিয়েছে, ঘরের ভিতরে প্রবেশ করবামাত্রই চোখে ধাঁধা লেগে যায়। ঘরের একপাশে পিয়ানো, বেহালা, বাঁশি বাজছে, ঘরের চারিধারে কৌচ চৌকি সাজানো, ইতস্তত দেয়ালের আয়নার উপর গ্যাসের আলো ও রূপের প্রতিবিম্ব পড়ে ঝকমক করছে। নাচবার ঘরের মেজে কাঠের, তার উপর কার্পেট প্রভৃতি কিছু পাতা নেই, সে কাঠের মেজে এমন পালিশ করা যে, পা পিছলে যায়। ঘর যত পিছল হয় ততই নাচবার উপযুক্ত হয়, কেননা পিছল ঘরে নাচের গতি সহজ হয়, পা কোনো বাধা পায় না,

আপনা-আপনি পিছলে আসে। ঘরের চারিদিকে আশেপাশে যে-সকল বারান্দার মতো আছে, তাই একটু ঢেকেঢুকে, গাছপালা দিয়ে, দু-একটি কৌচ চৌকি রেখে তাকে প্রণয়ীদের কুঞ্জ নামে অভিহিত করা হয়েছে। সেইখানে নাচে শ্রান্ত হয়ে বা কোলাহলে বিরক্ত হয়ে যুবকযুবতী নিরিবিলি মধুরালাপে মগ্ন থাকতে পারেন। ঘরে ঢোকবার সময় সকলের হাতে সোনার অক্ষরে ছাপা এক-একখানি কাগজ দেওয়া হয়, সেই কাগজে কী কী নাচ হবে তাই লেখা থাকে। ইংরেজি নাচ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, একরকম হচ্ছে স্ত্রীপুরুষে মিলে ঘুরে ঘুরে নাচা, তাতে কেবল দু-জন লোক একসঙ্গে নাচে; আর-একরকম নাচে চারটি জুড়ি নর্তকনর্তকী চতুষ্কোণ হয়ে সুমুখাসুমুখি দাঁড়ায় ও হাতধরাধরি করে নানা ভঙ্গীতে চলাফেরা করে বেড়ায়, কোনো কোনো সময় চার জুড়ি না হয়ে আট জুড়িও হয়। ঘুরে ঘুরে নাচকে রাউণ্ড ডান্স্ বলে ও চলাফেরা করে নাচার নাম স্কোয়ার ডান্স। নাচ আরম্ভ হবার পূর্বে গৃহকর্ত্রী মহিলা ও পুরুষদের মধ্যে আলাপ করিয়ে দেন অর্থাৎ পুরুষ-অভ্যাগতকে সঙ্গে করে কোনো এক অভ্যাগত-মহিলার কাছে নিয়ে গিয়ে বলেন, "মিস অমুক, ইনি মিস্টার অমুক।" অমনি মিস ও মিস্টার শিরঃকম্পন করেন। কোনো মিসের সঙ্গে পরিচয় হবার পর নাচবার ইচ্ছে করলে পকেট থেকে সেই সোনার জলে ছাপানো প্রোগ্রামটি বের করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে হয়, "আপনি কি অমুক নৃত্যে বাগ্‌দত্তা হয়ে আছেন?" তিনি যদি 'না' বলেন তা হলে তাঁকে বলতে হবে, "তবে আমি কি আপনার সঙ্গে নাচবার সুখভোগ করতে পারি?" তিনি 'থ্যাঙ্ক য়ু' বললে বোঝা যাবে কপালে তাঁর সঙ্গে নাচবার সুখ আছে। অমনি সেই কাগজটিতে সেই নাচের পাশে তাঁর নাম এবং তাঁর কাগজে আবেদনকারীর নাম লিখে দিতে হয়।

নাচ আরম্ভ হল। ঘুর-ঘুর-ঘুর। একটা ঘরে, মনে করো, চল্লিশ-পঞ্চাশ জুড়ি নাচছে; ঘেঁষাঘেঁষি, ঠেলাঠেলি, কখনো বা জুড়িতে জুড়িতে ধাক্কাধাক্কি। তবু ঘুর-ঘুর-ঘুর। তালে তালে বাজনা বাজছে, তালে তালে পা পড়ছে, ঘর গরম হয়ে উঠেছে। একটা নাচ শেষ হল, বাজনা থেমে গেল; নর্তক মহাশয় তাঁর শ্রান্ত সহচরীকে আহারের ঘরে নিয়ে গেলেন, সেখানে টেবিলের উপর ফলমূল মিষ্টান্ন মদিরার আয়োজন; হয়তো আহার-পান করলেন না-হয় দুজনে নিভৃত কুঞ্জে বসে রহস্যালাপ করতে লাগলেন। আমি নতুন লোকের সঙ্গে বড়ো মিলে মিশে নিতে পারি নে, যে-নাচে আমি একেবারে সুপণ্ডিত, সে-নাচও নতুন লোকের সঙ্গে নাচতে পারি নে। সত্যি কথা বলতে কি, নাচের নেমন্তন্নগুলো আমার বড়ো ভালো লাগে না। যাদের সঙ্গে বিশেষ আলাপ আছে, তাদের সঙ্গে নাচতে মন্দ লাগে

না। যেমন তাস খেলবার সময় খারাপ জুড়ি পেলে তার 'পরে তার দলের লোক চটে যায়, তেমনি নাচের সময় খারাপ জুড়ির 'পরে মেয়েরা ভারি চটে যায়। আমার নাচের সহচরী বোধ হয় নাচার সময় মনে মনে আমার মরণ কামনা করেছিলেন। নাচ ফুরিয়ে গেল, আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেম, তিনিও নিস্তার পেলেন।

প্রথমে নাচের ঘরে ঢুকেই আমি একেবারে চমকে উঠেছিলেম, দেখি যে শত শ্বেতাঙ্গিনীদের মধ্যে আমাদের একটি ভারতবর্ষীয়া শ্যামাঙ্গিনী রয়েছেন। দেখেই তো আমার বুকটা একেবারে নেচে উঠেছিল। তার সঙ্গে কোনোমতে আলাপ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেম। কতদিন শ্যামলা মুখ দেখি নি! আর, তার মুখে আমাদের বাঙালি মেয়েদের ভালোমানুষি নম্রভাব মাখানো। আমি অনেক ইংরেজ মেয়েদের মুখে ভালোমানুষি নরম ভাব দেখেছি কিন্তু এর সঙ্গে তার কী একটা তফাত আছে বলতে পারি নে। তার চুল বাঁধা আমাদের দেশের মতো। সাদা মুখ আর উগ্র অসংকোচ সৌন্দর্য দেখে দেখে আমার মনটা ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল, এতদিনে তাই বুঝতে পারলেম। হাজার হ'ক, ইংরেজ মেয়েরা সম্পূর্ণ আলাদা জাত, আমি এতদূর ইংরেজি কায়দা শিখি নি যে, তাদের সঙ্গে বেশ খোলাখুলি ভাবে কথাবার্তা কইতে পারি। পরিচিত বাঁধি গতের সীমা লঙ্ঘন করতে সাহস হয় না।

আজ ব্রাইটনের অনেক তপস্যার ফলে সূর্য উঠেছেন। এদেশে রবি যেদিন মেঘের অন্তঃপুর থেকে বের হন সেদিন একটি লোকও কেউ ঘরে থাকে না। সেদিন সমুদ্রের ধারে বেড়াবার রাস্তায় লোক কিলবিল করতে থাকে। এদেশে যদিও 'বাড়ির ভিতর' নেই, তবু এদেশের মেয়েরা যেমন অসূর্যম্পশ্যরূপা এমন আমাদের দেশে নয়।

সাড়ে আটটার কমে আমাদের বিছানা থেকে ওঠা হয় না, ছ-টার সময় বিছানা থেকে উঠলে এখানকার লোকেরা আশ্চর্য হয়। তার পরে উঠেই আমি রোজ ঠাণ্ডা জলে স্নান করি। এদেশে যাকে স্নান বলে, আমি সে-রকম স্নানের বিড়ম্বনা করি নে। আমি মাথায় জল ঢেলে স্নান করি, গরম জল নয়— এখানকার এই বরফের মতো ঠাণ্ডা জল। ন-টার সময় আমাদের খাবার আসে। এখানকার ন-টা আর সেখানকার ছ-টা সমান। আমাদের আর-একটি খাওয়া দেড়টার সময়, সেইটিই প্রধান খাওয়া— মধ্যাহ্নভোজন। মধ্যে একবার চা রুটি প্রভৃতি আসে, তার পরে রাত আটটার সময় আর-একটি সুপ্রশস্ত ভোজনের আয়োজন হয়ে থাকে; এইরকম আমাদের দিনের প্রধান বিভাগগুলি খাওয়া নিয়ে।

অন্ধকার হয়ে আসছে, চারটে বাজে ব'লে, চারটে বাজলে পরে আলো না জ্বেলে পড়া দুষ্কর। এখানে প্রকৃতপক্ষে ন-টার সময় দিন আরম্ভ হয়, কেননা গড়ে রোজ

আটটার কমে ওঠা হয় না। তার পর আবার বৈকাল চারটের সময়েই এখানকার দিনের আলো নিভে যায়। দিনগুলো যেন দশটা চারটে আপিস করতে আসে। ট্যাক-ঘড়ির ডালা খুলতে খুলতেই এদেশে দিন চলে যায়। এখানকার রাত্তির তেমনি ঘোড়ায় চড়ে আসে, আর পায়ে হেঁটে ফেরে।

মেঘ, বৃষ্টি, বাদল, অন্ধকার, শীত— এ আর একদণ্ডের তরে ছাড়া নেই। আমাদের দেশে যখন বৃষ্টি হয় তখন মুষলধারে বৃষ্টির শব্দ, মেঘ, বজ্র, বিদ্যুৎ, ঝড়— তাতে একটা কেমন উল্লাসের ভাব আছে; এখানে এ তা নয়, এ টিপ টিপ করে সেই একঘেয়ে বৃষ্টি ক্রমাগতই অতিনিঃশব্দ পদসঞ্চারে চলছে তো চলছেই। রাস্তায় কাদা, পত্রহীন গাছগুলো স্তব্ধভাবেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে, কাঁচের জানলার উপর টিপ টিপ করে জল ছিটিয়ে পড়চে। আমাদের দেশে স্তরে স্তরে মেঘ করে; এখানে আকাশ সমতল, মনে হয় না যে মেঘ করেছে, মনে হয় কোনো কারণে আকাশের রংটা ঘুলিয়ে গিয়েছে, সমস্তটা জড়িয়ে স্থাবরজঙ্গমের একটা অবসন্ন মুখশ্রী। লোকের মুখে সময়ে সময়ে শুনতে পাই বটে যে, কাল বজ্র ডেকেছিল, কিন্তু বজ্রের নিজের এমন গলার জোর নেই যে তার মুখ থেকেই সে খবরটা পাই। সূর্য তো এখানে গুজবের মধ্যে হয়ে পড়েছে। যদি অনেক ভাগ্যবলে সকালে উঠে সূর্যের মুখ দেখতে পাই, তবে তখনই আবার মনে হয়—

এমন দিন না রবে, তা জানো।

দিনে দিনে শীত খুব ঘনিয়ে আসছে; লোকে বলছে, কাল পরশুর মধ্যে হয়তো আমরা বরফ পড়া দেখতে পাব। তাপমান যন্ত্র ত্রিশ ডিগ্রি পর্যন্ত নেবে গিয়েছে— সেই তো হচ্ছে ফ্রীজিং পয়েন্ট। অল্পস্বল্প ফ্রস্ট দেখা দিয়েছে। রাস্তার মাটি খুব শক্ত। কেননা তার মধ্যে যা জল ছিল সমস্ত জমাট হয়ে গিয়েছে। রাস্তার মাঝে মাঝে কাঁচের টুকরোর মতো শিশির খুব শক্ত হয়ে জমেছে। দুই-এক জায়গায় ঘাসের মধ্যে কে যেন চুন ছড়িয়ে দিয়েছে, বরফের এই প্রথম সূত্রপাত। খুব শীত পড়েছে, এক এক সময়ে হাত-পা এমন ঠাণ্ডা হয়ে যায় যে জ্বালা করতে থাকে। সকালে লেপ থেকে বেরোতে ভাবনা হয়।

আমাদের দিশি কাপড় দেখে রাস্তার এক-এক জন সত্যি সত্যি হেসে ওঠে, এক-এক জন এত আশ্চর্য হয়ে যায় যে, তাদের আর হাসবার ক্ষমতা থাকে না। কত লোক হয়তো আমাদের জন্যে গাড়ি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছে। প্যারিসে আমাদের গাড়ির পিছনে পিছনে এক দল ইস্কুলের ছোকরা চীৎকার করতে করতে ছুটেছিল, আমরা তাদের সেলাম করলেম। এক-এক জন আমাদের মুখের উপর হেসে ওঠে, এক-এক জন চেঁচাতে থাকে—"Jack, look at the blackies!"

চতুর্থ পত্র

আমরা সেদিন হাউস অফ কমন্সে গিয়েছিলেম। পার্লামেন্টের অভ্রভেদী চূড়া, প্রকাণ্ড বাড়ি, হাঁ-করা ঘরগুলো দেখলে তাক লেগে যায়। একটা বড়ো ঘরে হাউস বসে, ঘরের চারি দিকে গোল গ্যালারি, তার এক দিকে দর্শকেরা আর-এক দিকে খবরের কাগজের রিপোর্টাররা। গ্যালারি অনেকটা থিয়েটারের ড্রেস-সার্কলের মতো। গ্যালারির নিচে স্টলে মেম্বাররা বসে। তাদের জন্যে দু-পাশে হদ্দ দশখানি বেঞ্চি। এক পাশের পাঁচখানি বেঞ্চিতে গবর্নমেন্টের দল, আর-এক পাশের পাঁচ-খানিতে বিপক্ষ দল। সুমুখের প্লাটফর্মের উপর একটা কেদারা আছে, সেইখানে প্রেসিডেন্টের মতো এক জন (যাকে স্পীকার বলে) মাথায় পরচুলা পরে অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বসে থাকেন। যদি কেউ কখনো কোনো অন্যায় ব্যবহার বা কোনো আইনবিরুদ্ধ কাজ করে তাহলে স্পীকার উঠে তাকে বাধা দেয়। যেখানে খবরের কাগজের রিপোর্টারর সব বসে, তার পিছনে খড়খড়ি-দেওয়া একটা গ্যালারিতে মেয়েদের জায়গা, বাইরে থেকে তাদের দেখা যায় না। আমরা যখন গেলেম, তখন ও'ডোনেল বলে এক জন আইরিশ সভ্য ভারতবর্ষ সংক্রান্ত বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, প্রেস-অ্যাক্টের বিরুদ্ধে ও অন্যান্য নানা বিষয় নিয়ে তিনি আন্দোলন করছিলেন। তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে গেল। হাউসের ভাবগতিক দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেম। যখন এক জন কেউ বক্তৃতা করছে, তখন হয়তো অনেক মেম্বার মিলে "ইয়া" "ইয়া" "ইয়া" "ইয়া" করে চীৎকার করছে, হাসছে। আমাদের দেশে সভাস্থলে ইস্কুলের ছোকরারাও হয়তো এমন করে না। অনেক সময়ে বক্তৃতা হচ্ছে আর মেম্বাররা কপালের উপর টুপি টেনে দিয়ে অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছেন। এক বার দেখলেম যে, ভারতবর্ষের বিষয় নিয়ে একটা বক্তৃতার সময় ঘরে নয়-দশ জনের বেশি মেম্বার ছিল না, অন্যান্য সবাই ঘরের বাইরে হাওয়া খেতে, বা সাপার খেতে গিয়েছেন; আর যেই ভোট নেবার সময় হল অমনি সবাই চার দিক থেকে এসে উপস্থিত। বক্তৃতা শুনে বা কোনোপ্রকার যুক্তি শুনে যে কারো মত স্থির হয়, তা তো বোধ হল না।

গত বৃহস্পতিবারে হাউস অফ কমন্সে ভারতবর্ষ নিয়ে খুব বাদানুবাদ চলেছিল। সেদিন ব্রাইট সিভিল সার্ভিস সম্বন্ধে, গ্লাডস্টোন তুলা-জাতের শুল্ক ও আফগান যুদ্ধ সম্বন্ধে, ভারতবর্ষীয়দের দরখাস্ত দাখিল করেন। চারটের সময় পার্লামেন্ট খোলে।

আমরা কয়েক জন বাঙালি চারটে না বাজতেই হাউসে গিয়ে উপস্থিত হলেম। তখন হাউস খোলে নি, দর্শনার্থীরা হাউসের বাইরে একটা প্রকাণ্ড ঘরে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের চার দিকে বার্ক, ফক্স, চ্যাটাম, ওঅলপোল প্রভৃতি রাজনীতিবিশারদ মহাপুরুষদের প্রস্তরমূর্তি। প্রতি দরজার কাজে পাহারাওআলা পাকা চুলের পরচুলা-পরা। গাউন-ঝোলানো পার্লামেণ্টের কর্মচারীরা হাতে দুই একটা খাতাপত্র নিয়ে আনাগোনা করছিলেন। চারটের সময় হাউস খুলল। আমাদের কাছে স্পীকার্স গ্যালারির টিকিট ছিল। হাউস অফ কমন্সে পাঁচ শ্রেণীর গ্যালারি আছে,— স্ট্রেঞ্জার্স গ্যালারি, স্পীকার্স গ্যালারি, ডিপ্লম্যাটিক গ্যালারি, রিপোর্টার্স গ্যালারি, লেডিজ গ্যালারি। হাউসের যে-কোনো মেম্বারের কাছ থেকে বৈদেশিক গ্যালারির টিকিট পাওয়া যায়, আর বক্তার অনুগ্রহ হলে তবে বক্তার গ্যালারির টিকিট পাওয়া যেতে পারে। ডিপ্লম্যাটিক গ্যালারিটা কী পদার্থ তা ভালো করে বলতে পারি নে, আমি যে ক-বার হাউসে গিয়েছি দুই-এক জন ছাড়া সেখানে লোক দেখতে পাই নি। স্ট্রেঞ্জার্স গ্যালারি থেকে বড়ো ভালো দেখাশুনো যায় না; তার সামনে স্পীকার্স গ্যালারি; তার সামনে ডিপ্লম্যাটিক গ্যালারি। আমরা গিয়ে তো বসলেম। পরচুলা-ধারী স্পীকার মহাশয় গরুড় পক্ষীটির মতো তাঁর সিংহাসনে উঠলেন। হাউসের সভ্যেরা সব আসন গ্রহণ করলেন। কাজ আরম্ভ হল। হাউসের প্রথম কাজ প্রশ্নোত্তর করা। হাউসের পূর্ব অধিবেশনে এক-এক জন মেম্বার বলে রাখেন যে, "আগামী বারে আমি অমুক অমুক বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব, তার উত্তর দিতে হবে।" সেদিন ও'ডোনেল নামে একজন আইরিশ মেম্বার জিজ্ঞাসা করলেন যে, "একো এবং আরো দুই-একটি খবরের কাগজে জুলুদের প্রতি ইংরেজ সৈন্যদের অত্যাচারের যে বিবরণ বেরিয়েছে, সে বিষয়ে গভর্নমেণ্ট কি কোনো সংবাদ পেয়েছেন? আর সে-সকল অত্যাচার কি খ্রীস্টানদের অনুচিত নয়?" অমনি গভর্নমেণ্টের দিক থেকে সার মাইকেল হিক্স্‌বিচ উঠে ও'ডোনেলকে কড়া কড়া দুই-এক কথা শুনিয়ে দিলেন, অমনি একে একে যত আইরিশ মেম্বার ছিলেন, সকলে উঠে তার কড়া কড়া উত্তর দিতে লাগলেন। এইরকম অনেকক্ষণ ঝগড়াঝাঁটি করে দুই পক্ষ শান্ত হয়ে বসলেন। উত্তর-প্রত্যুত্তরের ব্যাপার সমাপ্ত হলে পর যখন বক্তৃতা করবার সময় এল, তখন হাউস থেকে অধিকাংশ মেম্বার উঠে চলে গেলেন। দুই-একটা বক্তৃতার পর ব্রাইট উঠে সিভিল সার্ভিসের রাশি রাশি দরখাস্ত হাউসে দাখিল করলেন। বৃদ্ধ ব্রাইটকে দেখলে অত্যন্ত ভক্তি হয়, তাঁর মুখে ঔদার্য ও দয়া যেন মাখানো। দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রাইট সেদিন কিছু বক্তৃতা করলেন না। হাউসে অতি অল্প মেম্বারই অবশিষ্ট ছিলেন,

যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই নিদ্রার আয়োজন করছিলেন, এমন সময় গ্ল্যাডস্টোন উঠলেন। গ্ল্যাডস্টোন ওঠবামাত্র সমস্ত ঘর একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল, গ্ল্যাডস্টোনের স্বর শুনতে পেয়ে আস্তে আস্তে বাইরে থেকে দলে দলে মেম্বার আসতে লাগলেন, দুই দিকের বেঞ্চি পুরে গেল। তখন পূর্ণ উৎসের মতো গ্ল্যাডস্টোনের বক্তৃতা উৎসারিত হতে লাগল। কিছুমাত্র চীৎকার, তর্জনগর্জন ছিল না, অথচ তাঁর প্রতি কথা, ঘরের যেখানে যে-কোনো লোক বসেছিল, সকলেই একেবারে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল। গ্ল্যাডস্টোনের কী একরকম দৃঢ়স্বরে বলবার ধরন আছে, তাঁর প্রতি কথা মনের ভিতর গিয়ে যেন জোর করে বিশ্বাস জন্মিয়ে দেয়। একটা কথায় জোর দেবার সময় তিনি মুষ্টি বদ্ধ করে একেবারে নুয়ে নুয়ে পড়েন, যেন প্রত্যেক কথা তিনি একেবারে নিংড়ে নিংড়ে বের করছেন। আর সেইরকম প্রতি জোর-দেওয়া কথা দরজা ভেঙে চুরে যেন মনের ভিতর প্রবেশ করে। গ্ল্যাডস্টোন অনর্গল বলেন বটে কিন্তু তাঁর প্রতি কথা ওজন করা, তার কোনো অংশ অসম্পূর্ণ নয়; তিনি বক্তৃতার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্বরে জোর দিয়ে বললেন না, কেননা সে-রকম বলপূর্বক বললে স্বভাবতই শ্রোতাদের মন তার বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে দাঁড়ায়। তিনি যে-কথায় জোর দেওয়া আবশ্যক মনে করেন, সেই কথাতেই জোর দেন; তিনি খুব তেজের সঙ্গে বলেন বটে কিন্তু চীৎকার করে বলেন না, মনে হয় যা বলছেন, তাতে তাঁর নিজের খুব আন্তরিক বিশ্বাস।

গ্ল্যাডস্টোনের বক্তৃতাও যেমন থামল, অমনি হাউস শূন্যপ্রায় হয়ে গেল, দু-দিকের বেঞ্চিতে ছ-সাত জনের বেশি আর লোক ছিল না। গ্ল্যাডস্টোনের পর স্মলেট যখন বক্তৃতা আরম্ভ করলেন তখন দুই দিককার বেঞ্চিতে লোক ছিল না বললেও হয়; কিন্তু তিনি ক্ষান্ত হবার পাত্র নন, শূন্য হাউসকে সম্বোধন করে অত্যন্ত দীর্ঘ এক বক্তৃতা করলেন। সেই অবকাশে আমি অত্যন্ত দীর্ঘ এক নিদ্রা দিই। দুই-একজন মেম্বার, যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা কেউ বা পরস্পর গল্প করছিলেন, কেউ বা চোখের উপর টুপি টেনে দিয়ে ডিসরেলির পদচ্যুতির পর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখছিলেন।

হাউসে আইরিশ মেম্বারদের ভারি মুশকিল; তাঁরা যখন বক্তৃতা করতে ওঠেন, তখন চার দিক থেকে ঘোরতর কোলাহল আরম্ভ হয়, মেম্বারেরা হাঁসের মতো "ইয়া" "ইয়া" করে চেঁচাতে থাকে। বিদ্রূপাত্মক "হিয়ার" "হিয়ার" শব্দে বক্তার স্বর ডুবে যায়। এইরকম বাধা পেয়ে বক্তা আর আত্মসংবরণ করতে পারেন না, খুব জ্বলে ওঠেন, আর তিনি যতই রাগ করতে থাকেন ততই হাস্যাস্পদ হন। আইরিশ

মেম্বারেরা এই রকম জ্বালাতন হয়ে আজকাল শোধ তুলতে আরম্ভ করেছেন। হাউসে যে-কোনো কথা ওঠে, প্রায় সকল বিষয়েই তাঁরা বাধা দেন, আর প্রতি প্রস্তাবে এক জনের পর আর-এক জন করে উঠে দীর্ঘকালব্যাপী বক্তৃতায় হাউসকে বিব্রত করে তোলেন।

পঞ্চম পত্র

বিলেতে নতুন এসেই বাঙালিদের চোখে কোন্ জিনিস্ ঠেকে, বিলিতি সমাজে নতুন মিশে প্রথমে বাঙালিদের কী রকম লাগে, সে-সকল বিষয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আপাতত কিছু বলব না। কেননা, এ-সকল বিষয় আমার বিচার করবার অধিকার নেই, যাঁরা পূর্বে অনেক কাল বিলেতে ছিলেন ও বিলেত যাঁরা খুব ভালো করে চেনেন তাঁরা আমাকে সঙ্গে করে এনেছেন, আর তাঁদের সঙ্গেই আমি বাস করছি। বিলেতে আসবার আগেই বিলেতের বিষয় তাঁদের কাছে অনেক শুনতে পেতেম, সুতরাং এখানে এসে খুব অল্প জিনিস নিতান্ত নতুন মনে হয়েছে। এখানকার লোকের সঙ্গে মিশতে গিয়ে প্রতি পদে হুঁচট খেয়ে খেয়ে আচার-ব্যবহার আমাকে শিখতে হয় নি। তাই ভাবছি যে, আমার নিজের অভিজ্ঞতার বিষয় আপাতত তোমাদের কিছু বলব না। এখানকার দুই-এক জন বাঙালির মুখে তাঁদের যে-রকম বিবরণ শুনেছি তাই তোমাদের লিখছি।

জাহাজে তো তাঁরা উঠলেন। যাত্রীদের সেবার জন্যে জাহাজে অনেক ইংরেজ চাকর থাকে তাদের নিয়েই প্রথম গোল বাধে। এঁরা অনেকে তাদের "সার" "সার" বলে সম্বোধন্ করতেন, তাদের কোনো কাজ করতে হুকুম দিতে তাঁদের বাধো-বাধো করত। জাহাজে তাঁরা অত্যন্ত সসংকোচ ভাবে থাকতেন। তাঁরা বলেন, সকল বিষয়েই তাঁদের যে ও-রকম সংকোচ বোধ হত, সেটা কেবল ভয়ে নয়, তার সঙ্গে কতকটা লজ্জাও আছে। যে-কাজ করতে যান, মনে হয় পাছে বেদস্তুর হয়ে পড়ে। জাহাজে ইংরেজদের সঙ্গে মেশা বড়ো হয়ে ওঠে না। তারা টাটকা ভারতবর্ষ থেকে আসছে, 'হুজুর ধর্মাবতার'গণ দেশী লোক দেখলে নাক তুলে, ঘাড় বেঁকিয়ে চলে যায়। মাঝে মাঝে ভদ্র ইংরেজ দেখতে পাবে, তাঁরা তোমাকে নিতান্ত সঙ্গিহীন দেখে তোমার সঙ্গে মিশতে চেষ্টা করবেন, তাঁরা যথার্থ ভদ্র, অর্থাৎ ভদ্র ও উচ্চ পরিবারের লোক। এখানকার গলিতে গলিতে যে 'জন-জোন্‌স্-টমাস'গণ কিলবিল করছে, তারা

ভারতবর্ষের যে-অঞ্চলে পদার্পণ করে, সে-অঞ্চলে ঘরে ঘরে তাদের নাম রাষ্ট্র হয়ে যায়, যে-রাস্তায় তারা চাবুক হস্তে ঘোড়ায় চড়ে যায় (হয়তো সে চাবুক কেবলমাত্র ঘোড়ার জন্যেই নয়) সে রাস্তাসুদ্ধ লোক শশব্যস্ত হয়ে তাদের পথ ছেড়ে দেয়, তাদের এক-একটা ইঙ্গিতে ভারতবর্ষের এক-একটা রাজার সিংহাসন কেঁপে ওঠে, এ-রকম অবস্থায় তাদের যে বিকৃতি ঘটে আমি তো তাতে বিশেষ অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পাই নে। কোনো জন্মে যে-মানুষ ঘোড়া চালায় নি, তাকে ঘোড়া চালাতে দাও, ঘোড়াকে চাবুক মেরে মেরেই জর্জরিত করবে; সে জানে না যে, একটু লাগাম টেনে দিলেই তাকে চালানো যায়। কিন্তু মাঝে মাঝে এক-একটি ভদ্র সাহেবকে দেখা যায়, তাঁরা অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ানত্বের ঘোরতর সংক্রামক রোগের মধ্যে থেকেও বিশুদ্ধ থাকেন, অপ্রতিহত প্রভুত্ব ও ক্ষমতা পেয়েও উদ্ধত গর্বিত হয়ে ওঠেন না। সমাজ-শৃঙ্খল ছিন্ন হয়ে, সহস্র সেবকদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে ভারতবর্ষে থাকা উন্নত ভদ্র মনের একপ্রকার অগ্নিপরীক্ষা।

যা হ'ক, এত ক্ষণে জাহাজ সাউথাম্পটনে এসে পৌঁচেছে। বঙ্গীয় যাত্রীরা বিলেতে এসে পৌঁছলেন। লণ্ডন উদ্দেশে চললেন। ট্রেন থেকে নাববার সময় একজন ইংরেজ গার্ড এসে উপস্থিত। বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে, তাঁদের কী প্রয়োজন আছে, কী করে দিতে হবে। তাঁদের মোট নাবিয়ে দিলে, গাড়ি ডেকে দিলে, তাঁরা মনে মনে বললেন, "বাঃ! ইংরেজরা কী ভদ্র!" ইংরেজরা যে এত ভদ্র হতে পারে, তা তাঁদের জ্ঞান ছিল না। তার হস্তে একটি শিলিং গুঁজে দিতে হল বটে। তা হ'ক, একজন নবাগত বঙ্গ-যুবক একজন যে-কোনো শ্বেতাঙ্গের কাছ থেকে একটিমাত্র সেলাম পেতে, অকাতরে এক শিলিং ব্যয় করতে পারেন। আমি যাদের কাছ থেকে সব কথা শুনতে পাই, তাঁরা অনেক বৎসর বিলেতে আছেন, বিলেতের নানাপ্রকার ছোটোখাটো জিনিস দেখে তাঁদের প্রথম কী রকম মনে হয়েছিল, তা তাঁদের স্পষ্ট মনে নেই। যে-সব বিষয়ে তাঁদের বিশেষ মনে লেগেছিল, তাই এখনো তাঁদের মনে আছে।

তাঁরা বিলেতে আসবার পূর্বে তাঁদের বিলিতি বন্ধুরা এখানে তাঁদের জন্যে ঘর ঠিক করে রেখেছিলেন। ঘরে ঢুকে দেখেন, ঘরে কার্পেট পাতা, দেয়ালে ছবি টাঙানো, একটা বড়ো আয়না এক জায়গায় ঝোলানো, কৌচ, কতকগুলি চৌকি, দুই-একটা কাঁচের ফুলদানি, এক পাশে একটি ছোটো পিয়ানো। কী সর্বনাশ! তাঁদের বন্ধুদের ডেকে বললেন, "আমরা কি এখেনে বড়োমানুষি করতে এসেছি? আমাদের বাপু বেশি টাকাকড়ি নেই, এ রকম ঘরে থাকা আমাদের পোষাবে না!" বন্ধুরা অত্যন্ত

আমোদ পেলেন, কারণ তখন তাঁরা একেবারে ভুলে গেছেন যে বহুপূর্বে তাঁদেরও একদিন এইরকম দশা ঘটেছিল। নবাগতদের নিতান্ত অন্নজীবী বাঙালি মনে করে অত্যন্ত বিজ্ঞতার স্বরে বললেন, "এখানকার সকল ঘরই এইরকম!" নবাগত ভাবলেন, আমাদের দেশে সেই একটা স্যাঁতসেঁতে ঘরে একটা তক্তা ও তার উপরে একটা মাদুর পাতা, ইতস্তত হুঁকোর বৈঠক, কোমরে একটুখানি কাপড় জড়িয়ে জুতোজোড়া খুলে দু-চার জন মিলে শতরঞ্চ খেলা চলছে, বাড়ির উঠোনে একটা গোরু বাঁধা, দেয়ালে গোবর দেওয়া, বারান্দা থেকে ভিজে কাপড় শুকোচ্ছে ইত্যাদি। তাঁরা বলেন, প্রথম প্রথম দিনকতক চৌকিতে বসতে, কৌচে শুতে, টেবিলে খেতে কার্পেটে বিচরণ করতে অত্যন্ত সংকোচ বোধ হত। সোফায় অত্যন্ত আড় হয়ে বসতেন, ভয় হত, পাছে সোফা ময়লা হয়ে যায় বা তার কোনোপ্রকার হানি হয়। মনে হত, সোফাগুলো কেবল ঘর সাজাবার জন্যেই রেখে দেওয়া, এগুলো ব্যবহার করতে দিয়ে মাটি করা কখনোই ঘরের কর্তার অভিপ্রেত হতে পারে না। ঘরে এসে প্রথম মনের ভাব তো এই, তার পরে আর-একটি প্রধান কথা বলা বাকি।

বিলেতে ছোটোখাটো বাড়িতে "বাড়িওআলা" বলে একটা জীবের অস্তিত্ব আছে হয়তো, কিন্তু যাঁরা বাড়িতে থাকেন "বাড়িওআলী"র সঙ্গেই তাঁদের সমস্ত সম্পর্ক। ভাড়া চুকিয়ে দেওয়া, কোনোপ্রকার বোঝাপড়া, আহারাদির বন্দোবস্ত করা, সে সমস্তই বাড়িওআলীর কাছে। আমার বন্ধুরা যখন প্রথম পদার্পণ করলেন, দেখলেন, এক ইংরেজনী এসে অতি বিনীত স্বরে তাঁদের 'সুপ্রভাত' অভিবাদন করলে, তাঁরা নিতান্ত শশব্যস্ত হয়ে ভদ্রতার যথাযোগ্য প্রতিদান দিয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু যখন তাঁরা দেখলেন, তাঁদের অন্যান্য ইঙ্গবঙ্গ বন্ধুগণ তাঁর সঙ্গে অতি অসংকুচিত স্বরে কথাবার্তা আরম্ভ করে দিলেন, তখন আর তাঁদের বিস্ময়ের আদি অন্ত রইল না। মনে করো এক সজীব বিবিসাহেব জুতো-পরা, টুপি-পরা, গাউন-পরা! তখন ইঙ্গবঙ্গ বন্ধুদের উপর সেই নবাগত বঙ্গযুবকদের ভক্তির উদয় হল, কোনো কালে যে এই অসমসাহসিকদের মতো তাঁদেরও বুকের পাটা জন্মাবে, তা তাঁদের সম্ভব বোধ হল না। যা হ'ক, এই নবাগতদের যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে ইঙ্গবঙ্গ বন্ধুগণ স্ব স্ব আলয়ে গিয়ে সপ্তাহকাল ধরে তাঁদের অজ্ঞতা নিয়ে অপর্যাপ্ত হাস্যকৌতুক করলেন। পূর্বোক্ত গৃহকর্ত্রী প্রত্যহ নবাগতদের অতি বিনীতভাবে, কী চাই, কী না চাই, জিজ্ঞাসা করতে আসত। তাঁরা বলেন, এই উপলক্ষে তাঁদের অত্যন্ত আহ্লাদ হত। তাঁদের মধ্যে একজন বলেন, প্রথম দিন যেদিন তিনি এই ইংরেজ মেয়েকে একটুখানি ধমকাতে পেরেছিলেন, সেদিন সমস্ত দিন তাঁর মন অত্যন্ত প্রফুল্ল

ছিল। অথচ সেদিন সূর্য পশ্চিম দিকে ওঠে নি, পর্বত চলাফেরা করে বেড়ায় নি, বহ্নিও শীতলতা প্রাপ্ত হয় নি।

কার্পেট মোড়া ঘরে তাঁরা সুখে বাস করছেন। তাঁরা বলেন, "আমাদের দেশে নিজের ঘর বলে একটা স্বতন্ত্র পদার্থ ছিল না; যে-ঘরে বসতেম, সে-ঘরে বাড়ির দশজনে যাতায়াত করছেই। আমি একপাশে লিখছি, দাদা একপাশে একখানা বই হাতে করে ঢুলছেন, আর-এক দিকে মাদুর পেতে গুরুমশায় ভুলুকে উচ্চৈঃস্বরে সুর করে করে নামতা পড়াচ্ছেন। এখানে আমার নিজের ঘর; সুবিধামত করে বইগুলি এক দিকে সাজালেম, লেখবার সরঞ্জাম একদিকে গুছিয়ে রাখলেম, কোনো ভয় নেই যে, একদিন পাঁচটা ছেলে মিলে সমস্ত ওলট-পালট করে দেবে, আর-একদিন ছুটোর সময় কলেজ থেকে এসে দেখব, তিনটে বই পাওয়া যাচ্ছে না, অবশেষে অনেক খোঁজ-খোঁজ করে দেখা যাবে বইগুলি নিয়ে আমার ছোটো ভাগ্নীটি তাঁর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহচরীদের ডেকে ছবি দেখতে ঘোরতর ব্যস্ত। এখানে নিজের ঘরে বসে থাকো, দরজাটি ভেজানো, সট করে না বলে কয়ে কেউ ঘরের মধ্যে এসে পড়ে না, ঘরে ঢোকবার আগে দরজায় শব্দ করে, ছেলেপিলেগুলো চারিদিকে চেঁচামেচি কান্নাকাটি জুড়ে দেয় নি, নিরিবিলি নিরালা, কোনো হাঙ্গামা নেই।" দেশের সম্বন্ধে মেজাজ খিটখিটে হয়ে ওঠে। প্রায় দেখা যায় আমাদের দেশের পুরুষেরা এখানকার পুরুষ-সমাজে বড়ো মেশেন না। কারণ এখানকার পুরুষসমাজে মিশতে গেলে একরকম বলিষ্ঠ স্ফূর্তির ভাব থাকা চাই, বাধো-বাধো মিঠে সুরে দু-চারটে সসংকোচ 'হাঁ না' দিয়ে গেলে চলে না। বাঙালি অভ্যাগত ডিনার টেবিলে তাঁর পার্শ্বস্থ মহিলাটির কানে কানে মিষ্টি মিষ্টি টুকরো টুকরো দুই-একটি কথা মৃদু ধীর স্বরে কইতে পারেন, আর সে মহিলার সহবাসে তিনি যে স্বর্গ-সুখ উপভোগ করছেন, তা তাঁর মাথার চুল থেকে বুট জুতোর আগা পর্যন্ত প্রকাশ হতে থাকে, সুতরাং মেয়ে-সমাজে বাঙালিরা পসার করে নিতে পারেন। আমাদের দেশে ঘোমটাচ্ছন্ন-মুখচন্দ্র-শোভী অনালোকিত অন্তঃপুর থেকে এখানকার রূপের মুক্ত জ্যোৎস্নায় এসে আমাদের মন-চকোর প্রাণ খুলে গান গেয়ে ওঠে।

এক দিন আমাদের নবাগত বঙ্গযুবক তাঁর প্রথম ডিনারের নিমন্ত্রণে গিয়েছেন। নিমন্ত্রণসভায় বিদেশীর অত্যন্ত সমাদর। তিনি গৃহস্বামীর যুবতী কন্যা মিস অমুকের বাহু গ্রহণ করে আহারের টেবিলে গিয়ে বসলেন। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মুক্তভাবে মিশতে পাই নে, তার পরে নতুন নতুন এসে এখানকার স্ত্রীলোকদের ভাবও ঠিক বুঝতে পারি নে। কোনো সামাজিকতার অনুরোধে তারা আমাদের

মনোরঞ্জন করবার জন্যে যে-সকল কথাবার্তা হাস্যালাপ করে, আমরা তার ঠিক মর্ম-গ্রহণ করতে পারি নে, আমরা হঠাৎ মনে করি, আমাদের উপরেই এই মহিলাটির বিশেষ অনুকূল দৃষ্টি। আমাদের বঙ্গযুবকটি মিসকে ভারতবর্ষ সংক্রান্ত অনেক কথা জানালেন। বললেন তাঁর বিলেত অত্যন্ত ভালো লাগে, ভারতবর্ষ ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না, ভারতবর্ষে অনেক প্রকার কুসংস্কার আছে। শেষকালে দুই-একটি সাজানো কথাও বললেন। যথা, তিনি সুন্দরবনে বাঘ শিকার করতে গিয়ে একবার মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিলেন। মিসটি অতি সহজে বুঝতে পারলেন যে, এই যুবকের তাঁকে অত্যন্ত ভালো লেগেছে। তিনি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হলেন ও তাঁর মিষ্টতম বাক্যবাণ যুবকের প্রাণে হানতে লাগলেন। "আহা, কী গোছালো কথা! কোথায় আমাদের দেশের মেয়েদের মুখের সেই নিতান্ত শ্রমলভ্য দুই-একটি 'হাঁ না' যা এত মৃদু যে ঘোমটার সীমার মধ্যেই মিলিয়ে যায়; আর কোথায় এখানকার বিম্বোষ্ঠ-নিঃসৃত অজস্র মধুধারা, যা অযাচিতভাবে মদিরার মতো শিরায় শিরায় প্রবেশ করে!"

হয়তো বুঝতে পারছ, কী কী মসলার সংযোগে বাঙালি বলে একটা পদার্থ ক্রমে ইঙ্গবঙ্গ নামে একটা খিচুড়িতে পরিণত হয়। সমস্ত প্রক্রিয়াটা বিস্তারিত করে লিখতে পারি নি। এত সব ছোটো ছোটো বিষয়ের সমষ্টি মানুষের মনে অলক্ষিত পরিবর্তন উপস্থিত করে যে, সে-সকল খুঁটিনাটি করে বর্ণনা করতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায়।

ইঙ্গবঙ্গদের ভালো করে চিনতে গেলে তাদের তিন রকম অবস্থায় দেখতে হয়। তাঁরা ইংরেজদের সম্মুখে কী রকম ব্যবহার করেন, বাঙালিদের সম্মুখে কী রকম ব্যবহার করেন ও তাঁদের স্বজাত ইঙ্গবঙ্গদের সম্মুখে কী রকম ব্যবহার করেন। একটি ইঙ্গবঙ্গকে একজন ইংরেজের সম্মুখে দেখো, চক্ষু জুড়িয়ে যাবে। ভদ্রতার ভারে প্রতি কথায় ঘাড় নুয়ে নুয়ে পড়ছে, তর্ক করবার সময় অতিশয় সাবধানে নরম করে প্রতিবাদ করেন ও প্রতিবাদ করতে হল বলে অপর্যাপ্ত দুঃখ প্রকাশ করেন, অসংখ্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কথা কন আর না কন, একজন ইংরেজের কাছে একজন ইঙ্গবঙ্গ চুপ করে বসে থাকলেও তাঁর প্রতি অঙ্গভঙ্গী, প্রতি মুখের ভাবে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ হতে থাকে। কিন্তু তাকেই আবার তাঁর স্বজাতিমণ্ডলে দেখো, দেখবে তাঁর মেজাজ। বিলেতে যিনি তিন বৎসর আছেন, এক বৎসরের বিলেতবাসীর কাছে তাঁর অত্যন্ত পায়া ভারি। এই তিন বৎসর ও এক বৎসরের মধ্যে যদি কখনো তর্ক ওঠে, তা হলে তুমি "তিন বৎসরের" প্রতাপটা একবার

দেখতে পাও। তিনি প্রতি কথা এমন ভাবে, এমন স্বরে বলেন যে, যেন সেই কথাগুলি নিয়ে সরস্বতীর সঙ্গে তাঁর বিশেষ বোঝাপড়া হয়ে একটা স্থিরসিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। যিনি প্রতিবাদ করছেন তাঁকে তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলেন 'ভ্রান্ত', কখনো বা মুখের উপর বলেন 'মূর্খ'।

সেদিন এক জন গল্প করছিলেন যে তাঁকে আর-এক জন বাঙালি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, "মশায়ের কী কাজ করা হয়?" এই গল্প শুনবামাত্র আমাদের একজন ইঙ্গবঙ্গ বন্ধু নিদারুণ ঘৃণার সঙ্গে বলে উঠলেন, "দেখুন দেখি, কী বার্বারস!" ভাবটা এই যে, যেমন মিথ্যে কথা না বলা, চুরি না করা, নীতি-শাস্ত্রের কতকগুলি মূল নিয়ম, তেমনি অন্য মানুষকে তার জীবিকার কথা জিজ্ঞাসা না করাও একটা মূল নিয়মের মধ্যে।

সেদিন এক জায়গায় আমাদের দেশের শ্রাদ্ধের কথা হচ্ছিল, বাপ-মার মৃত্যুর পর আমরা হবিষ্য করি, বেশভূষা করি নে ইত্যাদি। শুনে একজন ইঙ্গবঙ্গ যুবক অধীর ভাবে আমাকে বলে উঠলেন যে, "আপনি অবিশ্যি, মশায়, এ-সকল অনুষ্ঠান ভালো বলেন না।" আমি বললেম, "কেন নয়? আমি দেখছি ইংরেজেরা যদি আত্মীয়ের মৃত্যু উপলক্ষ্যে হবিষ্যান্ন খেত, আর আমাদের দেশের লোকেরা না খেত, তা হলে হবিষ্যান্ন খায় না বলে আমাদের দেশের লোকের উপর তোমার দ্বিগুণতর ঘৃণা হত ও মনে করতে হবিষ্যান্ন খায় না বলেই আমাদের দেশের এত দুর্দশা।" তুমি হয়তো জানো, ইংরেজেরা এক টেবিলে তেরো জন খাওয়া অলক্ষণ মনে করে, তাদের বিশ্বাস তা হলে এক বৎসরের মধ্যে তাদের একজনের মৃত্যু হবেই। এক জন ইঙ্গবঙ্গ যখন নিমন্ত্রণ করেন তখন কোনোমতে তেরো জন নিমন্ত্রণ করেন না, জিজ্ঞাসা করলে বলেন, "আমি নিজে বিশ্বাস করি নে, কিন্তু যাঁদের নিমন্ত্রণ করি তাঁরা পাছে ভয় পান তাই বাধ্য হয়ে এ নিয়ম পালন করতে হয়।" সেদিন এক জন ইঙ্গবঙ্গ তাঁর একটি আত্মীয় বালককে রবিবার দিনে রাস্তায় খেলা করতে যেতে বারণ করছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করাতে বললেন, "রাস্তার লোকেরা কী মনে করবে?"

কতকগুলি বাঙালি বলেন, এখানকার মতো ঘর ভাড়া দেবার প্রথা তাঁরা আমাদের দেশে প্রচলিত করবেন। তাঁদের সেই একটিমাত্র সাধ। আর-এক জন বাঙালি বাংলা সমাজ সংস্কার করতে চান, বিলেতের সমাজে মেয়ে পুরুষে একত্রে নাচাটাই তাঁর চোখে অত্যন্ত ভালো লেগেছে। কতকগুলি সাধারণ বিষয়ে আমাদের দেশের ও এ-দেশের মেয়েদের অমিল দেখে তার পরে তিনি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ

বিষয় নিয়ে ছেলেমানুষের মতো খুঁতখুঁত করতে থাকেন। একজন ইঙ্গবঙ্গ নালিশ করছিলেন যে, আমাদের দেশের মেয়েরা পিয়ানো বাজাতে পারে না, ও এখানকার মতো ভিজিটারদের সঙ্গে দেখা করতে ও ভিজিট প্রত্যর্পণ করতে যায় না। এই রকম ক্রমাগত প্রতি ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে এ-দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের তুলনা করে করে তাঁদের চটাভাব চটনমান যন্ত্রে ব্লাড হীট ছাড়িয়ে ওঠে। একজন ইঙ্গবঙ্গ তাঁর সমবেদক বন্ধুদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে বলছিলেন যে, যখন তিনি মনে করেন যে, দেশে ফিরে গেলে তাঁকে চারি দিকে ঘিরে মেয়েগুলো প্যান প্যান করে কাঁদতে আরম্ভ করবে, তখন আর তাঁর দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না। অর্থাৎ তিনি চান যে, তাঁকে দেখবামাত্রই 'ডিয়ার ডার্লিং' বলে ছুটে এসে তাঁর স্ত্রী তাঁকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করে তাঁর কাঁধে মাথা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। ডিনারের টেবিলে কাঁটা ছুরি উল্‌টে ধরতে হবে, কি পাল্‌টে ধরতে হবে তাই জানবার জন্যে তাঁদের গবেষণা দেখলে তাঁদের উপর ভক্তির উদয় হয়। কোটের কোন ছাঁটটা ফ্যাশন-সংগত, আজকাল নোবিলিটি আঁট প্যান্টলুন পরেন কি ঢল্‌কো পরেন, ওয়ালট্‌স্‌ নাচেন কি পোলকা মজুর্কা, মাছের পর মাংস খান কি মাংসের পর মাছ, সে-বিষয়ে তাঁরা অভ্রান্ত খবর রাখেন। ওইরকম ছোটোখাটো বিষয়ে এক জন বাঙালি যত দস্তুর-বেদস্তুর নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, এমন এ-দিশি করে না। তুমি যদি মাছ খাবার সময় ছুরি ব্যবহার কর তবে এক জন ইংরেজ তাতে বড়ো আশ্চর্য হবেন না, কেননা তিনি জানেন তুমি বিদেশী, কিন্তু একজন ইঙ্গবঙ্গ সেখানে উপস্থিত থাকলে তাঁর স্মেলিং সল্‌টের আবশ্যক করবে। তুমি যদি শেরি খাবার গ্লাসে শ্যাম্পেন খাও তবে একজন ইঙ্গবঙ্গ তোমার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকবেন, যেন তোমার এই অজ্ঞতার জন্যে সমস্ত পৃথিবীর সুখ শান্তি নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছে। সন্ধ্যেবেলায় তুমি যদি মর্নিং কোট পর, তা হলে তিনি ম্যাজিস্ট্রেট হলে জেলে নির্জনবাসের আজ্ঞা দিতেন। এক জন বিলেত-ফেরতা কাউকে মটন দিয়ে রাই দিয়ে খেতে দেখলে বলতেন, "তবে কেন মাথা দিয়ে চল না?"

আর একটি আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করে দেখেছি যে, বাঙালিরা ইংরেজদের কাছে স্বদেশের লোকেদের ও আচার ব্যবহারের যত নিন্দে করেন, এমন এক জন ভারতদ্বেষী অ্যাংগ্লো ইণ্ডিয়ানও করেন না। তিনি নিজে ইচ্ছা করে কথা পাড়েন ও ভারতবর্ষের নানাপ্রকার কুসংস্কার প্রভৃতি নিয়ে প্রাণ খুলে হাস্যপরিহাস করেন। তিনি গল্প করেন যে, আমাদের দেশে বল্লভাচার্যের দল বলে একরকম বৈষ্ণবের দল আছে। তাদের সমস্ত অনুষ্ঠান সবিস্তারে বর্ণনা করতে থাকেন। সভার লোকদের হাসাবার

অভিপ্রায়ে, নেটিব নচ-গার্লরা কী রকম করে নাচে অঙ্গভঙ্গী করে তার নকল করেন ও তাই দেখে সকলে হাসলে আনন্দ উপভোগ করেন। তাঁর নিতান্ত ইচ্ছে, তাঁকে কেউ ভারতবর্ষীয় দলের মধ্যে গণ্য না করে। সাহেব-সাজা বাঙালিদের প্রতি পদে ভয়, পাছে তাঁরা বাঙালি বলে ধরা পড়েন। এক জন বাঙালি এক বার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, আর-এক জন ভারতবর্ষীয় এসে তাঁকে হিন্দুস্থানিতে দুই-এক কথা জিজ্ঞাসা করে, তিনি মহা খাপা হয়ে উত্তর না দিয়ে চলে যান। তাঁর ইচ্ছে, তাঁকে দেখে কেউ মনে না করতে পারে যে, তিনি হিন্দুস্থানি বোঝেন। একজন ইঙ্গবঙ্গ একটি 'জাতীয় সংগীত' রামপ্রসাদী সুরে রচনা করেছেন; এই গানটার একটু অংশ পূর্ব পত্রে লিখেছি, বাকি আর-একটুকু মনে পড়েছে, এই জন্য আবার তার উল্লেখ করছি। এ গীত যাঁর রচনা, তিনি রামপ্রসাদের মতো শ্যামার উপাসক নন, তিনি গৌরীভক্ত। এই জন্যে গৌরীকে সম্বোধন করে বলছেন,—

মা, এবার মলে সাহেব হব;
রাঙা চুলে হ্যাট বসিয়ে, পোড়া নেটিব নাম ঘোচাব।
সাদা হাতে হাত দিয়ে মা, বাগানে বেড়াতে যাব
(আবার) কালো বদন দেখলে পরে 'ডার্কি' বলে মুখ ফেরাব।

আমি পূর্বেই বিলাতে বাড়িওআলী শ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছি। তারা বাড়ির লোকদের আবশ্যকমত সেবা করে। অনেক ভাড়াটে থাকলে তারা চাকরানী রাখে বা অন্য আত্মীয়েরা তাদের সাহায্য করবার জন্যে থাকে। অনেকে সুন্দরী ল্যাণ্ডলেডি দেখে ঘর ভাড়া করেন। বাড়িতে পদার্পণ করেই ল্যাণ্ডলেডির যুবতী কন্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে নেন, দু-তিন দিনের মধ্যে তার একটি আদরের নামকরণ করা হয়, সপ্তাহ অতীত হলে তার নামে হয়তো একটা কবিতা রচনা করে তাকে উপহার দেন। সেদিন ল্যাণ্ডলেডির মেয়ে তাঁকে এক পেয়ালা চা এনে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, চায়ে কি চিনি দিতে হবে? তিনি হেসে বললেন, "না নেলি, তুমি যখন ছুঁয়ে দিয়েছ, তখন আর চিনি দেবার দরকার দেখছি নে!" আমি জানি, এক জন ইঙ্গবঙ্গ তাঁর বাড়ীর দাসীদের মেজদিদি সেজদিদি বলে ডাকতেন।

আমি এক জনকে জানি, তিনি তাঁর মেজদিদি-সেজদিদিবর্গকে এত মান্য করে চলতেন যে, তাঁর ঘরে বা তাঁর পাশের ঘরে যদি এদের মধ্যে কেউ উপস্থিত থাকত, এবং সে অবস্থায় যদি তাঁর কোনো ইঙ্গবঙ্গ বন্ধু গান বা হাস্যপরিহাস করতেন তা হলে তিনি মহা অপ্রতিভ হয়ে বলে উঠতেন, "আরে চুপ করো, চুপ করো, মিস এমিলি কী মনে করবেন?" আমার মনে আছে, দেশে থাকতে একবার এক ব্যক্তি

বিলেত থেকে ফিরে গেলে পর, আমরা তাকে খাওয়াই। খাবার সময় তিনি নিশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, "এই আমি প্রথম খাচ্ছি, যেদিন আমার খাবার টেবিলে কোনো লেডি নেই।" এক জন ইঙ্গবঙ্গ একবার তাঁর কতকগুলি বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। খাবার টেবিলে কতকগুলি ল্যাণ্ডলেডি ও দাসী বসে ছিল, তাদের এক জনের ময়লা কাপড় দেখে নিমন্ত্রণকর্তা তাকে কাপড় বদলে আসতে অনুরোধ করেছিলেন। শুনে সে বললে, "যাকে ভালোবাসা যায়, তাকে ময়লা কাপড়েও ভালোবাসা যায়।"

এইবার ইঙ্গবঙ্গদের একটি গুণের কথা তোমাকে বলছি। এখানে যাঁরা আসেন, অনেকেই কবুল করেন না যে তাঁরা বিবাহিত, যেহেতু স্বভাবতই যুবতী কুমারী-সমাজে বিবাহিতদের দাম অল্প। অবিবাহিত বলে পরিচয় দিলে এখানকার অবিবাহিতদের সঙ্গে মিশে অনেক যথেচ্ছাচার করা যায়, কিন্তু বিবাহিত বলে জানলে তোমার অবিবাহিত সঙ্গীরা ও-রকম অনিয়ম করতে দেয় না; সুতরাং অবিবাহিত বলে পরিচয় দিলে অনেক লাভ আছে।

অনেক ইঙ্গবঙ্গ দেখতে পাবে তাঁরা আমার এই বর্ণনার বহির্গত। কিন্তু সাধারণত ইঙ্গবঙ্গত্বের লক্ষণগুলি আমি যতদূর জানি তা লিখেছি।

ভারতবর্ষে গিয়ে ইঙ্গবঙ্গদের কী রকম অবস্থা হয় সে-বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতাও নেই, বক্তব্যও নেই। কিন্তু কিছু কাল ভারতবর্ষে থেকে তার পরে ইংলণ্ডে এলে কী রকম ভাব হয় তা আমি অনেকের দেখেছি। তাঁদের ইংলণ্ড আর তেমন ভালো লাগে না; অনেক সময়ে তাঁরা ভেবে পান না, ইংলণ্ড বদলেছে, কি তাঁরা বদলেছেন। আগে ইংলণ্ডের অতি সামান্য জিনিস ভালো লাগত; এখন ইংলণ্ডের শীত ইংলণ্ডের বর্ষা তাঁদের ভালো লাগছে না, এখন তাঁরা ভারতবর্ষে ফিরে যেতে হলে দুঃখিত হন না। তাঁরা বলেন, আগে তাঁরা ইংলণ্ডের স্ট্রবেরি ফল অত্যন্ত ভালোবাসতেন। এমন কি, তাঁরা যত রকম ফল খেয়েছেন তার মধ্যে স্ট্রবেরিই তাঁদের সকলের চেয়ে স্বাদু মনে হত। কিন্তু এই কয় বৎসরের মধ্যে স্ট্রবেরির স্বাদ বদলে গেল নাকি। এখন দেখছেন তার চেয়ে অনেক দিশি ফল তাঁদের ভালো লাগে। আগে ডেভন-শিয়রের ক্রীম তাদের এত ভালো লাগত যে, তার আর কথা নেই, কিন্তু এখন দেখছেন আমাদের দেশের ক্ষীর তার চেয়ে ঢের ভালো। তাঁরা ভারতবর্ষে গিয়ে স্ত্রীপুত্রপরিবার নিয়ে সংসারী হয়ে পড়েন, রোজগার করতে আরম্ভ করেন, ভারতবর্ষের মাটিতে তাদের শিকড় এক রকম বসে যায়। মনটা কেমন শিথিল হয়ে আসে, তখন পায়ের উপর পা দিয়ে টানা পাখার বাতাস খেয়ে কোনোপ্রকারে দিন কাটিয়ে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত থাকেন। বিলেতে আমোদ বিলাস ভোগ করতে গেলেও

অনেক উদ্যমের আবশ্যক করে। এখানে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যেতে হলে গাড়ির চলন নেই, হাত-পা নাড়তে চাড়তে দশটা চাকরের উপর নির্ভর করলে চলে না। গাড়িভাড়া অত্যন্ত বেশি, আর চাকরের মাইনে মাসে সাড়ে তিন টাকা নয়। থিয়েটার দেখতে যাও; সন্ধ্যেবেলা বৃষ্টি পড়ছে, পথে কাদা, একটা ছাতা ঘাড়ে করে মাইল কতক ছুটোছুটি করে তবে ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারবে। যখন রক্তের তেজ থাকে তখন এ-সকল পেরে ওঠা যায়।

ষষ্ঠ পত্র

আমাদের ব্রাইটনের বাড়িটি, সমুদ্রের কাছে একটি নিরালা জায়গায়। এক সার কুড়ি-পঁচিশটি বাড়ি, বাড়িগুলির নাম মেডিনা ভিলাজ। হঠাৎ মনে হয়েছিল বাগান-বাড়ি। এখানে এসে দেখি, 'ভিলা'ত্বর মধ্যে আমাদের বাড়ির সামনে দু-চার হাত জমিতে দু-চারটে গাছ পোঁতা আছে। বাড়ির দরজায় একটা লোহার কড়া লাগানো, সেইটেতে ঠক ঠক করলেম, আমাদের ল্যাণ্ডলেডি এসে দরজা খুলে দিলে। আমাদের দেশের তুলনায় এখানকার ঘরগুলো লম্বা চওড়া ও উঁচুতে ঢের ছোটো। চারিদিকে জানলা বন্ধ, একটু বাতাস আসবার জো নেই, কেবল জানলাগুলো সমস্ত কাঁচের বলে আলো আসে। শীতের পক্ষে এ-রকম ছোটোখাটো ঘরগুলো ভালো, একটু আগুন জ্বাললেই সমস্ত বেশ গরম হয়ে ওঠে, কিন্তু তা হ'ক, যেদিন মেঘে চারদিক অন্ধকার টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, তিন-চার দিন ধরে মেঘ-বৃষ্টি-অন্ধকারের এক মুহূর্ত বিরাম নেই, সেদিন এই ছোটো অন্ধকার ঘরটার এক কোণে বসে আমার মনটা অত্যন্ত বিগড়ে যায়, কোনোমতে সময় কাটে না। খালি আমি বলে নয়, আমার ইংরেজ আলাপীরা বলেন সে-রকম দিনে তাঁদের অত্যন্ত swear করার প্রবৃত্তি জন্মায় (swear করা রোগটা সম্পূর্ণ য়ুরোপীয়, সুতরাং ওর বাংলা কোনো নাম নেই), মনের ভাবটা অধার্মিক হয়ে ওঠে। যা হ'ক এখানকার ঘর-দুয়ারগুলি বেশ পরিষ্কার; বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলে কোথাও ধুলো দেখবার জো নেই, মেজের সর্বাঙ্গ কার্পেট প্রভৃতি দিয়ে মোড়া, সিঁড়িগুলি পরিষ্কার তক তক করছে। চোখে দেখতে খারাপ হলে এরা সইতে পারে না। প্রতি সামান্য বিষয়ে এদের ভালো দেখতে হওয়াটা প্রধান আবশ্যক। শোকবস্ত্রও সুশ্রী দেখতে হওয়া

চাই। আমরা যাকে পরিষ্কার বলি সেটা কিন্তু আর একটা জিনিস। এখানকার লোকেরা খাবার পরে আঁচায় না, কেন না আঁচানো জল মুখ থেকে পড়ছে সে অতি কুশ্রী দেখায়। শ্রী হানি হয় বলে পরিষ্কার হওয়া হয় না। এখানে যে-রকম কাসি-সর্দির প্রাদুর্ভাব, তাতে ঘরে একটা পিকদান নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু তার ব্যবহার কুশ্রী বলে ঘরে রাখা হয় না, রুমালে সমস্ত কাজ চলে। আমাদের দেশের যে রকম পরিষ্কার ভাব, তাতে আমরা বরঞ্চ ঘরে একটা পিকদানি রাখতে পারি, কিন্তু জামার পকেটে এ-রকম একটা বীভৎস পদার্থ বহন করতে ঘৃণা হয়। কিন্তু এখানে চোখেরই আধিপত্য। রুমাল কেউ দেখতে পাবে না, তা হলেই হল। চুলটি বেশ পরিষ্কার করে আঁচড়ানো থাকবে, মুখটি ও হাত দুটি সাফ থাকবে, স্নান করবার বিশেষ দরকার নেই। এখানে জামার উপরে অন্যান্য অনেক কাপড় পরে বলে জামার সমস্তটা দেখা যায় না, খালি বুকের ও হাতের কাছে একটু বেরিয়ে থাকে। একরকম জামা আছে, তার যতটুকু বেরিয়ে থাকে ততটুকু জোড়া দেওয়া, সেটুকু খুলে ধোবার বাড়ি দেওয়া যায়; তাতে সুবিধে হচ্ছে যে ময়লা হয়ে গেলে জামা বদলাবার কোনো আবশ্যক করে না, সেই জোড়া টুকরোগুলো বদলালেই হল। এখানকার দাসীদের কোমরে এক আঁচল বাঁধা থাকে, সেইটি দিয়ে তারা না পোঁছে এমন পদার্থ নেই; খাবার কাঁচের প্লেট যে দেখছ ঝক্ ঝক্ করছে, সেটিও সেই সর্ব-পাবক-আঁচল দিয়ে মোছা হয়েছে, কিন্তু তাতে কী হানি, কিছু খারাপ দেখাচ্ছে না। এখানকার লোকেরা অপরিষ্কার নয়, আমাদের দেশে যাকে 'নোংরা' বলে তাই। এখানে পরিষ্কার ভাবের যে অভাব আমরা দেখতে পাই, সে অনেকটা শীতের জন্যে। আমরা যে-কোনো জিনিস হ'ক না কেন, জল দিয়ে পরিষ্কার না হলে পরিষ্কার মনে করি নে। এখানে অত জল নিয়ে নাড়াচাড়া পোষায় না। তাছাড়া শীতের জন্য এখানকার জিনিসপত্র শীঘ্র নোংরা হয়ে ওঠে না। এখানে শীতে ও গায়ের আবরণ থাকাতে শরীর তত অপরিষ্কার হয় না। এখানে জিনিসপত্র পচে ওঠে না। এইরকম পরিষ্কারের পক্ষে নানা বিষয়ে সুবিধে। আমাদের যেমন পরিষ্কার ভাব আছে, তেমনি পরিষ্কার হওয়ার বিষয়ে অনেক ঢিলেমিও আছে। আমাদের দেশের পুষ্করিণীতে কী না ফেলে? অপরিষ্কার জলকুণ্ডের স্নান; তেল মেখে দুটো ডুব দিলেই আমরা শুচিতা কল্পনা করি। আমরা নিজের শরীর ও খাওয়া-দাওয়া সংক্রান্ত জিনিসের বিষয়ে বিশেষ পরিষ্কার থাকি, কিন্তু ঘরদুয়ার যথোচিত পরিষ্কার করি নে। এমন কি অস্বাস্থ্যকর করে তুলি।

আমাদের দুই-একটি করে আলাপী হতে লাগল। ডাক্তার ম—এক জন আধবুড়ো

চিকিৎসাব্যবসায়ী। তিনি এক জন প্রকৃত ইংরেজ, ইংলণ্ডের বহির্ভূত কোনো জিনিস তাঁর পছন্দসই নয়। তাঁর কাছে ক্ষুদ্র ইংলণ্ডই সমস্ত পৃথিবী, তাঁর কল্পনা কখনো ডোভার প্রণালী পার হয় নি। তাঁর কল্পনার এমন অভাব যে, তিনি মনে করতে পারেন না যারা বাইবেলের দশ অনুশাসন মানে না, তাদের মিথ্যে কথা বলতে কী করে সংকোচ হতে পারে। অখ্রীষ্ট লোকদের নীতির বিরুদ্ধে এই তাঁর প্রধান যুক্তি। যে ইংরেজ নয়, যে খ্রীষ্টান নয়, এমন একটা অপূর্ব সৃষ্টি দেখলে তার মনুষ্যত্ব কী করে থাকতে পারে ভেবে পান না। তাঁর মটো হচ্ছে Gladly he would learn and gladly teach, কিন্তু আমি দেখলুম তাঁর লার্ন করবার ঢের আছে, কিন্তু টীচ করবার মতো সম্বল বেশি নেই। তাঁর স্বদেশীয় সাহিত্যের বিষয়ে তিনি আশ্চর্য কম জানেন; কতকগুলি মাসিক পত্রিকা পড়ে তিনি প্রতি মাসে দুই-চারিটি করে ভাসা ভাসা জ্ঞান লাভ করেন। তিনি কল্পনা করতে পারেন না একজন ভারতীয় কী করে এডুকেটেড হতে পারে। এখানকার মেয়েরা শীতকালে হাত গরম রাখবার জন্যে একরকম গোলাকার লোমশ পদার্থের মধ্যে হাত গুঁজে রাখে, তাকে মাফ্ বলে। প্রথম বিলেতে এসে সেই অপূর্ব পদার্থ যখন দেখি, তখন ডাক্তার ম— কে সে-দ্রব্যটা কী জিজ্ঞাসা করি। আমার অজ্ঞতায় তিনি আকাশ থেকে পড়লেন। এখানকার অনেক লোকের রোগ দেখেছি, তাঁরা আশা করেন, আমরা তাঁদের সমাজের প্রত্যেক ছোটোখাটো বিষয় জানব। এক দিন একটা নাচে গিয়েছিলুম এক জন মেয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বধূটিকে (bride) তোমার কী রকম লাগছে? আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "বধূটি কে?" অতগুলি মেয়ের মধ্যে এক জন নববধূ কোথায় আছেন তা আমি জানতুম না। শুনে তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন, তিনি বললেন, "তার মাথায় কমলালেবুর ফুল দেখে চিনতে পার নি?"

দুই মিস ক—র সঙ্গে আলাপ হল। তাঁরা এখানকার পাদরির মেয়ে। পাড়ার পরিবারদের দেখাশুনো, রবিবাসরিক স্কুলে বন্দোবস্ত করা, শ্রমিকদের জন্যে টেম্পারেন্স সভা স্থাপন ও তাদের আমোদ দেবার জন্যে সেখানে গিয়ে গানবাজনা করা— এই সকল কাজে তাঁরা দিনরাত্রি ব্যস্ত আছেন। বিদেশী বলে আমাদের তাঁরা অত্যন্ত যত্ন করতেন। নগরে কোথাও আমোদ-উৎসব হলে আমাদের খবর দিতেন, আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন, অবসর পেলে সকালে কিংবা সন্ধ্যেবেলায় এসে আমাদের সঙ্গে গল্প করতেন, ছেলেদের নিয়ে গিয়ে মাঝে মাঝে গান শেখাতেন, এক-এক দিন তাঁদের সঙ্গে রাস্তায় বেড়াতে যেতুম। এইরকম আমাদের যথেষ্ট যত্ন ও আদর করতেন। বড়ো মিস ক— অত্যন্ত ভালোমানুষ ও গম্ভীর। একটা কথার

উত্তর দিতে কেমন থতমত খেতেন। "হাঁ—না—তা হবে—জানি নে" এইরকম তাঁর উত্তর। এক-এক সময় কী বলবেন ভেবে পেতেন না, এক-এক সময় একটা কথা বলতে বলতে মাঝখানে থেমে পড়তেন, আর কথা জোগাত না, কোনো বিষয়ে মত জিজ্ঞাসা করলে বিব্রত হয়ে পড়তেন। যদি জিজ্ঞাসা করা যেত, "আজ কি বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে?" তিনি বলতেন, "কী করে বলব।" তিনি বুঝতেন না যে অভ্রান্ত বেদবাক্য শুনতে চাচ্ছি নে। তিনি আন্দাজ করতে নিতান্ত নারাজ। ছোটো মিস ক—র মতো প্রশান্ত প্রফুল্ল ভাব আর কারো দেখি নি। দেখে মনে হয় কোনো কালে তাঁর মনের কোনোখানে আঁচড় পড়ে নি। খুব ভালোমানুষ, সর্বদাই হাসিখুশি গল্প। কাপড়চোপড়ের আড়ম্বর নেই—কোনোপ্রকার ভান নেই; অত্যন্ত সাদাসিদে।

ডাক্তার ম—র বাড়িতে একদিন আমাদের সান্ধ্যনিমন্ত্রণ হল। খাওয়াই এখানকার নেমন্তন্নের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় গানবাজনা আমোদ-প্রমোদের জন্যই দশজনকে ডাকা। আমরা সন্ধ্যের সময় গিয়ে হাজির হলুম। একটি ছোটো ঘরে অনেকগুলি মহিলা ও পুরুষের সমাগম হয়েছে। ঘরে প্রবেশ করে কর্তা-গিন্নিকে আমাদের সম্মান জানালুম। সমাগত লোকদের সঙ্গে যথাযোগ্য অভিবাদন সম্ভাষণ ও আলাপ হল। ঘরে জায়গার এত টানাটানি ও লোক এত বেশি যে চৌকির অত্যন্ত অভাব হয়েছিল; অধিকাংশ পুরুষে মিলে আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প জুড়ে দিয়েছিলুম। নতুন কোনো অভ্যাগত মহিলা এলে গিন্নি কিংবা কর্তা তাঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দিচ্ছেন, আলাপ হবামাত্র তাঁর পাশে গিয়ে এক বার বসছি কিংবা দাঁড়াচ্ছি ও দুই-একটা করে কথাবার্তা আরম্ভ করছি। প্রায় আবহাওয়া নিয়ে কথার আরম্ভ; মহিলাটি বলেন "ড্রেডফুল ওয়েদার"। তাঁর সঙ্গে আমার নিঃসংশয়ে মতের ঐক্য হল। তার পরে তিনি অনুমান করলেন যে আমাদের পক্ষে অর্থাৎ ভারতীয়দের পক্ষে এমন ওয়েদার বিশেষ ট্রায়িং ও আশা করলেন আকাশ শীঘ্র পরিষ্কার হয়ে যাবে ইত্যাদি। তার পরে এই সূত্রে নানা কথা। সভার মধ্যে দুই জন সুন্দরী উপস্থিত ছিলেন। বলা বাহুল্য যে তাঁরা জানতেন তাঁরা সুন্দরী। এখানে সৌন্দর্যের পুজো হয়; এখানে রূপ কোনোমতে আত্মবিস্মৃত থাকতে পারে না, রূপাভিমান সুপ্ত থাকতে পারে না; চারদিক থেকে প্রশংসার কোলাহল তাকে জাগিয়ে তোলে। নাচঘরে রূপসীর দর অত্যন্ত চড়া; নাচে তাঁর সাহচর্য-সুখ পাবার জন্যে দরখাস্তের পর দরখাস্ত আসছে; তাঁর তিলমাত্র কাজ করে দেবার জন্যে বহু লোক প্রস্তুত। রূপবান পুরুষদেরও যথোচিত আদর আছে। তারা এখানকার ড্রয়িং রুমের

ডার্লিং। আমি দেখছি, এ-কথা শুনে তোমার এখানে আসতে লোভ হবে। তোমার মতো সুপুরুষ এখানকার মতো রূপমুগ্ধ দেশে এলে চতুর্দিকে উঠবে—

……….ঘন

নিশ্বাস প্রলয়বায়ু, অশ্রুবারিধারা

আসার, জীমূতমন্দ্র হাহাকার রব—

যা হ'ক নিমন্ত্রণ-সভায় Miss—দ্বয় রূপসীশ্রেষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু তাঁরা দু জনেই কেমন চুপচাপ গম্ভীর। বড়ো যে মেশামেশি হাসিখুশি তা ছিল না। ছোটো মিস একটা কৌচে গিয়ে হেলান দিয়ে বসলেন, আর বড়ো মিস দেওয়ালের কাছে এক চৌকি অধিকার করলেন। আমরা দুই এক জনে তাঁদের আমোদে রাখবার জন্যে নিযুক্ত হলুম। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি কথোপকথনশাস্ত্রে বিচক্ষণ নই, এখানে যাকে উজ্জ্বল বলে তা নই। গৃহকর্তা, একজন সংগীতশাস্ত্রজ্ঞতাভিমানিনী প্রৌঢ়া মহিলাকে বাজাতে অনুরোধের জন্যে এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন। গৃহের মহিলাদের মধ্যে তাঁর বয়স সব চেয়ে বেশি ; তিনি সব-চেয়ে বেশি সাজগোজ করে এসেছিলেন, তাঁর দু হাতের দশ আঙুলে যতগুলো ধরে তত আংটি ছিল। আমি যদি নিমন্ত্রণকর্তা হতুম তা হলে তাঁর আংটির বাহুল্য দেখেই বুঝতে পারতুম যে তিনি পিয়ানো বাজাবেন বলে বাড়ি থেকে স্থিরসংকল্প হয়ে এসেছেন। তাঁর বাজনা সাঙ্গ হলে পর গৃহকর্ত্রী আমাকে গান গাবার জন্যে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি আরম্ভ করলেন। আমি বড়ো মুশকিলে পড়লুম। আমি জানতুম, আমাদের দেশের গানের উপর যে তাঁদের বড়ো অনুরাগ আছে তা নয়। ভালোমানুষ হবার বিপদ এই যে নিজেকে হাস্যকরতা থেকে বাঁচানো যায় না। তাই মিস্টার টি— গান গাওয়ার ভূমিকা স্বরূপ দুই-একটি আরম্ভসূচক কাসি-ধ্বনি করলেন। সভা শান্ত হল। কোনোপ্রকারে কর্তব্য পালন করলুম। সভাস্থ মহিলাদের এত হাসি পেয়েছিল যে, ভদ্রতার বাঁধ টলমল করছিল ; কেউ কেউ হাসিকে কাসির রূপান্তরে পরিণত করলেন, কেউ কেউ হাত থেকে কী যেন পড়ে গেছে ভান করে ঘাড় নিচু করে হাসি লুকোতে চেষ্টা করলেন, এক জন কোনো উপায় না দেখে তাঁর পার্শ্বস্থ সহচরীর পিঠের পিছনে মুখ লুকোলেন ; যাঁরা কতকটা শান্ত থাকতে পেরেছিলেন তাঁদের মধ্যে চোখে চোখে টেলিগ্রাফ চলছিল। সেই সংগীতশাস্ত্রবিশারদ প্রৌঢ়াটির মুখে এমন একটু মৃদু তাচ্ছিল্যের হাসি লেগে ছিল যে, সে দেখে শরীরের রক্ত জল হয়ে আসে। গান যখন সাঙ্গ হল তখন আমার মুখ কান লাল হয়ে উঠেছে, চারদিক থেকে একটা প্রশংসার গুঞ্জনধ্বনি উঠল, কিন্তু অত হাসির পর আমি সেটাকে কানে তুললুম না। ছোটো মিস হ—আমাকে গানটা ইংরেজিতে অনুবাদ

করতে অনুরোধ করলেন, আমি অনুবাদ করলেম। গানটা হচ্ছে "প্রেমের কথা আর ব'লো না।" তিনি অনুবাদটা শুনে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের দেশে প্রেমের স্বাধীনতা আছে নাকি। কতকগুলি রোমের ভগ্নাবশেষের ফোটোগ্রাফ ছিল, সেইগুলি নিয়ে গৃহকর্ত্রী কয়েক জন অভ্যাগতকে জড়ো করে দেখাতে লাগলেন। ডাক্তার ম— একটা টেলিফোন কিনে এনেছেন, সেইটে নিয়ে তিনি কতকগুলি লোকের কৌতূহল তৃপ্ত করছেন। পাশের ঘরে টেবিলে খাবার সাজানো। এক-এক বার গৃহকর্তা এসে এক-এক জন পুরুষের কানে কানে বলে যাচ্ছেন, মিস অথবা মিসেস অমুককে নিশিভোজনে নিয়ে যাও; তিনি গিয়ে সেই মহিলার কাছে তাঁকে খাবার ঘরে নিয়ে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করছেন ও তাঁর বাহুগ্রহণ করে তাঁকে পাশের ঘরে আহারস্থলে নিয়ে যাচ্ছেন। এ-রকম সভায় সকলে মিলে এক বারে খেতে যায় না, তার কারণ তা হলে আমোদপ্রমোদের স্রোত অনেকটা বন্ধ হয়ে যায়। এই রকম এক সঙ্গে পুরুষ মহিলা সকলে মিলে গানবাজনা গল্প আমোদপ্রমোদ আহারাদিতে একটা সন্ধ্যা কাটানো গেল।

এখানে মিলনের উপলক্ষ্য কতপ্রকার আছে, তার সংখ্যা নেই। ডিনার, বল, conversazione, চা-সভা, লন পার্টি, এক্সকার্শন, পিকনিক ইত্যাদি। থ্যাকারে বলেন, English society has this eminent advantage over all others— that is, if there be any society left in the wretched distracted old European continent— that it is above all others a dinner-giving society. অবসর পেলে এক সন্ধ্যে বন্ধুবান্ধবদের জড়ো করে আহারাদি করা ও আমোদপ্রমোদ করে কাটানো এখানকার পরিবারের অবশ্যকর্তব্যের মধ্যে। ডিনার-সভার বর্ণনা করতে বসা বাহুল্য। ডাক্তার ম—র বাড়িতে যে পার্টির কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি, তার সঙ্গে ডিনার পার্টির প্রভেদ কেবল দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারে (এ ম্লেচ্ছদের দেশে ভক্ষণটা আবার দক্ষিণ বাম উভয় হস্তের ব্যাপার)। আমি একবার এখানকার একটি বোট-যাত্রা ও পিকনিক পার্টিতে ছিলুম। এখানকার একটি রবিবারিক সভার সভ্যেরা এই বোট-যাত্রার উদ্‌যোগী। এই সভার সভ্য এবং সভ্যারা রবিবার পালনের বিরোধী। তাই তাঁরা রবিবারে একত্র হয়ে নির্দোষ আমোদপ্রমোদ করেন। এই রবিবারিক সভার সভ্য আমাদের এক বাঙালি মিত্র ম—মহাশয় আমাদের অনুগ্রহ করে টিকিট দেন। লণ্ডন থেকে রেলোয়ে করে টেমসের ধারে এক গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছলুম। গিয়ে দেখলুম টেমসে একটা প্রকাণ্ড নৌকো বাঁধা, আর প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন রবিবার-বিদ্রোহী মেয়েপুরুষে একত্র

হয়েছেন। দিনটা অন্ধকার, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, আর যাঁদের যাঁদের আসবার কথা ছিল, তাঁরা সকলে আসেন নি। আমার নিজের এ পার্টিতে যোগ দিবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু ম—মহাশয় নাছোড়বান্দা। আমরা অনেক ভারতবর্ষীয় একত্র হয়েছিলুম, বোধ হয় ম—মহাশয় সকলকেই সুন্দরীর লোভ দেখিয়েছিলেন, কেন না সকলেই প্রায় বাহারে সাজগোজ করে গিয়েছিলেন। অনেকেই গলায় লাল ফাঁসি বেঁধেছিলেন। ম—মহাশয় স্বয়ং তাঁর নেকটাইয়ে একটি তলবারের আকারের পিন গুঁজে এসেছিলেন। আমাদের মধ্যে এক জন তাঁকে ঠাট্টা করে জিজ্ঞাসা করলেন, "দেশের সমস্ত টাইয়ে যে তলবারের আঘাত করা হয়েছে, ওটা কি তার বাহ্য লক্ষণ?" তিনি হেসে বললেন, "তা নয় গো, বুকের কাছে একটা কটাক্ষের ছুরি বিঁধেছে, ওটা তারই চিহ্ন।" দেশে থাকতে বিঁধেছিল, কি এখানে, তা কিছু বললেন না। ম—মহাশয়ের হাসিতামাশার বিরাম নেই; সেদিন তিনি স্টীমারে সমস্ত লোকের সঙ্গে সমস্ত দিন ঠাট্টা ও গল্প করে কাটিয়েছিলেন। এক বার তিনি মহিলাদের হাত দেখে গুনতে আরম্ভ করলেন। তখন তিনি বোটসুদ্ধ মেয়েদের এত প্রচুর পরিমাণে হাসিয়েছিলেন যে, সত্যি কথা বলতে কি, তাঁর উপর আমার মনে মনে একটুখানি ঈর্ষার উদ্রেক হয়েছিল। যথাসময়ে বোট ছেড়ে দিল। নদী এত ছোটো যে, আমাদের দেশের খালের কাছাকাছি পৌঁছয়। স্টীমারের মধ্যে আমাদের আলাপ-পরিচয় গল্পসল্প চলতে লাগল। এক জন ইংরেজের সঙ্গে আমাদের এক জন দিশি লোকের ধর্মসম্বন্ধীয় তর্ক উঠল। আমাদের সঙ্গে এক জনের আলাপ হল, তিনি তাঁদের ইংরেজি সাহিত্যের কথা তুললেন, তাঁর শেলির কবিতা অত্যন্ত ভালো লাগে; সে-বিষয়ে আমার সঙ্গে তাঁর মতের মিল হল দেখে তিনি ভারি খুশি হলেন; তিনি আমাকে বিশেষ করে তাঁর বাড়ি যেতে অনুরোধ করলেন। ইনি ইংরেজি সাহিত্য ও তাঁর নিজের দেশের রাজনীতি ভালোরকম করে চর্চা করেছেন, কিন্তু যেই ভারতবর্ষের কথা উঠল, অমনি তাঁর অজ্ঞতা বেরিয়ে পড়ল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন্ রাজার অধীনে।" আমি অবাক্ হয়ে বললুম, "ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের।" তিনি বললেন, "তা আমি জানি, কিন্তু আমি বলছি, কোন্ ভারতবর্ষীয় রাজার অব্যবহিত অধীনে।" কলকাতার বিষয়ে এর জ্ঞান এই রকম। তিনি অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "আমার অজ্ঞতা মাপ করবেন, ভারতবর্ষের বিষয়ে আমাদের ঢের জানা উচিত ছিল, কিন্তু লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি আমি এ-বিষয়ে খুব কম জানি।" এইরকম বোটের ছাতের উপর আমাদের কথাবার্তা চলতে লাগল; আমাদের মাথার উপরে একটা কানাতের আচ্ছাদন। মাঝে মাঝে টিপ টিপ করে

বৃষ্টি হচ্ছে, কানাতের আচ্ছাদনে সেটা কতকটা নিবারণ করছে। যেদিকে বৃষ্টির ছাঁট পৌঁছচ্ছে না, সেইদিকে মেয়েদের রেখে আর-এক পাশে এসে ছাতা খুলে দাঁড়ালুম। দেখি আমাদের দিশি বন্ধু ক— মহাশয় সেই মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছেন। এই নিয়ে তাঁকে ঠাট্টা করাতে তিনি বার বার করে বললেন যে, বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়া ছাড়া তাঁর অন্য অভিসন্ধি ছিল না। কিন্তু কথাটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। যা হ'ক সেদিন আমরা বৃষ্টিতে তিন-চার বার করে ভিজেছি। এই রকম ভিজতে ভিজতে গম্যস্থানে গিয়ে পৌঁছলেম। তখন বৃষ্টি থেমে গেছে, কিন্তু আকাশে মেঘ আছে ও জমি ভিজে। মাঠে নেবে আমাদের খাওয়াদাওয়ার কথা ছিল, আকাশের ভাবগতিক দেখে তা আর হল না। আহারের পর আমরা নৌকা থেকে নেবে বেড়াতে বেরোলেম। কোনো কোনো প্রণয়ীযুগল একটি ছোটো নৌকো নিয়ে দাঁড় বেয়ে চললেন, কেউ বা হাতে হাতে ধরে নিরিবিলি কানে কানে কথা কইতে কইতে মাঠে বেড়াতে লাগলেন। আমাদের সঙ্গে একজন ফোটোগ্রাফওআলা তার ফোটোগ্রাফের সরঞ্জাম সঙ্গে করে এনেছিল, আমরা সমস্ত দল মাঠে দাঁড়ালেম, আমাদের ছবি নেওয়া হল। সহসা ম—মহাশয়ের খেয়াল গেল যে আমরা যতগুলি কৃষ্ণমূর্তি আছি, একত্রে সকলের ছবি নেওয়া হবে। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন, তাঁরা এ প্রস্তাবে ইতস্তত করতে লাগলেন, এরকম একটা ইন্‌ভিডিয়স ডিসটিংসন তাঁদের মনঃপূত নয়; কিন্তু ম—মহাশয় ছাড়বার পাত্র নন। অবশেষে স্টীমার লণ্ডন অভিমুখে ছাড়া হল। তখন ভগবান মরীচিমালী তাঁহার সহস্র রশ্মি সংযমন পুরঃসর অস্তাচলচূড়াবলম্বী জলধরপটলশয়নে বিশ্রান্ত মস্তক বিন্যাসপূর্বক অরুণবর্ণ নিদ্রাতুর লোচন মুদ্রিত করিলেন; বিহগকুল স্ব স্ব নীড়ে প্রত্যাবর্তন করিল, গাভীবৃন্দ হাম্বারব করিতে করিতে গোপালের অনুবর্তন করিয়া গোষ্ঠাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। আমরা লণ্ডনের অভিমুখে যাত্রা করলেম।

সপ্তম পত্র

এখানকার ধনী ফ্যাশনেবল মেয়েদের কথা একটু বলে নিই। তাঁদের দোরস্ত করতে হলে দিন-দুই আমাদের দিশি শাশুড়ির ও বিধবা ননদের হাতে রাখতে হয়। তাঁরা হচ্ছেন বড়োমানুষের মেয়ে কিংবা বড়োমানুষের স্ত্রী। তাঁদের চাকর আছে, কাজকর্ম করতে হয় না, একজন হাউস-কীপার আছে, সে বাড়ির সমস্ত

ঘরকন্না তদারক করে, একজন নার্স আছে, সে ছেলেদের মানুষ করে, একজন গভর্নেস আছেন, তিনি ছেলেপিলেদের পড়াশুনা দেখেন ও অন্যান্য নানাবিধ বিষয়ে তদারক করেন ; তবে আর পরিশ্রম করার কী রইল বলো। কেবল একটা বাকি আছে, সেটা হচ্ছে সাজসজ্জা ; কিন্তু তার জন্য তাঁর লেডিজ মেড আছে, সুতরাং সেটাও সমস্তটা নিজের হাতে করতে হয় না। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত দিনটা তাঁর হাতে আস্ত পড়ে থাকে। সকালবেলায় বিছানায় প'ড়ে দরজা-জানলা বন্ধ করে সূর্যের আলো আসতে না দিয়ে দিনটাকে কতকটা সংক্ষেপ করেন, বিছানায় শুয়ে শুয়ে ব্রেকফাস্ট খান ও এগারোটার আগে শয়নগৃহ থেকে বেরোলে যথেষ্ট ভোরে উঠেছেন মনে করেন। তার পরে সাজসজ্জা ; সে-বিষয়ে তোমাকে কোনো প্রকার খবর দিতে পারছি নে। শোনা যায় খুব সম্প্রতি বিলেতে স্নানটা ফ্যাশন হয়েছে কিন্তু এখনো এটা খুব কম দূর ব্যাপ্ত। সীমন্তিনীরা হাতের যতটুকু বেরিয়ে থাকে— মুখটি ও গলাটি— দিনের মধ্যে অনেকবার অতি যত্নে ধুয়ে থাকেন ; বাকি অঙ্গ পরিষ্কার করবার তাঁরা তত আবশ্যক দেখেন না ; কেননা মনোহরণের প্রধান সিঁধ মুখটিতে কোনোপ্রকার মরচে না পড়লেই হল। মাসে দু-বার একটা স্পঞ্জ-বাথ নিলেই তাঁরা যথেষ্ট মনে করেন। আমি কোনো ইংরেজ পরিবারের মধ্যে বাস করতে গিয়েছিলেম, আমি স্নান করি শুনে তাঁরা বিপন্ন হয়েছিলেন। কোনো প্রকার স্নানের সরঞ্জাম ছিল না, সেজন্যে অগভীর একটা গোল জলাধার ধার করে আনতে হয়েছিল। বাড়িতে লোক দেখা করতে এলে তাদের সঙ্গে আলাপচারি করা গৃহিণীর কাজ, অনেক লোক একসঙ্গে এলে তাঁর কর্তব্য হচ্ছে তাঁর বাক্য ও হাসির অমৃত সকলকে সমানভাবে বিতরণ করা, বিশেষ কারো সঙ্গে বেশি কথা কওয়া বা বিশেষ কাউকে বেশি যত্ন করাটা উচিত নয়। এ কাজটা অত্যন্ত দুরূহ, বোধ হয় অনেক অভ্যেসে দুরস্ত হয়। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি তাঁরা একজনের মুখের দিকে চেয়ে একটা কথা কন, তার পরে শেষ করেই সকলের দিকে চেয়ে একবার হাসেন, কখনো বা তাঁরা একজনের মুখের দিকে চেয়ে একটা কথা আরম্ভ করেন, তার পর বলতে বলতে এক এক বার করে সকলের মুখের দিকে চেয়ে নেন, কখনো বা, তাস খেলবার সময় যে-রকম করে চটপট তাস বিতরণ করে, তেমনি তাঁরা আগন্তুকদের একে একে ক'রে একটি একটি কথার টুকরো ছড়িয়ে ছড়িয়ে দেন, এমন তাড়াতাড়ি ও এমন দক্ষতার সঙ্গে যে, তাঁদের হাতে যে অনেক কথার তাস গোছানো রয়েছে তা সহজেই বোঝা যায়। এক জনকে বললেন, "Lovely morning, isn't it ?" তার পরেই তাড়াতাড়ি আর-এক জনের মুখের দিকে চেয়ে বললেন

"কাল রাত্তিরে সংগীতশালায় মাডাম নীল্‌সন গান করেছিলেন, it was exquisite!" যতগুলি মহিলা ভিজিটর বসেছিলেন সকলে এই কথায় এক-একটা বিশেষণ যোগ করতে লাগলেন; এক জন বললেন "charming," এক জন বললেন "superb," এক জন বললেন "something unearthly," আর-এক জন বাকি ছিলেন, তিনি বললেন "Isn't it?" আমার বোধ হয়, এ এক-রকম সকালবেলা উঠে কথোপকথনের মুগুর ভাঁজা। যা হ'ক এই রকম মাঝে মাঝে ভিজিটর আনাগোনা করছে। মুডীজ লাইব্রেরিতে তিনি চাঁদা দিয়ে থাকেন। সেখান থেকে অনবরত ক্ষণজীবী নভেলগুলো তাঁর ওখানে যাতায়াত করে। সেগুলো অনবরত গলাধঃকরণ করেন। তা ছাড়া আছে ভালোবাসার অভিনয়। মিষ্টি হাসি ও মিষ্টি কথার আদান-প্রদান, অলীক ছুতো নিয়ে একটু অলীক অভিমান, হয়তো পুরুষ-পক্ষ থেকে একটু রসিকতা, অপর পক্ষে উদ্যত ক্ষুদ্র মুষ্টি সহযোগে সুমধুর লাঞ্ছনা, "Oh you naughty, wicked, provoking man!" তাতে নটি ম্যান-এর পরিপূর্ণ তৃপ্তি। এই রকম ভিজিটর অভ্যর্থনা, ভিজিট প্রত্যর্পণ, নতুন নভেল পড়া, নতুন ফ্যাশন সৃষ্টি ও নতুন ফ্যাশনের অনুবর্তন করা, এবং তার সঙ্গে মধুর রস যোগ করে ফ্লার্ট এবং হয়তো 'লাভ' করা তাঁদের দিনকৃত্য। আমাদের দেশে যেমন ছেলেবেলা থেকে মেয়েদের বিয়ের জন্যে প্রস্তুত করে, যথেষ্ট লেখাপড়া শেখায় না, কেননা মেয়েদের আপিসে যেতে হবে না; এখানেও তেমনি মাগ্‌গি দরে বিকোবার জন্যে মেয়েদের ছেলেবেলা থেকে পালিশ করতে থাকে, বিয়ের জন্যে যতটুকু লেখাপড়া শেখা দরকার ততটুকু যথেষ্ট। একটু গান গাওয়া, একটু পিয়ানো বাজানো, ভালো করে নাচা, খানিকটা ফরাসি ভাষা বিকৃত উচ্চারণ, একটু বোনা ও সেলাই করা জানলে একটি মেয়েকে বিয়ের দোকানের জানলায় সাজিয়ে রাখবার উপযুক্ত রংচঙে পুতুল গড়ে তোলা যায়। এ-বিষয়ে একটা দিশি পুতুল ও একটা বিলিতি পুতুলের যতটুকু তফাত, আমাদের দেশের ও এদেশের মেয়েদের মধ্যে ততটুকু তফাত মাত্র। আমাদের দিশি মেয়েদের পিয়ানো ও অন্যান্য টুকিটাকি শেখবার দরকার করে না, বিলিতি মেয়েদেরও অল্পস্বল্প লেখাপড়া শিখতে হয়, কিন্তু দুই-ই দোকানে বিক্রি হবার জন্যে তৈরি। এখানেও পুরুষেরাই হর্তাকর্তা, স্ত্রীরা তাদের অনুগতা; স্ত্রীকে আদেশ করা, স্ত্রীর মনে লাগাম লাগিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো চালিয়ে বেড়ানো স্বামীরা ঈশ্বরনির্দিষ্ট অধিকার মনে করেন। ফ্যাশনী মেয়ে ছাড়া বিলেতে আরো অনেক রকম মেয়ে আছে, নইলে সংসার চলত না। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ মেয়েদের অনেকটা মেহনত করতে হয়, বাবুয়ানা করলে চলে না। সকালে উঠে একবার রান্নাঘর তদারক করতে

হয়, সে-ঘর পরিষ্কার আছে কি না, জিনিসপত্র যথাপরিমিত আনা হয়েছে কি না, যথাস্থানে রাখা হয়েছে কি না ইত্যাদি দেখাশুনো করা ; রান্না ও খাবার জিনিস আনতে হুকুম দেওয়া, পয়সা বাঁচাবার জন্যে নানাপ্রকার গিন্নিপনার চাতুরী খেলা, কালকের মাংসের হাড়গোড় কিছু যদি অবশিষ্ট থাকে তা হলে বন্দোবস্ত করে তার থেকে আজকের সুপ চালিয়ে নেওয়া, পরশু দিনকার বাসি রাঁধা মাংস যদি খাওয়া-দাওয়ার পর খানিকটা বাকি থাকে তা হ'লে সেটাকে রূপান্তরিত করে আজকের টেবিলে আনবার সুবিধে করে দেওয়া, এইরকম নানাপ্রকার গৃহিণীপনা। তার পর ছেলেদের জন্য মোজা কাপড়-চোপড়, এমন কি নিজেরও অনেক কাপড় নিজে তৈরি করেন। এঁদের সকলের ভাগ্যে নভেল পড়া ঘটে ওঠে না ; বড়োজোর খবরের কাগজ পড়েন, তাও সকলে পড়েন না দেখেছি ; অনেকের পড়াশুনোর মধ্যে কেবল চিঠি পড়া ও চিঠি লেখা, দোকানদারদের বিল পড়া ও হিসাব লেখা। তাঁরা বলেন, "পলিটিক্স এবং অন্যান্য গ্রাম্ভারি বিষয় নিয়ে পুরুষেরা নাড়াচাড়া করুন ; আমাদের কর্তব্য কাজ স্বতন্ত্র।" দুর্বলতা মেয়েদের একটা গর্বের বিষয় ; সুতরাং অনেক মেয়ে শ্রান্ত না হলেও এলিয়ে পড়েন। বুদ্ধিবিদ্যার বিষয়েও এইরকম ; মেয়েরা জাঁক করে বলেন, "আমরা বাপু ও-সব বুঝিসুঝি নে।" বিদ্যার অভাব, বুদ্ধির খর্বতা একটা প্রকাশ্য জাঁকের বিষয় হয়ে ওঠে। এখানকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়েরা বিদ্যাচর্চার দিকে ততটা মনোযোগ দেন না, তাঁদের স্বামীরাও তার জন্যে বড়ো দুঃখিত নন, তাঁদের জীবন হচ্ছে কতকগুলি ছোটোখাটো কাজের সমষ্টি। সন্ধ্যেবেলায় স্বামী কর্মক্ষেত্র থেকে এলে একটি আদরের চুম্বন উপার্জন করেন ; (পরিবার-বিশেষে যে তার অন্যথা হয় তা বলাই বাহুল্য) ঘরে তাঁর জন্যে আগুন জ্বালানো, খাবার সাজানো আছে। সন্ধ্যেবেলায় স্ত্রী হয়তো একটা সেলাই নিয়ে বসলেন, স্বামী তাঁকে একটি নভেল চেঁচিয়ে পড়ে শোনাতে লাগলেন, সুমুখে আগুন জ্বলছে, ঘরটি বেশ গরম, বাইরে পড়ছে বৃষ্টি, জানলা-দরজাগুলি বন্ধ। হয়তো স্ত্রী পিয়ানো বাজিয়ে স্বামীকে খানিকটা গান শোনালেন। এখানকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গিন্নিরা সাদাসিদে। যদিও তাঁরা ভালো করে লেখাপড়া শেখেন নি, তবু তাঁরা অনেক বিষয় জানেন, এবং তাঁদের বুদ্ধি যথেষ্ট পরিষ্কার। এদেশে কথায় বার্তায় জ্ঞানলাভ করা যায়, তাঁরা অন্তঃপুরে বদ্ধ নন, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলাপ করেন, আত্মীয়-সভায় একটা কোনো উচ্চ বিষয় নিয়ে চর্চা হলে তাঁরা শোনেন ও নিজের বক্তব্য বলতে পারেন, বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা একটা বিষয়ের কত দিক দেখেন ও কী রকম চক্ষে দেখেন তা বুঝতে পারেন। সুতরাং একটা কথা উঠলে কতকগুলো ছেলেমানুষি আকাশ-থেকে-পড়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন না

ও তাঁকে হাঁ করে থাকতে হয় না। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে খুব সহজভাবে গল্পস্বল্প করতে পারেন, নিমন্ত্রণসভায় মুখ ভার করে বা লজ্জায় অবসন্ন হয়ে থাকেন না, পরিচিতদের সঙ্গে অন্যায় ঘেঁষাঘেঁষি নেই, কিংবা তাদের কাছ থেকে নিতান্ত অসামাজিক ভাবে দূরেও থাকেন না। লোকসমাজে মুখটি খুব হাসিখুশি, প্রসন্ন; যদিও নিজে খুব রসিকা নন, কিন্তু হাসিতামাশা বেশ উপভোগ করতে পারেন, একটা কিছু ভালো লাগলে মন খুলে প্রশংসা করেন, একটা কিছু-মজার কথা শুনলে প্রাণ খুলে হাস্য করেন।

আমি দিনকতক আমার শিক্ষকের পরিবারের মধ্যে বাস করেছিলুম। সে বড়ো অদ্ভুত পরিবার। মিস্টার ব— মধ্যবিত্ত লোক। তিনি লাটিন ও গ্রীক খুব ভালো রকম জানেন। তাঁর ছেলেপিলে কেউ নেই; তিনি, তাঁর স্ত্রী, আমি, আর এক জন দাসী, এই চার জন মাত্র একটি বাড়িতে থাকতুম। কর্তা আধবুড়ো লোক, অত্যন্ত অন্ধকার মূর্তি, দিনরাত খুঁতখুঁত খিট খিট করেন, নীচের তলায় রান্নাঘরের পাশে একটি ছোট্টো জানলাওয়ালা দরজা-বদ্ধ অন্ধকার ঘরে থাকেন। একে তো সূর্যকিরণ সে ঘরে সহজেই প্রবেশ করতে পারে না, তাতে জানলার উপরে একটা পর্দা ফেলা, চারদিকে পুরোনো ছেঁড়া ধুলোমাখা নানাপ্রকার আকারের ভীষণদর্শন গ্রীক লাটিন বইয়ে দেয়াল ঢাকা, ঘরে প্রবেশ করলে এক রকম বদ্ধ হাওয়ায় হাঁপিয়ে উঠতে হয়। এই ঘরটা হচ্ছে তাঁর স্টাডি, এইখানে তিনি পড়েন ও পড়ান। তাঁর মুখ সর্বদাই বিরক্ত। আঁট বুটজুতো পরতে বিলম্ব হচ্ছে, বুটজুতোর উপর চটে ওঠেন; যেতে যেতে দেয়ালের পেরেকে তাঁর পকেট আটকে যায়, রেগে ভুরু কুঁকড়ে ঠোঁট নাড়তে থাকেন। তিনি যেমন খুঁতখুঁতে মানুষ, তাঁর পক্ষে তেমনি খুঁতখুঁতের কারণ প্রতি পদে জোটে। আসতে যেতে হুঁচট খান, অনেক টানাটানিতে তাঁর দেরাজ খোলে না, যদি বা খোলে তবু যে-জিনিস খুঁজছিলেন তা পান না। এক-এক দিন সকালে তাঁর স্টাডিতে এসে দেখি, তিনি অকারণে বসে বসে ভ্রূকুটি করে উঁ আঁ করছেন, ঘরে একটি লোক নেই। কিন্তু ব— আসলে ভালোমানুষ— তিনি খুঁতখুঁতে বটে, রাগী নন; খিট্‌খিট্‌ করেন, কিন্তু ঝগড়া করেন না। নিদেন তিনি মানুষের উপর রাগ প্রকাশ করেন না, টাইনি বলে তাঁর একটি কুকুর আছে তার উপরেই তাঁর আক্রোশ। সে একটু নড়লে চড়লে তাকে ধমকাতে থাকেন, আর দিনরাত তাকে লাথিয়ে লাথিয়ে একাকার করেন। তাঁকে আমি প্রায় হাসতে দেখি নি। তাঁর কাপড়চোপড় ছেঁড়া অপরিষ্কার। মানুষটা এই রকম। তিনি এক-কালে পাদরি ছিলেন; আমি নিশ্চয় বলতে পারি, প্রতি রবিবারে তাঁর বক্তৃতায় তিনি শ্রোতাদের নরকের বিভীষিকা দেখাতেন। তাঁর এত কাজের ভিড়, এত লোককে

পড়াতে হত যে, এক-এক দিন তিনি ডিনার খেতে অবকাশ পেতেন না। এক-এক দিন তিনি বিছানা থেকে উঠে অবধি রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত কাজে ব্যস্ত থাকতেন। এমন অবস্থায় খিটখিটে হয়ে ওঠা কিছু আশ্চর্য নয়। গৃহিণী খুব ভালোমানুষ, রাগী উদ্ধত নন, এককালে বোধ হয় ভালো দেখতে ছিলেন, যত বয়স তার চেয়ে তাঁকে বড়ো দেখায়, চোখে চশমা, সাজগোজের বড়ো আড়ম্বর নেই। নিজে রাঁধেন, বাড়ির কাজকর্ম করেন, ছেলেপিলে নেই, সুতরাং কাজকর্ম বড়ো বেশি নয়। আমাকে খুব যত্ন করতেন। খুব অল্প দিনেতেই বোঝা যায় যে, দম্পতির মধ্যে বড়ো ভালোবাসা নেই, কিন্তু তাই বলে যে দু-জনের মধ্যে খুব বিরোধ ঘটে তাও নয়, অনেকটা নিঃশব্দে সংসার চলে যাচ্ছে। মিসেস ব— কখনো স্বামীর স্টাডিতে যান না; সমস্ত দিনের মধ্যে খাবার সময় ছাড়া দু-জনের মধ্যে দেখাশুনা হয় না, খাবার সময়ে দু-জনে চুপচাপ বসে থাকেন। খেতে খেতে আমার সঙ্গে গল্প করেন, কিন্তু দু-জনে পরস্পর গল্প করেন না। ব—র আলুর দরকার হয়েছে, তিনি চাপা গলায় মিসেসকে বললেন, "some potatoes" (please কথাটা বললেন না কিংবা শোনা গেল না)। মিসেস ব— বলে উঠলেন "I wish you were a little more polite"। ব— বললেন "I did say 'please'" মিসেস ব— বললেন "I did not hear it"; ব— বললেন "it was no fault of mine"। এইখানেই দুই পক্ষ চুপ করে রইলেন। মাঝে থেকে আমি অত্যন্ত অপ্রস্তুতে পড়ে যেতেম। একদিন আমি ডিনারে যেতে একটু দেরি করেছিলেম, গিয়ে দেখি, মিসেস ব—, ব—কে ধমকাচ্ছেন, অপরাধের মধ্যে তিনি মাংসের সঙ্গে একটু বেশি আলু নিয়েছিলেন। আমাকে দেখে মিসেস ক্ষান্ত হলেন, মিস্টার সাহস পেয়ে শোধ তোলবার জন্যে দ্বিগুণ করে আলু নিতে লাগলেন, মিসেস তাঁর দিকে নিরুপায় মর্মভেদী কটাক্ষপাত করলেন। দুই পক্ষই দুই পক্ষকে যথারীতি ডিয়ার ডার্লিং বলে ভুলেও সম্বোধন করেন না, কিংবা কারো ক্রিশ্চান নাম ধরে ডাকেন না, পরস্পর পরস্পরকে মিস্টার ব— ও মিসেস ব— বলে ডাকেন। আমার সঙ্গে মিসেস হয়তো বেশ কথাবার্তা কচ্ছেন, এমন সময় মিস্টার এলেন, অমনি সমস্ত চুপচাপ। দুই পক্ষেই এই রকম। একদিন মিসেস আমাকে পিয়ানো শোনাচ্ছেন, এমন সময় মিস্টার এসে উপস্থিত; বললেন "When are you going to stop?" মিসেস বললেন "I thought you had gone out"। পিয়ানো থামল। তার পরে আমি যখন পিয়ানো শুনতে চাইতেম মিসেস বলতেন, "that horrid man যখন বাড়িতে না থাকবেন তখন শোনাব", আমি ভারি অপ্রস্তুতে পড়ে যেতুম। দু-জনে এই রকম অমিল অথচ

সংসার বেশ চলে যাচ্ছে। মিসেস রাঁধছেন বাড়ছেন, কাজকর্ম করছেন, মিস্টার রোজগার করে টাকা এনে দিচ্ছেন ; দু-জনে কখনো প্রকৃত ঝগড়া হয় না, কেবল কখনো কখনো দুই-এক বার দুই একটা কথা-কাটাকাটি হয়, তা এত মৃদুস্বরে যে পাশের ঘরের লোকের কানে পর্যন্ত পৌঁছয় না। যা হ'ক আমি সেখানে দিনকতক থেকে বিব্রত হয়ে সে অশান্তির মধ্যে থেকে চলে এসে বেঁচেছি।

অষ্টম পত্র

আমরা এখন লণ্ডন ত্যাগ করে এসেছি। লণ্ডনের জনসমুদ্রে জোয়ারভাঁটা খেলে তা জান? বসন্তের আরম্ভ থেকে গরমির কিছুদিন পর্যন্ত লণ্ডনের জোয়ার-ঋতু। এই সময়ে লণ্ডন উৎসবে পূর্ণ থাকে— থিয়েটার, নাচগান, প্রকাশ্য ও পারিবারিক 'বল', আমোদপ্রমোদে ঘেঁষাঘেঁষি ঠেসাঠেসি। ধনী লোকদের বিলাসিনী মেয়েরা রাতকে দিন করে তোলে। আজ তাদের নাচে নেমন্তন্ন, কাল ডিনারে, পরশু থিয়েটার, তরশু রাত্তিরে ম্যাডাম প্যাটির গান, দিনের চেয়ে রাত্তিরের ব্যস্ততা বেশি। সুকুমারী মহিলা, যাঁদের তিলমাত্র শ্রম লাঘবের জন্যে শত শত ভক্ত সেবকের দল দিনরাত্রি প্রাণপণ করছেন— চৌকিটা সরিয়ে দেওয়া, প্লেটটা এগিয়ে দেওয়া, দরজাটা খুলে দেওয়া, মাংসটা কেটে দেওয়া, পাখাটা কুড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি— তাঁরা রাত্তিরের পর রাত্তির ন-টা থেকে ভোর চারটে পর্যন্ত গ্যাসের ও মানুষের নিশ্বাসে গরম ঘরের মধ্যে অবিশ্রান্ত নৃত্যে রত; সে আবার আমাদের দেশের অলস নড়েচড়ে বেড়ানো বাইনাচের মতো নয়, অনবরত ঘুরপাক। ললিতা রমণীরা কী করে টিকে থাকেন, আমি তাই ভাবি। এই তো গেল আমোদপ্রমোদ, তা ছাড়া এই সময়ে পার্লামেণ্টের অধিবেশন। ব্যাণ্ডের একতান স্বর, নাচের পদশব্দ, ডিনার-টেবিলের হাস্যালাপধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র একটা পোলিটিকাল উত্তেজনা। স্থিতিশীল ও গতিশীল দলভুক্তরা প্রতি রাত্রের পার্লামেণ্টের রাজনৈতিক মল্লযুদ্ধের বিবরণ কী আগ্রহের সঙ্গে আলোচনা করতে থাকে। সীজ্‌নের সময় লণ্ডনে এই রকম আলোড়ন। তার পরে আবার ভাঁটা পড়তে আরম্ভ হয়, লণ্ডনের কৃষ্ণপক্ষ আসে। তখন আমোদ-কোলাহল বন্ধ হয়ে যায়, বাকি থাকে অল্পস্বল্প লোক, যাদের শক্তি নেই, বা দরকার আছে, বা বাইরে যাবার ইচ্ছে নেই। সেই সময়ে লণ্ডন থেকে চলে যাওয়া একটা ফ্যাশন। আমি একটা বইয়ে ("Sketches and Travels in London" : Thackeray) পড়েছিলুম, এই সময়টাতে অনেকে যারা নগরে থাকে তারা বাড়ির সম্মুখে দরজা

জানলা সব বন্ধ করে বাড়ির পিছনদিকের ঘরে লুকিয়ে-চুরিয়ে বাস করে। দেখাতে চায় তারা লণ্ডন ছেড়ে চলে গেছে। সাউথ কেনসিংটন বাগানে যাও; ফিতে, টুপি, পালক, রেশম, পশম ও গাল-রং-করা মুখের সমষ্টি চোখ ঝলসে প্রজাপতির ঝাঁকের মতো বাগান আলো করে বেড়াচ্ছে না; বাগান তেমনি সবুজ আছে, সেখানে তেমনি ফুল ফুটেছে, কিন্তু তার সজীব শ্রী নেই। গাড়ি ঘোড়া লোকজনের হিজিবিজি ঘুচে গিয়ে লণ্ডনটা পরিষ্কার হয়ে গেছে।

সম্প্রতি লণ্ডনের সীজ্‌ন অতীত, আমরাও লণ্ডন ছেড়ে টন্‌ব্রিজ ওয়েল্‌স বলে একটা আধা-পাড়াগেঁয়ে জায়গায় এসেছি। অনেক দিনের পর হালকা বাতাস খেয়ে বাঁচা গেল। হাজার হাজার চিমনি থেকে অবিশ্রান্ত পাথুরে কয়লার ধোঁয়া ও কয়লার গুঁড়ো উড়ে উড়ে লণ্ডনের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করেছে। রাস্তায় বেরিয়ে এসে হাত ধুলে সে হাত-ধোয়া জলে বোধ করি কালির কাজ করা যায়। নিশ্বাসের সঙ্গে অবিশ্রান্ত কয়লার গুঁড়ো টেনে মগজটা বোধ হয় অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ হয়ে দাঁড়ায়। টন্‌ব্রিজ ওয়েল্‌স অনেক দিন থেকে তার লৌহপদার্থমিশ্রিত উৎসের জন্যে বিখ্যাত। এই উৎসের জল খাবার জন্যে এখানে অনেক যাত্রীর সমাগম হয়। উৎস শুনেই আমরা কল্পনা করলেম— না জানি কী সুন্দর দৃশ্য হবে; চারিদিকে পাহাড়-পর্বত, গাছপালা, সারসমরালকুল-কূজিত, কমলকুমুদকহ্লার-বিকশিত সরোবর, কোকিল-কূজন, মলয়-বীজন, ভ্রমর-গুঞ্জন ও অবশেষে এই মনোরম স্থানে পঞ্চশরের প্রহার ও এক ঘটি জল খেয়ে বাড়ি ফিরে আসা। গিয়ে দেখি, একটা হাটের মধ্যে একটা ছোটো গর্ত পাথর দিয়ে বাঁধানো, সেখানে একটু একটু করে জল উঠছে, একটা বুড়ি কাঁচের গেলাস হাতে দাঁড়িয়ে। এক এক পেনি নিয়ে এক-এক গেলাস জল বিতরণ করছে ও অবসরমত একটা খবরের কাগজে গতরাত্রের পার্লামেন্টের সংবাদ পড়ছে। চারদিকে দোকানবাজার; গাছপালার কোনো সম্পর্ক নেই; সম্মুখেই একটা কসাইয়ের দোকান, সেখানে নানা চতুষ্পদের ও "হংসমরালকুল" এর ডানা ছাড়ানো মৃতদেহ দড়িতে ঝুলছে; এই সব দেখে আমার মন এমন চটে উঠল যে, কোনোমতে বিশ্বাস হল না যে, এ জলে কোনোপ্রকার রোগ নিবারণ বা শরীরের উন্নতি হতে পারে।

টন্‌ব্রিজ ওয়েল্‌স শহরটা খুব ছোটো, দু-পা বেরোলেই গাছপালা মাঠ দেখতে পাওয়া যায়। বাড়িগুলো লণ্ডনের মতো থামবারান্দাশূন্য, ঢালু ছাতওআলা সারি সারি একঘেয়ে ভাবে দাঁড়িয়ে; অত্যন্ত শ্রীহীন দেখতে। দোকানগুলো তেমনি সুসজ্জিত, পরিপাটি, কাঁচের জানলা দেওয়া। কাঁচের ভিতর থেকে সাজানো পণ্য-

দ্রব্য দেখা যাচ্ছে ; কসাইয়ের দোকানে কোনোপ্রকার কাঁচের আবরণ নেই, চতুষ্পদের আস্ত আস্ত পা ঝুলছে— ভেড়া, গোরু, শুওর, বাছুরের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নানাপ্রকার ভাবে চোখের সামনে টাঙিয়ে রাখা, হাঁস প্রভৃতি নানাপ্রকার মরা পাখি লম্বা লম্বা গলাগুলো নীচের দিকে ঝুলিয়ে আছে, আর খুব একটা জোয়ান পেটমোটা ব্যক্তি হাতে একটা প্রকাণ্ড ছুরি নিয়ে কোমরে একটা আঁচলা ঝুলিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে।

বিলেতের ভেড়াগোরুগুলো তাদের মোটাসোটা মাংসচর্বিওআলা শরীরের ও সুস্বাদের জন্যে বিখ্যাত, যদি কোনো মানুষ-খেগো সভ্যজাত থাকত, তা হলে বোধ হয় বিলেতের কসাইগুলো তাদের হাটে অত্যন্ত মাগ্‌গি দামে বিকোত। একজন মেমসাহেব বলেন যে, কসাইয়ের দোকান দেখলে তাঁর অত্যন্ত তৃপ্তি হয় ; মনে আশ্বাস হয়, দেশে আহারের অপ্রতুল নেই, দেশের পেট ভরবার মতো খাবার প্রচুর আছে, দুর্ভিক্ষের কোনো সম্ভাবনা নেই। ইংরেজদের খাবার টেবিলে যে রকম আকারে মাংস এনে দেওয়া হয়, সেটা আমার কাছে দুঃখজনক। কেটে-কুটে মসলা দিয়ে মাংস তৈরি করে আনলে একরকম ভুলে যাওয়া যায় যে একটা সত্যিকার জন্তু খেতে বসেছি ; কিন্তু মুখ-পা বিশিষ্ট আস্ত প্রাণীকে অবিকৃত আকারে টেবিলে এনে দিলে একটা মৃতদেহ খেতে বসেছি বলে গা কেমন করতে থাকে।

নাপিতের দোকানের জানলায় নানাপ্রকার কাঠের মাথায় নানাপ্রকার কোঁকড়ানো পরচুলো বসানো রয়েছে, দাড়িগোঁফ ঝুলছে, মার্কামারা শিশিতে টাক-নাশক চুল-উঠে-যাওয়া-নিবারক অব্যর্থ ওষুধ রয়েছে ; দীর্ঘকেশী মহিলারা এই দোকানে গেলে সেবকেরা (সেবিকা নয়) তাঁদের মাথা ধুয়ে দেবে, চুল বেঁধে দেবে, চুল কুঁকড়ে দেবে। এখানে মদের দোকানগুলোই সব-চেয়ে জমকালো, সন্ধ্যের সময় সেগুলো আলোয় আকীর্ণ হয়ে যায়, বাড়িগুলো প্রায় প্রকাণ্ড হয়, ভিতরটা খুব বড়ো ও সাজানো, খদ্দেরের ঝাঁক দোকানের বাইরে ও ভিতরে সর্বদাই, বিশেষত সন্ধ্যেবেলায় লেগে থাকে। দরজির দোকানও মন্দ নয়। নানা ফ্যাশনের সাজসজ্জা কাঁচের জানলার ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে, বড়ো বড়ো কাঠের মূর্তিকে কাপড় পরিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে ; মেয়েদের কাপড়চোপড় এক দিকে ঝোলানো ; এইখানে কত লুব্ধ নেত্র দিনরাত্রি তাকিয়ে আছে তার সংখ্যা নেই। এখানকার বিলাসিনীরা, যাদের নতুন ফ্যাশনের দামি কাপড় কেনবার টাকা নেই, তারা দোকানে এসে কাপড়গুলো ভালো করে দেখে যায়, তার পরে বাড়িতে গিয়ে সস্তায় নিজের হাতে তৈরি করে।

আমাদের বাড়ির কাছে একটা খোলা পাহাড়ে জায়গা আছে; সেটা কমন অর্থাৎ সরকারি জায়গা; চারিদিক খোলা, বড়ো গাছ খুব অল্প; ছোটো ছোটো গুল্মের ঝোপ ও ঘাসে পূর্ণ, চারিদিক সবুজ, বিচিত্র গাছপালা নেই বলে কেমন ধূ ধূ করছে, কেমন বিধবার মতো চেহারা। উঁচুনিচু জমি, কাঁটাগাছের ঝোপঝাপ, জায়গাটা আমার খুব ভালো লাগে। মাঝে মাঝে এইরকম কাঁটা-খোঁচা এবড়ো-খেবড়োর মধ্যে এক-এক জায়গায় ব্লু-বেল্‌স্ নামক ছোটো ছোটো ফুল ঘেঁষাঘেঁষি ফুটে সবুজের মধ্যে স্তূপাকার নীল রং ছড়িয়ে রেখেছে, কোথাও বা ঘাসের মধ্যে রাশ রাশ সাদা ডেজি ও হল্‌দে বাটার-কাপ অজস্র সৌন্দর্যে প্রকাশিত। ঝোপঝাপের মাঝে মাঝে এবং গাছের তলায় এক-একটা বেঞ্চি পাতা। এইটে সাধারণের বেড়াবার জায়গা। এখানে মানুষ এত অল্প ও জায়গা এত বেশি যে ঘেঁষাঘেষি নেই। লণ্ডনের বড়ো বড়ো বেড়াবার বাগানের মতো চারদিকেই ছাতা-হস্তক, টুপি-মস্তক, চোখ-ধাঁধক ভিড়ের আনাগোনা নেই; দূর-দূর বেঞ্চির মধ্যে নিরালা যুগলমূর্তি রোদ্দুরে এক ছাতার ছায়ায় আসীন; কিংবা তারা হাত ধরাধরি করে নিরিবিলি বেড়াচ্ছে। সবসুদ্ধ জড়িয়ে জায়গাটা উপভোগ্য। এখনো গরমিকাল শেষ হয় নি। এখানে গরমিকালে সকাল ও সন্ধ্যে অত্যন্ত সুন্দর। গরমির পূর্ণযৌবনের সময় রাত দুটো-তিনটের পরে আলো দেখা দিতে আরম্ভ করে, চারটের সময় রোদ্দুর ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে ও রাত্রি ন-টা দশটার আগে দিনের আলো নেবে না। আমি একদিন পাঁচটার সময় উঠে কমন-এ বেড়াতে গিয়েছিলুম। পাহাড়ের উপর একটা গাছের তলায় গিয়ে বসলুম, দূরে ছবির মতো ঘুমন্ত শহর, একটুও কুয়াশা নেই। নির্জন রাস্তাগুলি, গির্জের উন্নত চূড়া, রৌদ্ররঞ্জিত বাড়িগুলি নীল আকাশের পটে যেন একটি কাঠে খোদাই করা ছবির মতো আঁকা। আসলে এই শহরটা কিছুই ভালো দেখতে নয়; এখানকার বাড়িগুলোতে জানলা-কাটা-কাটা চারটে দেয়াল, একটা ঢালু ছাদ ও তার উপরে ধোঁয়া বেরোবার কতকগুলি কুশ্রী নল। ক্রমে ক্রমে যতই বেলা হতে লাগল শত শত চিমনি থেকে অমনি ধোঁয়া বেরোতে লাগল, ধোঁয়াতে ক্রমে শহরটা অস্পষ্ট হয়ে এল, রাস্তায় ক্রমে মানুষ দেখা দিল, গাড়িঘোড়া ছুটতে আরম্ভ হল, হাতগাড়ি কিংবা ঘোড়ার গাড়িতে করে দোকানিরা মাংস রুটি তরকারি বাড়ি বাড়ি বিতরণ করে বেড়াতে লাগল (এখানে দোকানিরা বাড়িতে বাড়িতে জিনিসপত্র দিয়ে আসে), ক্রমে কমন-এ লোক জমতে শুরু হল, আমি বাড়ি ফিরে এলেম।

এখানে আমার একটি শখের বেড়াবার জায়গা আছে। গাড়ির চাকার দাগ এবড়ো-খেবড়ো উঁচুনিচু পাহাড়ে রাস্তা, দুধারে ব্ল্যাকবেরী ও ঘন লতা-গুল্মের

বেড়া, বড়ো বড়ো গাছে ছায়া করে আছে, রাস্তার আশেপাশে ঘাস ও ঘাসের মধ্যে ডেজি প্রভৃতি বুনোফুল। শ্রমজীবীরা ধুলোকাদা-মাখানো ময়লা কোর্ট-প্যাণ্টলুন ও ময়লা মুখ নিয়ে আনাগোনা করছে, ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে লাল লাল ফুলো ফুলো মুখে বাড়ির দরজার বাইরে কিংবা রাস্তায় খেলা করছে—এমন মোটাসোটা গোলগাল ছেলে কোনো দেশে দেখি নি। এক-একটা বাড়ির কাছে ছোটো ছোটো পুকুরের মতো, সেখানে পোষা হাঁসগুলো ভাসছে। মাঠগুলো যদিও পাহাড়ে, উঁচুনিচু, কিন্তু চষা জমি সমতল ও পরিষ্কার। ঘাসগুলো অত্যন্ত সবুজ ও তাজা, এখানে রৌদ্র তীব্র নয় বলে ঘাসের রং আমাদের দেশের মতন জ্বলে যায় না, তাই এখানকার মাঠের দিকে চেয়ে থাকতে অত্যন্ত ভালো লাগে, অজস্র স্নিগ্ধ সবুজ রঙে চোখ যেন ডুবে যায়। মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো গাছ ও সাদা সাদা বাড়িগুলো দূর থেকে ছোটো ছোটো দেখাচ্ছে। এই রকম শূন্য মাঠ ছাড়িয়ে অনেক দূরে এসে এক-একটা প্রকাণ্ড পাইন গাছের অরণ্য পাওয়া যায়, ঘেঁষাঘেঁষি গাছে অনেক দূর জুড়ে অন্ধকার, খুব গম্ভীর, খুব নিস্তব্ধ।

নবম পত্র

গরমি কাল। সুন্দর সূর্য উঠেছে। এখন দুপুর দুটো বাজে। আমাদের দেশের শীতকালের দুপুরবেলাকার বাতাসের মতো বেশ একটি মিষ্টি হাওয়া। রোদ্দুরে চারদিক ঝাঁঝাঁ করছে। এমন ভালো লাগছে আর এমন একটু কেমন উদাস ভাব মনে আসছে যে কী বলব।

আমরা এখন ডেভনশিয়রের অন্তর্গত টর্কি বলে এক নগরে আছি। সমুদ্রের ধারে। চারিদিকে পাহাড়। অতি পরিষ্কার দিন। মেঘ নেই, কুয়াশা নেই, অন্ধকার নেই; চারিদিকে গাছপালা, চারিদিকে পাখি ডাকছে, ফুল ফুটছে। যখন টন্‌ব্রিজ ওয়েল্‌সে ছিলুম, তখন ভাবতুম এখানে যদি মদন থাকে, তবে অনেক বনবাদাড় ঝোপঝাপ কাঁটাগাছ হাতড়ে দু-চারটে বুনো ফুল নিয়েই কোনোমতে তাকে ফুলশর বানাতে হয়। কিন্তু টর্কিতে মদন যদি গ্যাট্‌লিং কামানের মতো এমন একটা বাণ উদ্ভাবন করে থাকে, যার থেকে প্রতি মিনিটে হাজারটা করে তীর ছোঁড়া যায় আর সেই বাণ দিনরাত যদি কাজে ব্যস্ত থাকে, তবু মদনের ফুলশরে তহবিল এখানে দেউলে হবার কোনো সম্ভাবনা নেই, এত ফুল। যেখানে সেখানে, পথে-ঘাটে, ফুল মাড়িয়ে চলতে হয়। আমরা রোজ

পাহাড়ে বেড়াতে যাই। গোরু চরছে, ভেড়া চরছে; এক-এক জায়গায় রাস্তা এত ঢালু যে, উঠতে-নাবতে কষ্ট হয়। এক-এক জায়গায় খুব সংকীর্ণ পথ, দু ধারে গাছ উঠেছে আঁধার করে, ওঠবার সুবিধের জন্যে ভাঙা ভাঙা সিঁড়ির মতন আছে, পথের মধ্যেই লতা গুল্ম উঠেছে। চারদিকে মধুর রোদ্দুর। এখানকার বাতাস বেশ গরম, ভারতবর্ষ মনে পড়ে। এইটুকু গরমেই লণ্ডনের প্রাণীদের চেয়ে এখানকার জীবজন্তুদের কত নির্জীব ভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। ঘোড়াগুলো আস্তে আস্তে যাচ্ছে, মানুষগুলোর তেমন ভারি ব্যস্ত ভাব নেই, গড়িমসি করে চলেছে।

এখানকার সমুদ্রের ধার আমার বড়ো ভালো লাগে। যখন জোয়ার আসে, তখন সমুদ্রতীরের খুব প্রকাণ্ড পাথরগুলো জলে ডুবে যায়, তাদের মাথা বেরিয়ে থাকে। ছোটো ছোটো দ্বীপের মতো দেখায়। জলের ধারেই ছোটো বড়ো কত পাহাড়। ঢেউ লেগে লেগে পাহাড়ের নীচে গুহা তৈরি হয়ে গেছে; যখন ভাঁটা পড়ে যায়, তখন আমরা এক-এক দিন এই গুহার মধ্যে গিয়ে বসে থাকি। গুহার মধ্যে জায়গায় জায়গায় অতি পরিষ্কার একটু জল জমে রয়েছে, ইতস্তত সমুদ্র-শৈবাল জমে আছে, সমুদ্রের একটা স্বাস্থ্যজনক গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, চারদিকে পাথর ছড়ানো। আমরা সবাই মিলে এক-এক দিন সেই পাথরগুলো ঠেলাঠেলি করে নাড়াবার চেষ্টা করি, নানা শামুক ঝিনুক কুড়িয়ে নিয়ে আসি। এক একটা পাহাড় সমুদ্রের জলের উপর খুব ঝুঁকে পড়েছে; আমরা প্রাণপণ করে এক এক দিন সেই অতি দুর্গম পাহাড়গুলোর উপর উঠে বসে নীচে সমুদ্রের ঢেউয়ের ওঠাপড়া দেখি। হু হু শব্দ উঠছে, ছোটো ছোটো নৌকো পাল তুলে চলে যাচ্ছে, চারদিকে রোদ্দুর, মাথার উপর ছাতা খোলা, পাথরের উপর মাথা দিয়ে আমরা শুয়ে শুয়ে গল্প করছি। আলস্যে কাল কাটাবার এমন জায়গা আর কোথায় পাব? এক-এক দিন পাহাড়ে যাই, আর পাথর-দিয়ে-ঘেরা ঝোপেঝাপে-ঢাকা একটি প্রচ্ছন্ন জায়গা দেখলে সেই খাদটিতে গিয়ে বই নিয়ে পড়তে বসি।

দশম পত্র

ক্রিস্‌মাস ফুরোল, আবার দেখতে দেখতে আর-একটা উৎসব এসে পড়ল। আজ নূতন বর্ষের প্রথম দিন। কিন্তু তার জন্যে কিছুই গোলমাল দেখতে পাচ্ছি নে। নূতন বৎসর যে এখানে এমন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আসবে তা জানতেম না। শুনেছি ফ্রান্সে লোকে নতুন বৎসরকে খুব সমাদরের সঙ্গে আবাহন করে। কাল

পুরাতন বৎসরের শেষ রাত্রে আমাদের প্রতিবেশীরা বাড়ির জানলা খুলে রেখেছিল। পাছে পুরোনো বৎসর ঘরের মধ্যে আটকা পড়ে থাকে, পাছে নতুন বৎসর এসে জানলার কাছে বৃথা ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

টর্কি থেকে বহুদিন হল আমরা আবার লণ্ডনে এসেছি। এখন আমি ক—র পরিবারের মধ্যে বাস করি। তিনি, তাঁর স্ত্রী, তাঁদের চার মেয়ে, দুই ছেলে, তিন দাসী, আমি ও টেবি বলে এক কুকুর নিয়ে এই বাড়ির জনসংখ্যা। মিস্টার ক—একজন ডাক্তার। তাঁর মাথার চুল ও দাড়ি প্রায় সমস্ত পাকা। বেশ বলিষ্ঠ ও সুশ্রী দেখতে। অমায়িক স্বভাব, অমায়িক মুখশ্রী। মিসেস ক— আমাকে আন্তরিক যত্ন করেন। শীতের সময় আমি বিশেষ গরম কাপড় না পরলে তাঁর কাছে ভর্ৎসনা খাই। খাবার সময় যদি তাঁর মনে হয় আমি কম করে খেয়েছি, তা হলে যতক্ষণ না তাঁর মনের মতো খাই ততক্ষণ পীড়াপীড়ি করেন। বিলেতে লোকে কাশিকে ভয় করে; যদি দৈবাৎ আমি দিনের মধ্যে দু-বার কেশেছি তা হলেই তিনি জোর করে আমার স্নান বন্ধ করান, আমাকে দশ রকম ওষুধ গেলান, শুতে যাবার আগে আমার পায়ে খানিকটা গরম জল ঢালবার বন্দোবস্ত করেন, তবে ছাড়েন। বাড়ির মধ্যে সকলের আগে বড়ো মিস ক—ওঠেন। তিনি নীচে এসে ব্রেকফাস্ট তৈরি হয়েছে কি না তদারক করেন; অগ্নিকুণ্ডে দু-চার হাতা কয়লা দিয়ে ঘরটি বেশ উজ্জ্বল করে রাখেন। খানিক বাদে সিঁড়িতে একটা দুদ্দাড় পায়ের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। বুড়ো ক—শীতে হি হি করতে করতে খাবার ঘরে এসে উপস্থিত। তাড়াতাড়ি আগুনে হাত-পা পিঠ-বুক তাতিয়ে খবরের কাগজ হাতে খাবার টেবিলে এসে বসেন। তাঁর বড়ো মেয়েকে চুম্বন করেন, আমার সঙ্গে সুপ্রভাত অভিবাদন হয়। লোকটা প্রফুল্ল। আমার সঙ্গে খানিকটা হাসিতামাশা হয়, খবরের কাগজ থেকে এটা-ওটা পড়ে শোনান। তাঁর এক পেয়ালা কফি শেষ হয়ে গেছে, এমন সময়ে তাঁর আর দুটি মেয়ে এসে তাঁকে চুম্বন করলেন। তাঁদের সঙ্গে তাঁর বন্দোবস্ত ছিল যে, তাঁরা যেদিন মিস্টার ক—র আগে উঠবেন, সেদিন মিস্টার ক—তাঁদের পাঁচ সিকে পুরস্কার দিবেন, আর যেদিন মিস্টার ক—তাঁদের আগে উঠবেন, সেদিন তাঁদের চার আনা দণ্ড দিতে হবে। যদিও এত অল্প দিতে হত, তবু তাঁদের কাছে প্রায় দু-তিন পাউণ্ড পাওনা হয়েছে। রোজ সকালে পাওনাদার পাওনার দাবি করেন। কিন্তু দেনদাররা হেসেই উড়িয়ে দেন। ক—বলেন, "এ ভারি অন্যায়।" আমাকে মাঝে মাঝে মধ্যস্থ মেনে বলেন, "আচ্ছা মিস্টার টি—তুমিই বলো, এ-রকম ডেট অফ অনর ফাঁকি দেওয়া কি ভদ্রতা?" যা হোক

পরিশোধের অভাবে পাওনা বেড়েই চলেছে। তার পরে মিসেস ক— এলেন। আমাদের ব্রেকফাস্ট প্রায় সাড়ে ন-টার মধ্যে শেষ হয়। বাড়ির বড়ো ছেলে আগেই খাওয়া সেরে কাজে গিয়েছেন, আর মিস্টার ক— র ছোটো ছেলেটি ও ছোটো মেয়েটি অনেকক্ষণ হল খাওয়া শেষ করেছে। একজনের কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। টেবি কুকুরটি অনেকক্ষণ হল এসে আগুনের কাছে বসে আছে। ছোট্টো কুকুরটি। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া রোঁয়া। রোঁয়াতে চোখমুখ ঢাকা। বুড়ো হয়েছে, আর তার একটা চোখ কানা হয়ে গেছে। আদর পেয়ে পেয়ে এই ব্যক্তির অভ্যাস হয়েছে নবাবি চাল। ড্রয়িংরুম ছাড়া অন্য কোনো ঘরে তার মন বসে না। ঘরের সকলের চেয়ে ভালো কেদারাটিতে অম্লানবদনে লাফিয়ে উঠে বসে, এক পাশে যদি আর কেউ এসে বসল, অমনি সে সদর্পে পাশের কৌচটির উপরে গিয়ে বসে পড়ে। সকাল-বেলায় ব্রেকফাস্টের সময় তার তিনটি বিস্কুট বরাদ্দ। সে বিস্কুটগুলি নিয়ে খাবার ঘরে বসে থাকে, যতক্ষণ আমি গিয়ে সেই বিস্কুটগুলি নিয়ে তার সঙ্গে খানিকটা খেলা করি, একবার তার মুখ থেকে কেড়ে নিই একবার গড়িয়ে দিই। আগে আগে যখন আমার উঠতে দেরি হত, সে তার বরাদ্দ বিস্কুট নিয়ে আমার শোবার ঘরের কাছে বসে ঘেউ ঘেউ করত। কিন্তু গোল করলে বিরক্ত হতুম দেখে সে এখন আর ঘেউ ঘেউ করে না। আস্তে আস্তে পা দিয়ে দরজা ঠেলে, যতক্ষণ না দরজা খুলে দিই চুপ করে বাইরে বসে থাকে। দরজা খুলে ঘর থেকে বেরোলেই লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে লেজ নেড়ে উৎসাহ প্রকাশ করে; তার পরে একবার বিস্কুটের দিকে চায় একবার আমার মুখের দিকে। যা হোক সাড়ে ন-টার মধ্যে ব্রেকফাস্ট শেষ হয়। তার পরে হাতে দস্তানা পরা গৃহিণী দাসীদের নিয়ে তাঁর চৌতলা থেকে একতলা পর্যন্ত, জিনিসপত্র গুছিয়ে ঘরদ্বার পরিষ্কার ও গৃহকার্য তদারক করে ওঠা-নাবায় প্রবৃত্ত। একবার রান্নাঘরে যান, সেখানে শাকওআলা রুটিওআলা মাংসওআলার বিল দেখেন, দেনা চুকিয়ে দেন। মাঝে মাঝে উপরে এসে কর্তার সঙ্গে গৃহকার্যের পরামর্শ হয়। রান্নাঘরের উপকরণ পরিষ্কার আছে কি না ও যথাস্থানে তাদের রাখা হয়েছে কি না দেখেন, ভালো মাংস এনেছে কি না, ওজনে কম পড়েছে কি না তদন্ত করেন। রাঁধুনীর সঙ্গে মাঝে মাঝে যোগ দেন। এইরকম ব্রেকফাস্টের পর থেকে প্রায় বেলা একটা-দেড়টা পর্যন্ত তাঁকে নানাবিধ কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে তাঁর বড়ো মেয়ে যোগ দেন। মেজো মেয়ে প্রত্যহ একটি ঝাড়ন নিয়ে ড্রয়িংরুম সাফ করেন। দাসীরা ঘর ঝাঁট দিয়ে যায়, আর জিনিসপত্রে যা কিছু ধুলো লাগে তা তিনি নিজের হাতে ঝেড়ে-ঝুড়ে সাফ করেন। তৃতীয় মেয়ে বালিশের

আচ্ছাদন আসন মোজা কাপড় প্রভৃতি নানাবিধ সেলাইয়ে নিযুক্ত হন, চিঠিপত্র লেখেন, এক-এক দিন বাজনা ও গান অভ্যাস করেন। বাড়ির মধ্যে তিনিই গাইয়ে বাজিয়ে। আজকাল স্কুল বন্ধ, ছোটো ছেলেটি ও মেয়েটি ভারি খেলায় মগ্ন। দেড়টার সময় আমাদের লাঞ্চ খাওয়া সমাপন হলে আবার যিনি যাঁর কাজে নিযুক্ত হন। এই সময়ে ভিজিটরদের আসবার সময়। হয়তো মিসেস ক— তাঁর স্বামীর এক জোড়া ছেঁড়া মোজা নিয়ে চশমা প'রে ড্রয়িংরুমে বসে সেলাই করছেন। ছোটো মেয়ে একটি পশমের জামা তাঁর ভাইপোর জন্যে তৈরি করে দিচ্ছেন। মেজো মেয়েটি একটু অবসর পেয়ে আগুনের কাছে বসে হয়তো গ্রীনের লিখিত ইংরেজ জাতির ইতিহাস পড়তে নিযুক্ত। বড়ো মিস ক— হয়তো তাঁর কোনো আলাপীর বাড়িতে ভিজিট করতে গিয়েছেন। তিনটের সময় হয়তো একজন ভিজিটর এলেন। দাসী ড্রয়িংরুমে এসে নাম উচ্চারণ করলে "মিস্টার ও মিসস এ—" বলতে বলতে ঘরের মধ্যে তাঁরা দু-জনে উপস্থিত। মোজা জামা রেখে, বই মুড়ে, গৃহিণী ও তাঁর কন্যারা আগন্তুকদের অভ্যর্থনা করলেন। আবহাওয়া সম্বন্ধে পরস্পরের মতামতের ঐক্য নিয়ে আলাপ শুরু হল। মিসেস এ— বললেন, "মিস্টার এক্স—এর তেতাল্লিশ বৎসর বয়সে হাম হয়। হাম হয়েছিল বলে তিনি চার দিন আপিসে যেতে পারেন নি। কাল আপিসে গিয়েছিলেন। তাঁর হামের প্রসঙ্গে আপিসের লোকেরা তাঁকে নির্দয়রূপে ঠাট্টা করতে আরম্ভ করেছে।" অন্যেরা লোকটি সম্বন্ধে দরদ প্রকাশ করলে। এই কথা থেকে ক্রমে হামরোগের বিষয়ে যত কথা উঠতে পারে উঠল। মিস ক— খবর দিলেন মিস্টার জ—এর তৃতীয় ছেলেটির হাম হয়েছে। তার থেকে কথা উঠল যে, মিস্টার জ—এর যে এক পিতৃব্য বোন মিস ই—অস্ট্রেলিয়ায় আছেন, তাঁর কাপ্তেন ব—এর সঙ্গে বিবাহ হয়ে গেছে। এই রকম খানিকক্ষণ কথোপকথন হলে পর তাঁরা চলে গেলেন। বিকেলে হয়তো আমরা সবাই মিলে একটু বেড়াতে গেলুম। বেড়িয়ে এসে সাড়ে ছ'টার সময় আমাদের ডিনার। ডিনার খেয়ে সাতটার সময় আমরা সবাই মিলে ড্রইংরুমে গিয়ে বসি। আগুন জ্বলছে। ঘরটি বেশ গরম হয়ে উঠেছে। আমরা আগুনের চারদিকে ঘিরে বসলুম। এক-এক দিন আমাদের গান-বাজনা হয়। আমি ইতিমধ্যে অনেক ইংরেজি গান শিখেছি। আমি গান করি। মিস ক— বাজান। মিস ক— আমাকে অনেকগুলি গান শিখিয়েছেন। কিন্তু প্রায় সন্ধ্যেবেলায় আমাদের একটু আধটু পড়াশুনা হয়। আমরা পালা করে ছ দিনে ছ রকমের বই পড়ি। বই পড়তে পড়তে এক-এক দিন প্রায় সাড়ে-এগারোটা বারোটা হয়ে যায়।

ছেলেদের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেছে। তারা আমাকে আর্থার খুড়ো বলে।

এথেল ছোটো মেয়েটির ইচ্ছে যে আমি কেবল একলা তারই আঙ্কল্ আর্থার হই। তার ভাই টম যদি আমাকে দাবি করে তবেই তার দুঃখ। একদিন টম তার ছোটো বোনকে রাগাবার জন্যে একটু বিশেষ জোর দিয়ে বলেছিল, আমারই আঙ্কল্ আর্থার। তখনই এথেল আমার গলা জড়িয়ে ধরে ঠোঁট দুটি ফুলিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে দিলে। টম একটু অস্থির, কিন্তু ভারি ভালোমানুষ। খুব মোটাসোটা। মাথাটা খুব প্রকাণ্ড। মুখটা খুব ভারি ভারি। সে এক-এক সময়ে আমাকে এক-একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে। একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল, "আচ্ছা, আঙ্কল্ আর্থার, ইঁদুররা কী করে?" আঙ্কল্ বললেন, "তারা রান্নাঘর থেকে চুরি করে খায়।" সে একটু ভেবে বললে, "চুরি করে? আচ্ছা, চুরি করে কেন?" আঙ্কল্ বললেন, "তাদের খিদে পায় বলে।" শুনে টমের বড়ো ভালো লাগল না। সে বরাবর শুনে আসছে যে, জিজ্ঞাসা না করে পরের জিনিস নেওয়া অন্যায়। আর-একটি কথা না বলে সে চলে গেল। যদি তার বোন কখনো কাঁদে, সে তাড়াতাড়ি এসে সান্ত্বনার স্বরে বলে, "Oh, poor Ethel, don't you cry! Poor Ethel!" এথেলের মনে মনে জ্ঞান আছে যে, সে একজন লেডি। সে কেমন গম্ভীরভাবে কেদারায় ঠেস দিয়ে বসে। টমকে এক-এক সময়ে ভর্ৎসনা করে বলে, "আমাকে বিরক্ত ক'রো না।" একদিন টম পড়ে গিয়ে কাঁদছিল। আমি তাকে বললেম, "ছি, কাঁদতে আছে!" অমনি এথেল আমার কাছে ছুটে এসে জাঁক করে বললে, "আঙ্কল্ আর্থার, আমি একবার ছেলেবেলায় রান্নাঘরে পড়ে গিয়েছিলেম, কিন্তু কাঁদি নি।" ছেলেবেলায়!

মিস্টার ন—, ডাক্তারের আর এক ছেলে, বাড়িতে থাকেন কিন্তু তাঁকে দেখতে পাই নে। তিনি সমস্ত দিন আপিসে। আপিস থেকে এলেও তাঁর বড়ো একটা দেখা পাওয়া যায় না। তার কারণ মিস্ ই—র সঙ্গে তাঁর বিয়ের সম্বন্ধ। তাঁদের দু-জনে কোর্টশিপ চলছে। রবিবার দু-বেলা প্রেয়সীকে নিয়ে তাঁর চার্চে যেতে হয়। যখন বিকেলে একটু অবসর পান, প্রণয়িনীর বাড়িতে গিয়ে এক পেয়ালা চা খেয়ে আসেন। প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যেবেলা তাঁদের বাড়িতে তাঁর নেমন্তন্ন। এই রকমে তাঁর সময় ভারি অল্প। উভয়ে পরস্পরকে নিয়ে এমন সুখী আছেন যে, অবসরকাল কাটাবার জন্যে অন্য কোনো জীবের সঙ্গ তাঁদের আবশ্যক করে না। শুক্রবার সন্ধ্যেবেলায় যদি আকাশ ভেঙে পড়ে তবু মিস্টার ন— পরিষ্কার করে চুলটি ফিরিয়ে, পমেটম মেখে, কোট ব্রাশ করে ফিটফাট হয়ে, ছাতা হাতে বাড়ি থেকে বেরোবেনই। একবার খুব শীত পড়েছিল, আর তাঁর ভারি

কাশি হয়েছিল ; মনে করলেম, আজ বুঝি বেচারির আর যাওয়া হয় না। সাতটা বাজতে না বাজতেই দেখি তিনি ফিটফাট হয়ে নেবে এসেছেন।

যা হ'ক, আমার এই পরিবারের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। সেদিন মেজো মেয়ে আমাকে বলছিলেন যে, প্রথম যখন তাঁরা শুনলেন যে একজন ভারতবর্ষীয় ভদ্রলোক তাঁদের মধ্যে বাস করতে আসছে, তাঁদের ভারি ভয় হয়েছিল। যেদিন আমার আসবার কথা সেইদিন মেজো ও ছোটো মেয়ে, তাঁদের এক আত্মীয়ের বাড়িতে পালিয়ে গিয়েছিলেন। প্রায় এক হপ্তা বাড়িতে আসেন নি। তার পর হয়তো যখন তাঁরা শুনলেন যে, মুখে ও সর্বাঙ্গে উল্কি নেই, ঠোঁট বিঁধিয়ে অলঙ্কার পরে নি, তখন তাঁরা বাড়িতে ফিরে এলেন। ওঁরা বলেন যে প্রথম প্রথম এসে যদিও আমার সঙ্গে কথাবার্তা কয়েছিলেন তবুও দু-দিন পর্যন্ত আমার মুখ দেখেন নি। হয়তো ভয় হয়েছিল যে কী অপূর্ব ছাঁচে ঢালাই মুখই না জানি দেখবেন। তার পর যখন মুখ দেখলেন— তখন ?

যা হ'ক, এই পরিবারে সুখে আছি। সন্ধ্যেবেলা আমোদে কেটে যায়— গান বাজনা, বই পড়া। আর এথেল তার আঙ্কল্ আর্থারকে মুহূর্ত ছেড়ে থাকতে চায় না।

য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত

সুহৃদ্বরকে এই গ্রন্থ

স্মরণোপহারস্বরূপে

উৎসর্গ করিলাম।

গ্রন্থকার

য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি

শুক্রবার। ২২শে আগস্ট ১৮৯০। দেশকালের মধ্যে যে একটা প্রাচীন ঘনিষ্ঠতা আছে, বাষ্পযানে সেটা লোপ করে দেবার চেষ্টা করছে। পূর্বে সময় দিয়ে দূরত্বের পরিমাণ হত; লোকে বলত এক প্রহরের রাস্তা, দু-দিনের রাস্তা। এখন কেবল গজের মাপটাই অবশিষ্ট। দেশকালের চিরদাম্পত্যের মাঝখান দিয়ে অবাধে বড়ো বড়ো কলের গাড়ি এবং কলের জাহাজ চলে যাচ্ছে।

কেবল তাই নয়— এশিয়া এবং আফ্রিকা দুই ভগ্নীর বাহুবন্ধন বিচ্ছিন্ন করে মাঝে বিরহের লবণাম্বুরাশি প্রবাহিত করা হয়েছে। আমেরিকার উত্তর দক্ষিণ যমজ ভ্রাতার মতো জন্মাবধি সংলগ্ন হয়ে আছে, শোনা যায় তাদের মধ্যেও লৌহাস্ত্র চালনার উদ্যোগ করা হয়েছিল। এমনি করে সভ্যতা সর্বত্রই জলে স্থলে দেশে কালে গৃহবিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়ে আপনার পথটি করে নেবার চেষ্টা করছে।

পূর্বে যখন দীর্ঘ পথ প্রদক্ষিণ করে য়ুরোপে পৌঁছতে অনেক বৎসর লাগত তখন এই দুই মহাদেশের যথার্থ ব্যবধান সম্পূর্ণ ধারণা করবার দীর্ঘকাল অবসর পাওয়া যেত। এখন ক্রমেই সেটা হ্রাস হয়ে আসছে।

কিন্তু দেশকালের ঘনিষ্ঠতা যতই হ্রাস হ'ক, চিরকালের অভ্যাস একেবারে যাবার নয়। যদিও তিন মাসের টিকিট মাত্র নিয়ে য়ুরোপে চলেছি, তবু একটা কাল্পনিক দীর্ঘকালের বিভীষিকা মন থেকে তাড়াতে পারছি নে। মনে হচ্ছে যেন অনেক দিনের জন্যে চলেছি।

কালিদাসের সময়ে যখন রেলগাড়ি ইস্টিমার পোস্ট-আপিস ছিল না তখনই খাঁটি বিরহ ছিল; এবং তখনকার দিনে বছরখানেকের জন্য রামগিরিতে বদলি হয়ে যক্ষ যে সুদীর্ঘচ্ছন্দে বিলাপ-পরিতাপ করেছিল সে তার পক্ষে অযথা হয় নি। কিন্তু স্তূপাকার তুলো যেমন কলে চেপে একটি পরিমিত গাঁটে পরিণত হয়, সভ্যতার চাপে আমাদের সমস্তই তেমনি সংক্ষিপ্ত নিবিড় হয়ে আসছে। ছয় মাসকে জাঁতার তলায় ফেলে তিন মাসের মধ্যে ঠেসে দেওয়া হচ্ছে; পূর্বে যা মুটের মাথার বোঝা ছিল এখন তা পকেটের মধ্যে ধরে। এখন দুই-এক পাতার মধ্যেই বিরহগীতির সমাপ্তি এবং বিদ্যুৎযান যখন প্রচলিত হবে তখন বিরহ এত গাঢ় হবে যে, চতুর্দশ-পদীও তার পক্ষে ঢিলে বোধ হবে।

সূর্য অস্তপ্রায়। জাহাজের ছাদের উপর হালের কাছে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের

তীরের দিকে চেয়ে রইলুম। সমুদ্রের জল সবুজ, তীরের রেখা নীলাভ, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সন্ধ্যা রাত্রির দিকে এবং জাহাজ সমুদ্রের মধ্যে ক্রমশই অগ্রসর হচ্ছে। বামে বোম্বাই বন্দরের দীর্ঘ রেখা এখনও দেখা যাচ্ছে।

ক্রমে বন্দর ছাড়িয়ে গেলুম। সন্ধ্যার মেঘাবৃত অন্ধকারটি সমুদ্রের অনন্ত শয্যায় দেহ বিস্তার করলে। আকাশে তারা নেই। কেবল দূরে লাইট-হাউসের আলো জ্বলে উঠল; সমুদ্রের শিয়রের কাছে সেই কম্পিত দীপশিখা যেন ভাসমান সন্তানদের জন্যে ভূমিমাতার আশঙ্কাকুল জাগ্রত দৃষ্টি।

জাহাজ বোম্বাই বন্দর পার হয়ে গেল।

ভাসল তরী সন্ধেবেলা, ভাবিলাম এ জলখেলা,
মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে।

কিন্তু সী-সিক্‌নেসের কথা কে মনে করেছিল!

যখন সবুজ জল ক্রমে নীল হয়ে এল এবং তরঙ্গে তরীতে মিলে আন্দোলন উপস্থিত করে দিলে তখন দেখলুম সমুদ্রের পক্ষে জলখেলা বটে কিন্তু আমার পক্ষে নয়।

ভাবলুম এই বেলা মানে মানে কুঠরির মধ্যে ঢুকে কম্বলটা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ি গে। যথাসম্ভব ক্যাবিনের মধ্যে প্রবেশ করে কাঁধ থেকে কম্বলটা বিছানার উপর ফেলে দরজা বন্ধ করে দিলুম। ঘর অন্ধকার। বুঝলুম, আলো নিবিয়ে দিয়ে দাদা তাঁর বিছানায় শুয়েছেন। শারীরিক দুঃখ নিবেদন করে একটুখানি স্নেহ উদ্রেক করবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "দাদা, ঘুমিয়েছেন কি?" হঠাৎ নিতান্ত বিজাতীয় মোটা গলায় কে একজন হুংকার দিয়ে উঠল, "হূজ ছাট!" আমি বললুম, "বাস রে! এ তো দাদা নয়!" তৎক্ষণাৎ বিনীত অনুতপ্ত স্বরে জ্ঞাপন করলুম, "ক্ষমা করবেন, দৈবক্রমে ভুল কুঠরিতে প্রবেশ করেছি।" অপরিচিত কণ্ঠ বললে, "অল রাইট!" কম্বলটি পুনশ্চ তুলে নিয়ে কাতর শরীরে সংকুচিত চিত্তে বেরোতে গিয়ে দেখি দরজা খুঁজে পাই নে। বাক্স তোরঙ্গ লাঠি বিছানা প্রভৃতি বিচিত্র জিনিসের মধ্যে খট্‌ খট্‌ শব্দে হাতড়ে বেড়াতে লাগলুম। ইঁদুর কলে পড়লে তার মানসিক ভাব কী রকম হয় এই অবসরে কতকটা বুঝতে পারা যেত, কিন্তু তার সঙ্গে সমুদ্রপীড়ার সংযোগ হওয়াতে ব্যাপারটা অপেক্ষাকৃত জটিল হয়ে পড়েছিল।

মন যতই ব্যাকুল হয়ে উঠছে শরীর ততই গলদ্‌ঘর্ম এবং কণ্ঠাগত অন্তরিন্দ্রিয়ের আক্ষেপ উত্তরোত্তর অবাধ্য হয়ে উঠছে। অনুসন্ধানের পর যখন হঠাৎ মসৃণ চিক্কণ শ্বেতকাচ-নির্মিত দ্বারকর্ণটি হাতে ঠেকল, তখন মনে হল এমন প্রিয়স্পর্শসুখ বহুকাল অনুভব করা হয় নি। দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ে নিঃসংশয়চিত্তে পরবর্তী ক্যাবিনের

দ্বারে গিয়ে উপস্থিত। গিয়েই দেখি, আলো জ্বলছে, কিন্তু মেজের উপর পরিত্যক্ত গাউন পেটিকোট প্রভৃতি স্ত্রীলোকের গাত্রাবরণ বিক্ষিপ্ত। আর অধিক কিছু দৃষ্টিপথে পড়বার পূর্বেই পলায়ন করলুম। প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে বার বার তিন বার ভ্রম করবার অধিকার সকলেরই আছে, কিন্তু তৃতীয় বার পরীক্ষা করতে সাহস হল না। এবং সেরূপ শক্তিও ছিল না। অবিলম্বে জাহাজের ছাতে গিয়ে উপস্থিত হলুম। সেখানে বিহ্বলচিত্তে জাহাজের কাঠরার 'পরে ঝুঁকে পড়ে শরীরমনের একান্ত উদ্বেগ কিঞ্চিৎ লাঘব করা গেল। তার পরে বহুলাঞ্ছিত অপরাধীর মতো আস্তে আস্তে কম্বলটি গুটিয়ে তার উপর লজ্জিত নতমস্তক স্থাপন করে একটি কাঠের বেঞ্চিতে শুয়ে পড়লুম।

কী সর্বনাশ! এ কার কম্বল! এ তো আমার নয় দেখছি। যে সুখসুপ্ত বিশ্বস্ত ভদ্রলোকটির ঘরের মধ্যে রাত্রে প্রবেশ করে কয়েক মিনিট ধরে অনুসন্ধান-কার্যে ব্যাপৃত ছিলুম নিশ্চয় এ তারই। একবার ভাবলুম ফিরে গিয়ে চুপিচুপি তার কম্বল স্বস্থানে রেখে আমারটি নিয়ে আসি; কিন্তু যদি তার ঘুম ভেঙে যায়! পুনর্বার যদি তার ক্ষমা প্রার্থনা করবার প্রয়োজন হয় তবে সে কি আর আমাকে বিশ্বাস করবে! যদি বা করে, তবু এক রাত্রের মধ্যে দু-বার ক্ষমা প্রার্থনা করলে নিদ্রাকাতর বিদেশীর খৃষ্টীয় সহিষ্ণুতার প্রতি অতিমাত্র উপদ্রব করা হবে না কি! আরো একটা ভয়ংকর সম্ভাবনার কথা মনে উদয় হল। দৈববশত দ্বিতীয় বার যে ক্যাবিনের দ্বারে গিয়ে পড়েছিলুম তৃতীয় বারও যদি ভ্রমক্রমে সেইখানে গিয়েই উপস্থিত হই এবং প্রথম ক্যাবিনের ভদ্রলোকটির কম্বলটি সেখানে রেখে সেখানকার একটি গাত্রাচ্ছাদন তুলে নিয়ে আসি তাহলে কী রকমের একটা রোমহর্ষণ প্রমাদ-প্রহেলিকা উপস্থিত হয়! ইত্যাকার দুশ্চিন্তায় তীব্র তাম্রকূটবাসিত পরের কম্বলের উপর কাতরভাবে রাত্রি যাপন করলুম।

২৩ আগস্ট। আমার স্বদেশীয় সঙ্গী বন্ধুটি সমস্ত রাত্রির সুখনিদ্রাবসানে প্রাতঃকালে অত্যন্ত প্রফুল্ল পরিপুষ্ট সুস্থ মুখে ডেকের উপর দর্শন দিলেন। আমি তাঁর দুই হস্ত চেপে ধরে বললুম, "ভাই, আমার তো এই অবস্থা।" শুনে তিনি আমার বুদ্ধিবৃত্তির উপর কলঙ্ক আরোপ করে হাস্যসহকারে এমন দুটো-একটা বিশেষণ প্রয়োগ করলেন যা গুরুমশায়ের পাঠশালা পরিত্যাগের পর থেকে আর কখনো শোনা হয় নি। সমস্ত রজনীর দুঃখের পর প্রভাতের এই অপমানটাও নিরুত্তরে সহ্য করলুম। অবশেষে তিনি দয়াপরবশ হয়ে আমার ক্যাবিনের ভৃত্যটিকে ডেকে দিলেন। তাকেও আবার একে একে সমস্ত ঘটনাটি খুলে বলতে হল। প্রথমে সে কিছুই বুঝতে পারলে না, মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তার জীবনের অভিজ্ঞতায় নিঃসন্দেহ এ-রকম ঘটনা এই

প্রথম। অবশেষে ধীরে ধীরে সে সমুদ্রের দিকে এক বার মুখ ফেরালে এবং ঈষৎ হাসলে; তার পর চলে গেল।

সী-সীক্‌নেস ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল। সে-ব্যাধিটার যন্ত্রণা অনভিজ্ঞ স্থলচরদের কিছুতে বোঝানো যেতে পারে না। নাড়িতে ভারতবর্ষের অন্ন তিলমাত্র অবশিষ্ট রইল না। য়ুরোপে প্রবেশ করবার পূর্বে সমুদ্র এই দেহ হতে ভারতবর্ষটাকে যেন ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে একেবারে সাফ করে ফেলবার চেষ্টা করছে। ক্যাবিনে চার দিন পড়ে আছি।

২৬ আগস্ট। শনিবার থেকে আর আজ এই মঙ্গলবার পর্যন্ত কেটে গেল। জগতে ঘটনা বড়ো কম হয় নি— সূর্য চার বার উঠেছে এবং তিন বার অস্ত গেছে, বৃহৎ পৃথিবীর অসংখ্য জীব দন্তধাবন থেকে দেশ-উদ্ধার পর্যন্ত বিচিত্র কর্তব্যের মধ্যে দিয়ে তিনটে দিন মহা ব্যস্তভাবে অতিবাহিত করেছে— জীবনসংগ্রাম, প্রাকৃতিক নির্বাচন, আত্মরক্ষা, বংশরক্ষা প্রভৃতি জীবরাজ্যের বড়ো বড়ো ব্যাপার সবেগে চলছিল— কেবল আমি শয্যাগত জীবন্মৃত হয়ে পড়ে ছিলুম। আধুনিক কবিরা কখনো মুহূর্তকে অনন্ত কখনো অনন্তকে মুহূর্ত আখ্যা দিয়ে প্রচলিত ভাষাকে নানাপ্রকার বিপরীত-ব্যায়াম-বিপাকে প্রবৃত্ত করান। আমি আমার এই চারটে দিনকে বড়ো রকমের একটা মুহূর্ত বলব, না এর প্রত্যেক মুহূর্তকে একটা যুগ বলব স্থির করতে পারছি নে।

যাই হ'ক কষ্টের সীমা নেই। মানুষের মতো এতবড়ো একটা উন্নত জীব যে সহসা এতটা উৎকট দুঃখ ভোগ করে তার একটা মহৎ নৈতিক কিংবা আধ্যাত্মিক কারণ থাকাই উচিত ছিল; কিন্তু জলের উপরে কেবল খানিকটা ঢেউ ওঠার দরুন জীবাত্মার এত বেশি পীড়া নিতান্ত অন্যায় অসংগত এবং অগৌরবজনক বলে বোধ হয়। কিন্তু জাগতিক নিয়মের প্রতি দোষারোপ করে কোনো সুখ নেই, কারণ সে নিন্দাবাদে কারো গায়ে কিছু ব্যথা বাজে না, এবং জগৎ-রচনার তিলমাত্র সংশোধন হয় না।

যন্ত্রণাশয্যায় অচেতনপ্রায় ভাবে পড়ে আছি। কখনো কখনো ডেকের উপর থেকে পিয়ানোর সংগীত মৃদু মৃদু কর্ণে এসে প্রবেশ করে, তখন স্মরণ হয় আমার এই সংকীর্ণ শয়ন-কারাগারের বাইরে সংসারের নিত্য আনন্দস্রোত সমভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। বহুদূরে ভারতবর্ষের পূর্বসীমায় আমার সেই সংগীতধ্বনিত স্নেহমধুর গৃহ মনে পড়ে। সুখ-স্বাস্থ্য-সৌন্দর্যময় জীবজগৎকে অতিদূরবর্তী ছায়ারাজ্যের মতো বোধ হয়। মধ্যের এই সুদীর্ঘ মরুপথ অতিক্রম করে কখন সেখানকার জীবন-উৎসবের মধ্যে ফিরে যেতে পারব, এই কথাই কেবল ভাবি। মঙ্গলবার প্রাতে যখন শরীরের মধ্যে প্রাণটা ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট ছিল না, তখন আমার বন্ধু অনেক

আশ্বাস দিয়ে আমাকে জাহাজের ছাদের উপরে নিয়ে গেলেন ; সেখানে লম্বা বেতের চৌকিটির উপর পা ছড়িয়ে বসে পুনর্বার এই মর্ত্য পৃথিবীর স্পর্শ এবং নবজীবনের আস্বাদ লাভ করা গেল।

জাহাজের যাত্রীদের বর্ণনা করতে চাই নে। অতিনিকট হতে কোনো মসীলিপ্ত লেখনীর সূচ্যগ্রভাগ যে তাদের প্রতি তীক্ষ্ণ লক্ষ স্থাপন করতে পারে এ-কথা তারা স্বপ্নেও না মনে করে বেশ বিশ্বস্তচিত্তে ডেকের উপর বিচরণ করছে, টুংটাং শব্দে পিয়ানো বাজাচ্ছে, বাজি রেখে হার-জিত খেলছে, ধূমপানশালায় বসে তাস পিটোচ্ছে ; তাদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তিন বাঙালি তিন লম্বা চৌকিতে জাহাজের একটি প্রান্ত সম্পূর্ণ অধিকার করে অবশিষ্ট জনসংখ্যার প্রতি অত্যন্ত ঔদাস্যদৃষ্টিপাত করে থাকি।

আমার সঙ্গী যুবকটির নিত্যকর্ম হচ্ছে তামাকের থলিটি বার বার হারানো, তার সন্ধান এবং উদ্ধারসাধন। আমি তাঁকে বারংবার সতর্ক করে দিয়েছি যে, যদি তাঁর মুক্তির কোনো ব্যাঘাত থাকে সে তাঁর চুরুট। মহর্ষি ভরত মৃত্যুকালেও হরিণ-শিশুর প্রতি চিত্তনিবেশ করেছিলেন বলে পরজন্মে হরিণশাবক হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। আমার সর্বদাই আশঙ্কা হয়, আমার বন্ধু জন্মান্তরে ব্রহ্মদেশীয় কোন্ এক কৃষকের কুটিরের সম্মুখে মস্ত একটা তামাকের খেত হয়ে উদ্ভূত হবেন। বিনা প্রমাণে তিনি শাস্ত্রের এ-সকল কথা বিশ্বাস করেন না, বরঞ্চ তর্ক করে আমারও সরল বিশ্বাস নষ্ট করতে চান এবং আমাকে পর্যন্ত চুরুট ধরাতে চেষ্টা করেন, কিন্তু এ-পর্যন্ত কৃতকার্য হতে পারেন নি।

২৭।২৮ আগস্ট। দেবাসুরগণ সমুদ্র মন্থন করে সমুদ্রের মধ্যে যা-কিছু ছিল সমস্ত বাহির করেছিলেন। সমুদ্র দেবেরও কিছু করতে পারলেন না, অসুরেরও কিছু করতে পারলেন না, হতভাগ্য দুর্বল মানুষের উপর তার প্রতিশোধ তুলছেন। মন্দরপর্বত কোথায় জানি নে এবং শেষ নাগ তদবধি পাতালে বিশ্রাম করছেন, কিন্তু সেই সনাতন মন্থনের ঘূর্ণিবেগ যে এখনো সমুদ্রের মধ্যে রয়ে গেছে তা নরজঠরধারী মাত্রেই অনুভব করেন। যাঁরা করেন না তাঁরা বোধ করি দেবতা অথবা অসুরবংশীয়। আমার বন্ধুটিও শেষোক্ত দলের, অর্থাৎ তিনিও করেন না।

রোগশয্যা ছেড়ে এখন 'ডেকে' উঠে বসেছি। সম্পূর্ণ বললাভ হয় নি। শরীরের এইরকম অবস্থার মধ্যে একটু মাধুর্য আছে। এই সময়ে পৃথিবীর আকাশ বাতাস সূর্যালোক সবসুদ্ধ সমস্ত বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে যেন একটি নূতন পরিচয় আরম্ভ হয়। তাদের সঙ্গে আমাদের প্রতিদিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কিছুকালের মতো বিচ্ছিন্ন হওয়াতে

আবার যেন নবপ্রেমিকের মতো উভয়ের মধ্যে মৃদু সলজ্জ মধুর ভাবে কথাবার্তা জানাশোনার অল্প অল্প সূত্রপাত হতে থাকে।

২৯ আগস্ট। আজ রাত্রে এডেনে পৌছব। সেখানে কাল প্রাতে জাহাজ বদল করতে হবে। সমুদ্রের মধ্যে দুটি-একটি করে পাহাড়-পর্বতের রেখা দেখা যাচ্ছে।

জ্যোৎস্না রাত্রি। এডেন বন্দরে এসে জাহাজ থামল। আহারের পর রহস্যালাপে প্রবৃত্ত হবার জন্যে আমরা দুই বন্ধু ছাদের এক প্রান্তে চৌকি দুটি সংলগ্ন করে আরামে বসে আছি। নিস্তরঙ্গ সমুদ্র এবং জ্যোৎস্নাবিমুগ্ধ পর্বতবেষ্টিত তটচিত্র আমাদের আলস্য-বিজড়িত অর্ধনিমীলিত নেত্রে স্বপ্ন-মরীচিকার মতো লাগছে।

এমন সময় শোনা গেল এখনই নূতন জাহাজে চড়তে হবে। সে জাহাজ আজ রাত্রেই ছাড়বে। ক্যাবিনের মধ্যে স্তূপাকার বিক্ষিপ্ত জিনিসপত্র যেমন-তেমন করে চর্মপেটকের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়ে দিয়ে তার উপরে তিন-চারজনে দাঁড়িয়ে নির্দয়ভাবে নৃত্য করে বহুকষ্টে চাবি বন্ধ করা গেল। ভৃত্যদের যথাযোগ্য পুরস্কার দিয়ে ছোটো বড়ো মাঝারি নানা আকারের বাক্স তোরঙ্গ বিছানাপত্র বহন করে নৌকারোহণপূর্বক নূতন জাহাজ "ম্যাসীলিয়া" অভিমুখে চললুম।

অনতিদূরে মাস্তুল-কণ্টকিত ম্যাসীলিয়া তার দীপালোকিত ক্যাবিনগুলির সুদীর্ঘ-শ্রেণীবদ্ধ বাতায়ন উদ্ঘাটিত করে দিয়ে পৃথিবীর আদিম কালের অতিকায় সহস্রচক্ষু জলজন্তুর মতো স্থির সমুদ্রে জ্যোৎস্নালোকে নিস্তব্ধভাবে ভাসছে। সহসা সেখান থেকে ব্যাণ্ড বেজে উঠল। সংগীতের ধ্বনিতে এবং নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নানিশীথে মনে হতে লাগল, অর্ধরাত্রে এই আরবের উপকূলে আরব্য উপন্যাসের মতো কী একটা মায়ার কাণ্ড ঘটবে।

ম্যাসীলিয়া অস্ট্রেলিয়া থেকে যাত্রী নিয়ে আসছে। কুতূহলী নরনারীগণ ডেকের বারান্দা ধরে সকৌতুকে নবযাত্রীসমাগম দেখছে। কিন্তু সে-রাত্রে নূতনত্ব সম্বন্ধে আমাদেরই তিনজনের সব-চেয়ে জিত। বহুকষ্টে জিনিসপত্র উদ্ধার করে ডেকের উপর যখন উঠলুম মুহূর্তের মধ্যে এক জাহাজ দৃষ্টি আমাদের উপর বর্ষিত হল। যদি তার কোনো চিহ্ন দেবার ক্ষমতা থাকত তাহলে আমাদের সর্বাঙ্গ কটা কালো ও নীল ছাপে ভরে যেত। জাহাজটি প্রকাণ্ড। তার সংগীতশালা এবং ভোজনগৃহের ভিত্তি শ্বেতপ্রস্তরে মণ্ডিত। বিদ্যুতের আলো এবং ব্যাণ্ডের বাদ্যে উৎসবময়।

অনেক রাত্রে জাহাজ ছেড়ে দিলে।

৩০ আগস্ট। আমাদের এ জাহাজে ডেকের উপরে আর-একটি দোতলা ডেকের মতো আছে। সেটি ছোটো এবং অপেক্ষাকৃত নির্জন। সেইখানেই আমরা আশ্রয় গ্রহণ করলুম।

আমার বন্ধুটি নীরব এবং অন্যমনস্ক। আমিও তদ্রূপ। দূর সমুদ্রতীরের পাহাড়গুলো রৌদ্রে ক্লান্ত এবং ঝাপসা দেখাচ্ছে। একটা মধ্যাহ্নতন্দ্রার ছায়া পড়ে যেন অস্পষ্ট হয়ে এসেছে।

খানিকটা ভাবছি, খানিকটা লিখছি, খানিকটা ছেলেদের খেলা দেখছি। এ-জাহাজে অনেকগুলি ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে আছে; আজকের দিনে যেটুকু চাঞ্চল্য সে কেবল তাদেরই মধ্যে। জুতোমোজা খুলে ফেলে তারা আমাদের ডেকের উপর কমলালেবু গড়িয়ে খেলা করছে—তাদের তিনটি দাসী বেঞ্চির উপরে বসে নতমুখে নিস্তব্ধভাবে সেলাই করে যাচ্ছে এবং মাঝে মাঝে কটাক্ষপাতে যাত্রীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছে।

বহুদূরে এক-আধটা জাহাজ দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে সমুদ্রে এক-একটা পাহাড় জেগে উঠেছে, অনুর্বর কঠিন কালো দগ্ধ তপ্ত জনশূন্য। অন্যমনস্ক প্রহরীর মতো সমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তারা উদাসীনভাবে তাকিয়ে আছে, সামনে দিয়ে কে আসছে কে যাচ্ছে তার প্রতি কিছুমাত্র খেয়াল নেই।

এইরকম করে ক্রমে সূর্যাস্তের সময় হল। "কাস্‌ল্‌ অফ ইণ্ডোলেন্স্‌" অর্থাৎ কুঁড়েমির কেল্লা যদি কাকেও বলা যায় সে হচ্ছে জাহাজ। বিশেষত গরম দিনে প্রশান্ত লোহিতসাগরের উপরে। যাত্রীরা সমস্ত বেলা ডেকের উপর আরামকেদারায় পড়ে ভ্রূর উপরে টুপি টেনে দিয়ে দিবাস্বপ্নে তলিয়ে রয়েছে। চলবার মধ্যে কেবল জাহাজ চলছে এবং তার দুই পাশের আহত নীল জল নাড়া পেয়ে অলস আপত্তির ক্ষীণ কলস্বরে পাশ কাটিয়ে কোনোমতে একটুখানিমাত্র সরে যাচ্ছে।

সূর্য অস্ত গেল। আকাশ এবং জলের উপর চমৎকার রং দেখা দিয়েছে। সমুদ্রের জলে একটি রেখামাত্র নেই। দিগন্তবিস্তৃত অটুট জলরাশি যৌবনপরিপূর্ণ পরিস্ফুট দেহের মতো একেবারে নিটোল এবং সুডোল। এই অপার অখণ্ড পরিপূর্ণতা আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত থম্‌থম্‌ করছে। বৃহৎ সমুদ্র হঠাৎ যেন একটা জায়গায় এসে থেমেছে যার ঊর্ধ্বে আর গতি নেই, পরিবর্তন নেই; যা অনন্তকাল অবিশ্রাম চাঞ্চল্যের পরম পরিণতি, চরম নির্বাণ। সূর্যাস্তের সময় চিল আকাশের নীলিমার যে একটি সর্বোচ্চ সীমার কাছে গিয়ে সমস্ত বৃহৎ পাখা সমতল-রেখায় বিস্তৃত করে দিয়ে হঠাৎ গতি বন্ধ করে দেয়, চিরচঞ্চল সমুদ্র ঠিক যেন সহসা সেইরকম একটা পরম প্রশান্তির শেষ সীমায় এসে ক্ষণেকের জন্যে পশ্চিম অস্তাচলের দিকে মুখ তুলে একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে আছে। জলের যে বর্ণবিকাশ হয়েছে সে আকাশের ছায়া কি সমুদ্রের আলো ঠিক বলা যায় না। যেন একটা মাহেন্দ্রক্ষণে

আকাশের নীরব নির্নিমেষ নীল নেত্রের দৃষ্টিপাতে হঠাৎ সমুদ্রের অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে থেকে একটা আকস্মিক প্রতিভার দীপ্তি স্ফূর্তি পেয়ে তাকে অপূর্ব মহিমান্বিত করে তুলেছে।

সন্ধ্যা হয়ে এল। ঢং ঢং ঢং ঢং ঘণ্টা বাজল। সকলে বেশভূষা পরিবর্তন করে সান্ধ্যভোজনের জন্যে সুসজ্জিত হতে গেল। আধঘণ্টা পরে আবার ঘণ্টা। নরনারীগণ দলে দলে ভোজনশালায় প্রবেশ করলে। আমরা তিন বাঙালি একটি স্বতন্ত্র ছোটো টেবিল অধিকার করে বসলুম। আমাদের সামনে আর-একটি টেবিলে দুটি মেয়ে একটি উপাসক-সম্প্রদায়ের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে খেতে বসেছেন।

চেয়ে দেখলুম তাঁদের মধ্যে একটি যুবতী আপনার যৌবনশ্রী বহুলপরিমাণে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়ে সহাস্যমুখে আহার এবং আলাপে নিযুক্ত। তাঁর শুভ্র সুগোল সুচিক্কণ গ্রীবাবক্ষবাহুর উপর সমস্ত বিদ্যুৎ-প্রদীপের অনিমেষ আলো এবং পুরুষ-মণ্ডলীর বিস্মিত সকৌতুক দৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছিল। একটা অনাবৃত আলোকশিখা দেখে দৃষ্টিগুলো যেন কালো কালো পতঙ্গের মতো চারিদিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে লম্ফ দিয়ে পড়ছে। এমন কি, অনেকে মুখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে তাকে নিরীক্ষণ করছে এবং তাই নিয়ে ঘরের সর্বত্র একটা চাপা হাসির চাঞ্চল্য উঠেছে। অনেকেই সেই যুবতীর পরিচ্ছদটিকে "ইণ্ডেকোরাস" বলে উল্লেখ করছে। কিন্তু আমাদের মতো বিদেশী লোকের পক্ষে তার বেআব্রু বেআদবিটা বোঝা একটু শক্ত। কারণ, নৃত্যশালায় এ-রকম কিংবা এর চেয়ে অনাবৃত বেশে গেলে কারো বিস্ময় উদ্রেক করে না।

কিন্তু বিদেশের সমাজনীতি সম্বন্ধে বেশি উৎসাহের সঙ্গে কিছু বলা ভালো নয়। আমাদের দেশে বাসরঘরে এবং কোনো কোনো বিশেষ উপলক্ষ্যে মেয়েরা যেমন অবাধে লজ্জাহীনতা প্রকাশ করে, অন্য কোনো সভায় তেমন করলে সাধারণের কাছে দূষ্য হত সন্দেহ নেই। সমাজে যেমন নিয়মের বাঁধাবাঁধি, তেমনি মাঝে মাঝে দুটো-একটা ছুটিও থাকে।

৩১ আগস্ট। আজ রবিবার। প্রাতঃকালে উঠে উপরের ডেকে চৌকিতে বসে সমুদ্রের বায়ু সেবন করছি, এমন সময় নীচের ডেকে খ্রীস্টানদের উপাসনা আরম্ভ হল। যদিও জানি এদের মধ্যে অনেকেই শুষ্কভাবে অভ্যস্ত মন্ত্র আউড়িয়ে কল্-টেপা আর্গিনের মতো গান গেয়ে যাচ্ছিল— কিন্তু তবু এই যে দৃশ্য, এই যে গুটিকতক চঞ্চল ছোটো ছোটো মনুষ্য অপার সমুদ্রের মাঝখানে স্থির বিনম্রভাবে দাঁড়িয়ে গম্ভীর সমবেত কণ্ঠে এক চির-অজ্ঞাত অনন্ত রহস্যের প্রতি ক্ষুদ্র মানবহৃদয়ের ভক্তি-উপহার প্রেরণ করছে, এ অতি আশ্চর্য।

কিন্তু এর মধ্যে হঠাৎ এক-একবার অট্টহাস্য শোনা গেল। গতরাত্রের সেই ডিনার-টেবিলের নায়িকাটি উপাসনায় যোগ না দিয়ে উপরের ডেকে বসে তাঁরই একটি উপাসক যুবকের সঙ্গে কৌতুকালাপে নিমগ্ন আছেন। মাঝে মাঝে উচ্চহাস্য করে উঠছেন, আবার মাঝে মাঝে গুন গুন স্বরে ধর্মসংগীতেও যোগ দিচ্ছেন।

আজ আহারের সময় একটি নূতন সংবাদের সৃষ্টি করা গেছে। ছোটো টেবিলটিতে আমরা তিন জনে ব্রেকফাস্ট খেতে বসেছি। একটা শক্ত গোলাকার রুটির উপরে ছুরি চালনা করতে গিয়ে ছুরিটা সবলে পিছলে আমার বাম হাতের দুই আঙুলের উপর এসে পড়ল। রক্ত চার দিকে ছিটকে পড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ আহারে ভঙ্গ দিয়ে ক্যাবিনে পলায়ন করলুম। ইতিহাসে অনেক রক্তপাত লিপিবদ্ধ হয়েছে— আমার ডায়ারিতে আমার এই রক্তপাত লিখে রাখলুম; ভাবী বঙ্গবীরদের কাছে গৌরবের প্রার্থী নই; বর্তমান বঙ্গাঙ্গনাদের মধ্যে কেউ যদি একবার 'আহা' বলেন।

১ সেপ্টেম্বর। সন্ধ্যার পর আহারান্তে উপরের ডেকে আমাদের যথাস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করা গেল। মৃদু শীতল বায়ুতে আমার বন্ধু ঘুমিয়ে পড়েছেন এবং দাদা অলস-ভাবে ধূমসেবন করছেন, এমন সময় নীচের ডেকে নাচের বাজনা বেজে উঠল। সকলে মিলে জুড়ি জুড়ি ঘূর্ণনৃত্য আরম্ভ হল।

তখন পূর্বদিকে নব কৃষ্ণপক্ষের পূর্ণপ্রায় চন্দ্র ধীরে ধীরে সমুদ্রশয়ন থেকে উঠে আসছে। এই তীররেখাশূন্য জলময় মহামরুর পূর্বসীমান্তে উদয়পথের ঠিক নীচে থেকে আমাদের জাহাজ পর্যন্ত অন্ধকার সমুদ্রের মধ্যে প্রশস্ত দীর্ঘ আলোকপথ ঝিক্‌মিক্ করছে। জ্যোৎস্নাময়ী সন্ধ্যা কোন এক অলৌকিক বৃন্তের উপরে অপূর্ব শুভ্র রজনীগন্ধার মতো আপন প্রশান্ত সৌন্দর্যে নিঃশব্দে চতুর্দিকে দলপ্রসারণ করল। আর মানুষগুলো পরস্পরকে জড়াজড়ি করে ধরে পাগলের মতো তীব্র আমোদে ঘুরপাক খাচ্ছে, হাঁপাচ্ছে, উত্তপ্ত হয়ে উঠছে।

৩ সেপ্টেম্বর। বেলা দশটার সময় সুয়েজখালের প্রবেশমুখে এসে জাহাজ থামল। চারিদিকে চমৎকার রঙের খেলা। পাহাড়ের উপর রৌদ্র, ছায়া এবং নীলিম বাষ্প। ঘননীল সমুদ্রের প্রান্তে বালুকাতীরের রৌদ্রদুঃসহ গাঢ় পীত রেখা।

খালের মধ্যে দিয়ে জাহাজ সমস্ত দিন অতি ধীর গতিতে চলছে। দু-ধারে তরুহীন বালুকা। কেবল মাঝে মাঝে এক-একটি ছোটো কোঠাঘর বহুযত্নবর্ধিত গুটিকতক গাছে-পালায় বেষ্টিত হয়ে আরামজনক দেখাচ্ছে।

অনেক রাতে আধখানা চাঁদ উঠল। ক্ষীণ চন্দ্রালোকে দুই তীর অস্পষ্ট ধূ ধূ করছে। — রাত দুটো-তিনটের সময় জাহাজ পোর্ট্‌সৈয়েদে নোঙর করলে।

৪ সেপ্টেম্বর। এখন আমরা ভূমধ্যসাগরে, য়ুরোপের অধিকারের মধ্যে। বাতাসও শীতল হয়ে এসেছে, সমুদ্রও গাঢ়তর নীল। আজ রাত্রে আর ডেকের উপর শোওয়া হল না।

৫ সেপ্টেম্বর। বিকালের দিকে ক্রীট দ্বীপের তটপর্বত দেখা দিয়েছিল। ডেকের উপর একটা স্টেজ বাঁধা হচ্ছে। জাহাজে একদল নাট্যব্যবসায়ী যাত্রী আছে, তারা অভিনয় করবে। অন্যদিনের চেয়ে সকাল সকাল ডিনার খেয়ে নিয়ে তামাশা আরম্ভ হল। প্রথমে যাত্রীদের মধ্যে যারা গানবাজনা কিঞ্চিৎ জানেন এবং জানেন না, তাঁদের কারো বা দুর্বল পিয়ানোর টিং টিং কারো বা মৃদু ক্ষীণকণ্ঠে গান হল। তার পরে যবনিকা উদ্ঘাটন করে নটনটি কর্তৃক 'ব্যালে' নাচ, সং, নিগ্রোর গান, যাদু, প্রহসন, অভিনয় প্রভৃতি বিবিধ কৌতুক হয়েছিল। মধ্যে নাবিকাশ্রমের জন্যে দর্শকদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ হল।

৬ সেপ্টেম্বর। খাবার ঘরে খোলা জানলার কাছে বসে বাড়িতে চিঠি লিখছি। একবার মুখ তুলে বামে চেয়ে দেখলুম 'আয়োনিয়ান' দ্বীপ দেখা দিয়েছে। পাহাড়ের কোলের মধ্যে সমুদ্রের ঠিক ধারেই মনুষ্যরচিত ঘনসন্নিবিষ্ট একটি শ্বেত মৌচাকের মতো দেখা যাচ্ছে। এইটি জান্তি শহর (Zanthe)। দূর থেকে মনে হচ্ছে যেন পর্বতটা তার প্রকাণ্ড করপুটে কতকগুলো শ্বেত পুষ্প নিয়ে সমুদ্রকে অঞ্জলি দেবার উপক্রম করছে।

ডেকের উপর উঠে দেখি আমরা দুই শৈলশ্রেণীর মাঝখান দিয়ে সংকীর্ণ সমুদ্রপথে চলেছি। আকাশে মেঘ করে এসেছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে— ঝড়ের সম্ভাবনা। আমাদের সর্বোচ্চ ডেকের চাঁদোয়া খুলে ফেলে দিলে। পর্বতের উপর অত্যন্ত নিবিড় মেঘ নেমে এসেছে; কেবল দূরে একটিমাত্র পাহাড়ের উপর মেঘছিদ্রমুক্ত সন্ধ্যালোকের একটি দীর্ঘ আরক্ত ইঙ্গিত এসে স্পর্শ করেছে, অন্য সবগুলো আসন্ন ঝটিকার ছায়ায় আচ্ছন্ন। কিন্তু ঝড় এল না। একটু প্রবল বাতাস এবং সবেগ বৃষ্টির উপর দিয়েই সমস্ত কেটে গেল। ভূমধ্যসাগরে আকাশের অবস্থা অত্যন্ত অনিশ্চিত। শুনলুম, আমরা যে পথ দিয়ে যাচ্ছি এখান দিয়ে জাহাজ সচরাচর যায় না। জায়গাটা নাকি ভারি ঝোড়ো।

রাত্রে ডিনারের পর যাত্রীরা কাপ্তেনের স্বাস্থ্যপান এবং গুণগান করলে। কাল ব্রিন্দিসি পৌঁছব। জিনিসপত্র বাঁধতে হবে।

৭ সেপ্টেম্বর। আজ সকালে ব্রিন্দিসি পৌঁছনো গেল। মেলগাড়ি প্রস্তুত ছিল, আমরা গাড়িতে উঠলুম।

গাড়ি যখন ছাড়ল তখন টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। আহার করে এসে একটি কোণে জানলার কাছে বসা গেল।

প্রথমে, দুই ধারে কেবল আঙুরের খেত। তার পরে জলপাইয়ের বাগান। জলপাইয়ের গাছগুলো নিতান্ত বাঁকাচোরা, গ্রন্থি ও ফাটল-বিশিষ্ট, বলি-অঙ্কিত, বেঁটেখাটো রকমের; পাতাগুলো উর্দ্ধমুখ; প্রকৃতির হাতের কাজে যেমন একটি সহজ অনায়াসের ভাব দেখা যায়, এই গাছগুলোয় তার বিপরীত। এরা নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়া, কায়ক্লেশে অষ্টাবক্র হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; এক-একটা এমন বেঁকে ঝুঁকে পড়েছে যে পাথর উঁচু করে তাদের ঠেকো দিয়ে রাখতে হয়েছে।

বামে চষা মাঠ; সাদা সাদা ভাঙা ভাঙা পাথরের টুকরো চষা মাটির মধ্যে মধ্যে উৎক্ষিপ্ত। দক্ষিণে সমুদ্র। সমুদ্রের একেবারে ধারেই এক-একটি ছোটো ছোটো শহর দেখা দিচ্ছে। চার্চ্‌চূড়া-মুকুটিত সাদা ধব্‌ধবে নগরীটি একটি পরিপাটি তন্বী নাগরীর মতো কোলের কাছে সমুদ্র-দর্পণ রেখে নিজের মুখ দেখে হাসছে। নগর পেরিয়ে আবার মাঠ। ভুট্টার খেত, আঙুরের খেত, ফলের খেত, জলপাইয়ের বন; খেতগুলি খণ্ড প্রস্তরের বেড়া দেওয়া। মাঝে মাঝে এক-একটি বাঁধা কূপ। দূরে দূরে দুটো-একটা সঙ্গিহীন ছোটো সাদা বাড়ি।

সূর্যাস্তের সময় হয়ে এল। আমি কোলের উপর এক থোলো আঙুর নিয়ে বসে বসে এক-আধটা করে মুখে দিচ্ছি। এমন মিষ্ট টস্‌টসে সুগন্ধ আঙুর ইতিপূর্বে কখনো খাই নি। মাথায় রঙিন রুমাল বাঁধা ওই ইতালীয়া যুবতীকে দেখে আমার মনে হচ্ছে ইতালীয়ানীরা এখানকার আঙুরের গুচ্ছের মতো, অমনি একটি বৃন্তভরা অজস্র সুডোল সৌন্দর্য, যৌবনরসে অমনি উৎপূর্ণ— এবং ওই আঙুরেরই মতো তাদের মুখের রং— অতি বেশি সাদা নয়।

এখন একটা উচ্চ সমুদ্রতটের উপর দিয়ে চলেছি। আমাদের ঠিক নীচেই ডান দিকে সমুদ্র। ভাঙাচোরা জমি ঢালু হয়ে জলের মধ্যে প্রবেশ করেছে। গোটা চার-পাঁচ পাল-মোড়া নৌকো ডাঙার উপর তোলা। নিচেকার পথ দিয়ে গাধার উপর চড়ে লোক চলেছে। সমুদ্রতীরে কতকগুলো গোরু চরছে— কী খাচ্ছে ওরাই জানে; মাঝে মাঝে কেবল কতকগুলো শুকনো খড়কের মতো আছে মাত্র।

রাত্রে আমরা গাড়ির ভোজনশালায় ডিনারে বসেছি, এমন সময়ে গাড়ি একটা স্টেশনে এসে দাঁড়াল। একদল নরনারী প্ল্যাটফর্মে ভিড় করে বিশেষ কৌতূহলের সঙ্গে আমাদের ভোজ দেখতে লাগল। তারই মধ্যে গ্যাসের আলোকে দুটি-একটি সুন্দর মেয়ের মুখ দেখা যাচ্ছিল, তাতে করে ভোজনপাত্র থেকে আমাদের চিত্তকে অনেকটা

পরিমাণে বিক্ষিপ্ত করছিল। ট্রেন ছাড়বার সময়ে আমাদের সহযাত্রিগণ তাদের প্রতি অনেক টুপি রুমাল আন্দোলন, অনেক চুম্বন-সংকেত-প্রেরণ, তারস্বরে অনেক উল্লাসধ্বনি প্রয়োগ করলে; তারাও গ্রীবা-আন্দোলনে আমাদের প্রত্যভিবাদন করতে লাগল।

৮ সেপ্টেম্বর। কাল আড্রিয়াটিকের সমতল শ্রীহীন তীরভূমি দিয়ে আসছিলুম, আজ শস্যশ্যামলা লম্বার্ডির মধ্যে দিয়ে গাড়ি চলছে। চারি দিকে আঙুর জলপাই ভুট্টা ও তুঁতের খেত। কাল যে আঙুরের লতা দেখা গিয়েছিল সেগুলো ছোটো ছোটো গুল্মের মতো। আজ দেখছি খেতময় লম্বা লম্বা কাঠি পোঁতা, তারই উপর ফলগুচ্ছপূর্ণ দ্রাক্ষালতা লতিয়ে উঠেছে।

ক্রমে পাহাড় দেখা দিচ্ছে। পাহাড়গুলি উপর থেকে নীচে পর্যন্ত দ্রাক্ষাদণ্ডে কণ্টকিত হয়ে উঠেছে, তারই মাঝখানে এক-একটি লোকালয়।

রেলের লাইনের ধারে দ্রাক্ষাক্ষেত্রের প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র কুটির; এক হাতে তারই একটি দুয়ার ধরে এক হাত কোমরে দিয়ে একটি ইতালিয়ান যুবতী সকৌতুক কৃষ্ণ-নেত্রে আমাদের গাড়ির গতি নিরীক্ষণ করছে। অনতিদূরে একটি বালিকা একটা প্রখরশৃঙ্গ প্রকাণ্ড গোরুর গলার দড়িটি ধরে নিশ্চিন্তমনে চরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তার থেকে আমাদের বাংলা দেশের নবদম্পতির চিত্র মনে পড়ল। মস্ত একটা চশমা-পরা গ্রাজুয়েট-পুংগব, এবং তারই দড়িটা ধরে ছোটো একটি চোদ্দ-পনেরো বৎসরের নোলক-পরা নববধূ; জন্তুটি দিব্যি পোষ মেনে চরে বেড়াচ্ছে, এবং মাঝে মাঝে বিস্ফারিতনয়নে কর্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করছে।

ট্যুরিন স্টেশনে আসা গেল। এ দেশের সামান্য পুলিসম্যানের সাজ দেখে অবাক হতে হয়। মস্ত চূড়াওয়ালা টুপি, বিস্তর জরিজড়াও, লম্বা তলোয়ার— সকল ক'টিকেই সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র বলে মনে হয়।

দক্ষিণে বামে তুষাররেখাঙ্কিত সুনীল পর্বতশ্রেণী। বামে ঘনচ্ছায়াস্নিগ্ধ অরণ্য। যেখানে অরণ্যের একটু বিচ্ছেদ পাওয়া যাচ্ছে সেইখানেই শস্যক্ষেত্র তরুশ্রেণী ও পর্বত -সমেত এক-একটা নব নব আশ্চর্য দৃশ্য খুলে যাচ্ছে। পর্বতশৃঙ্গের উপর পুরাতন দুর্গশিখর, তলদেশে এক-একটি ছোটো ছোটো গ্রাম। যত এগোচ্ছি অরণ্যপর্বত ক্রমশ ঘন হয়ে আসছে। মাঝে মাঝে যে গ্রামগুলি আসছে সেগুলি তেমন উদ্ধত শুভ্র নবীন পরিপাটি নয়; একটু যেন ম্লান দরিদ্র নিভৃত; একটি আধটি চার্চের চূড়া আছে মাত্র; কিন্তু কল-কারখানার ধূমোদ্গারী বৃংহিতধ্বনিত ঊর্ধ্বমুখ ইষ্টকশুণ্ড নেই।

ক্রমে অল্পে অল্পে পাহাড়ের উপর ওঠা যাচ্ছে। পার্বত্য পথ সাপের মতো এঁকে-

বেঁকে চলেছে; ঢালু পাহাড়ের উপর চষা খেত সোপানের মতো থাকে থাকে উঠেছে। একটি গিরিনদী স্বচ্ছ সফেন জলরাশি নিয়ে সংকীর্ণ উপলপথ দিয়ে ঝরে পড়ছে।

গাড়িতে আলো দিয়ে গেল। এখনই মন্ট্ সেনিসের বিখ্যাত দীর্ঘ রেলোয়ে-সুরঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। গহ্বরটি উত্তীর্ণ হতে প্রায় আধঘণ্টা লাগল।

এইবার ফ্রান্স। দক্ষিণে এক জলস্রোত ফেনিয়ে ফেনিয়ে চলেছে। ফরাসি জাতির মতো দ্রুত চঞ্চল উচ্ছ্বসিত হাস্যপ্রিয় কলভাষী।

ফ্রান্সের প্রবেশদ্বারে একবার একজন কর্মচারী গাড়িতে এসে জিজ্ঞাসা করে গেল আমাদের মাশুল দেবার যোগ্য জিনিস কিছু আছে কি না। আমরা বললুম, না। আমাদের একজন বৃদ্ধ সহযাত্রী ইংরেজ বললেন, I don't parlez-vous francaise.

সেই স্রোত এখনো আমাদের ডান দিক দিয়ে চলেছে। তার পূর্ব তীরে 'ফার্' অরণ্য নিয়ে পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। চঞ্চলা নির্ঝরিণী বেঁকেচুরে ফেনিয়ে ফুলে নেচে কলরব করে পাথরগুলোকে সর্বাঙ্গ দিয়ে ঠেলে রেলগাড়ির সঙ্গে সমান দৌড় দিয়েছে। মাঝে মাঝে এক-একটা লোহার সাঁকো মুষ্টি দিয়ে তার ক্ষীণ কটিদেশ পরিমাপ করবার চেষ্টা করছে। এক জায়গায় জলরাশি খুব সংকীর্ণ; দুই তীরের শ্রেণীবদ্ধ দীর্ঘ বৃক্ষগুলি শাখায় শাখায় বেষ্টন করে দুরন্ত স্রোতকে অন্তঃপুরে বন্দী করতে বৃথা চেষ্টা করছে। উপর থেকে ঝরনা এসে সেই প্রবাহের সঙ্গে মিশছে। বরাবর পূর্ব তীর দিয়ে একটি পার্বত্য পথ সমরেখায় স্রোতের সঙ্গে বেঁকে চলে গেছে। এক জায়গায় আমাদের সহচরীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হল। হঠাৎ সে দক্ষিণ থেকে বামে এসে এক অজ্ঞাত সংকীর্ণ শৈলপথে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

শ্যামল তৃণাচ্ছন্ন পর্বতশ্রেণীর মধ্যে এক-একটা পাহাড় তৃণহীন সহস্র-রেখাঙ্কিত পাষাণ-কঙ্কাল প্রকাশ করে নগ্নভাবে দাঁড়িয়ে আছে; কেবল তার মাঝে মাঝে এক-এক জায়গায় খানিকটা করে অরণ্যের খণ্ড আবরণ রয়েছে। প্রচণ্ড সংগ্রামে একটা দৈত্য সহস্র সহস্র হিংস্র নখের বিদারণরেখা রেখে যেন ওর শ্যামল ত্বক অনেকখানি করে আচড়ে ছিঁড়ে নিয়েছে।

আবার হঠাৎ ডান দিকে আমাদের সেই পূর্বসঙ্গিনী মুহূর্তের জন্যে দেখা দিয়ে বামে চলে গেল। একবার দক্ষিণে, একবার বামে, একবার অন্তরালে। আবার হয়তো যেতে যেতে কোনো এক পর্বতের আড়াল থেকে সহসা কলহাস্যে করতালি দিয়ে আচমকা দেখা দেবে।

সেই জলপাই এবং দ্রাক্ষাকুঞ্জ অনেক কমে গেছে। বিবিধ শস্যের ক্ষেত্র এবং দীর্ঘ সরল পপ্লার গাছের শ্রেণী। ভুট্টা, তামাক, নানাবিধ শাকসবজি। কেবলই যেন

বাগানের পর বাগান। এই কঠিন পর্বতের মধ্যে মানুষ বহুদিন থেকে বহুযত্নে প্রকৃতিকে বশ করে তার উচ্ছৃঙ্খলতা হরণ করেছে। প্রত্যেক ভূমিখণ্ডের উপর মানুষের কত প্রয়াস প্রকাশ পাচ্ছে। এ দেশের লোকেরা যে আপনার দেশকে ভালোবাসবে তাতে কিছু আশ্চর্য নেই। এরা আপনার দেশকে আপনার যত্নে আপনার করে নিয়েছে। এখানে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বহুকাল থেকে একটা বোঝাপড়া হয়ে আসছে, উভয়ের মধ্যে ক্রমিক আদানপ্রদান চলছে, তারা পরস্পর সুপরিচিত এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। এক দিকে প্রকাণ্ড প্রকৃতি উদাসীনভাবে দাঁড়িয়ে আর-একদিকে বৈরাগ্যবৃদ্ধ মানব উদাসীনভাবে শুয়ে— য়ুরোপের সে-ভাব নয়। এদের এই সুন্দরী ভূমি এদের একান্ত সাধনার ধন, একে এরা নিয়ত বহু আদর করে রেখেছে। এর জন্যে যদি প্রাণ না দেবে তো কিসের জন্যে দেবে! এই প্রেয়সীর প্রতি কেউ তিলমাত্র হস্তক্ষেপ করলে কি আর সহ্য হয়? আমরা তো জঙ্গলে থাকি; খালবিল বনবাদাড় ভাঙারাস্তা এবং পানাপুকুরের ধারে বাস করি। খেত থেকে দু'মুঠো ধান আনি, মেয়েরা আঁচল ভরে শাক তুলে নিয়ে আসে, ছেলেরা পাঁকের মধ্যে নেমে চিংড়িমাছ ধরে আনে, প্রাঙ্গণের গাছ থেকে গোটাকতক তেঁতুল পাড়ি, তার পরে শুকনো কাঠকুট সংগ্রহ করে এক-বেলা অথবা দু-বেলা কোনো রকম করে আহার চলে যায়; ম্যালেরিয়া এসে যখন জীর্ণ অস্থিকঙ্কাল কাঁপিয়ে তোলে তখন কাঁথা মুড়ি দিয়ে রৌদ্রে পড়ে থাকি, গ্রীষ্মকালে শুষ্কপ্রায় পঙ্ককুণ্ডের হরিদ্বর্ণ জলাবশেষ থেকে উঠে এসে ওলাউঠা যখন আমাদের গৃহ আক্রমণ করে তখন ওলাদেবীর পূজা দিই এবং অদৃষ্টের দিকে কোটরপ্রবিষ্ট হতাশ শূন্যদৃষ্টি বদ্ধ করে দল বেঁধে মরতে আরম্ভ করি। আমরা কি আমাদের দেশকে পেয়েছি না পেতে চেষ্টা করেছি? আমরা ইহলোকের প্রতি ঔদাস্য করে এখানে কেবল অনিচ্ছুক পথিকের মতো যেখানে-সেখানে পড়ে থাকি এবং যত শীঘ্র পারি দ্রুতবেগে বিশ-পঁচিশটা বৎসর ডিঙিয়ে একেবারে পরলোকে গিয়ে উপস্থিত হই।

কিন্তু এ কী চমৎকার চিত্র! পর্বতের কোলে, নদীর ধারে, হ্রদের তীরে পপ্‌লার-উইলো-বেষ্টিত কাননশ্রেণী। নিষ্কণ্টক নিরাপদ নিরাময় ফলশস্যপরিপূর্ণ প্রকৃতি প্রতিক্ষণে মানুষের ভালোবাসা পাচ্ছে এবং মানুষকে দ্বিগুণ ভালোবাসছে। মানুষের মতো জীবের এই তো যোগ্য আবাসস্থান। মানুষের প্রেম এবং মানুষের ক্ষমতা যদি আপনার চতুর্দিককে সংযত সুন্দর সমুজ্জ্বল করে না তুলতে পারে তবে তরুকোটর-গুহাগহ্বর-বনবাসী জন্তুর সঙ্গে মানুষের প্রভেদ কী?

৮ সেপ্টেম্বর। পথের মধ্যে আমাদের প্যারিসে নাববার প্রস্তাব হচ্ছে। কিন্তু

আমাদের এই ট্রেন প্যারিসে যায় না—একটু পাশ কাটিয়ে যায়। প্যারিসের একটি নিকটবর্তী স্টেশনে স্পেশাল ট্রেন প্রস্তুত রাখবার জন্যে টেলিগ্রাফ করা গেল।

রাত দুটোর সময় আমাদের জাগিয়ে দিলে। ট্রেন বদল করতে হবে। জিনিস-পত্র বেঁধে বেরিয়ে পড়লুম। বিষম ঠাণ্ডা। অনতিদূরে আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে। কেবলমাত্র একটি এঞ্জিন, একটি ফার্স্ট ক্লাস এবং একটি ব্রেকভ্যান। আরোহীর মধ্যে আমরা তিনটি ভারতবর্ষীয়। রাত তিনটের সময় প্যারিসের জনশূন্য বৃহৎ স্টেশনে পৌঁছনো গেল। সুপ্তোত্থিত দুই-একজন "মসিয়" আলো-হস্তে উপস্থিত। অনেক হাঙ্গাম করে নিদ্রিত কাস্টম-হাউসকে জাগিয়ে তার পরীক্ষা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে একটা গাড়ি ভাড়া করলুম। তখন প্যারিস তার সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করে শুব্ধ রাজপথে দীপশ্রেণী জ্বালিয়ে রেখে নিদ্রামগ্ন। আমরা হোটেল ট্যার্মিনুতে আমাদের শয়নকক্ষে প্রবেশ করলুম। পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন, বিদ্যুদুজ্জ্বল, স্ফটিকমণ্ডিত, কার্পেটাবৃত, চিত্রিত-ভিত্তি, নীলযবনিকাপ্রচ্ছন্ন শয়নশালা; বিহগপক্ষসুকোমল শুভ্র শয্যা।

বেশ বদল করে শয়নের উদ্যোগ করবার সময় দেখা গেল আমাদের জিনিসপত্রের মধ্যে আর-একজনের ওভারকোট গাত্রবস্ত্র। আমরা তিনজনেই পরস্পরের জিনিস চিনি নে; সুতরাং হাতের কাছে যে-কোনো অপরিচিত বস্ত্র পাওয়া যায় সেইটেই আমাদের কারো-না-কারো স্থির করে অসংশয়ে সংগ্রহ করে আনি। অবশেষে নিজের নিজের জিনিস পৃথক করে নেবার পর উদ্বৃত্ত সামগ্রী পাওয়া গেলে, তা আর পূর্বাধিকারীকে ফিরিয়ে দেবার কোনো সুযোগ থাকে না। ওভারকোটটি রেলগাড়ি থেকে আনা হয়েছে; যার কোট সে বেচারা বিশ্বস্তচিত্তে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। গাড়ি এতক্ষণে সমুদ্রতীরস্থ ক্যালে নগরীর নিকটবর্তী হয়েছে। লোকটি কে, এবং সমস্ত ব্রিটিশ রাজ্যের মধ্যে তার ঠিকানা কোথায়, আমরা কিছুই জানি নে। মাঝের থেকে তার লম্বা কুর্তি এবং আমাদের পাপের ভার স্কন্ধের উপর বহন করে বেড়াচ্ছি—প্রায়শ্চিত্তের পথ বন্ধ। মনে হচ্ছে একবার যে লোকটির কম্বল হরণ করেছিলুম এ-কুর্তিটিও তার। সে বেচারা বৃদ্ধ শীতপীড়িত, বাতে পঙ্গু, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পুলিস-অধ্যক্ষ। পুলিসের কাজ করে মানবচরিত্রের প্রতি সহজেই তার বিশ্বাস শিথিল হয়ে এসেছে, তার পরে যখন কাল প্রত্যুষে ব্রিটিশ চ্যানেল পার হবার সময় তীব্র শীতবায়ু তার হৃতকুর্তি জীর্ণ দেহকে কম্পান্বিত করে তুলবে তখন সেই সঙ্গে মনুষ্যজাতির সাধুতার প্রতিও তার বিশ্বাস কম্পিত হতে থাকবে।

৯ সেপ্টেম্বর। প্রাতঃকালে দ্বিতীয়বার বেশপরিবর্তন করবার সময় দেখা গেল আমার বন্ধুর একটি পোর্টম্যান্টো পাওয়া যাচ্ছে না।

পুলিসে সংবাদ দিয়ে প্রাতঃকালে তিনজনে প্যারিসের পথে পদব্রজে বেরিয়ে পড়লুম। প্রকাণ্ড রাজপথ দোকান বাগান প্রাসাদ প্রস্তরমূর্তি ফোয়ারা লোকজন গাড়িঘোড়ার মধ্যে অনেক ঘুরে ঘুরে এক ভোজন-গৃহের বিরাট স্ফটিকশালার প্রান্তটেবিলে বসে অল্প আহার করে এবং বিস্তর মূল্য দিয়ে ঈফেল স্তম্ভ দেখতে গেলেম। এই লৌহস্তম্ভ চারি পায়ের উপরে ভর দিয়ে এক বাগানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। কলের দোলায় চড়ে এই স্তম্ভের চতুর্থ তলায় উঠে নিয়ে সমস্ত প্যারিসটাকে খুব একটা বড়ো ম্যাপের মতো প্রসারিত দেখতে পেলুম।

বলা বাহুল্য, এমন করে একদিনে তাড়াতাড়ি চক্ষুদ্বারা বহির্ভাগ লেহন করে প্যারিসের রসাস্বাদন করা যায় না। এ যেন, ধনিগৃহের মেয়েদের মতো বদ্ধ পালকির মধ্যে থেকে গঙ্গাস্নান করার মতো— কেবল নিতান্ত তীরের কাছে একটা অংশে এক ডুবে যতখানি পাওয়া যায়। কেবল হাঁপানিই সার।

হোটেলে এসে দেখলুম পুলিসের সাহায্যে বন্ধুর পোর্টম্যাণ্টো ফিরে এসেছে, কিন্তু এখনো সেই পরের হৃত কোর্তা সম্বন্ধে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আছি।

১০ সেপ্টেম্বর। লণ্ডন অভিমুখে চললুম। সন্ধ্যার সময় লণ্ডনে পৌঁছে দুই-একটি হোটেল অন্বেষণ করে দেখা গেল স্থানাভাব। অবশেষে একটি ভদ্রপরিবারের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করা গেল।

১১ সেপ্টেম্বর। সকালবেলায় আমাদের পুরাতন বন্ধুদের সন্ধানে বাহির হওয়া গেল।

প্রথমে লণ্ডনের মধ্যে আমার সর্বাপেক্ষা পরিচিত বাড়ির দ্বারে গিয়ে আঘাত করা গেল। যে দাসী এসে দরজা খুলে দিলে তাকে চিনি নে। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম আমার বন্ধু বাড়িতে আছেন কি না। সে বললে তিনি এ-বাড়িতে থাকেন না। জিজ্ঞাসা করলুম, কোথায় থাকেন? সে বললে, আমি জানি নে, আপনারা ঘরে এসে বসুন, আমি জিজ্ঞাসা করে আসছি। পূর্বে যে-ঘরে আমরা আহার করতুম সেই ঘরে গিয়ে দেখলেম সমস্ত বদল হয়ে গেছে— সেখানে টেবিলের উপর খবরের কাগজ এবং বই— সে-ঘর এখন অতিথিদের প্রতীক্ষাশালা হয়েছে। খানিকক্ষণ বাদে দাসী একটি কার্ডে লেখা ঠিকানা এনে দিলে। আমার বন্ধু এখন লণ্ডনের বাইরে কোন্ এক অপরিচিত স্থানে থাকেন। নিরাশহৃদয়ে আমার সেই পরিচিত বাড়ি থেকে বেরোলুম।

আমাদের গাড়ি মিস্ শ—এর বাড়ির সম্মুখে এসে দাঁড়াল। গিয়ে দেখি তিনি নির্জন গৃহে বসে একটি পীড়িত কুক্কুরশাবকের সেবায় নিযুক্ত। জলবায়ু, পরস্পরের স্বাস্থ্য এবং কালের পরিবর্তন সম্বন্ধে কতকগুলি প্রচলিত শিষ্টালাপ করা গেল।

সেখান থেকে বেরিয়ে, লণ্ডনের সুরঙ্গপথে যে পাতাল-বাষ্পযান চলে, তাই অবলম্বন করে বাসায় ফেরবার চেষ্টা করা গেল। কিন্তু পরিণামে দেখতে পেলুম পৃথিবীতে সকল চেষ্টা সহজে সফল হয় না। আমরা দুই ভাই তো গাড়িতে চড়ে বেশ নিশ্চিন্ত বসে আছি; এমন সময় গাড়ি যখন হ্যামারস্মিথ নামক দূরবর্তী স্টেশনে গিয়ে থামল তখন আমাদের বিশ্বাসপরায়ণ চিত্তে ঈষৎ সংশয়ের সঞ্চার হল। একজনকে জিজ্ঞাসা করাতে সে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলে আমাদের গম্যস্থান যেদিকে এ-গাড়ির গম্যস্থান সেদিকে নয়। পুনর্বার তিন-চার স্টেশন ফিরে গিয়ে গাড়ি বদল করা আবশ্যক। তাই করা গেল। অবশেষে গম্য স্টেশনে নেমে রাস্তায় বেরিয়ে আমাদের বাসা খুঁজে পাই নে। বিস্তর গবেষণার পর বেলা সাড়ে তিনটের সময় বাড়ি ফিরে ঠাণ্ডা টিফিন খাওয়া গেল। এইটুকু আত্মজ্ঞান জন্মেছে যে, আমরা দুটি ভাই লিভিংস্টোন অথবা স্টান্‌লির মতো ভৌগোলিক আবিষ্কার-কার্যের যোগ্য নই; পৃথিবীতে যদি অক্ষয় খ্যাতি উপার্জন করতে চাই তো নিশ্চয় অন্য কোনো দিকে মনোনিবেশ করতে হবে।

১২ সেপ্টেম্বর। আমাদের বন্ধুর একটি গুণ আছে; তিনি যতই কল্পনার চর্চা করুন না কেন, কখনো পথ ভোলেন না। সুতরাং তাঁকেই আমাদের লণ্ডনের পাণ্ডাপদে বরণ করেছি। আমরা যেখানে যাই তাঁকে সঙ্গে টেনে নিয়ে যাই, এবং তিনি যেখানে যান আমরা কিছুতেই তাঁর সঙ্গ ছাড়ি নে। কিন্তু একটা আশঙ্কা আছে, এ-রকম অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব এ-পৃথিবীতে সকল সময় সমাদৃত হয় না। হায়! এ-সংসারে কুসুমে কণ্টক, কলানাথে কলঙ্ক এবং বন্ধুত্বে বিচ্ছেদ আছে— কিন্তু ভাগ্যিস আছে!

১৫ সেপ্টেম্বর। স্যাভয় থিয়েটারে "গণ্ডোলিয়র্স" নামক একটি গীতিনাট্য অভিনয় দেখতে গিয়েছিলুম। আলোকে সংগীতে সৌন্দর্যে বর্ণবিন্যাসে দৃশ্যে নৃত্যে হাস্যে কৌতুকে মনে হল একটা কোন্ কল্পনারাজ্যে আছি। মাঝে এক অংশে অনেকগুলি নর্তক-নর্তকীতে মিলে নৃত্য আছে; আমার মনে হল যেন হঠাৎ একসময়ে একটা উন্মাদকর যৌবনের বাতাসে পৃথিবী জুড়ে নরনারীর একটা উলটপালট ঢেউ উঠেছে— তাতে আলোক এবং বর্ণচ্ছটা, সংগীত এবং উৎফুল্ল নয়নের উজ্জ্বল হাসি সহস্র ভঙ্গীতে চারিদিকে ঠিকরে পড়ছে।

১৬ সেপ্টেম্বর। আজ আমাদের গৃহস্বামীর কুমারী কন্যা আমার কতকগুলি পুরাতন পূর্বশ্রুত সুর পিয়ানোয় বাজাচ্ছিলেন; তাই শুনে আমার গৃহ মনে পড়তে লাগল। সেই ভারতবর্ষে রৌদ্রালোকিত প্রাতঃকাল, মুক্ত বাতায়ন, অব্যাহত আকাশ এবং পিয়ানো যন্ত্রে এই স্বপ্নবহ পরিচিত সংগীতধ্বনি।

১৭ সেপ্টেম্বর। যে দুর্ভাগার শীতকোর্তা আমরা বহন করে বেড়াচ্ছি ইণ্ডিয়া আপিস যোগে সে আমাদের একটি পত্র লিখেছে— আমরাই যে তার গাত্রবস্ত্রটি সংগ্রহ করে এনেছি সে-বিষয়ে পত্রলেখক নিজের দৃঢ়বিশ্বাস প্রকাশ করেছে; তার সঙ্গে 'ভ্রমক্রমে' বলে একটা শব্দ যোগ করে দিয়েছিল। একটা সন্তোষের বিষয় এই, যার কম্বল নিয়েছিলুম এটা তার নয়। ভ্রমক্রমে দুবার একজনের গরম কাপড় নিলে ভ্রম সপ্রমাণ করা কিছু কঠিন হত।

১৯ সেপ্টেম্বর। এখানে রাস্তায় বেরিয়ে সুখ আছে। সুন্দর মুখ চোখে পড়বেই। শ্রীযুক্ত দেশানুরাগ যদি পারেন তো আমাকে ক্ষমা করবেন। নবনীর মতো সুকোমল শুভ্র রঙের উপরে একখানি পাতলা টুকটুকে ঠোঁট, সুগঠিত নাসিকা এবং দীর্ঘপল্লববিশিষ্ট নির্মল নীলনেত্র— দেখে প্রবাসদুঃখ দূর হয়ে যায়। শুভানুধ্যায়ীরা শঙ্কিত এবং চিন্তিত হবেন, প্রিয় বয়স্যেরা পরিহাস করবেন কিন্তু এ-কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে সুন্দর মুখ আমার সুন্দর লাগে। সুন্দর হওয়া এবং মিষ্ট করে হাসা মানুষের যেন একটি পরমাশ্চর্য ক্ষমতা। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার ভাগ্যক্রমে ওই হাসিটা এদেশে কিছু বাহুল্য পরিমাণে পেয়ে থাকি। অনেক সময়ে রাজপথে কোনো নীলনয়না পান্থরমণীর সম্মুখবর্তী হবামাত্র সে আমার মুখের দিকে চেয়ে আর হাসি সংবরণ করতে পারে না। তখন তাকে ডেকে বলে দিতে ইচ্ছা করে, "সুন্দরী, আমি হাসি ভালোবাসি বটে, কিন্তু এতটা নয়। তা ছাড়া বিম্বাধরসংলগ্ন হাসি যতই সুমিষ্ট হোক না কেন, তারো একটা যুক্তিসংগত কারণ থাকা চাই; কারণ, মানুষ কেবলমাত্র যে সুন্দর তা নয়, মানুষ বুদ্ধিমান জীব। হে নীলাঞ্জনয়নে, আমি তো ইংরেজের মতো অসভ্য খাটো কুর্তি এবং অসংগত লম্বা ধুচুনি টুপি পরি নে, তবে হাস কী দেখে? আমি সুশ্রী কি কুশ্রী সে-বিষয়ে কোনো প্রসঙ্গ উত্থাপন করা রুচিবিরুদ্ধ কিন্তু এটা আমি জোর করে বলতে পারি বিদ্রূপের তুলি দিয়ে বিধাতা-পুরুষ আমার মুখমণ্ডল অঙ্কিত করেন নি। তবে যদি রঙটা কালো এবং চুলগুলো কিছু লম্বা দেখে হাসি পায়, তা হলে এই পর্যন্ত বলতে পারি, প্রকৃতিভেদে হাস্যরস সম্বন্ধে অদ্ভুত রুচিভেদ লক্ষিত হয়। তোমরা যাকে 'হিউমার' বল, আমার মতে কালো রঙের সঙ্গে তার কোনো কার্যকারণ-সম্বন্ধ নেই। দেখছি বটে, তোমাদের দেশে মুখে কালি মেখে কাফ্রি সেজে নৃত্যগীত করা একটা কৌতুকের মধ্যে গণ্য হয়ে থাকে। কিন্তু, কনককেশিনি, সেটা আমার কাছে নিতান্ত হৃদয়হীন বর্বরতা বলে বোধ হয়।"

২২ সেপ্টেম্বর। আজ সন্ধ্যার সময় গোটাকতক বাংলা গান গাওয়া গেল। তার

মধ্যে গুটি দুই-তিন এখানকার শ্রোত্রীগণ বিশেষ পছন্দ করেছেন। আশা করি, সেটা কেবলমাত্র মৌখিক ভদ্রতা নয়। তবে চাণক্য বলেছেন— ইত্যাদি।

২৩ সেপ্টেম্বর। আজকাল সমস্ত দিনই প্রায় জিনিসপত্র কিনে দোকানে দোকানে ঘুরে কেটে যাচ্ছে। বাড়ি ফিরে এলেই আমার বন্ধু বলেন, এস বিশ্রাম করি গে। তার পরে খুব সমারোহে বিশ্রাম করতে যাই। শয়নগৃহে প্রবেশ করে বান্ধবটি অনতিবিলম্বে শয্যাতল আশ্রয় করেন, আমি পার্শ্ববর্তী একটি সুগভীর কেদারার মধ্যে নিমগ্ন হয়ে বসি। তার পরে, কোনো বিদেশী কাব্যগ্রন্থ পাঠ করি, না হয়, দু-জনে মিলে জগতের যত কিছু অতলস্পর্শ বিষয় আছে দেখতে দেখতে তার মধ্যে তলিয়ে অন্তর্ধান করি। আজকাল এইভাবে এতই অধিক বিশ্রাম করছি যে, কাজের অবকাশ তিলমাত্র থাকে না। ড্রয়িংরুমে ভদ্রলোকেরা গীতবাদ্য সদালাপ করেন, আমরা তার সময় পাই নে, আমরা বিশ্রামে নিযুক্ত। শরীররক্ষার জন্যে সকলে কিয়ৎকাল মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণাদি করে থাকেন, সে হতেও আমরা বঞ্চিত, আমরা এত অধিক বিশ্রাম করে থাকি। রাত দুটো বাজল, আলো নিবিয়ে দিয়ে সকলেই আরামে নিদ্রা দিচ্ছে, কেবল আমাদের দুই হতভাগ্যের ঘুমোবার অবসর নেই, আমরা তখনো অত্যন্ত দুরূহ বিশ্রামে ব্যস্ত।

২৫ সেপ্টেম্বর। আজ এখানকার একটি ছোটোখাটো এক্‌সিবিশন দেখতে গিয়েছিলুম। শুনলুম, এটা প্যারিস এক্‌সিবিশনের অত্যন্ত সুলভ এবং সংক্ষিপ্ত দ্বিতীয় সংস্করণ। সেখানে চিত্রশালায় প্রবেশ করে কারোলু ড্যুরাঁ-নামক একজন বিখ্যাত ফরাসী চিত্রকর-রচিত একটি বসনহীনা মানবীর ছবি দেখলুম। আমরা প্রকৃতির সকল শোভাই দেখি, কিন্তু মর্ত্যের এই চরম সৌন্দর্যের উপর, জীব-অভিব্যক্তির এই সর্বশেষ কীর্তিখানির উপর, মানুষ স্বহস্তে একটি চির-অন্তরাল টেনে রেখে দিয়েছে। এই দেহখানির স্নিগ্ধ শুভ্র কোমলতা এবং প্রত্যেক সুঠাম সুনিপুণ ভঙ্গিমার উপরে অসীম সুন্দরের সযত্ন অঙ্গুলির সদ্যস্পর্শ দেখা যায় যেন। এ কেবলমাত্র দেহের সৌন্দর্য নয়, যদিও দেহের সৌন্দর্য যে বড়ো সামান্য এবং সাধুজনের উপেক্ষণীয় তা বলতে পারি নে— কিন্তু এতে আরও অনেকখানি গভীরতা আছে। একটি প্রীতিরমণীয় সুকোমল নারী-প্রকৃতি, একটি অমরসুন্দর মানবাত্মা এর মধ্যে বাস করে, তারই দিব্য লাবণ্য এর সর্বত্র উদ্ভাসিত। দূর থেকে চকিতের মতো সেই অনির্বচনীয় চির-রহস্যকে দেহের স্ফটিক-বাতায়নে একটুখানি যেন দেখা গেল।

২৭ সেপ্টেম্বর। আজ লাইসীয়ম নাট্যশালায় গিয়েছিলুম। স্কট-রচিত "ব্রাইড অফ লামারমূর" উপন্যাস নাট্যাকারে অভিনীত হয়েছিল। বিখ্যাত অভিনেতা আর্ভিং

নায়ক সেজেছিলেন। তাঁর উচ্চারণ অস্পষ্ট এবং অঙ্গভঙ্গী অদ্ভুত। তৎসত্ত্বেও তিনি কী এক নাট্যকৌশলে ক্রমশ দর্শকদের হৃদয়ে সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করতে পারেন।

আমাদের সম্মুখবর্তী একটি বাক্সে দুটি মেয়ে বসে ছিল। তার মধ্যে একটি মেয়ের মুখ রঙ্গভূমির সমস্ত দর্শকের চিত্ত এবং দুরবিন আকৃষ্ট করেছিল। নিখুঁত সুন্দর ছোটো মুখখানি, অল্প বয়স, দীর্ঘ বেণী পিঠে ঝুলছে, বেশভূষার আড়ম্বর নেই। অভিনয়ের সময় যখন সমস্ত আলো নিবিয়ে দিয়ে কেবল স্টেজের আলো জ্বলছিল এবং সেই আলো স্টেজের অনতিদূরবর্তী তার আধখানি মুখের উপর এসে পড়েছিল —তখন তার আলোকিত সুকুমার মুখের রেখা এবং সুভঙ্গিম গ্রীবা অন্ধকারের উপর চমৎকার চিত্র রচনা করেছিল। হিতৈষীরা আমাকে পুনশ্চ মার্জনা করবেন— অভিনয়কালে সেদিকে আমার দৃষ্টি বদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু দুরবিন কষাটা আমার আসে না। নির্লজ্জ স্পর্ধার সহিত পরস্পরের প্রতি অসংকোচে দুরবিন প্রয়োগ করা নিতান্ত রূঢ় মনে হয়।

২ অক্টোবর। একটি গুজরাটির সঙ্গে দেখা হল। ইনি ভারতবর্ষ থেকে সমস্ত পথ জাহাজের ডেকে চড়ে এসেছেন। তখন শীতের সময়। মাছ-মাংস খান না। সঙ্গে চিঁড়ে শুষ্কফল প্রভৃতি কিছু ছিল এবং জাহাজ থেকে শাকসবজি কিছু সংগ্রহ করতেন। ইংরেজি অতি সামান্য জানেন। গায়ে শীতবস্ত্র অধিক নেই। লণ্ডনে স্থানে স্থানে উদ্ভিজ্জ ভোজনের ভোজনশালা আছে, সেখানে ছয় পেনিতে তাঁর আহার সমাধা হয়। যেখানে যা কিছু দ্রষ্টব্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে সমস্ত অনুসন্ধান করে বেড়ান। বড়ো বড়ো লোকের সঙ্গে অসংকোচে সাক্ষাৎ করেন। কী রকম করে কথাবার্তা চলে বলা শক্ত। মধ্যে মধ্যে কার্ডিনাল ম্যানিঙের সঙ্গে ধর্মালোচনা করে আসেন। ইতিমধ্যে এক্‌সিবিশনের সময় প্যারিসে দুই মাস যাপন করে এসেছেন এবং অবসর-মত আমেরিকায় যাবার সংকল্প করছেন। ভারতবর্ষে এঁকে আমি জানতুম। ইনি বাংলা শিক্ষা করে অনেক ভালো বাংলা বই গুজরাটিতে তরজমা করেছেন। এঁর স্ত্রীপুত্র পরিবার কিছুই নেই। ভ্রমণ করা, শিক্ষা করা, এবং স্বদেশীয় সাহিত্যের উন্নতি সাধন করা এঁর একমাত্র কাজ। লোকটি অতি নিরীহ শীর্ণ, খর্ব, পৃথিবীতে অতি অল্প পরিমাণ স্থান অধিকার করেন। এঁকে দেখে আমার আশ্চর্য বোধ হয়।

৬ অক্টোবর। এখনো আমাদের প্রবাসের সময় উত্তীর্ণ হয় নি, কিন্তু আমি আর এখানে পেরে উঠছি নে। বলতে লজ্জা বোধ হয়, আমার এখানে ভালো লাগছে না। সেটা গর্বের বিষয় নয়, লজ্জার বিষয়— সেটা আমার স্বভাবের ত্রুটি।

যখন কৈফিয়ত সন্ধান করি তখন মনে হয় যে, য়ুরোপের যে ভাবটা আমাদের

মনে জাজ্বল্যমান হয়ে উঠেছে, সেটা সেখানকার সাহিত্য ইতিহাস পড়ে। সেটা হচ্ছে আইডিয়াল য়ুরোপ। অন্তরের মধ্যে প্রবেশ না করলে সেটা প্রত্যক্ষ করবার জো নেই। তিন মাস, ছ-মাস কিংবা ছ-বৎসর এখানে থেকে আমরা য়ুরোপীয় সভ্যতার কেবল হাত-পা নাড়া দেখতে পাই মাত্র। বড়ো বড়ো বাড়ি, বড়ো বড়ো কারখানা, নানা আমোদের জায়গা; লোক চলছে ফিরছে, যাচ্ছে আসছে, খুব একটা সমারোহ। সে যতই বিচিত্র, যতই আশ্চর্য হ'ক না কেন, তাতে দর্শককে শ্রান্তি দেয়; কেবলমাত্র বিস্ময়ের উত্তেজনা চিত্তকে পরিপূর্ণ করতে পারে না বরং তাতে মনকে সর্বদা বিক্ষিপ্ত করতে থাকে।

অবশেষে এই কথা মনে আসে— আচ্ছা ভালো রে বাপু, আমি মেনে নিচ্ছি তুমি মস্ত শহর, মস্ত দেশ, তোমার ক্ষমতা এবং ঐশ্বর্যের সীমা নেই। অধিক প্রমাণের আবশ্যকতা নেই। এখন আমি বাড়ি যেতে পারলে বাঁচি। সেখানে আমি সকলকে চিনি, সকলকে বুঝি; সেখানে সমস্ত বাহ্যাবরণ ভেদ করে মনুষ্যত্বের আস্বাদ সহজে পাই। সহজে উপভোগ করতে পারি, সহজে চিন্তা করতে পারি, সহজে ভালোবাসতে পারি। যেখানে আসল মানুষটি আছে সেখানে যদি অবাধে যেতে পারতুম, তা হলে বিদেশেও আপনার স্বজাতীয়কে দেখে এ-স্থানকে আর প্রবাস বলে মনে হত না। কিন্তু এখানে এসে দেখি কেবল ইংরেজ, কেবল বিদেশী, তাদের চালচলন ধরণধারণ যা কিছু নূতন সেইটেই কেবল ক্রমিক চক্ষে পড়ে, যা চিরকেলে পুরাতন সেটা ঢাকা পড়ে থাকে; সেই জন্যে এদের সঙ্গে কেবল পরিচয় হতে থাকে কিন্তু প্রণয় হয় না।

এইখানে কথামালার একটা গল্প মনে পড়ছে।

একটা চতুর শৃগাল একদিন এক সুবিজ্ঞ বককে আহারে নিমন্ত্রণ করেছিল। বক সভায় গিয়ে দেখে বড়ো বড়ো থালা সুমিষ্ট লেহ্য পদার্থে পরিপূর্ণ। প্রথম শিষ্ট-সম্ভাষণের পর শৃগাল বললে, "ভাই, এস আরম্ভ করে দেওয়া যাক।" বলেই তৎক্ষণাৎ অবলীলাক্রমে লেহন করতে প্রবৃত্ত হল। বক তার দীর্ঘ চঞ্চু নিয়ে থালার মধ্যে যতই ঠোকর মারে মুখে কিছুই তুলতে পারে না। অবশেষে চেষ্টায় নিবৃত্ত হয়ে স্বাভাবিক অটল গাম্ভীর্যে সরোবরকূলের ধ্যানে নিমগ্ন হল। শৃগাল বোধ করি মাঝে মাঝে কটাক্ষপাত করে বলছিল, "ভাই, খাচ্ছ না যে। এ কেবল তোমাকে মিথ্যা কষ্ট দেওয়াই হল। তোমার যোগ্য আয়োজন হয় নি।" বক বোধ করি মাথা নেড়ে উত্তর দিয়েছিল, "আহা সে কী কথা। রন্ধন অতি পরিপাটি হয়েছে। কিন্তু শরীর-গতিকে আজ আমার ক্ষুধা বোধ হচ্ছে না।" পরদিন বকের নিমন্ত্রণে শৃগাল গিয়ে

দেখেন, লম্বা ভাঁড়ের মধ্যে বিবিধ উপাদেয় সামগ্রী সাজানো রয়েছে। দেখে লোভ হয় কিন্তু তার মধ্যে শৃগালের মুখ প্রবেশ করে না। বক অনতিবিলম্বে লম্বচঞ্চু চালনা করে ভোজনে প্রবৃত্ত হল। শৃগাল বাহিরের থেকে পাত্রলেহন এবং দুটো-একটা উৎক্ষিপ্ত খাদ্যখণ্ডের স্বাদগ্রহণ করে নিতান্ত ক্ষুধাতুরভাবে বাড়ি ফিরে গেল।

জাতীয় ভোজে বিদেশীর অবস্থা সেইরকম। খাদ্যটা উভয়ের পক্ষে সমান উপাদেয় কিন্তু পাত্রটা তফাৎ। ইংরেজ যদি শৃগাল হয় তবে তার সুবিস্তৃত শুভ্র রজতথালের উপর উদ্ঘাটিত পায়সান্ন কেবল চক্ষে দর্শন করেই আমাদের ক্ষুধিতভাবে চলে আসতে হয়, আর আমরা যদি তপস্বী বক হই, তবে আমাদের সুগভীর পাথরের পাত্রটার মধ্যে কী আছে শৃগাল তা ভালো করে চক্ষেও দেখতে পায় না— দূর থেকে ঈষৎ ঘ্রাণ নিয়েই তাকে ফিরতে হয়।

প্রত্যেক জাতির অতীত ইতিহাস এবং বাহ্যিক আচারব্যবহারে তার নিজের পক্ষে সুবিধা, কিন্তু অন্য জাতির পক্ষে বাধা। এই জন্য ইংরেজসমাজ যদিও বাহ্যত সাধারণসমক্ষে উদ্ঘাটিত কিন্তু আমরা চক্ষুর অগ্রভাগটুকুতে তার দুই-চার ফোঁটার স্বাদ পাই মাত্র, ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে পারি নে। সর্বজাতীয় ভোজ কেবল সাহিত্য-ক্ষেত্রেই সম্ভব। সেখানে যার লম্বা চঞ্চু সেও বঞ্চিত হয় না, যার লোলজিহ্বা সেও পরিতৃপ্ত হয়।

কারণটা সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হ'ক বা না হ'ক এখানকার লোকের সঙ্গে হৌ-ডু-য়ু-ডু ব'লে, হাঁ ক'রে রাস্তায় ঘাটে পর্যটন ক'রে, থিয়েটার দেখে, দোকান ঘুরে, কলকারখানার তথ্য নির্ণয় ক'রে— এমন কি, সুন্দর মুখ দেখে আমার শ্রান্তি বোধ হয়েছে।

অতএব স্থির করেছি এখন বাড়ি ফিরব।

৭ অক্টোবর। 'টেম্‌স্‌' জাহাজে একটা ক্যাবিন স্থির করে আসা গেল। পরশু জাহাজ ছাড়বে।

৯ অক্টোবর। জাহাজে ওঠা গেল। এবারে আমি একা। আমার সঙ্গীরা বিলেতে রয়ে গেলেন। আমার নির্দিষ্ট ক্যাবিনে গিয়ে দেখি সেখানে এক কক্ষে চারজনের থাকবার স্থান ; এবং আর-একজনের জিনিসপত্র একটি কোণে রাশীকৃত হয়ে আছে। বাক্স-তোরঙের উপর নামের সংলগ্নে লেখা আছে 'বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস।' বলা বাহুল্য, এই লিখন দেখে ভাবী সঙ্গসুখের কল্পনায় আমার মনে অপরিমেয় আনন্দের সঞ্চার হয় নি। ভাবলুম ভারতবর্ষের রোদে ঝলসা শুকনো খটখটে হাড়-পাকা অত্যন্ত ঝাঁজালো ঝুনো অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে আমাকে এক জাহাজে পুরেছে।

গালে হাত দিয়ে বসে ভাবছি এমন সময়ে একজন অল্পবয়স্ক সুশ্রী ইংরেজ যুবক ঘরের মধ্যে ঢুকে আমাকে সহাস্যমুখে শুভপ্রভাত অভিবাদন করলেন— মুহূর্তের মধ্যে আমার সমস্ত আশঙ্কা দূর হয়ে গেল। সবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইনি ভারতবর্ষে যাত্রা করছেন। এঁর শরীরে ইংলণ্ডবাসী ইংরেজের স্বাভাবিক সহৃদয় ভদ্রতার ভাব এখনো সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

১০ অক্টোবর। সুন্দর প্রাতঃকাল। সমুদ্র স্থির। আকাশ পরিষ্কার। সূর্য উঠেছে। ভোরের বেলা কুয়াশার মধ্যে দিয়ে আমাদের ডান দিক থেকে অল্প অল্প তীরের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। অল্পে অল্পে কুয়াশার যবনিকা উঠে গিয়ে ওয়াইট দ্বীপের পার্বত্য তীর এবং ভেন্ট্‌নর শহর ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হয়ে পড়ল।

এ জাহাজে বড়ো ভিড়। নিরিবিলি কোণে চৌকি টেনে যে একটু লিখব তার জো নেই, সুতরাং সম্মুখে যা কিছু চোখে পড়ে তাই চেয়ে চেয়ে দেখি।

ইংরেজ মেয়ের চোখ নিয়ে আমাদের দেশের লোক প্রায়ই ঠাট্টা করে, বিড়ালের চোখের সঙ্গে তার তুলনা করে থাকে। কিন্তু এমন সর্বদাই দেখা যায়, তারাই যখন আবার বিলেতে আসে তখন স্বদেশের হরিণনয়নের কথাটা আর বড়ো মনে করে না। যতক্ষণ দূরে আছি কোনো বালাই নেই, কিন্তু লক্ষপথে প্রবেশ করলেই ইংরেজ সুন্দরীর দৃষ্টি আমাদের অভ্যাসের আবরণ বিদ্ধ ক'রে অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে। ইংরেজ সুনয়নার চোখ মেঘমুক্ত নীলাকাশের মতো পরিষ্কার, হীরকের মতো উজ্জ্বল এবং ঘন পল্লবে আচ্ছন্ন, তাতে আবেশের ছায়া নেই। এমন ভারত-সন্তান আমার জানা আছে যে নীলনেত্রের কাছেও অভিভূত এবং হরিণনয়নকেও কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারে না। কৃষ্ণ কেশপাশও সে মূঢ়ের পক্ষে বন্ধন এবং কনককুন্তলও সামান্য দৃঢ় নয়।

সংগীত সম্বন্ধেও দেখা যায়, পূর্বে যে ইংরেজি সংগীতকে পরিহাস করে আনন্দলাভ করা গেছে, এখন তার প্রতি মনোযোগ করে ততোধিক বেশি আনন্দলাভ করা যায়। এখন অভ্যাসক্রমে য়ুরোপীয় সংগীতের এতটুকু আস্বাদ পাওয়া গেছে যার থেকে নিদেন এইটুকু বোঝা গেছে যে যদি চর্চা করা যায় তা হলে য়ুরোপীয় সংগীতের মধ্যে থেকে পরিপূর্ণ রস পাওয়া যেতে পারে। আমাদের দেশী সংগীত যে আমার ভালো লাগে সে-কথার বিশেষ উল্লেখ করা বাহুল্য। অথচ দুয়ের মধ্যে যে সম্পূর্ণ জাতিভেদ আছে তার আর সন্দেহ নেই।

১৩ অক্টোবর। একটি রমণী গল্প করছিলেন, তিনি পূর্বেকার কোন্ এক সমুদ্র-যাত্রায় কাপ্তেন অথবা কোনো কোনো পুরুষযাত্রীর প্রতি কঠিন পরিহাস ও উৎপীড়ন

করতেন— তার মধ্যে একটা হচ্ছে চৌকিতে পিন ফুটিয়ে রাখা। শুনে আমার তেমন মজাও মনে হল না এবং সেই সকল বিশেষ অনুগৃহীত পুরুষদের স্থলাভিষিক্ত হতেও একান্ত বাসনার উদ্রেক হল না। দেখা যাচ্ছে, এখানে পুরুষদের প্রতি মেয়েরা অনেকটা দূর পর্যন্ত রূঢ়াচরণ করতে পারেন। যেমন বালকের কাছ থেকে উপদ্রব অনেক সময় আমোদজনক লীলার মতো মনে হয় স্ত্রীলোকদের অত্যাচারের প্রতিও পুরুষেরা সেইরকম স্নেহময় উপেক্ষা প্রদর্শন করে এবং অনেক সময় সেটা ভালোবাসে। পুরুষদের মুখের উপরে রূঢ় সমালোচনা শুনিয়ে দেওয়া স্ত্রীলোকদের একটা অধিকারের মধ্যে। সেই লঘুগতি তীব্রতার দ্বারা তাঁরা পুরুষের শ্রেষ্ঠতাভিমান বিদ্ধ করে গৌরব অনুভব করেন। সামাজিক প্রথা এবং অনিবার্যকারণবশত নানা বিষয়ে তাঁরা পুরুষের অধীন বলেই লৌকিকতা এবং শিষ্টাচার সম্বন্ধে অনেক সময়ে তাঁরা পুরুষদের লঙ্ঘন করে আনন্দ পান। কার্যক্ষেত্রে যেখানে প্রতিযোগিতা নেই সেখানে দুর্বল কিঞ্চিৎ দুরন্ত এবং সবল সম্পূর্ণ সহিষ্ণু এটা দেখতে মন্দ হয় না। বলাভিমানী পুরুষের পক্ষে এ একটা শিক্ষা। অবলার দুর্বলতা পুরুষের ইচ্ছাতেই বল প্রাপ্ত হয়েছে, এই জন্য যে-পুরুষের পৌরুষ আছে স্ত্রীলোকের উপদ্রব সে বিনা বিদ্রোহে আনন্দের সহিত সহ্য করে, এবং সহিষ্ণুতায় তার পৌরুষেরই চর্চা হতে থাকে। যে দেশের পুরুষেরা কাপুরুষ তারাই নির্লজ্জভাবে পুরুষ-পূজাকে, পুরুষের প্রাণপণ সেবাকেই, স্ত্রীলোকের সর্বোচ্চ ধর্ম বলে প্রচার করে; সেই দেশেই দেখা যায় স্বামী রিক্তহস্তে আগে আগে যাচ্ছে আর স্ত্রী তার বোঝাটি বহন করে পিছনে চলেছে, স্বামীর দল ফার্স্টক্লাসে চড়ে যাত্রা করছে আর কতকগুলি জড়োসড়ো ঘোমটাচ্ছন্ন স্ত্রীগণকে নিম্নশ্রেণীতে পুরে দেওয়া হয়েছে, সেই দেশেই দেখা যায় আহারে বিহারে ব্যবহারে সকল বিষয়েই সুখ এবং আরাম কেবল পুরুষের, উচ্ছিষ্ট ও উদ্‌বৃত্ত কেবল স্ত্রীলোকের, তাই নিয়ে বেহায়া কাপুরুষেরা অসংকোচে গৌরব করে থাকে এবং তার তিলমাত্র ব্যত্যয় হলে সেটাকে তারা খুব একটা প্রহসনের বিষয় বলে জ্ঞান করে। স্বভাবদুর্বল সুকুমার স্ত্রীলোকদের সর্বপ্রকার আরামসাধন এবং কষ্টলাঘবের প্রতি সযত্ন মনোযোগ যে কঠিনকায় বলিষ্ঠ পুরুষদের একটি স্বভাবসিদ্ধ গুণ হওয়া উচিত এ তারা কল্পনা করতে পারে না— তারা কেবল এইটুকুমাত্র জানে শাসনভীতা স্নেহশালিনী রমণী তাদের চরণে তৈল লেপন করবে, তাদের বদনে অন্ন জুগিয়ে দেবে, তাদের তপ্ত কলেবরে পাখার ব্যজন করবে, তাদের আলস্যচর্চার আয়োজন করে দেবে, পঙ্কিল পথে পায়ে জুতো দেবে না, শীতের সময় গায়ে কাপড় দেবে না, রৌদ্রের সময় মাথায় ছাতা দেবে না, ক্ষুধার সময় কম করে খাবে, আমোদের সময় যবনিকার আড়ালে থাকবে এবং এই বৃহৎ মুক্ত প্রকৃতির

মধ্যে যে আলোক আনন্দ সৌন্দর্য স্বাস্থ্য আছে তার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকবে। স্বার্থপরতা পৃথিবীর সর্বত্রই আছে কিন্তু নির্লজ্জ নিঃসংকোচ স্বার্থপরতা কেবল সেই দেশেই আছে যে দেশে পুরুষেরা ষোলো আনা পুরুষ নয়।

মেয়েরা আপনার স্নেহপরায়ণ সহৃদয়তা থেকে পুরুষের সেবা করে থাকে এবং পুরুষেরা আপনার উদার দুর্বলবৎসলতা থেকে স্ত্রীলোকের সেবা করে থাকে ; যে দেশে স্ত্রীলোকেরা সেই সেবা পায় না, কেবল সেবা করে, সেদেশে তারা অপমানিত এবং সে দেশও লক্ষ্মীছাড়া।

কিন্তু কথাটা হচ্ছিল স্ত্রীলোকের দৌরাত্ম্য সম্বন্ধে। গোলাপের যে-কারণে কাঁটা থাকা আবশ্যক, যেখানে স্ত্রী পুরুষে বিচ্ছেদ নেই সেখানে স্ত্রীলোকেরও সেই কারণে প্রখরতা থাকা চাই, তীক্ষ্ণ কথায় মর্মচ্ছেদ করবার অভ্যাস অবলার পক্ষে অনেক সময়েই কাজে লাগে।

আমাদের গোলাপগুলিই কি একেবারে নিষ্কণ্টক? কিন্তু সে-বিষয়ে সমধিক সমালোচনা করতে বিরত থাকা গেল।

১৪ অক্টোবর। জিব্রাল্টার পৌঁছনো গেল। মুষলধারায় বৃষ্টি হচ্ছে।

আজ ডিনার-টেবিলে একটা মোটা আঙুল এবং ফুলো গোঁফ -ওআলা প্রকাণ্ড জোয়ান গোরা তার সুন্দরী পার্শ্ববর্তিনীর সঙ্গে ভারতবর্ষীয় পাখাওআলার গল্প করছিল। সুন্দরী কিঞ্চিৎ নালিশের নাকিস্বরে বললেন— পাখাওআলারা রাত্রে পাখা টানতে টানতে ঘুমোয়। জোয়ান লোকটা বললে, তার একমাত্র প্রতিবিধান লাথি কিংবা লাঠি। পাখা-আন্দোলন সম্বন্ধে এইভাবে আন্দোলন চলতে লাগল। আমার বুকে হঠাৎ যেন একটা তপ্ত শূল বিঁধল। এইভাবে যারা স্ত্রীপুরুষে কথোপকথন করে তারা যে অকাতরে একসময় একটা দিশি দুর্বল মানব-বিড়ম্বনাকে ভবপারে লাথিয়ে ফেলে দেবে তার আর বিচিত্র কী? আমিও তো সেই অপমানিত জাতের লোক, আমি কোন্ লজ্জায় কোন্ সুখে এদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খাই এবং একত্রে দন্তোন্মীলন করি। শরীরের সমস্ত রাগ কণ্ঠ পর্যন্ত এল কিন্তু একটা কথাও বহু চেষ্টাতে সে-জায়গায় এসে পৌঁছল না। বিশেষত ওদের ওই ইংরেজি ভাষাটা বড়োই বিজাতীয়— মনটা একটু বিচলিত হয়ে গেলেই ও-ভাষাটা মনের মতো কায়দা করে উঠতে পারি নে। তখন মাথার চতুর্দিক হতে রাজ্যের বাংলা কথা চাক-নাড়া মৌমাছির মতো মুখদ্বারে ভিড় করে ছুটে আসে। ভাবলুম এত উতলা হয়ে উঠলে চলবে না, একটু ঠাণ্ডা হয়ে দুটো-চারটে ব্যাকরণশুদ্ধ ইংরেজি কথা মাথার মধ্যে গুছিয়ে নিই। ঝগড়া করতে গেলে নিদেন ভাষাটা ভালো হওয়া চাই।

তখন মনে মনে নিম্নলিখিত মতো ভাবটা ইংরেজিতে রচনা করতে লাগলুম :

কথাটা ঠিক বটে মশায়, পাখাওআলা মাঝে মাঝে রাত্রে ঢুললে অত্যন্ত অসুবিধা হয়। দেহধারণ করলেই এমন কতকগুলো সহ্য করতে হয় এবং সেই জন্যই খ্রীস্টীয় সহিষ্ণুতার প্রয়োজন ঘটে। এবং এইরূপ সময়েই ভদ্রাভদ্রের পরিচয় পাওয়া যায়।

যে লোক তোমার আঘাতের প্রতিশোধ নিতে একেবারেই অক্ষম, থপ করে তার উপরে লাথি তোলা চূড়ান্ত কাপুরুষতা ; অভদ্রতার চেয়ে বেশি।

আমরা জাতটা যে তোমাদের চেয়ে দুর্বল সেটা একটা প্রাকৃতিক সত্য— সে আমাদের অস্বীকার করবার জো নেই। তোমাদের গায়ের জোর বড্ডো বেশি— তোমরা ভারি পালোয়ান।

কিন্তু সেইটেই কি এত গর্বের বিষয় যে, মনুষ্যত্বকে তার নীচে আসন দেওয়া হবে ?

তোমরা বলবে— কেন, আমাদের আর কি কোনো শ্রেষ্ঠতা নেই ?

থাকতেও পারে। তবে, যখন একজন অস্থিজর্জর অর্ধ-উপবাসী দরিদ্রের রিক্ত উদরের উপর লাথি বসিয়ে দাও এবং তৎসম্বন্ধে রমণীদের সঙ্গে কৌতুকালাপ কর এবং সুকুমারীগণও তাতে বিশেষ বেদনা অনুভব করেন না, তখন কিছুতেই তোমাদের শ্রেষ্ঠ বলে ঠাহর করা যায় না।

বেচারার অপরাধ কী দেখা যাক। ভোরের বেলা অর্ধাশনে বেরিয়েছে, সমস্ত দিন খেটেছে। হতভাগা আর দুটো পয়সা বেশি উপার্জন করবার আশায় রাত্রের বিশ্রামটা তোমাকে দু-চার আনায় বিক্রী করেছে। নিতান্ত গরিব বলেই তার এই ব্যবসায়, বড়োসাহেবকে ঠকাবার জন্যে সে ষড়যন্ত্র করে নি।

এই ব্যক্তি রাত্রে পাখা টানতে টানতে মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়ে— এ দোষটা তার আছে বলতেই হবে।

কিন্তু আমার বোধ হয় এটা মানবজাতির একটা আদিম পাপের ফল। যন্ত্রের মতো বসে বসে পাখা টানতে গেলেই আদমের সন্তানের চোখে ঘুম আসবেই। সাহেব নিজে একবার পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

এক ভৃত্যের দ্বারা কাজ না পেলে দ্বিতীয় ভৃত্য রাখা যেতে পারে, কিন্তু যে কাপুরুষ তাকে লাথি মারে সে নিজেকে অপমান করে, কারণ তখনই তার একটি প্রতিলাথি প্রাপ্য হয়— সেটা প্রয়োগ করবার লোক কেউ হাতের কাছে উপস্থিত নেই, এইটুকুমাত্র প্রভেদ।

তোমরা অবসর পেলেই আমাদের বলে থাক যে, তোমাদের মধ্যে যখন বাল্যবিবাহ

প্রভৃতি সামাজিক কুপ্রথা প্রচলিত তখন তোমরা রাজ্যতন্ত্রের মধ্যে কোনো স্বাধীন অধিকার প্রাপ্তির যোগ্য নও।

কিন্তু তার চেয়ে এ-কথা সত্য যে, যে-জাত নিরাপদ দেখে দুর্বলের কাছে 'তেরিয়া'— অর্থাৎ তোমরা যাকে বলো 'বুলি'— যার কোনো বাংলা প্রতিশব্দ নেই— অপ্রিয় অশিষ্ট ব্যবহার যাদের স্বভাবত আসে, কেবল স্বার্থের স্থলে যারা নম্রভাব ধারণ করে, তারা কোনো বিদেশী রাজ্যশাসনের যোগ্য নয়।

অবশ্য যোগ্যতা দু-রকমের আছে— ধর্মত এবং কার্যত। এমন কতকগুলি স্থল আছে যেখানে শুদ্ধমাত্র কৃতকারিতাই যোগ্যতার প্রমাণ নয়। গায়ের জোর থাকলে অনেক কাজই বলপূর্বক চালিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু বিশেষ বিশেষ কাজে বিশেষ বিশেষ উপযোগী নৈতিক গুণের দ্বারাই সে কার্যবহনের প্রকৃত অধিকার পাওয়া যায়।

কিন্তু ধর্মের শাসন সন্থ সন্থ দেখা যায় না বলে যে, ধর্মের রাজ্য অরাজক তা বলা যায় না। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিষ্ঠুরতা এবং প্রতিদিনের ঔদ্ধত্য প্রতিদিন সঞ্চিত হচ্ছে, এক সময় এরা তোমাদেরই মাথায় ভেঙে পড়বে।

যদি বা আমরা সকল অপমানই নীরবে অথবা কথঞ্চিৎ-কলরব-সহকারে সহ্য করে যাই, প্রতিকারের কোনো ক্ষমতাই যদি আমাদের না থাকে, তবু তোমাদের মঙ্গল হবে না।

কারণ, অপ্রতিহত ক্ষমতার দম্ভ জাতীয় চরিত্রের মূল আক্রমণ করে। যে স্বাধীনতাপ্রিয়তার ভিত্তির উপর তোমাদের জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠিত, তলে তলে সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তার বিশুদ্ধতা নষ্ট করে। সেই জন্য ইংলণ্ডবাসী ইংরেজের কাছে শোনা যায় ভারতবর্ষীয় ইংরেজ একটা জাতই স্বতন্ত্র। কেবলমাত্র বিকৃত যকৃৎই তার একমাত্র কারণ নয়, যকৃতের চেয়ে মানুষের আরো উচ্চতর অন্তরিন্দ্রিয় আছে, সেটাও নষ্ট হয়ে যায়।

কিন্তু আমার এই বিভীষিকায় কেউ ডরাবে না। যার দ্বারে অর্গল নেই সেই অগত্যা চোরকে সাধুভাবে ধর্মোপদেশ দিতে বসে; যেন চোরের পরকালের হিতের জন্যই তার রাত্রে ঘুম হয় না।

লাথির পরিবর্তে উপদেশ দেওয়া এবং ধর্মভয় দেখানো যদিচ দেখতে অতি মনোহর বটে কিন্তু লাথির পরিবর্তে লাথি দিলেই ফলটা অতি শীঘ্র পাওয়া যায়। এই পুরাতন সত্যটি আমাদের জানা আছে, কিন্তু বিধাতা আমাদের সমস্ত শরীরমনের মধ্যে কেবল রসনার অগ্রভাগটুকুতে বলসঞ্চার করেছেন। সুতরাং হে জোয়ান, কিঞ্চিৎ নীতিকথা শোনো।

শোনা যায় ভারতবর্ষীয়ের পিলে যন্ত্রটাই কিছু খারাপ হয়ে আছে, এই জন্য তারা পেটের উপরে ইংরেজ প্রভুর নিতান্ত 'পেটার্নাল ট্রিটমেণ্ট'-টুকুরও ভর সইতে পারে না। কিন্তু ইংরেজের পিলে কী রকম অবস্থায় আছে এ-পর্যন্ত কার্যত তার কোনো পরীক্ষাই হয় নি।

কিন্তু সে নিয়ে কথা হচ্ছে না; পিলে ফেটে যে আমাদের অপঘাতমৃত্যু হয় সেটা আমাদের ললাটের লিখন। কিন্তু তার পরেই সমস্ত ব্যাপারটা তোমরা যে-রকম তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিতে চাও, তাতেই আমাদের সমস্ত জাতিকে অপমান করা হয়। তাতেই এক রকম করে বলা হয় যে, আমাদের তোমরা মানুষ জ্ঞান কর না। আমাদের দুটো-চারটে মানুষ যে খামকা তোমাদের চরণতলে বিলুপ্ত হয়ে যায় সে আমাদের পিলের দোষ। 'পিলে যদি ঠিক থাকত তা হলে লাথিও খেতে, বেঁচেও থাকতে এবং পুনশ্চ দ্বিতীয়বার খাবার অবসর পেতে।'

যা হ'ক ভদ্রনাম ধারণ করে অসহায়কে অপমান করতে যার সংকোচ বোধ হয় না, তাকে এত কথা বলাই বাহুল্য; বিশেষত যে ব্যক্তি অপমান সহ্য করে দুর্বল হলেও তাকে যখন অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা না করে থাকা যায় না।

কিন্তু একটা কথা আমি ভালো বুঝতে পারি নে। ইংলণ্ডে তো তোমাদের এত বিশ্বহিতৈষিণী মেয়ে আছেন, তাঁরা সভাসমিতি করে নিতান্ত অসম্পর্কীয় কিংবা দূরসম্পর্কীয় মানবজাতির প্রতিও দূর থেকে দয়া প্রকাশ করেন। এই হতভাগ্য দেশে সেই ইংরেজের ঘর থেকে কি যথেষ্ট পরিমাণে মেয়ে আসেন না যাঁরা উক্ত বাহুল্য করুণ-রসের কিয়দংশ উপস্থিত ক্ষেত্রে ব্যয় করে মনোভার কিঞ্চিৎ লাঘব করে যেতে পারেন। বরঞ্চ পুরুষমানুষে দয়ার দৃষ্টান্ত দেখেছি। কিন্তু তোমাদের মেয়েরা এখানে কেবল নাচগান করেন, সুযোগমতে বিবাহ করেন এবং কথোপকথনকালে সুচারু নাসিকার সুকুমার অগ্রভাগটুকু কুঞ্চিত করে আমাদের স্বজাতীয়ের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন। জানি না, কী অভিপ্রায়ে বিধাতা আমাদের ভারতবাসীকে তোমাদের ললনাদের স্নায়ুতন্ত্রের ঠিক উপযোগী করে সৃজন করেন নি।

যাই হ'ক, স্বগত উক্তি যত ভালোই হ'ক স্টেজ ছাড়া আর কোথাও শ্রোতাদের কর্ণগোচর হয় না। তা ছাড়া যে কথাগুলো আক্ষেপবশত মনের মধ্যে উদয় হয়েছিল সেগুলো যে এই গোঁফওআলা পালোয়ানের বিশেষ কিছু হৃদয়ঙ্গম হত এমন আমার বোধ হয় না। এদিকে, বুদ্ধি যখন বেড়ে উঠল চোর তখন পালিয়েছে— তারা পূর্বপ্রসঙ্গ ছেড়ে অন্য কথায় গিয়ে পড়েছে। মনের খেদে কেবল নিজেকেই ধিক্কার দিতে লাগলুম।

১৫ অক্টোবর। জাহাজে আমার একটি ইংরেজ বন্ধু জুটেছে। লোকটাকে লাগছে ভালো। অল্প বয়স, মন খুলে কথা কয়, কারো সঙ্গে বড়ো মেশে না, আমার সঙ্গে খুব চট করে বনে গেছে। আমার বিবেচনায় শেষটাই সব-চেয়ে মহৎ গুণ।

এ জাহাজে তিনটি অস্ট্রেলিয়ান কুমারী আছেন— তাঁদের সঙ্গেও আমার আলাপ হয়েছে। বেশ সহজ সরল রকমের লোক, কোনোপ্রকার অতিরিক্ত ঝাঁজ নেই। আমার নববন্ধু এঁদের প্রশংসাস্বরূপে বলে, "They are not at all smart." বাস্তবিক, অনেক অল্পবয়সী ইংরেজ মেয়ে দেখা যায় তারা বড়োই smart— বড্ডো চোখমুখের খেলা, বড্ডো নাকে মুখে কথা, বড্ডো খরতর হাসি, বড্ডো চোখাচোখা জবাব— কারো কারো লাগে ভালো, কিন্তু শান্তিপ্রিয় সামান্য লোকের পক্ষে নিতান্ত শ্রান্তিজনক।

১৬ অক্টোবর। আজ জাহাজে দুটি ছোটো ছোটো নাট্যাভিনয় হয়ে গেল। দলের মধ্যে একটি অভিনেত্রীকে যেমন সুন্দর দেখতে তিনি তেমনি সুন্দর অভিনয় করেছিলেন।

আজ অনেক রাত্রে নিরালায় একলা দাঁড়িয়ে জাহাজের কাটরা ধরে সমুদ্রের দিকে চেয়ে অন্যমনস্কভাবে গুন্‌গুন্ করে একটা দিশি রাগিণী ধরেছিলুম। তখন দেখতে পেলুম অনেকদিন ইংরেজি গান গেয়ে গেয়ে মনের ভিতরটা যেন অতৃপ্ত হয়ে ছিল। হঠাৎ এই বাংলা সুরটা পিপাসার জলের মতো বোধ হল। আমি দেখলুম সেই সুরটি সমুদ্রের উপর অন্ধকারের মধ্যে যে রকম প্রসারিত হল, এমন আর কোনো সুর কোথাও পাওয়া যায় বলে আমার মনে হয় না। আমার কাছে ইংরেজি গানের সঙ্গে আমাদের গানের এই প্রধান প্রভেদ ঠেকে যে, ইংরেজি সংগীত মানবজগতের সংগীত, আর আমাদের সংগীত প্রকাণ্ড নির্জন প্রকৃতির অনির্দিষ্ট অনির্বচনীয় বিষাদ-গভীর সংগীত। কানাড়া টোড়ি প্রভৃতি বড়ো বড়ো রাগিণীর মধ্যে যে গাম্ভীর্য এবং কাতরতা আছে সে যেন কোনো ব্যক্তিবিশেষের নয়— সে যেন অকূল অসীমের প্রান্তবর্তী এই সঙ্গিহীন বিশ্বজগতের।

১৭ অক্টোবর। বিকালের দিকে জাহাজ মাল্টা দ্বীপে পৌঁছল। কঠিন দুর্গপ্রাকারে বেষ্টিত অট্টালিকাখচিত তরুগুল্মহীন শহর। এই শ্যামল পৃথিবীর একটা অংশ যেন ব্যাধি হয়ে কঠিন হয়ে গেছে। দূর থেকে দেখে নাবতে ইচ্ছে করে না। অবশেষে আমার নববন্ধুর অনুরোধে তাঁর সঙ্গে একত্রে নেবে পড়া গেল। সমুদ্রতীর থেকে সুরঙ্গপথের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ঘাটের মতো উঠেছে, তারই সোপান বেয়ে শহরের মধ্যে উঠলুম। অনেকগুলি গাইড পাণ্ডা আমাদের ছেঁকে ধরলে। আমার বন্ধু বহুকষ্টে

তাদের তাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু একজন কিছুতেই আমাদের সঙ্গ ছাড়লে না। বন্ধু তাকে বার বার ঝেঁকে ঝেঁকে বললেন, "চাই নে তোমাকে, একটি পয়সাও দেব না।" তবু সে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে লেগে ছিল। তার পরে যখন তাকে নিতান্তই তাড়িয়ে দিলে তখন সে ম্লানমুখে চলে গেল। আমার তাকে কিছু দেবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু সঙ্গে স্বর্ণমুদ্রা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বন্ধু বললেন, লোকটা গরিব সন্দেহ নেই কিন্তু কোনো ইংরেজ হলে এমন করত না। আসলে মানুষ পরিচিত দোষ গুরুতর হলেও মার্জনা করতে পারে কিন্তু সামান্য অপরিচিত দোষ সহ্য করতে পারে না।

মাল্টা শহরটা দেখে মনে হয় একটা অপরিণত বিকৃত য়ুরোপীয় শহর। পাথরে বাঁধানো সরু রাস্তা একবার উপরে উঠছে একবার নীচে নামছে। সমস্তই দুর্গন্ধ ঘেঁষাঘেঁষি অপরিষ্কার। রাত্রে হোটেলে গিয়ে খেলুম। অনেক দাম দেওয়া গেল, কিন্তু খাদ্যদ্রব্য কদর্য। আহারান্তে, শহরের মধ্যে একটি বাঁধানো চক আছে, সেইখানে ব্যাণ্ড বাদ্য শুনে রাত দশটার সময় জাহাজে ফিরে আসা গেল। ফেরবার সময় নৌকোওআলা আমাদের কাছ থেকে ন্যায্য ভাড়ার চেয়ে কিছু বেশি আদায়ের চেষ্টায় ছিল। আমার বন্ধু এদের অসৎ ব্যবহারে বিষম রাগান্বিত। তাতে আমার মনে পড়ল এবারে লণ্ডনে প্রথম যেদিন আমরা দুই ভাই গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলুম গাড়োয়ান পাঁচ শিলিং ভাড়ার জায়গায় আমাদের কাছে বারো শিলিং ঠকিয়ে নিয়েছিল। সে লোকটার তত দোষ ছিল না, দোষ আমাদেরই। আমাদের দুই ভাইয়ের মুখে বোধ করি এমন কিছু ছিল যা দেখলে সৎলোকেরও ঠকিয়ে নিতে হঠাৎ প্রলোভন হ'তে পারে। যা হ'ক মাল্টাবাসীর অসাধু স্বভাবের প্রতি আমার বন্ধুর অতিমাত্র ক্রোধ দেখে এ ঘটনাটা উল্লেখ করা আমার কর্তব্য মনে করলুম।

১৮ অক্টোবর। আজ ডিনার-টেবিলে 'স্মাগ্লিং' সম্বন্ধে কেউ কেউ নিজ নিজ কীর্তি রটনা করছিলেন। গবর্মেণ্টকে মাশুল ফাঁকি দেবার জন্যে মিথ্যা প্রতারণা করাকে এরা তেমন নিন্দা বা লজ্জার বিষয় মনে করে না। অথচ মিথ্যা এবং প্রতারণাকে যে এরা দূষণীয় জ্ঞান করে না সে-কথা বলাও অন্যায়। মানুষ এমনি জীব! একজন ব্যারিস্টার তার মক্কেলের কাছ থেকে পুরা ফি নিয়ে যদি কাজ না করে এবং সেজন্যে যদি সে হতভাগ্যের সর্বনাশ হয়ে যায় তা হলেও কিছু লজ্জা বোধ করে না, কিন্তু ওই মক্কেল যদি তার দেয় ফির দুটি পয়সা কম দেয় তা হলে কৌঁস্থলির মনে যে ঘৃণামিশ্রিত আক্রোশের উদয় হয় তাকে তাঁরা ইংরেজি করে বলেন 'রাইটিয়াস ইণ্ডিগ্নেশন'!

১৯ অক্টোবর। আজ সকালে জাহাজ যখন ব্রিন্দিসি পৌঁছল তখন ঘোর বৃষ্টি। এই

বৃষ্টিতে এক দল গাইয়ে বাজিয়ে হার্প্‌ বেয়ালা ম্যাণ্ডোলিন নিয়ে ছাতা মাথায় জাহাজের সম্মুখে বন্দরের পথে দাঁড়িয়ে গানবাজনা জুড়ে দিলে।

বৃষ্টি থেমে গেলে বন্ধুর সঙ্গে ব্রিন্দিসিতে বেরোনো গেল। শহর ছাড়িয়ে একটা খোলা জায়গায় গিয়ে পৌঁছলুম। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, পাহাড়ে রাস্তা শুকিয়ে গেছে, কেবল দুই ধারের নালার মাঝে মাঝে জল দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার ধারে গাছে চড়ে দুটো খালি-পা ইটালিয়ান ছোকরা ফিগ পেড়ে খাচ্ছিল; আমাদের ডেকে ইশারায় জিজ্ঞাসা করলে, তোমরা খাবে কি? আমরা বললুম, না। খানিক বাদে দেখি তারা ফলবিশিষ্ট একটা ছিন্ন অলিভ শাখা নিয়ে এসে উপস্থিত। জিজ্ঞাসা করলে, অলিভ খাবে? আমরা অসম্মত হলুম। তার পরে ইশারায় তামাক প্রার্থনা করে বন্ধুর কাছ থেকে কিঞ্চিৎ তামাক আদায় করলে। তামাক খেতে খেতে দু-জনে বরাবর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলল। আমরা পরস্পরের ভাষা জানি নে— আমাদের উভয় পক্ষে প্রবল অঙ্গভঙ্গীদ্বারা ভাবপ্রকাশ চলতে লাগল। জনশূন্য রাস্তা ক্রমশ উঁচু হয়ে শস্যক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে বরাবর চলে গিয়েছে। কেবল মাঝে মাঝে এক-একটা ছোটো বাড়ি, সেখানে জানলার কাছে ফিগ ফল শুকোতে দিয়েছে। এক-এক জায়গায় ছোটো ছোটো শাখাপথ বক্রধারায় এক পাশ দিয়ে নেমে নীচে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ফেরবার মুখে একটা গোরস্থানে ঢোকা গেল। এখানকার গোর নূতন রকমের। অধিকাংশ গোরের উপরে এক-একটি ছোটো ঘর গেঁথেছে। সেই ঘর পর্দা দিয়ে, ছবি দিয়ে, রঙিন জিনিস দিয়ে, নানা রকমে সাজানো, যেন মৃত্যুর একটা খেলাঘর— এর মধ্যে কেমন একটি ছেলেমানুষি আছে, মৃত্যুটাকে যেন যথেষ্ট খাতির করা হচ্ছে না।

গোরস্থানের এক জায়গায় সিঁড়ি দিয়ে একটা মাটির নিচেকার ঘরে নাবা গেল। সেখানে সহস্র সহস্র মড়ার মাথা অতি সুশৃঙ্খলভাবে স্তূপাকারে সাজানো। আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই নিশিদিন যে একটা কঙ্কাল চলে বেড়াচ্ছে ওই মুণ্ডগুলো দেখে তার আকৃতিটা মনে উদয় হল। জীবন এবং সৌন্দর্য এই অসীম জীবলোকের উপর একটা চিত্রিত পর্দা ফেলে রেখেছে— কোনো নিষ্ঠুর দেবতা যদি হঠাৎ একদিন সেই লাবণ্যময় চর্মযবনিকা সমস্ত নরসংসার থেকে উঠিয়ে ফেলে, তা হলে অকস্মাৎ দেখতে পাওয়া যায় আরক্ত অধরপল্লবের অন্তরালে গোপনে বসে বসে শুষ্ক শ্বেত দন্তপংক্তি সমস্ত পৃথিবী জুড়ে বিদ্রূপের হাসি হাসছে। পুরোনো বিষয়! পুরোনো কথা! ওই নরকপাল অবলম্বন করে নীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা অনেক বিভীষিকা প্রচার করেছেন, কিন্তু অনেকক্ষণ

চেয়ে চেয়ে দেখে আমার কিছুই ভয় হল না। শুধু এই মনে হল, সীতাকুণ্ডের বিদীর্ণ জলবিম্ব থেকে যেমন খানিকটা তপ্ত বাষ্প বেরিয়ে যায়, তেমনি পৃথিবীর কত যুগের কত দুশ্চিন্তা দুরাশা অনিদ্রা ও শিরঃপীড়া ওই মাথার খুলিগুলোর, ওই গোলাকার অস্থি-বুদ্‌বুদ্‌গুলোর মধ্যে থেকে অব্যাহতি পেয়েছে। এবং সেই সঙ্গে এও মনে হল, পৃথিবীতে অনেক ডাক্তার অনেক টাকের ওষুধ আবিষ্কার করে চীৎকার করে মরছে, কিন্তু ওই লক্ষ লক্ষ কেশহীন মস্তক তৎপ্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন, এবং দন্তমার্জনওআলারা যতই প্রচুর বিজ্ঞাপন প্রচার করছে এই অসংখ্য দন্তশ্রেণী তার কোনো খোঁজ নিচ্ছে না।

যাই হ'ক আপাতত আমার নিজের কপালফলকটার ভিতরে বাড়ির চিঠির প্রত্যাশা সঞ্চরণ করছে। যদি পাওয়া যায় তা হলে এই খুলিটার মধ্যে খানিকটা খুশির উদয় হবে, আর যদি না পাই তা হলে এই অস্থিকোটরের মধ্যে দুঃখ-নামক একটা ব্যাপারের উদ্ভব হবে, ঠিক মনে হবে আমি কষ্ট পাচ্ছি।

২৩ অক্টোবর। স্থয়েজ খালের মধ্যে দিয়ে চলেছি। জাহাজের গতি অতি মন্থর।

উজ্জ্বল উত্তপ্ত দিন। একরকম মধুর আলস্যে পূর্ণ আছি। য়ুরোপের ভাব সম্পূর্ণ কাটল। আমাদের সেই রৌদ্রতপ্ত শ্রান্ত দরিদ্র ভারতবর্ষ, আমাদের সেই ধরাপ্রান্তবর্তী পৃথিবীর অপরিচিত নিভৃত নদীকলধ্বনিত ছায়াসুপ্ত বাংলা দেশ, আমার সেই অকর্মণ্য গৃহপ্রিয় বাল্যকাল, কল্পনাবিষ্ট যৌবন, নিশ্চেষ্ট নিরুদ্যম চিন্তাপ্রিয় জীবনের স্মৃতি এই সূর্যকিরণে, এই তপ্ত বায়ুহিল্লোলে সুদূর মরীচিকার মতো আমার দৃষ্টির সম্মুখে জেগে উঠেছে।

ডেকের উপরে গল্পের বই পড়ছিলুম। মাঝে একবার উঠে দেখলুম দু-ধারে ধূসরবর্ণ বালুকাতীর— জলের ধারে ধারে একটু একটু বনঝাউ এবং অর্ধশুষ্ক তৃণ উঠেছে। আমাদের ডান দিকের বালুকারাশির মধ্যে দিয়ে একদল আরব শ্রেণীবদ্ধ উট বোঝাই করে নিয়ে চলেছে। প্রখর সূর্যালোক এবং ধূসর মরুভূমির মধ্যে তাদের নীল কাপড় এবং সাদা পাগড়ি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কেউ বা এক জায়গায় বালুকাগহ্বরের ছায়ায় পা ছড়িয়ে অলসভাবে শুয়ে আছে, কেউ বা নমাজ পড়ছে, কেউ বা নাসারজ্জু ধরে অনিচ্ছুক উটকে টানাটানি করছে। সমস্তটা মিলে খররৌদ্র আরব মরুভূমির এক খণ্ড ছবির মতো মনে হল।

২৪ অক্টোবর। আমাদের জাহাজের মিসেস —কে দেখে একটা নাট্যশালার ভগ্নাবশেষ বলে মনে হয়। সেখানে অভিনয়ও বন্ধ, বাসের পক্ষেও সুবিধা নয়। রমণীটি খুব তীক্ষ্ণধার— যৌবনকালে নিঃসন্দেহ সেই তীক্ষ্ণতা ছিল উজ্জ্বল। যদিও

এখনো এর নাকে মুখে কথা, এবং অচিরজাত বিড়ালশাবকের মতো ক্রীড়াচাতুর্য, তবু কোনো যুবক এর সঙ্গে দুটো কথা বলবার ছুতো অন্বেষণ করে না, নাচের সময় আহ্বান করে না, আহারের সময়ে সযত্নে পরিবেশন করে না। তার চঞ্চলতার মধ্যে শ্রী নেই, প্রৌঢ়তার সঙ্গে রমণীর মুখে যে একটি স্নেহময় সুপ্রসন্ন সুগম্ভীর মাতৃভাব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে তাও তার কিছুমাত্র দেখি নে।

২৫ অক্টোবর। আজ সকালবেলা স্নানের ঘর বন্ধ দেখে দরজার সামনে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছি। কিছুক্ষণ বাদে বিরলকেশ পৃথুকলেবর দ্বিতীয় ব্যক্তি তোয়ালে এবং স্পঞ্জ হস্তে উপস্থিত। ঘর খালাস হবামাত্র সেই জন-বুল অম্লানবদনে প্রথমাগত আমাকে অতিক্রম করে ঘরে প্রবেশ করলে। প্রথমেই মনে হল তাকে ঠেলে ঠুলে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ি, কিন্তু শারীরিক দ্বন্দ্বটা অত্যন্ত হীন এবং রূঢ় বলে মনে হয়, বেশ স্বাভাবিকরূপে আসে না। সুতরাং অধিকার ছেড়ে দিয়ে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলুম, নম্রতা গুণটা খুব ভালো হতে পারে কিন্তু খ্রীস্টজন্মের উনবিংশ শতাব্দী পরেও এই পৃথিবীর পক্ষে অনুপযোগী এবং দেখতে অনেকটা ভীরুতার মতো। এ-ক্ষেত্রে নাবার ঘরে প্রবেশ করতে যতটা জেদের ততটা সংগ্রামের দরকার ছিল না। কিন্তু প্রাতঃকালেই একটা মাংসবহুল কপিশবর্ণ পিঙ্গলচক্ষু রূঢ় ব্যক্তির সঙ্গে সংঘর্ষ-সম্ভাবনাটা কেমন সংকোচজনক মনে হল। স্বার্থোদ্যম জয়লাভ করে, বলিষ্ঠ বলে নয়, অতিমাংস-গ্রস্ত কুৎসিত বলে।

২৬ অক্টোবর। জাহাজের একটা দিন বর্ণনা করা যাক।

সকালে ডেক ধুয়ে গেছে, এখনো ভিজে রয়েছে। দুই ধারে ডেকচেয়ার বিশৃঙ্খল ভাবে পরস্পরের উপর রাশীকৃত। খালিপায়ে রাত-কাপড়-পরা পুরুষগণ কেউ বা বন্ধু-সঙ্গে কেউ বা একলা মধ্যপথ দিয়ে হুহু করে বেড়াচ্ছে। ক্রমে যখন আটটা বাজল এবং একটি-আধটি করে মেয়ে উপরে উঠতে লাগল তখন একে একে এই বিরলবেশ পুরুষদের অন্তর্ধান।

স্নানের ঘরের সম্মুখে বিষম ভিড়। তিনটি মাত্র স্নানাগার। আমরা অনেকগুলি দ্বারস্থ। তোয়ালে এবং স্পঞ্জ হাতে দ্বারমোচনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। দশ মিনিটের অধিক স্নানের ঘর অধিকার করবার নিয়ম নেই।

স্নান এবং বেশভূষা সমাপনের পর উপরে গিয়ে দেখা যায় ডেকের উপর পদচারণশীল প্রভাতবায়ুসেবী অনেকগুলি স্ত্রীপুরুষের সমাগম হয়েছে। ঘন ঘন টুপি উদ্ঘাটন করে মহিলাদের এবং শিরঃকম্পে পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে শুভপ্রভাত অভিবাদন করে গ্রীষ্মের তারতম্য সম্বন্ধে পরস্পরের মত ব্যক্ত করা গেল।

ন-টার ঘণ্টা বাজল। ব্রেক্‌ফাস্ট প্রস্তুত। বুভুক্ষু নরনারীগণ সোপান-পথ দিয়ে নিম্নকক্ষে ভোজনবিবরে প্রবেশ করলে। ডেকের উপরে আর জনপ্রাণী অবশিষ্ট নেই, কেবল সারি সারি শূন্য চৌকি ঊর্ধ্বমুখে প্রভুদের জন্য প্রতীক্ষমাণ।

ভোজনশালা প্রকাণ্ড ঘর। মাঝে দুই সার লম্বা টেবিল ; এবং তার দুই পার্শ্বে খণ্ড খণ্ড ছোটো ছোটো টেবিল। আমরা দক্ষিণ পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র টেবিল অধিকার করে সাতটি প্রাণী দিনের মধ্যে তিন বার ক্ষুধা নিবৃত্ত করে থাকি। মাংস রুটি ফলমূল মিষ্টান্ন মদিরায় এবং হাস্যকৌতুক গল্পগুজবে এই অনতি-উচ্চ সুপ্রশস্ত ঘর কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

আহারের পর উপরে গিয়ে যে যার নিজ নিজ চৌকি অন্বেষণ এবং সেটা যথাস্থানে স্থাপনে ব্যস্ত। চৌকি খুঁজে পাওয়া দায়। ডেক ধোবার সময় কার চৌকি কোথায় ফেলেছে তার ঠিক নেই।

তার পর যেখানে একটু কোণ, যেখানে একটু বাতাস, যেখানে একটু রোদের তেজ কম, যেখানে যার অভ্যাস, সেইখানে ঠেলেঠুলে টেনেটুনে পাশ কাটিয়ে পথ করে আপনার চৌকিটি রাখতে পারলে সমস্ত দিনের মতো নিশ্চিন্ত।

দেখা যায় কোনো চৌকিহারা ম্লানমুখী রমণী কাতরভাবে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করছে, কিংবা কোনো বিপদগ্রস্ত অবলা এই চৌকি-অরণ্যের মধ্যে থেকে নিজেরটি বিশ্লিষ্ট করে নিয়ে অভিপ্রেত স্থানে স্থাপন করতে পারছে না— তখন পুরুষগণ নারীসহায়ব্রতে চৌকি-উদ্ধারকার্যে নিযুক্ত হয়ে সুশিষ্ট ও সুমিষ্ট ধন্যবাদ অর্জন করে থাকে।

তার পর যে যার চৌকি অধিকার করে বসে যাওয়া যায়। ধূমসেবিগণ, হয় ধূম-সেবনকক্ষে নয় ডেকের পশ্চাদ্ভাগে সমবেত হয়ে পরিতৃপ্তমনে ধূমপান করছে। মেয়েরা অর্ধনিলীন অবস্থায় কেউ বা নভেল পড়ছে, কেউ বা সেলাই করছে, মাঝে মাঝে দুই-একজন যুবক ক্ষণেকের জন্যে পাশে বসে মধুকরের মতো কানের কাছে গুন্ গুন্ করে আবার চলে যাচ্ছে।

আহার কিঞ্চিৎ পরিপাক হবামাত্র এক দলের মধ্যে কয়েট্‌স্ খেলা আরম্ভ হল। দুই বালতি পরস্পর হতে হাত দশেক দূরে স্থাপিত হল। দুই জুড়ি স্ত্রীপুরুষ বিরোধী পক্ষ অবলম্বন করে পালাক্রমে স্ব স্ব স্থান থেকে কলসীর বিড়ের মতো কতকগুলো রজ্জুচক্র বিপরীত বালতির মধ্যে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল। যে পক্ষ সর্বাগ্রে একুশ করতে পারবে তারই জিত। মেয়ে-খেলোয়াড়েরা কখনো জয়োচ্ছ্বাসে কখনো নৈরাশ্যে ঊর্ধ্বকণ্ঠে চীৎকার করে উঠছে। কেউ বা দাঁড়িয়ে দেখছে, কেউ বা গণনা করছে, কেউ বা খেলায় যোগ দিচ্ছে, কেউ বা আপন আপন পড়ায় কিংবা গল্পে নিবিষ্ট।

একটার সময় আবার ঘণ্টা। আবার আহার। আহারান্তে উপরে ফিরে এসে দুই স্তর খাদ্যের ভারে এবং মধ্যাহ্নের উত্তাপে আলস্য অত্যন্ত ঘনীভূত হয়ে আসে। সমুদ্র প্রশান্ত, আকাশ সুনীল মেঘমুক্ত, অল্প অল্প বাতাস দিচ্ছে। কেদারায় হেলান দিয়ে নীরবে নভেল পড়তে পড়তে অধিকাংশ আনীল নয়ন নিদ্রাবিষ্ট। কেবল দুই-একজন দাবা, ব্যাক্‌গ্যামন কিংবা ড্রাফ্‌ট্‌ খেলছে এবং দুই-একজন অশ্রান্ত অধ্যবসায়ী যুবক সমস্ত দিনই কয়েট্‌স্‌ খেলায় নিযুক্ত। কোনো রমণী কোলের উপর কাগজ কলম নিয়ে একাগ্রমনে চিঠি লিখছে এবং কোনো শিল্পকুশলা কৌতুকপ্রিয়া যুবতী নিদ্রিত সহযাত্রীর ছবি আঁকতে চেষ্টা করছে।

ক্রমে রৌদ্রের প্রখরতা হ্রাস হয়ে এল। তাপক্লিষ্ট ক্লান্তকায়গণ নীচে নেমে গিয়ে রুটি মাখন মিষ্টান্ন -সহযোগে চা-রস পানে শরীরের জড়তা পরিহার করে পুনর্বার ডেকে উপস্থিত। পুনর্বার যুগলমূর্তির সোৎসাহ পদচারণা এবং মৃদুমন্দ হাস্যালাপ আরম্ভ হল। কেবল দু-চার জন পাঠিকা উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদ থেকে কিছুতেই আপনাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারছে না, দিবাবসানের ম্লান ক্ষীণালোকে একাগ্রনিবিষ্ট দৃষ্টিতে নায়ক-নায়িকার পরিণাম অনুসরণ করছে।

দক্ষিণ আকাশে তপ্ত স্বর্ণবর্ণের প্রলেপ, তরল অগ্নির মতো জলরাশির মধ্যে সূর্য অস্তমিত, এবং বামে সূর্যাস্তের কিছু পূর্ব হতেই চন্দ্রোদয়ের সূচনা। জাহাজ থেকে পূর্বদিগন্ত পর্যন্ত জ্যোৎস্নারেখা ঝিক্‌ঝিক্‌ করছে।

জাহাজের ডেকের উপরে এবং কক্ষে কক্ষে বিদ্যুদ্দীপ জ্বলে উঠল। ছটার সময় বাজল ডিনারের প্রথম ঘণ্টা। বেশপরিবর্তন উপলক্ষে সকলে স্ব স্ব কক্ষে প্রবেশ করলে। আধ ঘণ্টা পরে দ্বিতীয় ঘণ্টা। ভোজনগৃহে প্রবেশ করা গেল। সারি সারি নরনারী বসে গেছে। কারো বা কালো কাপড়, কারো রঙিন কাপড়, কারো বা শুভ্র বক্ষ অর্ধ-অনাবৃত। মাথার উপরে শ্রেণীবদ্ধ বিদ্যুৎ-আলোক। গুন্‌গুন্‌ আলাপের সঙ্গে কাঁটাচামচের টুংটাং ঠুংঠাং শব্দ মুখরিত, এবং বিচিত্র খাদ্যের পর্যায় পরিচারকদের হাতে হাতে নিঃশব্দ স্রোতের মতো যাতায়াত করছে।

আহারের পর ডেকে গিয়ে শীতল বায়ু-সেবন। কোথাও বা যুবকযুবতী অন্ধকার কোণের মধ্যে চৌকি টেনে নিয়ে গিয়ে গুন্‌গুন্‌ করছে, কোথাও বা দু-জনে জাহাজের বারান্দা ধরে ঝুঁকে পড়ে রহস্যালাপে নিমগ্ন, কোনো কোনো জুড়ি গল্প করতে করতে ডেকের আলোক ও অন্ধকারের মধ্য দিয়ে দ্রুতপদে একবার দেখা দিচ্ছে একবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, কোথাও বা পাঁচ-সাতজন স্ত্রীপুরুষ এবং জাহাজের কর্মচারী জটলা করে উচ্চহাস্যে প্রমোদকল্লোল উচ্ছ্বসিত করে তুলছে। অলস পুরুষেরা কেউ বা বসে

কেউ বা দাঁড়িয়ে কেউ বা অর্ধশয়ান অবস্থায় চুরট টানছে, কেউ বা স্মোকিং সেলুনে কেউ বা নীচে খাবার ঘরে হুইস্কি সোডা পাশে রেখে চারজনে দল বেঁধে বাজি রেখে তাস খেলছে। ও দিকে সংগীতশালায় সংগীতপ্রিয় দু-চারজনের সমাবেশে গানবাজনা এবং মাঝে মাঝে করতালি শোনা যাচ্ছে।

ক্রমে সাড়ে দশটা বাজে, মেয়েরা নেবে যায়, ডেকের উপরে আলো হঠাৎ যায় নিবে, ডেক নিঃশব্দ নির্জন অন্ধকার হয়ে আসে। চারি দিকে নিশীথের নিস্তব্ধতা, চন্দ্রালোক, এবং অনন্ত সমুদ্রের অশ্রান্ত কলধ্বনি।

২৭ অক্টোবর। লোহিত সমুদ্রের গরম ক্রমেই বেড়ে উঠছে। ডেকের উপর মেয়েরা সমস্ত দিন তৃষাতুরা হরিণীর মতো ক্লিষ্ট কাতর। তারা কেবল অতি ক্লান্তভাবে পাখা নাড়ছে, স্মেলিং সল্ট শুঁকছে, এবং সকরুণ যুবকেরা যখন পাশে এসে কুশল জিজ্ঞাসা করছে তখন নিমীলিতপ্রায় নেত্রপল্লব ঈষৎ উন্মীলন করে ম্লানহাস্যে কেবল গ্রীবাভঙ্গীদ্বারা আপন সুকুমার দেহলতার একান্ত অবসন্নতা ইঙ্গিতে জানাচ্ছে। যতই পরিপূর্ণ করে টিফিন এবং লেবুর শরবৎ খাচ্ছে, ততই জড়ত্ব এবং ক্লান্তি বাড়ছে, নেত্র নিদ্রানত ও সর্বশরীর শিথিল হয়ে আসছে।

২৮ অক্টোবর। আজ এডেনে পৌঁছোনো গেল।

২৯ অক্টোবর। আমাদের জাহাজে একটি পার্সি সহযাত্রী আছে। তার ছুঁচোলো ছাঁটা দাড়ি এবং বড়ো বড়ো চোখ সর্বপ্রথমেই চোখে পড়ে। অল্প বয়স। নয় মাস য়ুরোপে বেড়িয়ে বিলিতি পোশাক এবং চালচলন ধরেছে। বলে, ইণ্ডিয়া লাইক করে না। বলে, তার য়ুরোপীয় বন্ধুদের (অধিকাংশই স্ত্রীবন্ধু) কাছ থেকে তিন-শ চিঠি এসে তার কাছে জমেছে, তাই নিয়ে বেচারা মহা মুশকিলে পড়েছে, কখনই বা পড়বে কখনই বা জবাব দেবে। লোকটা আবার নিজে বন্ধুত্ব করতে বড়োই নারাজ, কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনায় বন্ধুত্ব তার মাথার উপরে অনাহূত অযাচিত বর্ষিত হতে থাকে। সে বলে, বন্ধুত্ব করে কোনো 'ফান্' নেই। উপরন্তু কেবল ল্যাঠা। এমন কি শত শত জর্মান ফরাসি ইটালিয়ান এবং ইংরেজ মেয়ের সঙ্গে সে 'ফ্লার্ট' করে এসেছে, কিন্তু তাতে কোনো মজা পায় নি।

২ নবেম্বর। ভারতবর্ষের কাছাকাছি আসা গেছে। কাল বোম্বাই পৌঁছবার কথা। আজ সুন্দর সকালবেলা। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, সমুদ্র সফেন তরঙ্গে নৃত্য করছে, উজ্জ্বল রৌদ্র উঠেছে; কেউ কয়েট্স্ খেলছে, কেউ নভেল পড়ছে, কেউ গল্প করছে; ম্যুজিক সেলুনে গান, স্মোকিং সেলুনে তাস, ডাইনিং সেলুনে খানার আয়োজন হচ্ছে এবং একটি সংকীর্ণ ক্যাবিনের মধ্যে আমাদের একটি বৃদ্ধ সহযাত্রী মরছে।

সন্ধ্যা আটটার সময় ডিলন সাহেবের মৃত্যু হল। আজ সন্ধ্যার সময় একটি নাটক অভিনয় হবার কথা ছিল।

৩ নবেম্বর। সকালে অন্ত্যেষ্টি-অনুষ্ঠানের পর ডিলনের মৃতদেহ সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হল। আজ আমাদের সমুদ্রযাত্রার শেষ দিন।

অনেক রাত্রে জাহাজ বোম্বাই বন্দরে পৌঁছল।

৪ নবেম্বর। জাহাজ ত্যাগ করে ভারতবর্ষে নেমে এখন আমার অদৃষ্টের সঙ্গে আর কোনো মনান্তর নেই। সংসারটা মোটের উপরে বেশ আনন্দের স্থান বোধ হচ্ছে। কেবল একটা গোল বেধেছিল— টাকাকড়ি-সমেত আমার ব্যাগটি জাহাজের ক্যাবিনে ফেলে এসেছিলুম, তাতে করে সংসারের আবহাওয়ার হঠাৎ অনেকটা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হোটেল থেকে অবিলম্বে জাহাজে ফিরে গিয়ে সেটি সংগ্রহ করে এনেছি। এই ব্যাগ ভুলে যাবার সম্ভাবনা কাল চকিতের মতো একবার মনে উদয় হয়েছিল। মনকে তখনই সাবধান করে দিলুম, ব্যাগটি যেন না ভোলা হয়। মন বললে, ক্ষেপেছ! আজ সকালে তাকে বৃথা ভর্ৎসনা করেছি। নষ্টোদ্ধার করে হোটেলে ফিরে এসে স্নানের পর আরাম বোধ হচ্ছে। এই ঘটনা নিয়ে আমার বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি কটাক্ষপাত করবেন সৌভাগ্যক্রমে এমন প্রিয়বন্ধু কেউ উপস্থিত নেই। সুতরাং রাত্রে যখন কলিকাতামুখী গাড়িতে চড়ে বসা গেল, তখন যদিও আমার বালিশটা ভ্রমক্রমে হোটেলে ফেলে এসেছিলুম তবু সুখনিদ্রার বিশেষ ব্যাঘাত হয় নি।

১৩০০

গ্রন্থপরিচয়

[রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম সংস্করণ, বর্তমানে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রচলিত সংস্করণ, রচনাবলী-সংস্করণ, এই তিনের পার্থক্য সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে নির্দেশ করা গেল। পূর্ণতর তথ্যসংগ্রহ সর্বশেষ খণ্ডে একটি পঞ্জীতে সংকলিত হইবে।]

সন্ধ্যাসংগীত

সন্ধ্যাসংগীত ১২৮৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণে গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপনে লিখিত আছে—

"আমার রচিত কবিতার মধ্যে যেগুলি সন্ধ্যাসংগীত নামে উক্ত হইতে পারে, সেইগুলিই এই পুস্তকে প্রকাশিত হইল। ইহার অধিকাংশ কবিতাই গত দুই বৎসরের মধ্যে রচিত হইয়াছে, কেবল 'বিষ ও সুধা' নামক দীর্ঘ কবিতাটি বাল্যকালের রচনা।'

'বিষ ও সুধা' কবিতাটি, এবং প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত 'কেন গান গাই' ও 'কেন গান শুনাই' কবিতা দুইটি পরবর্তী কালে বর্জিত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণের অন্য কবিতাগুলি, সন্ধ্যাসংগীতের বর্তমানে প্রচলিত স্বতন্ত্র সংস্করণে (বিশ্বভারতী পুনর্মুদ্রণ, ভাদ্র ১৩৩৪) অল্পবিস্তর খণ্ডিতভাবে মুদ্রিত আছে। এই শেষোক্ত সংস্করণ হইতে 'ব্যথা বড়ো বাজিয়াছে প্রাণে' ('সন্ধ্যা') কবিতাটি "পুনরাবৃত্তি" বলিয়া বর্তমান রচনাগুলিতে কবি বর্জন করিয়াছেন, অন্য অনেক কবিতারও কোনো কোনো অংশ বর্জিত হইয়াছে।

সন্ধ্যাসংগীতের প্রথম সংস্করণে মূলগ্রন্থের ভূমিকারূপে ও গ্রন্থ "সমাপ্ত" হইবার পর, 'উপহার'শীর্ষক দুইটি কবিতা মুদ্রিত আছে। প্রথম 'উপহার' কবিতাটি বর্তমান রচনাবলীতে 'সন্ধ্যা' নামে, এবং দ্বিতীয়টি 'উপহার' নামেই মুদ্রিত আছে। দ্বিতীয়টি-কেই এই গ্রন্থের উপহার বা উৎসর্গ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

১৯১৫ সালে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ সন্ধ্যাসংগীত সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

'সন্ধ্যাসংগীতের পূর্ববর্তী আমার সমস্ত কবিতা আমার কাব্যগ্রন্থাবলী হইতে বাদ দিয়াছি। যদি সুযোগ পাইতাম তবে সন্ধ্যাসংগীতকেও বাদ দিতাম। কিন্তু সকল জিনিসেরই একটা আরম্ভ তো আছেই। সে আরম্ভ কাঁচা এবং দুর্বল, কিন্তু সম্পূর্ণতার খাতিরে তাহাকেও স্থান দিতে হয়।

'সন্ধ্যাসংগীত হইতেই আমার কাব্যস্রোত ক্ষীণভাবে শুরু হইয়াছে। এইখান

হইতেই আমার লেখা নিজের পথ ধরিয়াছে। পথ যে তৈরি ছিল তাহা নহে— গতিবেগে আপনি পথ তৈরি হইয়া উঠিয়াছে। তখন শক্তি অল্প, বাধা বিস্তর, নিজের কাব্যরূপকে তখনো স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই নাই, ভালোমন্দ বিচার করিবার কোনো আদর্শ মনের মধ্যে ছিল না। তাহা ছাড়া, প্রথম রচনার সকলের চেয়ে মস্ত দোষ এই যে তাহার মধ্যে সত্যের অভাব থাকে। কেননা সত্যকে মানুষ ক্রমে ক্রমে পায়— অথচ সত্যকে পাইবার পূর্বেই তাহার কর্ম আরম্ভ হইয়া থাকে; সেই কর্মের মধ্যে আবর্জনার ভাগই বেশি থাকে।

'মানুষের জীবন তাহার প্রতিদিনের আবর্জনা প্রতিদিন মোচন করিয়া তাহা মার্জনা করিয়া চলে। যুবা আপনার শৈশবের হামাগুড়িকে জমাইয়া রাখে না। দুর্ভাগ্যক্রমে সাহিত্যভাণ্ডারে আবর্জনাগুলাকে একেবারে দূর করিয়া দেওয়া যায় না। যাহা একবার প্রকাশ হইয়াছে তাহাকে বিদায় করা কঠিন।

'অতএব সন্ধ্যাসংগীতকে দিয়া কাব্যগ্রন্থাবলী আরম্ভ করা গেল। ইহার কবিতাগুলির মধ্যে কবির লজ্জার কারণ যথেষ্ট আছে। কিন্তু যদি তাহার পরবর্তী রচনায় কোনো গৌরবের বিষয় থাকে তবে এই প্রথম প্রয়াসের নিকট সেজন্য ঋণ স্বীকার করিতেই হইবে।'

প্রভাতসংগীত

প্রভাতসংগীত ১২৯০ সালের বৈশাখে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণে গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপনে লিখিত আছে—

'প্রভাতসংগীত প্রকাশিত হইল। 'অভিমানিনী নির্ঝরিণী' -নামক কবিতাটি আমার লিখিত নহে। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' রচিত হইলে পর আমার কোনো শ্রদ্ধেয় বন্ধু তাহারই প্রসঙ্গক্রমে 'অভিমানিনী নির্ঝরিণী' রচনা করেন। উভয় কবিতাই ভারতীতে একত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। অতএব উভয়ের মধ্যে যে একটি আজন্ম-বন্ধন স্থাপিত হইয়াছে, তাহা বিচ্ছিন্ন না করিয়া দুটিকেই একত্রে রক্ষা করিলাম।

'শরতে প্রকৃতি, শীত, ও গুটিকতক অনুবাদ ব্যতীত প্রভাতসংগীতের আর সমুদয় কবিতাগুলিই সম্প্রতি লিখিত হইয়াছে।'

'অভিমানিনী নির্ঝরিণী' কবিতাটি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর রচনা। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "বাল্যকালে কাব্যালোচনার মস্ত একজন অনুকূল সুহৃদ" অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন।

'অভিমানিনী নির্ঝরিণী', শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীর উদ্দেশে লিখিত 'স্নেহ-উপহার',

'শরতে প্রকৃতি' ও 'শীত', প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত এই কয়টি কবিতা পরবর্তীকালে বর্জিত হইয়াছে ('শীত' কবিতাটি শিশুতে খণ্ডিত ভাবে সংকলিত হইয়াছে)। প্রথম সংস্করণের অন্য কবিতাগুলি প্রভাতসংগীতের বর্তমানে প্রচলিত স্বতন্ত্র সংস্করণে (অগ্রহায়ণ ১৩৪৫) মুদ্রিত আছে। এই শেষোক্ত সংস্করণ হইতে 'কবি', 'বিসর্জন', 'তারা ও আঁখি', 'সূর্য ও ফুল' (চারিটি কবিতাই ভিক্টর হুগোর অনুবাদ) ও 'সম্মিলন' (শেলির অনুবাদ) বর্তমান রচনাবলীতে বর্জিত হইয়াছে। অন্য কোনো কোনো কবিতারও অল্পবিস্তর পরিবর্তন কবি রচনাবলীতে করিয়াছেন।

ছবি ও গান

ছবি ও গান ১২৯০ সালের ফাল্গুনে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণে গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপনে লিখিত আছে—

'এই গ্রন্থে প্রকাশিত ছোটো ছোটো কবিতাগুলি গত বৎসরে লিখিত হয়—কেবল শেষ তিনটি কবিতা পূর্বেকার লেখা, এই নিমিত্ত তাহারা কিছু স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে।

'ছন্দের সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। এই পুস্তকের কোনো কোনো গানে ছন্দ নাই বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। যে-সকল পাঠকের কান আছে, তাঁহারা ছন্দ খুঁজিয়া লইবেন, দেখিতে পাইবেন বাঁধাবাঁধি ছন্দ অপেক্ষা তাহা শুনিতে মধুর ; হসন্ত বর্ণকে অকারান্ত করিয়া পড়িলে কোনো কোনো স্থলে ছন্দের ব্যাঘাত হইবে।'

প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত একটি পত্রে (১৮৯০) রবীন্দ্রনাথ ছবি ও গান সম্বন্ধে লিখিতেছেন—

'আমার ছবি ও গান আমি যে কী মাতাল হয়ে লিখেছিলুম··· আমি তখন দিনরাত পাগল হয়ে ছিলুম। আমার সমস্ত বাহ্যলক্ষণে এমন-সকল মনোবিকার প্রকাশ পেত যে, তখন যদি তোমরা আমাকে প্রথম দেখতে তো মনে করতে এ ব্যক্তি কবিত্বের খেপামি দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। আমার সমস্ত শরীরে মনে নবযৌবন যেন একেবারে হঠাৎ বন্যার মতো এসে পড়েছিল। আমি জানতুম না আমি কোথায় যাচ্ছি, আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। একটা বাতাসের হিল্লোলে একরাত্রির মধ্যে কতকগুলো ফুল মায়ামন্ত্রবলে ফুটে উঠেছিল, তার মধ্যে ফলের লক্ষণ কিছু ছিল না। কেবলই একটা সৌন্দর্যের পুলক, তার মধ্যে পরিণাম কিছুই ছিল না। তোমাদেরও বোধ হয় এরকম অবস্থা হয়—

উড়িতেছে কেশ, উড়িতেছে বেশ,
উদাস পরান কোথা নিরুদ্দেশ,
হাতে লয়ে বাঁশি মুখে লয়ে হাসি
ভ্রমিতেছি আনমনে।
চারি দিকে মোর বসন্ত হসিত,
যৌবনমুকুল প্রাণে বিকশিত,
সৌরভ তাহার বাহিরে আসিয়া
রটিতেছে বনে বনে।

'সত্যি কথা বলতে কি, সেই নবযৌবনের নেশা এখনো আমার হৃদয়ের মধ্যে লেগে রয়েছে। ছবি ও গান পড়তে পড়তে আমার মন যেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে, এমন আমার কোনো পুরোনো লেখায় হয় না।'

ছবি ও গানের প্রথম সংস্করণের প্রথম ও শেষ কবিতা দুইটি ('আজু সখি মুহু মুহু' ও 'মরণ রে তুঁহুঁ মম শ্যামসমান') পরে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর অন্তর্গত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণের অন্য কবিতাগুলি ছবি ও গানের বর্তমানে প্রচলিত স্বতন্ত্র সংস্করণে মুদ্রিত আছে। এই শেষোক্ত সংস্করণ হইতে 'ধীরে ধীরে প্রভাত হল' ("বিরহ") কবিতাটি বর্তমান রচনাবলীতে বর্জিত ও অন্যগুলি গৃহীত হইয়াছে।

ছবি ও গানের 'রাহুর প্রেম' কবিতাটি সঞ্চয়িতায় বহুলাংশে পরিবর্তিত হইয়াছে।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

প্রকৃতির প্রতিশোধ ১২৯১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

প্রকৃতির প্রতিশোধের বর্তমান স্বতন্ত্র সংস্করণে (ভাদ্র ১৩৩৫) প্রথম সংস্করণের চতুর্দশ দৃশ্যটি নাই। ইহা ছাড়াও অনেক অংশ পরিবর্জিত ও পরিমার্জিত হইয়াছে। রচনাবলীতে বর্তমান সংস্করণই অনুসৃত হইয়াছে। প্রকৃতির প্রতিশোধের সমসাময়িক 'আলোচনা' গ্রন্থে কবি প্রকৃতির প্রতিশোধের অন্তর্নিহিত ভাবটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আলোচনা গ্রন্থ এখন অপ্রচলিত। জীবনস্মৃতিতে এ-সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন—

'আলোচনা নাম দিয়া যে ছোটো ছোটো গদ্য প্রবন্ধ বাহির করিয়াছিলাম তাহার গোড়ার দিকেই প্রকৃতির প্রতিশোধের ভিতরকার ভাবটির একটি তত্ত্বব্যাখ্যা লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সীমা যে সীমাবদ্ধ নহে, তাহা যে অতলস্পর্শ গভীরতাকে এক

কণার মধ্যে সংহত করিয়া দেখাইতেছে, ইহা লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। তত্ত্বহিসাবে সে ব্যাখ্যার কোনো মূল্য আছে কি না এবং কাব্যহিসাবে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'এর স্থান কী তাহা জানি না, কিন্তু আজ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে এই একটিমাত্র আইডিয়া অলক্ষ্যভাবে নানা বেশে আজ পর্যন্ত আমার সমস্ত রচনাকে অধিকার করিয়া আসিয়াছে।'

'বঙ্গভাষার লেখক' (১৯১১) গ্রন্থে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

'আমি বালকবয়সে প্রকৃতির প্রতিশোধ লিখিয়াছিলাম…তাহাতে এই কথা ছিল যে, এই বিশ্বকে গ্রহণ করিয়া, এই সংসারকে বিশ্বাস করিয়া, এই প্রত্যক্ষকে শ্রদ্ধা করিয়া, আমরা যথার্থভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে পারি। যে জাহাজে অনন্তকোটি লোক যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছে তাহা হইতে লাফ দিয়া পড়িয়া সাঁতারের জোরে সমুদ্র পার হইবার চেষ্টা সফল হইবার নহে।'

বাল্মীকিপ্রতিভা

বাল্মীকিপ্রতিভা ১২৮৭ সালের ফাল্গুনে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। "দ্বিতীয় সংস্করণ" (১২৯২ ফাল্গুন) গ্রন্থের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পাদটীকায় লিখিত আছে—

'অনেকগুলি গান পরিবর্তিত আকারে অথবা বিশুদ্ধ আকারে কালমৃগয়া গীতিনাট্য হইতে গৃহীত।'

কালমৃগয়ার অনেকটা অংশ বাল্মীকিপ্রতিভায় গৃহীত হইয়াছে বলিয়া কালমৃগয়া পরে আর ছাপানো হয় নাই, এ কথা জীবনস্মৃতিতে উল্লিখিত আছে। কালমৃগয়া হইতে নিম্নোক্ত গানগুলি বাল্মীকিপ্রতিভার দ্বিতীয় সংস্করণে অংশতঃ পরিবর্তিত অথবা যথাযথ আকারে গৃহীত হয়—

আঃ, বেঁচেছি এখন
এনেছি মোরা, এনেছি মোরা
রিম ঝিম ঘন ঘন রে বরষে
এই বেলা সবে মিলে চল হো
গহনে গহনে যা রে তোরা
চল্ চল্ ভাই, ত্বরা করে মোরা আগে যাই

কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে
প্রাণ নিয়ে তো সটকেছি রে
সর্দার মশায়, দেরি না সয়
কাজ কী খেয়ে তোফা আছি

দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম সংস্করণের কোনো কোনো গান বর্জিত হয় ও নিম্নোক্ত গানগুলি নূতন সন্নিবিষ্ট হয়—

সহে না, সহে না, কাঁদে পরান
ঐ মেঘ করে গগনে
মরি, ও কাহার বাছা
ছাড়ব না ভাই, ছাড়ব না
এত রঙ্গ শিখেছ কোথায়
রাঙাপদপদ্মযুগে
কী দোষে বাঁধিলে আমায়
রাজা মহারাজা কে জানে
আছে তোমার বিদ্যেসাধ্যি জানা
আঃ, কাজ কী গোলমালে
অহো, আস্পর্ধা এ কী তোদের
আয় মা, আমার সাথে
কোথায় জুড়াতে আছে ঠাঁই
কেন রাজা, ডাকিস কেন
বলব কী আর বলব খুড়ো
রাখ্‌ রাখ্‌, ফেল্‌ ধনু
দেখ্‌ দেখ্‌ ছুটো পাখি
নমি নমি ভারতী
শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা
বাণী বীণাপাণি করুণাময়ী

বাল্মীকিপ্রতিভার প্রথম এবং দ্বিতীয় সংস্করণে, গ্রন্থশেষে সরস্বতীর আশিস্‌-বচনের পূর্বে বাল্মীকির একটি সরস্বতী-বন্দনা ছিল ('হৃদয়ে রাখ গো দেবি')। 'গান' গ্রন্থের প্রথম প্রকাশকালে (সেপ্টেম্বর ১৯০৮) উহা বাল্মীকিপ্রতিভা হইতে

বর্জিত হয়; বর্তমান গ্রন্থেও নাই। সামান্য আরও দু-একটি পরিবর্তন ব্যতীত, বর্তমান সংস্করণ দ্বিতীয় সংস্করণের অনুবৃত্তি বলা যাইতে পারে।

বাল্মীকিপ্রতিভার দ্বিতীয় (১২৯২) সংস্করণকে, প্রথমসংস্করণ বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়ার যোগে পুনর্লিখিত গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করা অসংগত নহে। এইজন্য বর্তমান রচনাবলীর গ্রন্থানুক্রমে ইহাকে প্রকৃতির প্রতিশোধের পরে বসানো হইয়াছে।

মায়ার খেলা

মায়ার খেলা ১২৯৫ সালের অগ্রহায়ণে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন ও তাহার সহিত মুদ্রিত নাট্যের সংক্ষিপ্ত আখ্যায়িকা, পাঠক-সাধারণের স্থবিধার জন্য বর্তমান রচনাবলীতে পুনর্মুদ্রিত হইল। এগুলি প্রচলিত সংস্করণে ছিল না।

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, 'আমার পূর্বরচিত একটি অকিঞ্চিৎকর গদ্য নাটিকার সহিত এই গ্রন্থের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে।'

এই গদ্য নাটিকা "নলিনী" (১২৯১)।

মায়ার খেলার প্রথম সংস্করণে ও বর্তমান সংস্করণে (গীতবিতান, প্রথম খণ্ড, আশ্বিন ১৩৩৮) প্রভেদ সামান্য। বর্তমান রচনাবলীতে 'মায়ার খেলা' গীতবিতান-অনুযায়ী মুদ্রিত হইয়াছে, দু-এক স্থানে পরিবর্তন আছে।

রাজা ও রানী

রাজা ও রানী ১২৯৬ সালের শ্রাবণে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণ ও অধুনাপ্রচলিত (বিশ্বভারতী পুনর্মুদ্রণ, ১৩৩৪) সংস্করণের মধ্যে কতকগুলি প্রভেদ সাধারণ ভাবে নির্দেশ করা গেল। স্থানে স্থানে সামান্য পরিবর্তন ব্যতীত, প্রচলিত সংস্করণই রচনাবলীতে অনুসৃত হইয়াছে।

প্রথম সংস্করণের প্রথম অঙ্কে পঞ্চম দৃশ্যে "নারায়ণী। মিছে না। ঢেঁকির স্বর্গেও সুখ নেই।" (রচনাবলী, পৃ ২৭৯)—এই ছত্রের পর অতিথির প্রবেশ ও অতিথি (রামচরণ), নারায়ণী ও দেবদত্তের কথোপকথন ছিল। ইহা বতমানে নাই।

বর্তমানে দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের শেষে যে ত্রিবেদীর প্রবেশ ও উক্তি আছে, (রচনাবলী, পৃ ২৯৮) প্রথম সংস্করণে তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দৃশ্য (দ্বিতীয় অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য) ছিল।

প্রথম সংস্করণের চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য ছিল, জালন্ধর রণক্ষেত্রে বিক্রমদেবের

শিবিরদ্বারে সুমিত্রা ও সেনাপতির কথোপকথন। শিবিরপ্রবেশার্থিনী সুমিত্রাকে সেনাপতি বাধা দিতেছেন, ইহাই এই দৃশ্যে বর্ণিত ছিল। এই দৃশ্য বর্তমান সংস্করণে নাই।

প্রথম সংস্করণের পঞ্চম অঙ্কের সপ্তম দৃশ্য ছিল কাশ্মীর প্রাসাদে রেবতী, যুধাজিৎ, প্রহরী ও চন্দ্রসেনের কথোপকথন। কুমারকে বন্দী করিবার উদ্যমে রেবতী যুধাজিৎকে উত্তেজিত করিতেছেন, ইহাই এই দৃশ্যের প্রধান বিষয় ছিল। এই দৃশ্য বর্তমান সংস্করণে নাই।

প্রথম সংস্করণের পঞ্চম অঙ্কের দশম দৃশ্য ছিল, কাশ্মীরে বৃদ্ধ, করমচাঁদ, হনুমন্ত ও অন্যান্যের কথোপকথন। কুমার কাশ্মীরে ফিরিয়া আসিবেন, বিক্রমজিৎ স্বয়ং তাঁহাকে রাজটিকা পরাইবেন, এইরূপ সংবাদ শুনিয়া স্ত্রীপুরুষ-সাধারণের আনন্দপ্রকাশ ও উৎসবের আয়োজন এই দৃশ্যে বর্ণিত আছে। এই দৃশ্য বর্তমান সংস্করণে নাই।

ইহা ছাড়া অন্যান্য দৃশ্যেও মাঝে মাঝে অংশবিশেষ পরিবর্জিত ও পরিবর্তিত হইয়াছে।

রাজা ও রানীর কাহিনী লইয়া কবি পরবর্তীকালে গদ্যনাট্য "তপতী" (১৩৩৬) রচনা করেন। তপতীর ভূমিকায় তিনি রাজা ও রানী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

'রাজা ও রানী আমার অল্প বয়সের রচনা, সেই আমার প্রথম নাটক লেখার চেষ্টা।

'সুমিত্রা ও বিক্রমের সম্বন্ধের মধ্যে একটি বিরোধ আছে— সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই বিরোধের সমাধা হয়। বিক্রমের যে প্রচণ্ড আসক্তি পূর্ণভাবে সুমিত্রাকে গ্রহণ করবার অন্তরায় ছিল, সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই আসক্তির অবসান হওয়াতে সেই শান্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্য উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হল, এইটেই রাজা ও রানীর মূলকথা।

'রচনার দোষে এই ভাবটি পরিস্ফুট হয় নি। কুমার ও ইলার প্রেমের বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিকতার দ্বারা নাটককে বাধা দিয়েছে এবং নাটকের শেষ অংশে কুমার যে অসংগত প্রাধান্য লাভ করেছে তাতে নাট্যের বিষয়টি হয়েছে ভারগ্রস্ত ও দ্বিধাবিভক্ত। এই নাটকের অন্তিমে কুমারের মৃত্যু -দ্বারা চমৎকার-উৎপাদনের চেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে— এই মৃত্যু আখ্যানধারার অনিবার্য পরিণাম নয়।

'অনেক দিন ধরে রাজা ও রানীর ত্রুটি আমাকে পীড়া দিয়েছে। কিছুদিন পূর্বে শ্রীমান গগনেন্দ্রনাথ যখন এই নাটকটি অভিনয়ের উদ্‌যোগ করেন তখন এটাকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত করে একে অভিনয়যোগ্য করবার চেষ্টা করেছিলুম। দেখলুম এমনতরো অসম্পূর্ণ সংস্কারের দ্বারা সংশোধন সম্ভব নয়। তখনই স্থির

করেছিলুম এ নাটক আগাগোড়া নূতন করে না লিখলে এর সদ্গতি হতে পারে না। লিখে বইটার সম্বন্ধে আমার সাধ্যমত দায়িত্ব শোধ করেছি।'

তপতী-রচনার কিছুদিন পূর্বে রাজা ও রানী অভিনয়ের জন্য সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত করিবার কথা কবি যে উল্লেখ করিয়াছেন সেই অভিনয়-কালে (১৯২৯) সংস্করণের নাম ছিল 'ভৈরবের বলি'। ভৈরবের বলির অভিনয়পত্রীতে উহাকে "রবীন্দ্রনাথের রাজা ও রানীর কবি-কৃত নূতন সংস্করণ" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সংক্ষেপণ ও পরিবর্তন পাণ্ডুলিপি-আকারে রক্ষিত আছে, রাজা ও রানীর কোনো সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হয় নাই।

বউ-ঠাকুরানীর হাট

বউ-ঠাকুরানীর হাট ১২৮৯ সালের পৌষে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। রচনাবলীতে বর্তমান স্বতন্ত্র সংস্করণের (শ্রাবণ ১৩৩৯) পাঠ অনুসৃত হইয়াছে। প্রথম ও বর্তমান স্বতন্ত্র সংস্করণের কতকগুলি সাধারণ প্রভেদ নির্দেশ করা গেল।

প্রথম সংস্করণের প্রথম পরিচ্ছেদ বর্তমান স্বতন্ত্র সংস্করণে নাই; কাহিনীটির শেষ দৃশ্যের এক অংশ প্রথম পরিচ্ছেদেই নিবদ্ধ করা হইয়াছিল; তাহা চত্বারিংশ পরিচ্ছেদেও ভাষান্তরে লিপিবদ্ধ ছিল।

প্রথম সংস্করণের সপ্তদশ পরিচ্ছেদ বর্তমান স্বতন্ত্র সংস্করণে নাই।

প্রথম সংস্করণের ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদের প্রথমাংশ পূর্বতন (প্রথম সংস্করণে ২৫শ ও বর্তমান সংস্করণে ২৩শ) পরিচ্ছেদের শেষে যুক্ত হইয়াছে, অবশিষ্ট অংশ বর্জিত।

এতদ্‌ব্যতীত, বিভিন্ন পরিচ্ছেদে অনেক অংশ পরিবর্জিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছে।

বউ-ঠাকুরানীর হাটের কাহিনী অবলম্বনে কবি 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৩১৬) নাটক রচনা করেন; 'প্রায়শ্চিত্ত' পরে 'পরিত্রাণ' (১৩৩৬) নামে পুনর্লিখিত হয়।

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র ১২৮৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণে গ্রন্থকারের ভূমিকায় লিখিত আছে—

'বন্ধুদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া এই পত্রগুলি প্রকাশ করিলাম। প্রকাশ করিতে আপত্তি ছিল; কারণ কয়েকটি ছাড়া বাকি পত্রগুলি ভারতীর উদ্দেশে লিখিত হয় নাই, সুতরাং সে সমুদয়ে যথেষ্ট সাবধানের সহিত মত প্রকাশ করা যায় নাই, বিদেশীয় সমাজ প্রথম দেখিয়াই যাহা মনে হইয়াছে তাহাই ব্যক্ত করা গিয়াছে।

কিন্তু ইহাতে, আর কোনো উপকার হউক বা না হউক একজন বাঙালি ইংলণ্ডে গেলে কিরূপে তাহার মত গঠিত ও পরিবর্তিত হয় তাহার একটা ইতিহাস পাওয়া যায়।

'আমার মতে যে ভাষায় চিঠি লেখা উচিত সেই ভাষাতেই লেখা হইয়াছে। আত্মীয়স্বজনদের সহিত মুখামুখি একপ্রকার ভাষায় কথা কহা ও তাঁহারা চোখের আড়াল হইবামাত্র আর-একপ্রকার ভাষায় কথা কহা কেমন অসংগত বলিয়া বোধ হয়।

'পূজনীয় ভারতীর সম্পাদক মহাশয় আমার পত্রের উত্তরে তাঁহার যে-সকল অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাও পুস্তকে নিবিষ্ট হইল। সকল বিষয়েরই দুই পক্ষ আছে। উভয় পক্ষই পাঠকদের দেখা আবশ্যক।'

এই গ্রন্থের প্রকাশ কবি পরে আর ইচ্ছা করেন নাই, এইজন্য বহুকাল ইহা গ্রন্থাকারে প্রচারিত ছিল না। বহুকাল পরে 'পাশ্চাত্যভ্রমণ' (আশ্বিন ১৩৪৩) গ্রন্থে পরিবর্তিত রূপে ইহা 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'র দ্বিতীয় খণ্ডের সহিত প্রকাশিত হয়। বর্তমান রচনাবলীতে পাশ্চাত্যভ্রমণের পাঠ অনুসৃত হইয়াছে। য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র পুনঃপ্রকাশে কবির অনভিপ্রায় ও পরে স্বীকৃতির কারণ তিনি পাশ্চাত্যভ্রমণের ভূমিকায় বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, প্রথম সংস্করণের ভূমিকার প্রথম কয় ছত্রেও সে সম্বন্ধে ইঙ্গিত আছে। পাশ্চাত্য ভ্রমণের ভূমিকাটিও বর্তমান রচনাবলীতে প্রকাশিত হইল।

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রগুলি যখন ভারতীতে প্রকাশিত হয় তখন ভারতী-সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ওই পত্রগুলির কোনো কোনোটিতে প্রকাশিত মন্তব্যের বিশেষ সমালোচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পত্রগুলিতে "ইঙ্গবঙ্গ"দের সম্বন্ধে যেমন কঠিন সমালোচনা ও ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন, বিলাতের ধনীসমাজের মহিলাদের "বিলাসিনী" শ্রেণীর সম্বন্ধে যেমন পরিহাস করিয়াছিলেন, বিদেশের তুলনায় দেশের সামাজিক রীতি ও প্রথার (বিশেষত স্ত্রীস্বাধীনতার অভাব ও গুরুজনদের সহিত ব্যবহারের প্রচলিত রীতির) সম্বন্ধেও তেমনিই বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভারতী-সম্পাদক দেশীয় প্রথা ও রীতির সমর্থন ও রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যের প্রতিবাদ করিয়া টিপ্পনী প্রকাশ করেন, রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী পত্রে তাহার উত্তর দেন। এইরূপে বাদপ্রতিবাদ চলিয়াছিল। প্রথম সংস্করণেও তাহা মুদ্রিত আছে। পাশ্চাত্যভ্রমণে এই বাদপ্রতিবাদ সম্পূর্ণ বর্জিত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণের ষষ্ঠ পত্রের অংশ, সপ্তম পত্র, নবম পত্র ও দশম পত্র, এবং তৎসহ ভারতী-সম্পাদকের মন্তব্যগুলিও পরিত্যক্ত হইয়াছে। অন্য পত্রগুলিরও অনেক অংশ বর্জিত হইয়াছে।

য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি

য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি প্রথমে দুই খণ্ডে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল (বৈশাখ ১২৯৮, আশ্বিন ১৩০০)। ইহার প্রথম খণ্ড "ভূমিকা", তাহাতে য়ুরোপ ও ভারতবর্ষের সমাজ সংস্কৃতি জীবনদর্শন প্রভৃতির তুলনা ও আলোচনা আছে; ভ্রমণবৃত্তান্ত নাই। দ্বিতীয় খণ্ড ভ্রমণের ডায়ারি।

য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারির কোনো খণ্ডই পরবর্তী কালে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রচলিত ছিল না। প্রথম খণ্ডের প্রথম অংশ 'স্বদেশ' গ্রন্থে 'নূতন ও পুরাতন' নামে, ও দ্বিতীয় অংশ 'সমাজ' গ্রন্থে 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' নামে প্রবন্ধাকারে সংকলিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় খণ্ড 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থে 'য়ুরোপ-যাত্রী' নামে মুদ্রিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় খণ্ডটি পরে 'পাশ্চাত্যভ্রমণ' গ্রন্থে য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রের সহিত মুদ্রিত হয়। রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে এই দ্বিতীয় খণ্ডটি পাশ্চাত্যভ্রমণের পাঠ-অনুসারে মুদ্রিত হইল।

—

[রবীন্দ্র-রচনাবলীতে সংকলনের পরবর্তী কালে, রবীন্দ্র-শতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে, 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' ও 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' উভয় গ্রন্থেরই প্রথম-প্রকাশ-অনুযায়ী পুনর্মুদ্রণ হইয়াছে; প্রত্যেক গ্রন্থে পরিশিষ্ট ও বিশদ গ্রন্থপরিচয় যুক্ত হইয়াছে। শেষোক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্টে 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি : খসড়া' সংযুক্ত হওয়ায়, রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম দিকের রচনায় ভাব ও ভাষা -গত বিবর্তন কিভাবে কতদূর হইয়াছে তাহাও লক্ষ্য করিবার বিশেষ সুযোগ ঘটিয়াছে।]

—

রবীন্দ্রনাথ বহু পত্রে, প্রবন্ধে ও ভাষণে স্বীয় রচনার আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচনার মর্মগ্রহণের পক্ষে সেগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই আলোচনার কতকগুলি কোনো কোনো গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে। কতকগুলি গ্রন্থের ভূমিকারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। বর্তমান রচনাবলীতেও সেগুলি সেইভাবে মুদ্রিত হইবে। অন্যগুলি পাঠকের সহায়তার জন্য একত্র সংগৃহীত হইয়া পরিশিষ্ট খণ্ডে মুদ্রিত হইবে।

বর্তমান খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত, ছবি ও গান, প্রকৃতির প্রতিশোধ, বাল্মীকিপ্রতিভা, মায়ার খেলা, য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র— এগুলি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বা বিস্তারিত আলোচনা জীবনস্মৃতিতে লিপিবদ্ধ আছে। য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে বর্ণিত অনেক ব্যক্তির চরিত্র-চিত্র পূর্ণতর ভাবে জীবনস্মৃতিতে লিখিত আছে ; বউ-ঠাকুরানীর হাট উপন্যাসের উল্লেখ জীবনস্মৃতিতে আছে। 'মানুষের ধর্ম' (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমলা-বক্তৃতামালা ১৯৩৩) গ্রন্থের পরিশিষ্টে 'মানবসত্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রভাতসংগীতের অনেক কবিতা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। কোনো কোনো আলোচনা প্রয়োজনবোধে গ্রন্থপরিচয়ে অংশতঃ সংকলিত হইল। বর্তমান রবীন্দ্র-রচনাবলীর বিভিন্ন গ্রন্থের ভূমিকা ও সূচনাগুলি রবীন্দ্র-রচনাবলীর জন্য কবি-কর্তৃক নূতন লিখিত।

—

প্রথম সংস্করণের উৎসর্গপত্রগুলি অনেক গ্রন্থেই পরবর্তী সংস্করণে বর্জিত হইয়াছিল। রবীন্দ্র-রচনাবলীতে সেগুলি পুনঃসংকলিত হইল। একটি উৎসর্গের কবিতা-অংশ বর্জনের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

গ্রন্থপ্রকাশের কাল -অনুসারে 'চিঠিপত্র' (বর্তমানে 'সমাজ' গ্রন্থের অন্তর্গত) য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রের পরেই ছাপা উচিত ছিল। কিন্তু পাশ্চাত্যভ্রমণ গ্রন্থে য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র ও য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি (দ্বিতীয় খণ্ড) একই ভূমিকায় কবি আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া ও ওই ভূমিকাটি বর্তমান রচনাবলীতেও রক্ষা করা বাঞ্ছনীয় মনে হইয়াছে বলিয়া, য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র ও য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি (দ্বিতীয় খণ্ড) পর পর এই রচনাবলীতে মুদ্রিত হইল ; 'চিঠিপত্র' রবীন্দ্র-রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত হইবে।

—

বর্ণানুক্রমিক সূচী